উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ, ১৩৭৫
৭১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' ৭১তম বর্ষে পদার্পণ করিল।

পত্রিকাটি ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে এটি পাক্ষিক পত্রিকা ছিল, পরে দশম বর্ষ হইতে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

৭০ বৎসরের এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে, জনগণের চিন্তাধারার কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আনন্দের কথা, এই সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিবার সময় উদ্বোধন প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় তাহার 'ব্যক্তিত্ব'কে বজায় রাখিয়াই জনপ্রিয় থাকিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে পরিবর্তন যেখানে অবশ্যম্ভাবী এবং বাঞ্ছনীয়ও, আমাদের জাতীয় জীবনের সেই বাহ্য বিকাশকে সর্বদা স্পর্শ করিয়া থাকিলেও উদ্বোধনের ব্যক্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে জাতির প্রাণস্বরূপ কতকগুলি মৌলিক সত্যের ভিত্তির উপর, যে সত্য চিরদিনই এক।

স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধনের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে 'উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য' কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানবসভ্যতায় দুটি প্রাচীন জাতির, গ্রীক ও ভারতীয় জাতির অবদান প্রধান। প্রথমটি মানুষকে জাগতিক উন্নতির শিখরে উঠিতে শিখাইয়াছে, দ্বিতীয়টি শিখাইয়াছে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমে উঠিতে। এ-দুটির কোনটিকে বাদ দিয়া মানবসভ্যতা উন্নত হইতে, এমনকি বাঁচিতেও পারে না। যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এই দুই সভ্যতার মিলন মানবসভ্যতাকে অগ্রগতির পথে অধিকতর অগ্রসর করাইয়াছে। আধুনিক যুগে আবার উহাদের মিলনের সময় উপস্থিত এবং তাহা ঘটিবে ভারতবর্ষেই—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"।

এই মিলন ঘটাইবার কাজটি জটিল; একাজে আমাদের গভীরভাবে বহু বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, নিজস্ব অবলম্বনভূমিকে সর্বাগ্রে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, নতুবা পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া নিজস্বতা হইতে দূরে চলিয়া যাইবার ভয় সমূহ। এই মিলনের কাজে সহায়তা করাই "উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য"।

কিভাবে এই মিলন ঘটাইতে হইবে, তাহারও ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আধুনিক "ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের (গ্রীকগণের) মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান", কিন্তু "আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।" আমাদের কাজ তাই দুইটি—তামসিকতা হইতে টানিয়া তুলিয়া জাতিকে পাশ্চাত্যের রজোগুণে, কর্মোদ্যমে ভরাইয়া তোলা, জাগতিক উন্নতি করা, এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ধর্মজীবনের যথার্থ বিকাশ-সাধন করিয়া জাতিকে দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন ঘটাইতে যাইয়া ভুলক্রমে সর্ববিষয়ে কেবল পাশ্চাত্যকে অনুকরণের স্পৃহা আমাদের জাগিতে পারে (বর্তমানে যাহা হইতেছে), আমরা ধর্মজীবনের বিকাশের চেষ্টা না করিয়া পাশ্চাত্যের আপাতমধুর ইহকাল-সর্বস্বতার দিকে ছুটিতে পারি—এ আশঙ্কা স্বামীজীর মনে জাগিয়াছিল। তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে আমাদের "পৈতৃক সম্পদ"কে—ভারতের

সনাতন আদর্শকে সর্বদা দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে।

উদ্বোধন সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া সাধ্যমত এই কাজ করিয়া আসিতেছে। নানাভাবে যাঁহারা এই কাজে আমাদের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, নববর্ষের যাত্রারম্ভে তাঁহাদের সকলকেই—লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক প্রভৃতি সকলকেই আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি, সহায়তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য "সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।"

বর্তমান সমস্যা

বর্তমানে আমাদের জাতি বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ইহার কারণ, স্বাধীনতা-লাভের পর আমরা স্বামীজীকে, ভারতের সনাতন আদর্শকে আবার ভুলিতে বসিয়াছি। স্বামীজীর আদর্শকে গ্রহণ করা ছাড়া, জাতিকে তাহার শক্তির মূল উৎস ধর্মের ভিত্তিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া এ সমস্যা-সমাধানের অন্য কোন পথ আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজীই ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। স্বামীজীর ঈপ্সিত পথ ধরিয়া, ভারতের সনাতন আদর্শ আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এবং পাশ্চাত্যের "আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারণশীল রজোগুণ" লইয়া ভারতের যে বীর সন্তানগণ দেশসেবায় নামিয়াছিলেন, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে তাঁহাদেরই অবদান সর্বাধিক, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

স্বামীজীর বাণী এবং গীতাই ছিল অগ্নিযুগের পূজারীদের প্রেরণার উৎস। দেশাত্মবোধের অগ্নিকে তাঁহারাই উদ্দীপিত করিয়াছিলেন বিপুল শিখায়, যাহার দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সমগ্র দেশে। এই দেশাত্মবোধকে যিনি জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই মহাত্মাজীর জীবনেও প্রাচ্যের ধর্মভাবের সহিত পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সমন্বয় হইয়াছিল। বলা যায়, "তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই"—স্বামীজীর এই বাণীরই মূর্ত প্রকাশ যেন তাঁহার জীবন। আমাদের জড়তা ও দ্বিধা চূর্ণ করিয়া যিনি দেশবাসীর অন্তরকে তেজোদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই নেতাজীর জীবনও ছিল স্বামীজীর ঈপ্সিত ধর্মভিত্তিক ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে সমধিক সহায়ক এই জীবনগুলি সবই ছিল সংযম, ত্যাগ ও ঈশ্বরবিশ্বাসের সহিত বীর্যবত্তা, নির্ভীকতা ও স্বদেশপ্রেমের মিলন-ভূমি, ধর্মই যার মূল উৎস। ধর্ম যে মানুষকে ঝিমাইয়া দেয়, ধর্ম যে মানুষকে জনগণের দুঃখমোচনে উদাসীন করিয়া বাস্তব হইতে কল্পনার রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়,—একথা যে কত অন্তঃসারশূন্য, তাহা আর সবকিছু ছাড়িয়া দিলেও আমাদের যুগের স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার আদর্শানুগামী এই কয়টি জীবনই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আজ স্বাধীনতালাভের এতদিন পরও আমরা জাতীয় আদর্শই নিশ্চিতভাবে ধরিতে এবং তাহার বাস্তব রূপায়ণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলাম না। একদিকে তামসিকতায় এখনো আমরা আচ্ছন্ন, অপর দিকে পাশ্চাত্যের ভাবগ্রহণের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্যের দৃষ্টি লইয়াই আমাদের সত্ত্বগুণ ভিত্তিক জাতীয় আদর্শগুলির মূল্যায়ন করিয়া চলিয়াছি, জাতীয় জীবনে সেগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াসী হওয়া তো দূরের কথা। আত্মবিশ্বাসহীন এই প্রয়াস যে কী পরিমা

লজ্জাকর, জাতি-গঠনে কী পরিমাণ বিপজ্জনক তাহা ভাবিয়াও দেখিতেছি না।

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার আমাদের সজাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ভারতের জাতীয় জীবন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মই তাহার জীবনী-শক্তি, তাহার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তস্বরূপ। ইহা দূষিত হইয়াছে, ইহার ধারা ক্ষীণ হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি জাতিকে বাঁচাইতে চাই, ইহাকে সংশোধিত করিয়া, ইহার ধারাকে বাড়াইয়া জাতির ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই বাকী আর সব কিছু ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া, দূষিত হইয়াছে বলিয়া রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া অন্য যে-কোন প্রয়াসে যদি জাতিকে বাঁচাইতে যাই—ধর্মকে বাদ দিয়া যদি যে-কোন প্রকারের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি গ্রহণ করি—তাহা হইলে জাতি হিসাবে ভারতের মৃত্যু অবধারিত।

আমরা এখন ঠিক এই বিপরীত কাজটিই করিতেছি। শিক্ষা হইতে ধর্ম নির্বাসিত; শুধু নির্বাসিত বলিলে ভুল হয়, ধর্ম-বিরোধী যে-সব ভাবধারা যথেচ্ছভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতেছে, সেগুলিকে বাধা দেওয়ারও কোন প্রয়াস আমাদের নেই। এই অবস্থার ভিতর আমরা শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছি, ছাত্রগণকে আদর্শ 'ভারতীয় নাগরিকে' পরিণত করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এতদিন স্বাধীনভাবে এ ধারায় কাজ করিবার পর লাভ কি হইয়াছে? রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসা প্রভৃতি বড় বড় কথা এখনো আমরা পটভূমিতে রাখিয়াছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন ছোট আদর্শকেও কার্যকরী করিবার শক্তি আমাদের নাই! এমনকি, জাতীয় আদর্শের ভাবগুলিকে যাহারা আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে, তাহাদের রোধ করিবার শক্তিও নাই। অহিংসা প্রভৃতি যে খুব বড় কথা, সত্ত্বগুণোদ্ভূত, সে সম্বন্ধে আমরা কেন সকল চিন্তাশীল মানুষই একমত। কিন্তু বক্তব্য হইল, উহার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি কি না, মহাত্মাজী প্রভৃতির মতো জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিনা। দুর্বলের মুখে, অযোগ্যের মুখে বড় বড় কথা অপরের হাস্যোদ্রেকই করে, মানুষকে উন্নত না করিয়া তাহাকে অবনতই করে—উহা জন্মালস্যের উপর বৈরাগ্যের আবরণ' টানারই তুল্য। সামাজিক বিষয়ে আমরা নিয়মকানুন করিতেছি উদার দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়া, সে দৃষ্টি কিন্তু সবসময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপর সমভাবে পড়িতেছে না; ভারতীয়তার গভীরে ডুবিয়া ত্যাগপূত দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করা তো পরের কথা। ইহা সর্বনাশা পথ, মৃত্যুর পথ।

স্বাধীনতালাভের পূর্বে স্বামীজীর ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার শুভ ফলও পাইয়াছি। জাতিগঠনের সময় তাঁহার ভাবগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক—'মানুষে'র প্রয়োজন স্বাধীনতা-অর্জনেই শেষ হয় না, খাঁটি মানুষের প্রয়োজন সবসময়েই। স্বামীজী সর্বাধিক জোর দিয়াছেন 'মানুষ' গড়ার কাছে; স্বামীজীর কথা, 'মানুষ'ই হইল দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; 'মানুষে'র প্রয়োজন সর্বকালে, সর্বদেশে। তাছাড়া ভারতের উন্নতির জন্য সর্বাধ ক্ষেত্রেই স্বামীজী আলোকসম্পাত করিয়া গিয়াছেন; এখন সেদিকে আমাদের ফিরিয়া তাকানো প্রয়োজন। সর্বপ্রথম প্রয়োজন, জাতির মধ্যে যথার্থ ধর্মজীবনের বিকাশের প্রচেষ্টা। আমরা যেন না ভুলি, স্বামীজীর এ ধর্ম হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন বিশেষ

ধর্ম নহে, আবার কোনটিকে বাদ দিয়াও নহে। স্বামীজীর মতে—যাহা মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই ধর্ম ; যাহা মানুষকে অপরের জন্য আত্ম-বিসর্জন করিতে শেখায়, তাহাই ধর্ম ; যাহা সকল মানুষকে এক বলিয়া ভাবিতে শেখায়, মানুষকে যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, যাহা মানুষকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে পারে তাহাই ধর্ম। স্বামীজী যে ধর্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা মানুষকে, সমাজকে, দেশকে, সমগ্র জগতের মানুষকেই 'পূজা' করিতে শেখায়, তাহার কল্যাণসাধনে ব্রতী করে। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টধর্ম প্রভৃতি পথগুলি এই ধর্মলাভের উপায় মাত্র। আমরা যেন না ভাবি, যে-কোন পথেই হউক, ধর্মাচরণ বাদ দিয়া দেশে ব্যাপকভাবে মানুষকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করিতে বা দেবতার মতো করিয়া গাড়য়া তুলিতে পারিব। যে যাহার রুচিমত যে-কোন ধর্মপথ গ্রহণ করিয়া 'মানুষ' হইতে পারে, কিন্তু জীবনে ধর্মাচরণ চাই-ই। ধর্মের পোশাকমাত্র গায়ে জড়াইয়া বা ধর্মকে বাদ দিয়া বা ধর্মসম্বন্ধে উদারতার অছিলায় উদাসীন থাকিয়া এরূপ মানুষ—যাহা আমরা বিদ্যালয়ে সমাজে, রাষ্ট্রে চাহিতেছি—তৈয়ারী করা সম্ভব নহে।

আর সেই সঙ্গে স্বামীজীর আরো একটি আদর্শকে অবিলম্বে কার্যকরী করার প্রয়াস প্রয়োজন : যাহাদের দুঃখে তিনি দিনের পর দিন কাঁদিয়াছেন, সেই দুর্গতদের উন্নতির জন্য এমন কিছু করা, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে ভারতীয় আদর্শকে অবলম্বন করিয়াও তাহাদের দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহার জন্য মানবজাতির এই শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আজ পর্যন্ত এবিষয়ে আমরা উদাসীন, যাহার বিষময় ফলে জড়বাদী আদর্শকেই উন্নতির একমাত্র সহায়ক ভাবিয়া তাহারা উহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছে ; হয়ত একদিন আমাদের যা কিছু মহনীয়, যা কিছু বরণীয়, তাহা সবই ভাঙিয়া ফেলিয়া ভারতকে দেহসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতিগুলিরই অন্যতম করিতে চাহিবে।

শুধু ভারতে নয়, জগতের সর্বত্রই আজ মানুষ নিজেকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, মানুষের জয়গান আজ সর্বত্র। মানুষের মতো বাঁচিবার দাবীতে, মানুষের স্বাধীনতার দাবীতে, সাম্যের জয়গানে আজ জগতের আকাশ-বাতাস পূর্ণ। মানুষ যে আজ আত্মবিশ্বাস লইয়া জাগিতেছে, ছাত্র-আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দোলন, বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির নিপীড়নের কবল হইতে মুক্ত হইবার আন্দোলন এই জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে। স্বামীজী এই আত্মবিশ্বাস চাহিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই সব জাগরণ দেহসীমিত মানুষকে লইয়া ; মাত্র ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন আসল মানুষের, মানুষের দেহাতীত সত্তারও জাগরণ, যাহার জন্য সর্বাগ্রে দেশকে উপনিষদের ভাবে ভাসাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। একমাত্র এই জাগরণই মানুষকে যথার্থ সাম্য, যথার্থ স্বাধীনতা দিতে পারে, মানুষকে সারাজীবন ধরিয়া থাকিবার মতো একটা অবলম্বন দিতে পারে, মানুষের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে পারে। ইহার অভাব বলিয়াই আজ মানুষের কল্যাণের নাম লইয়া অকল্যাণই আসিতেছে, জাগরণ উন্নতির পথকে প্রশস্ততর না করিয়া বিভ্রান্তি ও সমস্যারই সৃষ্টি করিতেছে।

ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর না হইলে মানুষ তাহার আসল স্বরূপ, আসল

উন্নতিকে কোনদিনই চিনিতে পারিবে না, তাহার ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থপরতা কোনদিনই কমিবে না, এবং এই স্বার্থপরতাই আত্মঘাতী সংঘর্ষের জন্ম দিবে; যেমন আজ বহির্বিশ্বে নানাস্থানে ঘটিতেছে।

স্বামীজী তাই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির, ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের সমন্বয় চাহিয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া ভারতের জন্য, কারণ ভারত ছাড়া এ সমন্বয়ের আদর্শ অপর কোন জাতিই দেখাইতে পারিবে না। স্বামীজীর কথামত অবিলম্বে জাতীয় জীবনে ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং মানুষকে তাহার আসল স্বরূপে দেখিয়া সেরূপে তাহাকে সেবা করিবার, বিশেষ করিয়া তাঁহার "পাপী নারায়ণকে, তাপী নারায়ণকে, সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্রনারায়ণকে" "সর্বাধিক উপাস্য দেবতা" করিবার জন্য অবিলম্বে আমাদের সর্বাধিক শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির মূলে যাহা রহিয়াছে, এ-পথেই তাহার অপসারণ সম্ভব।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র*

মঠ
পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা
১৭. ৯. ৯৭

কুমারী মার্গারেট ই. নোব্‌ল সমীপেষু,
রাস্কিন স্কুল, ব্রান্টউড্ উর্পল
উইম্বলডন, লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম

প্রিয় মহাশয়া,

আমার পূর্ব পত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুলাই, ১৮৯৭-এ আমাদের ভারতবর্ষের কার্যবিবরণী প্রেরণ করিতেছি।

প্রথম পত্রে 'মঠ' নামে অভিহিত কেন্দ্রীয় শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সংক্ষেপিত বর্ণনা দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই চিঠিতে মনে হয়, মঠের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন; পূর্ব পত্রে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করা হয় নাই। আমাদের পরমপ্রিয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের স্বল্পকাল পরে, যে-কয়টি তরুণ যুবক তাঁহার পবিত্র সত্তার প্রতি গভীর ভালোবাসায় তাঁহার চারিপাশে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আচার্যদেবের আদেশ ও উপদেশাবলী জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য এক সন্ন্যাসিসঙ্ঘে পরিণত হন। মানবকে অধ্যাত্মজগতে পৌঁছিতে হইলে ত্যাগের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। আচার্যদেবের পদাঙ্ক-অনুসরণের জন্য ইঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমে ইঁহাদের সংখ্যা ছিল এগারো। বর্তমানে এই সংখ্যা তেইশে উঠিয়াছে। এ ছাড়া আরো ছয়জন যুবক রহিয়াছেন, যাঁহারা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ না করিলেও কায়িক, মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্ম অনুশাসন অবলম্বনে জীবনযাপন করিতেছেন। ধ্যান, ভজন, মননচর্চা, নৈতিক

---

* মূল ইংরেজী হইতে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

জীবনযাপন এবং সর্ববিষয়ে কঠোর সংযম—এইভাবে মঠের জীবনধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। মঠের সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বাধ্যায়চর্চা বিশেষভাবে হইতেছে; বেদান্ত ও অপরাপর দর্শনের শাখাসমূহ, সেইসঙ্গে গীতা, ভাগবত—যাহাতে ভক্তিযোগ বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত—এই ধরনের গ্রন্থই বেশীর ভাগ সময়ে পঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সভ্যগণ সকলে আমাদেরই মধ্যে কোনো সন্ন্যাসীমহারাজের ভাষণ শুনিতে সমবেত হন (আমার পূর্ব পত্রে এই সভা শিক্ষণশ্রেণীরূপে অভিহিত)। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম বিষয়ে শাস্ত্রীয় সূত্রসকল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক বক্তৃতার ক্লাশগুলি বিশেষ উপভোগ্য হয়। জুলাই মাসে আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—(ক) সন্ন্যাসীদের মঠ—স্বামী ত্রিগুণাতীত, (খ) বৈরাগ্য—স্বামী বিমলানন্দ, (গ) যথার্থ ধর্ম—স্বামী সুবোধানন্দ, (ঘ) ব্রহ্মচর্য—স্বামী প্রকাশানন্দ।

(২) আপনাকে লেখা আমার পূর্ব পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে সঙ্ঘের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বর্তমান পত্রে সঙ্ঘের কার্যক্ষেত্রের পরিধি, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

আমাদের বিশ্বাস, জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপনই আমাদের পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এই পরম আদর্শের রূপদানই আমাদের সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ কোনো মতবাদ লইয়া সংগ্রাম করিতে, অগণিত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিতে, হিন্দুধর্ম অথবা অন্য কোনো ধর্মের স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা করিতে আমরা বিশ্বরঙ্গভূমিতে প্রবেশ করি নাই, কারণ আমাদের দৃষ্টিতে "জগতের সব ধর্মই এক অনন্ত সর্বজনীন ধর্মের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই বিভিন্ন ধর্মমতগুলির মধ্যে শান্তিস্থাপনই আমাদের মূলমন্ত্র।" রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বাস, এই মহতী বাণী ঘোষণাই তাহার বিশেষ অধিকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। অবশ্য আমরা যে-সত্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই সত্য আমরা সর্বদাই অবলম্বন করিয়া থাকিব। আজ আমাদের প্রতি লোকে অবিচার করিয়া আমাদের উদ্দেশ্যের ভুল ব্যাখ্যা করে, সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে, কিছু লোক নিন্দা করে, আর বেশীর ভাগ লোকই সহানুভূতিহীন। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় সাড়া অতি সামান্যই মেলে, যদি অবশ্য সেই প্রচেষ্টা অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত না হয়। কিন্তু এ সকলের জন্য আমাদের কোনো অভিযোগ নাই। আমরা যে-কোনো বর্ণ বা সম্প্রদায়েরই হই না কেন, দৈহিক বা মানসিক, জাতিগত বা ধর্মগত যে-কোনো পার্থক্যই আমাদের মধ্যে থাকুক না কেন, সেই এক ব্রহ্মই সকলের অন্তরে প্রকাশিত, কাজেই ধর্ম লইয়া বিবাদ এখন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন, সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও সকলের অন্তর্নিহিত ঐক্যেরই প্রাধান্য লাভ করা উচিত—এই আদর্শপ্রচারের উপযুক্ত মুহূর্ত বর্তমানকালের মতো আর কখনো আসে নাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের কলিকাতা কেন্দ্রের সাপ্তাহিক সভাগুলি আমাদের প্রিয়তম প্রভু কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও স্বীয় জীবনে আচরিত আদর্শগুলিরই অনুধ্যান ও জীবনরূপায়ণের বিশেষ উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য সেইসব সভায়, যাঁহারা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং বস্তুতঃ যাঁহাদের জীবনে তাঁহার উপদেশাবলী রূপায়িত হইয়াছে, তাঁহারাই ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত

স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া থাকেন। এইসব সভার সভ্যবৃন্দ যাহাতে ধর্মের মূল আদর্শগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাঝে মাঝে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। বিশ্বাস, ভক্তি ও উপাসনার উদাহরণরূপে হিন্দুধর্মের সাধু-সন্ত, আচার্য ও অবতারগণের জীবনী বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়। জুলাই মাসে বাবু জি. সি. ঘোষ এবং বাবু এম্. এন্. গুপ্ত মহোদয়দের শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিপ্রসঙ্গ যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্মগ্রহণকারী মুসলমান মহাপুরুষ হরিদাসের সম্বন্ধে বাবু এস্. এন্. বোসের লেখাটি অতি মূল্যবান ও চমৎকার হইয়াছিল।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রী জে. জে. গুড্উইন মাদ্রাজ কেন্দ্রের পক্ষে মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হইয়াছেন এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পক্ষে বিশেষ সহায়করূপে পরিগণিত হইয়াছেন। মঠের সাধারণ কাজকর্ম ছাড়া মাদ্রাজের ইয়ং মেন্‌স্ হিন্দু এসোসিয়েশনে নিম্নলিখিত বক্তৃতাসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে—(ক) ভক্তিযোগ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, (খ) শ্রীচৈতন্যের জীবন ও উপদেশাবলী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, (গ) কর্ম—জে. জে. গুড্উইন।

(৪) স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতে আমরা পত্র পাইয়াছি। কলম্বোয় তিনি ভালভাবে কাজের সূচনা করিয়াছেন। কয়েকজন য়ুরোপীয় মহিলা ও ভদ্রমহোদয়কে লইয়া তিনি বক্তৃতার ক্লাশ খুলিয়াছেন এবং রাজযোগ লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। সপ্তাহে তিন দিন করিয়া তিনি ক্লাশ করিতেছেন। একটি গীতা ক্লাশও খোলা হইয়াছে। কলম্বোর শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের প্রায় বারো জন এই ক্লাশে যোগদান করেন। আশা করি, খুব শীঘ্রই আমরা কাজের বিস্তৃত বিবরণ পাইব।

(৫) মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সময়োচিত সেবাকার্য সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছে এবং সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লেভিঞ্জ, যিনি জনসাধারণের মধ্যে বস্ত্রবিতরণের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত স্বামীজীর সেবাকার্য সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ একই জেলার কান্দি মহকুমায়, যেখানে ত্রাণকার্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, স্বামী অখণ্ডানন্দ আরও একটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দিনাজপুর জেলার মতো বাংলার আর অন্য কোনো স্থানে এত চরম ও ব্যাপক দুঃখদুর্দশা দেখা দেয় নাই। সরকারী ও বেসরকারী সব সমাচারেই দেশের এই অঞ্চলটিতে আশু সেবাকেন্দ্র-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত। তাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সহায়ক স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে রওনা হইয়া যান এবং স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবোনহেম কার্টারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিরাল স্টেশনে সেবাকার্যের সূচনা করিয়াছেন। আমাদের আবেদনে বহু সহৃদয় ব্যক্তি সাড়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই আমরা কৃতজ্ঞ, বিশেষভাবে মাদ্রাজের সেই ভদ্রলোকটির নিকট, যিনি সাধারণ আয়ের মানুষ হইলেও এই সেবামূলক কার্যের জন্য ১৫০০৲ দান করার মতো মহৎ হৃদয়ের অধিকারী।

জুলাই মাসের এই বিবরণী প্রেরণে বিলম্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনার অতি বিশ্বস্ত

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ*

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার

...আজ এখানে যে বিষয়টি আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে সেটি সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। আমরা প্রায়ই 'ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁ' কথাটা ব্যবহার করি, কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস যখন আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই, সেখানে রেনেসাঁ কথাটি যে-অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য, সেটি ভারতবর্ষের পটভূমিকায় অনুপস্থিত। সেজন্য আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে রেনেসাঁ কথা থেকে ঐ 'রে' (Re) কথাটাকে বাদ দিলে বোধ হয় ভালো হয়—যদি শুধু 'নেসাঁ' কথাটা থাকে—জাগরণ কথাটা থাকে, তাহলে হয়ত ইতিহাসের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

এই যে জাগরণ, স্বামীজী যা এনেছিলেন, তা হঠাৎ হয়নি। স্বামীজী বলেছিলেন, "কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে।"—সত্যি কথা। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ একদিনে হয়নি—তার পেছনে সুগভীর প্রস্তুতি ছিল। যেমন কবি বলেছেন,—'রাত্রির তপস্যা, সে কি আনিবে না দিন?' রাত্রির সুগভীর তপস্যা ছিল। সেইজন্য আমরা প্রভাতসূর্যকে আহ্বান করতে পেরেছিলাম। এই যে জাগরণ তার মূল লক্ষণগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, তার ভেতরে মোটামুটিভাবে তিনটি লক্ষণ রয়েছে। এই জাগরণে এক হিসেবে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে, মানুষকে সবচাইতে বড় আসন দেওয়া হয়েছে, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যত রকম কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন তাই করা হয়েছে। মানুষ বলছে বারবার এসে—আমি এসেছি, আমি জেগেছি, আমাকে দেখ। অয়মহং ভোঃ—এই যে আমি এসেছি। আমার চাইতে বড় কেউ নেই—এই কথাটি মানুষ বারবার বলতে চেয়েছে। স্বামীজী মানুষের জয়গান যে কত বড় করে গেয়েছেন তা তাঁর অনেক উক্তির ভেতরে একটি উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হবে, যেখানে বলছেন—"Christs and Buddhas are but waves on the ocean which I am"—আমি একটি বিরাট সমুদ্র, একজন যীশুখ্রীষ্ট বা একজন বুদ্ধ সেই বিরাট সমুদ্রের একটি ঢেউমাত্র। এই যে 'আমি'র জয়গান গাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই 'আমি' কোন্ 'আমি'?—ঠাকুর যাকে বলতেন 'পাকা আমি'—এ 'আমি'র সঙ্গে ব্রহ্মের, সচ্চিদানন্দের কোন ভেদ নেই—সেই 'আমি'। একদিকে 'আমি'র জয়গান গাওয়া হয়েছে আর একদিকে বলা হয়েছে যে, আমি সত্যকে তখনই স্বীকার করব যখন আমার যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখব তার মধ্যে কিছু খাদ

---

* বেলঘরিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে প্রদত্ত (২৩.৪.৬৮) 'স্বামী নির্বেদানন্দ স্মৃতি বক্তৃতা'র অনুলিখন। বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বক্তা বলেন, "আমার মনে পড়ছে, প্রায় বারো বৎসর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের শতাব্দী জয়ন্তী উৎসব যখন পালন করা হয় তখন আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছিলেন, 'আমি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরেছি, কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, এই বেলঘরিয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে বিদ্যার্থী আশ্রম, এটি একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।' আচার্য যদুনাথ সেদিন বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে এরকম আদর্শ প্রতিষ্ঠান যত বেশী প্রতিষ্ঠিত হবে ততই আমাদের শিক্ষা কল্যাণপ্রদ হবে।'"

নেই, তার মধ্যে কিছু মালিন্য নেই। যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব, দেখতে পাব যে, সত্য আমার বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে- যখন জানতে পারব যে, সত্যকে আমি শুধু জানছি না, আমি প্রকৃতপক্ষে সত্য হচ্ছি—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি—তখনই আমি সত্যের মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, আমি সত্যকে জানছি না, সত্য হচ্ছি। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন—"Denial of God we have seen, but denial of Truth we have never known." সেই সত্যকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ ঐতিহ্যকে মানা হচ্ছে না—অন্ধ ইতিহাসকে অনুসরণ করে মতুয়ার (dogmatic) বুদ্ধি দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে সত্যের পরিবর্তে অন্ধকারের কাছে আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করছি না। এই হল আমাদের রেনেসাঁ বা জাগরণের দ্বিতীয় লক্ষণ। এখানে বুদ্ধির দীপ্তি বা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সত্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৃতীয় লক্ষণ যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হল—আমাদের জীবনের মধ্যে যে নানা খণ্ডখণ্ড প্রকোষ্ঠ রয়েছে তারই মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা। জ্ঞান এবং কর্মের সঙ্গে হোক, মুক্তি এবং বন্ধনের সঙ্গে হোক, কাল এবং কালাতীতের সঙ্গে হোক—Time & Eternity—এই সমন্বয়ের সূত্র আমরা দেখতে পাই নবজাগরণের মধ্যে। আমরা জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি না—আবার এই দৃশ্যমান জগৎই একমাত্র সত্য, এছাড়া কিছু নেই—এমন অসত্য কথাও বলছি না—আমরা দুয়ের ভেতরে সমন্বয় সাধন করছি—এইটি হল জাগরণের তৃতীয় লক্ষণ।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে এই জাগরণের প্রথম পুরোহিত ছিলেন রামমোহন। তিনি সর্বপ্রথম আমাদের অন্ধকুসংস্কারকে দূর করার জন্যে, মানুষকে তার আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আহ্বান জানালেন। তিনিই সর্বপ্রথম বললেন—আমি বেদান্তকে যুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করে দেখব। তিনি মানুষের স্বাধীনতার জয়গান গাইলেন—মানুষের মর্যাদার কথা নতুন করে বললেন। সে ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা করব না। আপনারা জানেন যে, সে সময়ে ভারতবর্ষে নানারকমে ভারতবাসীদের নির্যাতিত করা হোত। উনিশ শতকের প্রথম পাদের কথা বলছি। আদালতে যদি কোন ইংরেজ অপরাধী আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হোত, তবে তার বিচারের জন্য ভারতীয় জুরি নিযুক্ত করা হোত না। রামমোহন বহু তথ্যের সাহায্যে দেখালেন যে, East India Companyকে নানাভাবে সুযোগ সুবিধা এবং একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়াতে ভারতবাসী নানাপ্রকারে বঞ্চিত হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি রামমোহনের অত্যন্ত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর আকৃতি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে অবহিত হলেন। রামমোহন প্রথম বললেন যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীন জনমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কোন বাধা, কোন নিষেধ মানবো না। এজন্য তিনি প্রাণপণ সংগ্রাম করলেন। বোধ হয় একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, রামমোহনই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে, বিধিবদ্ধভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাঁর আগে বোধ হয় কেউ নামেননি।

সেই রামমোহন চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং যুক্তির পরাকাষ্ঠা

দেখিয়ে মানুষের গলায় জয়মালা দিলেন। কিন্তু রামমোহনের প্রচেষ্টা সার্থক হল না কেন? —এই প্রশ্ন যদি করেন তাহলে দেখা যাবে তাঁর ভেতর অনেক জিনিস ছিল, অনেক সম্ভাবনা ছিল যা একটি পরিপূর্ণ পুষ্পস্তবকে পরিণত হ'তে পারত—কিন্তু হল না দুটো কারণে। একদিকে তিনি সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন না যে, ভারতবাসীর পক্ষে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যতক্ষণ লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ তার চিন্তার স্বাধীনতা আসছে না। বস্তুতঃ রামমোহন ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে তখনও চাননি; ঐতিহাসিক কারণ তার অবশ্যই ছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, এটা বিধাতার আশীর্বাদ যে, ইংরেজ আমাদের দেশ এখন শাসন করছে। ইংরেজী শিক্ষার যে প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে আমাদের জাতীয় সংহতি বাড়বে, আমরা পরস্পরকে চিনতে এবং বুঝতে পারব—একথা সত্য, কিন্তু আর একটা দিক তিনি দেখলেন না যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও তার প্রতি যে ভারতবাসীর একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বা আকুতি ছিল সেটি সমগ্র মানুষের চিত্তের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যে-কথা স্বামীজী বলেছিলেন, গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও নরক, যে-কথা নিবেদিতা বলেছিলেন স্বামীজী সম্বন্ধে যে, **the queen of his adoration was his motherland.**

এ জাতীয় পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মুক্তির স্বপ্ন রামমোহন দেখেননি।

দ্বিতীয়তঃ রামমোহন যুক্তির বিচারে এত নৈপুণ্য ও বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী শুধু উপরতলার যে শিক্ষিত মানুষ—অভিজাত সম্প্রদায়ের যে মানুষ—তাঁদের কাছেই আদরণীয় হয়েছিল। যে মানুষ সর্বহারা এবং নিঃস্ব, যে মানুষ পদদলিত এবং উৎপীড়িত, যে মানুষ বঞ্চিত, সে মানুষের—নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে রামমোহনের বাণী পৌছায়নি। যে কথা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আমাদের প্রথম কাজ হবে to raise the masses"—একথা রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে আসন পায়নি।

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। স্বামীজীর তিরোধান ঘটেছে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী যদি পড়ে দেখেন, দেখবেন কখনও একথা বলা হয়নি (স্বামীজীর আগে, বোধ হয় ১৯২১-এর আগে কেউ বলেননি) যে, ভারতের উজ্জীবন নির্ভর করছে সাধারণ মানুষের উন্নতির উপর। "To raise the masses, restore their lost individuality without destroying their religion."—স্বামী বিবেকানন্দের কথা। যে মানুষ পদদলিত বঞ্চিত, যে মানুষ রিক্ত সর্বহারা, যে মানুষকে শোষণ করে আজকে আমাদের বিরাট অট্টালিকা তৈরী হয়েছে—যাদের সেবার ফলে আমরা বড় বড় আসনে বসেছি—সেই মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমরা—তাকে আগে তুলতে হবে—একথা স্বামীজী প্রথম বললেন, "To raise the masses, restore their lost individuality without destroying their religion"—তাদের ধর্মে আঘাত করো না, কিন্তু যে ব্যক্তিত্বকে সে হারিয়েছে, সে ব্যক্তিত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহন স্বাধীনতার নবজাগরণে মানুষের জয়গানের প্রথম পুরোহিত, প্রথম হোতা।

তাঁর জীবনীকার এক জায়গায় বলেছেন, রামমোহন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে যে স্মৃতিফলক তৈরী হবে তাতে একটি কথা যেন লেখা থাকে যেটি একটি ফার্সী কবির উক্তি, যেটাকে বাংলা করলে দাঁড়াবে 'ঈশ্বরকে ভালবাসা মানেই মানুষের কল্যাণ করা'। স্বামীজী পরবর্তী কালে কম্বুকণ্ঠে যা ঘোষণা করেছিলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' রামমোহন যে জাগরণের সূচনা করলেন, মানুষের জয়গান গাইলেন, সেটার পেছনে যুক্তির মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল। তিনি এক সমন্বয় সাধন করলেন জ্ঞানের এবং কর্মের, ঐহিক এবং পারত্রিক জীবনের। এই ধারা হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যখন আমরা হেনরী ডিরোজিওকে দেখলাম। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী ডিরোজিও। তিনি Young Bengal সৃষ্টি করলেন, যুবসম্প্রদায়ের মনের মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা, আকূতি জাগিয়ে তুললেন, যার ফলে সেকালের যুবসম্প্রদায় ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তা বিস্মৃত হতে লাগল। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখি যে, এই যুব-সম্প্রদায় মা কালীকে সম্বোধন করেছেন 'Good morning, Madam' বলে। কথা আছে, তাঁরা ব্রাহ্মণদের আঘাত দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে গোমাংস তাঁদের ঘরে নিক্ষেপ করতেন। এই ডিরোজিও স্বাধীন চিন্তার পথ প্রশস্ত করলেন সত্যি কথা, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্বাধীন স্পৃহা জাগালেন, সবই সত্যি কথা; কিন্তু হল কি? সেই সময়ের যুব-সম্প্রদায়, যাঁদের মধ্যে খুব নাম করা সব লোক ছিলেন, দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ছিলেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, রামগোপাল ঘোষ ছিলেন, সেকালের উনিশ শতকের একেবারে চাঁদের হাটে যাঁরা বসেছিলেন, সেই বিদ্বন্মণ্ডলী, পণ্ডিতের সমাজ, তাঁরা কি করলেন? তাঁরা ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে আকৃষ্ট হলেন। সত্যি কথা, কিন্তু ডিরোজিও সেই নব্য বঙ্গকে, নবীন যুব-সম্প্রদায়কে এমন কিছু দিতে পারলেন না যেখানে তাঁরা নোঙর ফেলতে পারেন—এমন কিছু দিতে পারলেন না যা তাঁদের জীবনে প্রশান্তি আনতে পারে, এমন কিছু দিতে পারলেন না যা সমস্ত জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে একটি শান্ত সমাহিত জীবনের মধ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে এই হল, Young Bengal (নব্য বাংলা) ডিরোজিওর কাছে ভাসা-ভাসা কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন, অত্যন্ত বিমুগ্ধ হলেন, অথচ বিপথে চলে গেলেন। যখন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ বিচারকের আসনে বসলেন ডিরোজিওর বিচার করতে, তখন নিজেকে সমর্থন করতে গিয়ে, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে ডিরোজিও বারবার বলেছিলেন, "এই যুবসম্প্রদায়ের কাছে আমি কখনো বলিনি যে আমি নাস্তিক, আমি কখনো বলিনি ঈশ্বর নেই। আমি শুধু হিন্দুধর্মকে যুক্তির আসনে, যুক্তিবিচারের আসনে দাঁড় করিয়ে দেখাতে চেয়েছি যুক্তির বিচারে হিন্দুধর্ম টেঁকে কিনা। এর বেশী কিছু বলিনি। আমি যদি David Hume, John Stuart Mill, Herbert Spencer, August Comte প্রভৃতি দার্শনিকদের মত প্রচার করে থাকি, আমি সঙ্গে সঙ্গে Bishop Barkeley-এর কথা বলেছি, আমি Hegel-এর কথা বলেছি, আমি আস্তিকবাদের কথাও বলেছি, আমি পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমানভাবে তাদের কাছে

পরিবেশন করেছি এবং বলেছি তোমাদের যুক্তিবিচারে যা গ্রহণীয় তাই গ্রহণ কর।" কিন্তু ফল হল কি? নেতিবাচক যদি কোন প্রচেষ্টা হয় তবে মানুষ তাতে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। আপনি বাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, কিন্তু যদি সেই ভিত্তির উপর নতুন বাড়ী তোলেন; তবেই মানুষ একটি আবাসস্থান পাবে। কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গবার জন্য ভাঙ্গা— মানুষ কখনো এ চায় না। গড়বার জন্য ভাঙ্গা সে বুঝতে পারে, ভাঙ্গার জন্য ভাঙ্গা সে বোঝে না। ডিরোজিও মানুষের বিশ্বাস ভেঙ্গে দিলেন শুধু, গড়লেন না কিছু। সেইজন্য পরবর্তী কালে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হল। তিনি নতুন করে আস্তিক্যবুদ্ধিকে ফিরিয়ে আনলেন। মানুষের মধ্যে ভাবগত সত্তাকে বিচ্ছুরিত করে দিলেন। তার মহিমা যে সত্যকারের ঈশ্বর-মহিমা, নতুন করে তাই শেখালেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে যুক্তির উপর নির্ভর করে-ছিলেন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা। প্রতিপক্ষ ছিলেন Dr. Alexander Duff, তাঁর কার্যকলাপে খৃষ্টান মিশনারীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। যখন ডিরোজিওর কাছে দলে দলে যুবকরা আসতে লাগলেন, তাঁরা নাস্তিক হয়ে পড়লেন, Alexander Duff এবং অন্যান্য মিশনারীরা উল্লসিত হয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে, এইবার ভারতবর্ষে আমরা এমন একটা ভিত্তি পেয়েছি, এমন একটা মাটি পেয়েছি যেটা খৃষ্টধর্মের প্রচারের পক্ষে সুবিধাজনক হবে; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় পাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সঙ্গীদের মারফত নতুন করে আবার ভারতীয় ঐতিহ্য, সাধনা ও সংহতিকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। Alexander Duff হিন্দুধর্মের প্রতি কটূক্তি করতে লাগলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এই মসীযুদ্ধ অনেকদিন চলতে লাগল। Alexander Duff ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন খৃষ্টধর্মই একমাত্র ধর্ম. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন—না, হিন্দুধর্ম খৃষ্ট-ধর্মের চাইতে অনেক বড়, অনেক উদার, অনেক ব্যাপক। এই সংঘাত চলতে লাগল। এই সংগ্রাম চলতে চলতে একদিন তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার খ্যাতি ও প্রয়োজন ধীরে ধীরে তিরোহিত হল। তারপর এলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই পূজারী ব্রাহ্মণ, যাঁর হাতে সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল না, যাঁর হাতে debating society ছিল না, যাঁর হাতে প্রেস ছিল না খবরের কাগজে ছাপাবার, যিনি যুক্তিতর্ক বুঝতেন না. যাঁর হাতে পত্রিকা ছিল না—কিছুই ছিল না; একটি মাত্র হাতিয়ার নিয়ে সেই পূজারী ব্রাহ্মণ এলেন—সেই হাতিয়ার বা অস্ত্রের নাম হল ভালবাসা বা প্রেম। তিনি প্রেমের বন্ধনে সকলকে বাঁধলেন। বললেন না যে খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের চাইতে ছোট, বললেন না যে হিন্দুধর্ম খৃষ্টধর্মের চাইতে বড়—বললেন সকল ধর্মই সমান। শুধু সমান নয়, সকল পথ দিয়ে একই লক্ষ্যে, একই সত্যে পৌঁছানো যেতে পারে। এত বড় আবিষ্কার মুগ্ধবিস্ময়ে উনিশ শতকের মানুষ শুনলো। শুনলো এমন একজন লোকের কাছ থেকে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাননি, যিনি গবেষণা করেননি, যাঁর হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না, যাঁর হাতে পত্রিকা ছিল না. দল ছিল না, কিছুই ছিল না। বলেছিলেন একবার পরিহাস করে, "দলটল,

ও-সব কৌশব বোঝে, আমার দলটল নেই।” বলেছিলেন একজন ভক্তকে, “যদি অনেক কথায় জানতে চাও ঈশ্বর কি, তাহলে কেশবের কাছে যাও, আর যদি এককথায় বুঝতে চাও ঈশ্বর কি, তা হলে আমার কাছে এস।” সেই এককথাটি কি? একটি একাক্ষর মন্ত্র দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। সেই মন্ত্রটি আর কিছুই নয়—'মা'। এই একাক্ষর 'মা'-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সকল সত্য উদ্ঘাটিত হল। সেখান থেকে প্রেরণা পেলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবার লক্ষ্য করুন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে চলবে না। জনজাগরণের এত বড় একজন পুরোহিত ধর্ম সম্বন্ধে বারবার বললেন, ধর্ম ডগমা (dogma) নয়, ধর্ম মানুষের বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য সাধন করে। মানুষের জয়গান বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে গাইলেন তা অনুধাবনযোগ্য। পুরাণকে তিনি অস্বীকার করলেন, বললেন—শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ মানুষ, তিনি পৌরাণিক দেবতা নন। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন - ধর্ম অনুশীলনের জিনিস—ধর্ম হল যা তোমাকে ধারণ করে রেখেছে ; এ তোমার শীল বা conduct-এর জিনিস। মহাভারত যেমন বারবার বলেছেন শিক্ষিত মানুষ আমরা তাকেই বলি যিনি “অভিন্নশ্রুতচরিত্রম্”, যাঁর মধ্যে অধীত বিদ্যা এবং আচরণের সামঞ্জস্য রয়েছে, উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা এসেছে। সেজন্য আমরা বাংলায় কুল এবং শীল কথাটা— এক সঙ্গে ব্যবহার করি। এই শীলের উপরে জোর দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্ম আচরণের জিনিস, ডগমা নয়, ritual নয়, অনুষ্ঠান নয়, আচার নয়। এলেন মাইকেল মধুসূদন। রাবণকে তিনি তাঁর আদর্শ করলেন। সবই সত্য কথা। তারপর আমরা আরও অনেক দেখেছি, গিরিশচন্দ্রকে দেখেছি, প্রতাপ মজুমদারকে দেখেছি, অনেক লোকের কথা, - নাম বলতে অনেক সময় যাবে। আমি এখন চলে আসছি রবীন্দ্রনাথের কথায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকে অনুসরণ করলেন। করে কি করলেন? তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বললেন— আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি নরদেবতার বেদীমূলে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। আমি প্রণাম করেছি সেই মানুষকে, যে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'; তাকে ইংরেজীতে বলে The Eternal man। সেই পরম পুরুষকে কবি দেখছেন! শেষের দিকে কবিতায় এক জায়গায় কবি বলেছেন, ‘‘দেখি তাঁরে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক”—তোমার এবং আমার মাঝে যে পুরুষ রয়েছেন তাঁকে দেখতে চাইলেন। কবি কিন্তু বারবার বলছেন —আমি তত্ত্বদর্শী নই, আমি গুরু নই, নেতা নই। আমি শুধু কবি, বাঁশি বাজিয়েছি, গান গেয়েছি, কবিতা লিখেছি। তিনি কিরকম ভাবে বাঁশি বাজিয়েছিলেন? বাঁশের বাঁশি যখন বাজে, বাঁশের মধ্যে যখন ছিদ্র তৈরি করা হয়—বাঁশের ব্যথা লাগে, সে কষ্ট পায়। কিন্তু বাঁশ জানে না যে, কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তাকে এইজন্য যে, ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সাতটি সুর বেরুবে—যে সুর মানুষকে মুগ্ধ করবে—যে-সুরের মূর্ছনায় আমরা অরূপের লোকে চলে যাবো—আনন্দের জগতে বিচরণ করবো! তেমনি জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী আমার সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছিদ্র তৈরি করেছেন, আমাকে দুঃখের মধ্য দিয়ে, আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন, যাতে আমার মধ্য দিয়ে তিনি বাঁশি বাজাতে পারেন। কবি এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, বললেন যে আমি

কখনো তত্ত্ব বুঝতে আসিনি। আমাকে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ অথবা অদ্বৈতবাদের কথা কিছু বলো না, আমি মুক্তিপ্রয়াসী নই ; কি বললেন ?

'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,
পরশ যারে যায় না করা,
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।'

তাই কবি বললেন, বারবার আকাঙ্ক্ষা করলেন কি ?

"...আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে॥
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
মাটির 'পরে করি খেলা
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে।
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার
আসি ফিরে॥..."

এই জগতে বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন। কেন ? "লভিয়াছি মানবজীবন এই মোর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।" একথা বারবার কবি বলেছেন। পরিশেষ কাব্যের মধ্যে তিনিও ভূমাকে চেয়েছেন। কিন্তু বলেছেন "মাটির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি, ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে।" গিরিগুহায় যেতে চাননি, গায়ে ছাই মাখতে চাননি, জীবনকে জগৎকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাননি। "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, তোমার সাথে সেইখানে যোগ আমারও · নয়কো বনে, নয় বিজনে"...ইত্যাদি। এমনি-ভাবে কবি জাগরণের একটা দিক দেখালেন, সমন্বয়ের সূত্র দেখালেন। ঈশোপনিষদের শ্লোক বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন যে, আমরা একক বাদ দিয়ে বহুর উপাসনা করতে পারি, বহুকে বাদ দিয়ে একের উপাসনা করতে পারি ; এর ফলে অন্ধকারে আমরা প্রবেশ করবো। কিন্তু গভীরতর অন্ধকারে কে যাবে ? যে বহুকে বাদ দিয়ে একের উপাসনা করবে সে। একক বাদ দিয়ে যে বহুর উপাসনা করবে, সে তো অন্ধকারে যাবেই, কিন্তু "বহুকে" বাদ দিয়ে যদি "একে" যাও, তুমি গভীরতর অন্ধকারে যাবে। ততো ভূয় এব তমঃ প্রবিশন্তি ইত্যাদি, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি সে কথা বলছেন। এই যে অবিদ্যা এবং বিদ্যা, বহু এবং এক—এই মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বললেন—"মাটির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে।" কিন্তু জাগরণের যে দ্বিতীয় সূত্রটি আমি বলেছিলাম, বুদ্ধির বিচারের কথা, সেটা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা ততটা পাচ্ছি না, বরং আমরা হৃদয়ের কথা পাচ্ছি বেশী করে। বারবার বলছেন, তত্ত্বজ্ঞানী তুমি বুঝবে না ; "আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠল রাঙা হয়ে" ; তুমি বলবে—এ তত্ত্বকথা, আমি বলব—এ সত্য, তাই এ সুন্দর। এই তত্ত্ব-কথাটাকে তিনি অনুভবের মধ্য দিয়ে নিলেন "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।" সমস্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে একটির অনুভূতিকে, সুন্দরকে পেতে চেয়েছেন, সেই সুন্দরের আবির্ভাবের কথা কবি বলেছেন। এর প্রতিষ্ঠা যুক্তিবিচারের দ্বারা হচ্ছে না, শুধু অনুভূতির দ্বারা হচ্ছে না। কবি মানুষের জয়গান বারবার গাইছেন একেবারে প্রথম থেকে : 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এই যে শুরু করলেন, শেষে গিয়ে 'পৃথিবী' কবিতার মধ্যে—

বলছেন, শেষদিকের কবিতার মধ্যে বলছেন, "তবে দিও তোমার মাটির তিলক আমার কপালে।" বলছেন, "আমি তারপরে সেই অসীমের মধ্যে মিশে যাব।" বলছেন, "আমি মানবজীবন লভিয়াছি এ মোর পরম আশীর্বাদ।" "সূর্য যখন উড়ালো কেতন অন্ধকারের প্রান্তে। তুমি আমি তার রথের চাকার ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে। সঙ্গীতে ভরি এ প্রাণের তরী অসীমে ভাসিছে রঙ্গে। চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী চলিলে আমার সঙ্গে।" সেই চিরসঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন? সেই মানুষের মধ্যে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন, কখনো মানুষকে বাদ দিয়ে যাচ্ছেন না। সেইজন্য কবি মহামানবের স্বপ্ন দেখেছেন। 'ঐ মহামানব আসে' বারবার বলছেন, শেষের দিকে "সভ্যতার সঙ্কটে"র মধ্যে ঐ একই কথা বলছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাসহারানো মহাপাপ।' সে বিশ্বাস তিনি হারাননি। কিন্তু কবি কখনো জীবন-দেবতা বলতে ঈশ্বর বুঝছেন না। Theism-এ আমরা বলি God, Personal God, সে কথা তিনি বার বার বলছেন না। "Eternal man" কথাটা বলেছেন, কিন্তু কখনও ব্রহ্মকথাটাকে তিনি দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করছেন না। উপনিষদে অবগাহন করেছেন সত্যি কথা, উপনিষদ থেকে সমস্ত রসদ নিয়েছেন সত্যি-কথা, কিন্তু কবি দার্শনিক বিচার করেননি। লক্ষ্য করবেন, ১৮৯৩ সালে Parliament of Religions-এ স্বামীজী ভাষণ দিলেন—সেখানে ধর্মের যে নতুন লক্ষণ দেখালেন তার ৭ বৎসর পরে ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'ধর্মের সবল আদর্শ', সেখানে সূত্রাকারে কবি তাই-ই বলেছিলেন—মানুষের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ধর্ম। সেই কথাটি পরবর্তী কালে Hibbert Lecture-এ Religion of Man এবং Kamala lecture-এ 'মানুষের ধর্ম' প্রসঙ্গে পরিস্ফুট করে তিনি বলেছেন। বলেছেন, একটি মানুষের ভেতর দুটি সত্তা আছে। উপনিষদের কথা, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'। একটি গাছে দুটি পাখী আছে। একটি পাখী—সে কেবল খাচ্ছে, আর একজন—কেবল দেখছে; প্রত্যেক মানুষের ভেতরে দুটি পাখী রয়েছে, একটি কেবল স্বাদু ফল খাচ্ছে আর একজন খাচ্ছে না—সে সাক্ষী হয়ে কেবল দেখছে। কবি এক জায়গায় বলেছেন, "আমার চোখের সামনে একটি পর্দা সরে গেল। সেদিন অন্তরাত্মাকে দেখলুম। মনে হলো আজ ভূমিষ্ঠ হয়ে কাউকে প্রণাম করি। দুচোখ বেয়ে আমার জল পড়ছে। মনে হচ্ছে জীবনে এত আনন্দের তরঙ্গায়িত সঙ্গীত আর কখনো শুনিনি।" সেই সঙ্গীতের মূর্ছনায় কবি অনুভব করলেন—জগতের সর্বত্র একটি অখণ্ড চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তবু তিনি জাগরণের স্বপ্ন দেখলেন, মানুষের জয়গান গাইলেন। মানুষকে বাদ দিয়ে সভ্যতা হচ্ছে না, কাব্য হচ্ছে না, সৌন্দর্যানুভূতি হচ্ছে না—কিছুই হচ্ছে না। কবি তাই মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করলেন, বললেন আমি যখন এ জন্মের অধিদেবতাকে প্রণাম করে যাব তখন বলে যাব আমি আনন্দিত। কেন? আমি মানুষের মধ্যে জন্মেছি, মানুষকে ভালবেসেছি। এই ধারা যদি আর একটু অনুসরণ করে আসি তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন তা বোঝা যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি প্রথমে যুক্তির পথে এগিয়েছিলেন। উইলিয়াম হেষ্টি General Assembly's Institution-এর অধ্যাপক। তিনি Wordsworth-এর কবিতা পড়াচ্ছেন

যেখানে mysticism-এর কথা রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করছেন mysticism ব্যাপারটা কি। যে নরেন্দ্রনাথ Herbert Spencer আত্মসাৎ করেছেন, August Comte পড়ছেন, John Stuart Mill-এর দর্শনে পাঠ গ্রহণ করেছেন, তিনি বলছেন mysticism কি। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কি সত্যিই হতে পারে ?

অধ্যাপক Hastie বললেন, 'তোমাদের চোখের সামনে একজন লোক রয়েছেন, যাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়েছে, যিনি সাধন-মার্গের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন, যিনি এই সাধনার মধ্যে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর নাম পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।' বিদেশী অধ্যাপক হেষ্টির কাছে এই সংবাদটি নরেন্দ্রনাথ পেলেন। এখানে পূর্ব এবং পশ্চিমের মিলন ঘটল। যে কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন—পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথা। Hastie-র কাছে, একজন পাশ্চাত্য বিদেশী শিক্ষকের কাছে নরেন্দ্রনাথ প্রথম শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি হয়েছে, তাঁর নির্বিকল্প অনুভূতি হয়েছে, তিনি ভগবানকে দেখেছেন। একথা যখন নরেন্দ্রনাথ জানলেন, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। জিজ্ঞাসা করলেন বহু লোককে, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?" স্পষ্ট জবাব কেউ দিলেন না—এমনকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও না। শুধু জবাব দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—দেখেছি বই-কি ; তোমাকে যেমন স্পষ্টভাবে দেখছি, তার চাইতেও স্পষ্ট দেখেছি! এটুকু বলে তিনি থামলেন না, বললেন—তোমাকেও দেখাতে পারি। ঈশ্বরানুভূতির demonstration যে দেওয়া যায় এটা নরেন্দ্রনাথ জানতেন না। এই প্রথম শুনলেন, বিমুগ্ধ হলেন, অবাক হলেন। এ কি কথা! শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু ঈশ্বরকে দেখেছেন তাই নয়, তিনি দেখাতেও পারেন! নরেন্দ্রনাথ সে কথা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালভাবে যাচাই করতে ছাড়লেন না। সেই পূজারী ব্রাহ্মণকে, প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণকে নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে চললেন বারবার, তাঁকে বাজিয়ে দেখলেন, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখলেন সোনা খাঁটি কিনা ; সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। পরিশেষে এমন একটি সময় এল—সে-ইতিহাস আপনারা জানেন—যখন নরেন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ করলেন। যদি বলেন যে, নরেন্দ্রনাথ সমস্ত বুদ্ধিকে বিসর্জন দিলেন, যদি বলেন যে, এখানে যুক্তি পরাজয় স্বীকার করল, হার মানল, আমি বলব তা নয়। এ যদি বিসর্জন হয় তবে এ নদীর আত্মবিসর্জন সমুদ্রের কাছে, বীজের আত্মসমর্পণ গাছের কাছে। বীজ থেকে যখন গাছ হয় সে-গাছকে উপড়ে ফেলুন, বীজকে বীজ-অবস্থায় আর পাবেন না। বীজের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সে মহান্ মৃত্যু ; বীজ নিজের জীবন দিয়ে নবজীবন লাভ করেছে। নবজীবনের মধ্যে সে অখণ্ড জীবনের স্বাদ পেয়েছে ; কিন্তু নিজের যে ক্ষুদ্র আমি, বীজের যে সত্তা সেটার মৃত্যু হয়েছে। নদী যখন সাগরে মিশেছে, সে আত্মসমর্পণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে নবজীবন লাভ করেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নরেন্দ্রনাথের জীবনেও তাই ঘটল। সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত বিচার, সমস্ত তর্ক বিশ্বাসের কাছে, উপলব্ধির কাছে, অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করল বৃহত্তর মহত্তর সুন্দরতর গভীরতর জীবন লাভ করার জন্য। সেই নবজীবন লাভ করে নরেন্দ্রনাথ ধন্য হলেন। তাঁর আচার্যদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ দুটি সত্য জেনেছিলেন। একটি সত্য হল এই—জীবে দয়া নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা

করতে হবে। দ্বিতীয় সত্য হল—সকল ধর্মই সত্য, সব নিজস্বতা নিয়েই সত্য; কোন ধর্মই ছোট বা কোন ধর্মই বড় নয়। এবং এর থেকে তৃতীয় সত্যটি আসছে যে ধর্মই হল মানবজীবনের প্রাণবিন্দু, কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই সত্যটিই আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছিলেন। রামমোহন কেবল পরোক্ষে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে যেন আমার স্মৃতিফলকে লেখা থাকে—ঈশ্বরকে আরাধনা করা মানে মানুষের কল্যাণ করা।" স্বামীজী করেছিলেন এই সত্যটিকে নবজাগরণের এবং পুনরুজ্জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি বললেন যে, ধর্মই হচ্ছে মানুষের জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, কেন্দ্রশক্তি। তিনি এই সত্যটি পরিবেশন করলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। যেমন বেদান্তশিক্ষার ব্যাপারে অরুন্ধতী-ন্যায়ের কথা আছে। বলা আছে যে, প্রথমেই আমরা অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মের কথা বলি না। 'জগৎ ব্রহ্মেতে আছে'—এই কথা প্রথমে বলি। একে বলে অধ্যারোপ। তারপর বলা হল যে, জগৎ ব্রহ্মেতে নেই—এর নাম অপবাদ। এ কথা শুনলে মনে হবে আপাতবিরোধী কথা। কিন্তু এ আপাতবিরোধী কথা নয়। যদি প্রথম থেকে বলা হতো "শোন হে বাপু, জগৎ ব্রহ্মেতে নেই; ব্রহ্ম নির্গুণ সচ্চিদানন্দ", তাহলে লোকের মনে সংশয় হত, জগৎ তো ব্রহ্মে নেই, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আছে। যেমন, বাবু অফিসে নেই তাহলে বাড়ীতে আছেন। এই জাতীয় সংশয় যাতে না আসে সেইজন্য প্রথম বলা হল—জগৎ যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে ব্রহ্মেতে আছে। তার একমাত্র অধিষ্ঠান-সত্তা ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সর্বব্যাপী, তাঁকে আশ্রয় করেই জগৎ থাকবে; নতুবা থাকবে কোথায় জগৎ? পরক্ষণে দেখা গেল ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বগত-ভেদরহিত, বিজাতীয়-ভেদরহিত, সজাতীয়-ভেদরহিত; কাজেই ভেদপূর্ণ জগৎ ব্রহ্মে থাকতে পারে না, অতএব জগৎ ব্রহ্মেতে নেই। যেমন দড়িতে আমরা সাপ দেখে অন্ধকারে ভুল করি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, 'সাপ দেখলি কোথা?' আমরা আঙুল দিয়ে দড়িটাকে দেখাই; দড়ি যদি না থাকত, তাহলে তো সাপ দেখতাম না। কাজেই সাপটা দড়িতেই আছে। কিন্তু ভুল যখন ভেঙে গেল, আলো আনলাম, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, ভাল করে স্পর্শ করলাম, তখন বললাম যে, যে-সাপটাকে দেখেছিলাম সে ভুল; ও নেই, ছিলও না। প্রথমে বললাম, সাপ যদি কোথাও থেকে থাকে তবে সে দড়িতে আছে। ভুল যখন ভাঙল তখন বললাম: সাপ দড়িতেও নেই, কদাচ ছিল না। এই প্রথমটা হল অধ্যারোপ, দ্বিতীয়টা হল অপবাদ। বলা আছে অরুন্ধতী-ন্যায়ের কথা। সেকালে নববধূ যখন শ্বশুরবাড়ীতে আসতেন, লজ্জাশীলা বধূ বড় ঘোমটা দিয়েছেন, কথা বলছেন না, শাশুড়ী-ননদদের সামনে কেবল মাথা নেড়ে হুঁ-হাঁ করছেন; তাঁকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাতে হবে। খই যেমন মাঙ্গলিক, দই যেমন মাঙ্গলিক, শাঁখ বাজানো যেমন একটা মাঙ্গলিক, তেমনি অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পাওয়া নববধূর কাছে একটি মঙ্গলকাজ। কিন্তু নববধূ লজ্জাশীলা, শাশুড়ী বলছেন, অরুন্ধতী দেখেছ, বৌমা? মাথা তুলে বৌমা বলছেন, 'হ্যাঁ'। লজ্জায় স্পষ্ট করে কথা বলছেন না। শাশুড়ী যা বলছেন তাই শুনে বৌমা মাথা নাড়ছেন। কিন্তু এমনি করে শাশুড়ী তাঁকে বড় একটা নক্ষত্র দেখাচ্ছেন। চোখ যখন সেখানে স্থির হয়েছে,

তখন আর একটা ছোট নক্ষত্রে যাচ্ছেন—আর একটা ছোট, এমনি করতে করতে অরুন্ধতীতে নিয়ে যাচ্ছেন। একে বলে অরুন্ধতী-ন্যায়। ঠিক সেই রকম প্রথমে বলা হল জগৎ ব্রহ্মেতে আছে, তারপর বলা হল জগৎ ব্রহ্মেতে নেই। স্বামীজীও ঠিক তাই করলেন। তিনি প্রথম বললেন মানুষকে—ঈশ্বরে বিশ্বাস করছো না, দরকার নেই, করো না। ঈশ্বর আছেন কিনা কে জানে? দরকার নেই ভেবে। কিন্তু নিজেকে বিশ্বাস করো তো? তুমি তো আছ? হ্যাঁ, আমি তো আছি। এই হলেই হল, ওতেই বিশ্বাস করো। ফরাসী দার্শনিক একজন বলেছিলেন: আমি সবকিছু সন্দেহ করে শুরু করবো, কিছুই মানবো না—দুয়ে দুয়ে চার না পাঁচ, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঈশ্বর আছেন কি না, সন্দেহ হচ্ছে; পাখাগুলো ঘুরছে কি না, সন্দেহ হচ্ছে। এটা বেলঘরিয়াতে আছি না পাটনায় আছি, সন্দেহ হচ্ছে; আপনারা বেঁচে আছেন না মৃত, সন্দেহ হচ্ছে; এটা আমার দেহ না অন্য লোকের দেহ, সন্দেহ হচ্ছে: এই করতে করতে সেই দার্শনিক বললেন- কিন্তু একটা জিনিস সন্দেহ করতে পারছি না; আমি যে সন্দেহ করছি, এটাতে তো সন্দেহ করা যাচ্ছে না। তখন বললেন: দেখো, সন্দেহ করার কর্তাকে খুঁজে বার করো—কে সন্দেহ করছে? বললেন, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, খাদক নেই—এ তো হয় না; একটু আগে গান শুনলেন, গান হচ্ছে, গায়ক নেই—এতো হয় না। বাজনা শুনলেন, বাদক নেই—এ কি কথা? তাহলে সন্দেহক্রিয়া যখন হয়েছে, কর্তা আছে। এই যে করছে সন্দেহ, সেটা কর্তা। তিনি বললেন—এটাকেও সন্দেহ করছি। এটাকেও যে সন্দেহ করছি, এই দেহটাকে, কাজেই দেহটা কর্তা নয়। এ একটা গাছের ডাল, এটাকে আমি কাটবো, দু টুকরো করবো—একটা দা দিয়ে কাটবো তো! এই গাছের ডালটা এই গাছের ডাল দিয়ে কাটবো কি করে? কাটা যায় না। কাজেই দা দিয়ে কাটতে হবে। তাই আমার দেহকে যখন সন্দেহ করছি—কাজেই দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে সন্দেহ করেছি—সেই অন্য কিছুর নাম আত্মা বা চৈতন্য। সেই আত্মাই সন্দেহ করছে। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন, যে-লোক নিজের অস্তিত্বকে, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করে, সে কিরকম লোক জান? সে নেমন্তন্ন বাড়ীতে ভূরিভোজন করে এসেছে, ঢেঁকুর তুলছে, অথচ বলছে ওঁরা বড় খারাপ লোক, কিছু খাওয়ায়নি। সেইরকম নিজের অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা যায় না। স্বামীজী এইভাবে শুরু করলেন। মানুষকে মর্যাদা দিলেন; তাঁর আচার্যদেবের কাছ থেকে একটা সূত্র পেয়েছিলেন। তিনি যখন বলেছিলেন, মানুষ মানে মান-হুঁশ। যে নিজের মানমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন সেই তো মানুষ। কিন্তু আমার মান বা মর্যাদাটা কি? সেটা হল, আমার ভেতরে অনন্ত শক্তি আছে। আমাকে বাইরে থেকে যতটা ছোট মনে করছ আমি ততটা ছোট নই। আমি অনন্ত শক্তির ধারক এবং বাহক। এইটি আমার মর্যাদা, এইটি আমার status, এইটি আমার dignity—এইটাকে রক্ষা করতে হবে।

স্বামীজী প্রথম বললেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করতে পার, করার দরকার নেই বাপু। নিজেকে বিশ্বাস করো। এই নিজেকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে মানুষের জাগরণ শুরু হল—পুনরুজ্জীবন—রেনেসাঁ। এতকাল মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই

ডিরোজিওর প্রভাব চলছিল। মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মোহে মূঢ় হয়ে পড়েছিল। নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তার সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না।

আপনারা সেই সিংহশাবক এবং মেষশিশুর গল্প জানেন; আমি সেই গল্প বলে সময় নষ্ট করবো না। স্বামীজী সেই কথাটি আবার বললেন: তুমি সিংহশিশু, তুমি মেষশাবক নও; একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো। এই প্রথম জাগরণের সূত্র দিলেন স্বামীজী; কিন্তু সেই আত্ম-অবলোকন বা আত্মানুসন্ধানের ফলে কি দেখা গেল? দেখা গেল যে আমিই আসলে ব্রহ্ম, স্বরূপতঃ আমি ও ঈশ্বর এক—"অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। এ কিন্তু পুঁথির কথা মাত্র নয়, এ উপলব্ধ সত্য।

[ক্রমশঃ]

পথটি বলে দাও

(গান)

শ্রীসুধাংশুকুমার দাস

যে গান আমার গাইতে হবে
হয়নি সে গান সাধা,
কোন্ তরীতে উঠতে হবে—
কোন্ ঘাটে সে বাঁধা?

খেলার মাঝে ডুবে আছি,
রঙের বনে মৌমাছি,
এবার যে মোর সময় হ'ল
বোঁচ্‌কা বিঁড়ে বাঁধা।

কোথায় গিয়ে খুঁজবো তাঁরে
কোন্ ঘাটে সে নাও,
প্রভু, তুমি দয়াল স্বামী,
পথটি বলে দাও।

এত দিনের কান্নাহাসা,
নিজের বলে ভালবাসা,
সব কিছু যে রইল পড়ে—
কোথায় তরী বাঁধা?

স্বাধ্যায়

স্বামী ধ্যানানন্দ

'স্বাধ্যায়' শব্দটির মুখ্য অর্থ হচ্ছে বেদাধ্যয়ন। 'অধি', 'আ' ও 'সু'– এই তিনটি উপসর্গপূর্বক ই-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করে স্বাধ্যায় শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ই-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করলে হয়—'আয়'। অধি + আয় = অধ্যায়। অধ্যায় ও অধ্যয়ন একার্থক। 'সু'-এর অর্থ সুন্দররূপে, অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত – এই ত্রিবিধ স্বর-সাহায্যে ; 'আ'-এর অর্থ সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ নিয়মপূর্বক। একই স্বরে দীর্ঘকাল যা কিছু পাঠ করা যায়, তা শুধু যে শ্রুতিমধুর হয় না, তাই নয়—বাগিন্দ্রিয়েরও ক্লেশকর হয়ে থাকে। আর প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট, পবিত্র স্থানে শুচিসংযত হয়ে অর্থে মনোনিবেশ করে পাঠ না করলে তাকে সম্যক্‌রূপে পাঠ বলা যায় না।

স্বাধ্যায়ের অন্য অর্থও আছে, তা এখানে আলোচ্য নয়।

শব্দটি অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগ থেকে আজ অবধি মোটামুটি একই অর্থে চলে আসছে। সমগ্র ঋগ্বেদসংহিতায় অবশ্য এই শব্দটি পাওয়া যায় না। শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণের একটি অধ্যায়ের নাম 'স্বাধ্যায়-প্রশংসা'। তাতে বেদপাঠের প্রয়োজনীয়তা ও মহিমার কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে 'যে হ বৈ কে চ শ্রমাঃ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেণ, স্বাধ্যায়ো হৈব তেষাং পরমতা কাষ্ঠা', অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে শ্রমসাধ্য যত তপস্যা আছে, বেদাধ্যয়ন তার পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাবল্লীর নবম অনুবাকে প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে 'স্বাধ্যায়-প্রবচনে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সংসারের সমস্ত কর্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচন—বেদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাও করতে হবে। এ দুটিকে বাদ দিলে চলবে না। ঐ বল্লীরই একাদশ অনুবাকে আছে—'স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ', 'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্'। স্বাধ্যায়ে অনবহিত হবে না ; স্বাধ্যায় ও প্রবচনে অনবহিত হবে না।

সমস্ত ধর্মসূত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম গৌতমধর্মসূত্রে আমরা 'নিত্যস্বাধ্যায়ঃ' এই সূত্রটি পাই। 'নিত্যস্বাধ্যায়ঃ' শব্দটি একটি বিশেষণ পদ। বিশেষ্যপদ 'গৃহস্থঃ' এবং ক্রিয়াপদ 'ভবেৎ' উহ্য আছে। অর্থাৎ গৃহী ব্যক্তি নিত্য বেদাভ্যাসী হবেন। স্বাধ্যায় গৃহস্থের নি ্যকর্ম—পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত। একেই ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। সমগ্র ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ধর্মসূত্র-গ্রন্থে ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির শ্লোকবদ্ধ সংহিতায় এই স্বাধ্যায়ের উপদেশ রয়েছে। ইতিহাস পুরাণ ও মহানির্বাণাদি তন্ত্রেও এই স্বাধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে।

'স্বাধ্যায়' শব্দটি পাতঞ্জলদর্শনে মোট তিনবার পাওয়া যায়। সূত্র তিনটি এই :— ১) তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ (২.১) ; (২) শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ (২.৩২) ; (৩) স্বাধ্যায়াদ্ ইষ্টদেবতা-সম্প্রয়োগঃ (২.৪৪)। ১ম ও ২য় সূত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে উভয়েরই ভাষ্যে উল্লিখিত প্রণবজপকেও যে স্বাধ্যায় বলে সেই কথাটি আগেই নিচ্ছি, কারণ তা না হলে এই ৩য় সূত্রটিতে স্বাধ্যায়ের অর্থ পরিষ্কার

হবে না। ৩য় সূত্রের ব্যাসভাষ্যে রয়েছে—দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্যে চ অস্য বর্তন্তে ইতি। ভাস্বতী' টীকায় ভাষ্যোক্ত 'স্বাধ্যায়শীলস্য' কথাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে—নিরন্তরং ভাবনাযুক্তজপশীলস্য। কার্যে' কথাটির ব্যাখ্যায় 'পাতঞ্জলরহস্য' টীকায় আছে—অনুগ্রহাদৌ। সাধক যদি কোনও দেবতা, ঋষি বা সিদ্ধের দর্শন চান তা হলে তাঁকে ওঙ্কার বা ওঙ্কারযুক্ত মন্ত্রের জপ ও সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের নিরন্তর ধ্যান করতে হবে। তা হলেই ইষ্ট দর্শন দেবেন এবং অন্যভাবেও সাধককে অনুগ্রহ করবেন। এই হল ভাষ্যটীকা অনুযায়ী সূত্রটির ব্যাখ্যা। প্রণবকে টেনে আনতে হয়েছে 'স্বাধ্যায়' শব্দটির জন্য। বেদের সার প্রণবকে আমরা বেদ থেকেই পাই। সুতরাং প্রণবজপ যে স্বাধ্যায় তাতে সন্দেহ নেই।

১ম ও ২য় সূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে—স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণাম্ অধ্যয়নং প্রণবজপো বা। প্রণবজপ অর্থাৎ ওঙ্কারের আবৃত্তি যে স্বাধ্যায় তা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মোক্ষশাস্ত্র কি? বেদের কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে শুধু যদি বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলির অধ্যয়ন এবং বেদেতর অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়নই ব্যাসভাষ্যে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্বাধ্যায়ের মৌলিক অর্থকে একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যাপকও করা হয়। কিন্তু আমাদের গত্যন্তর নেই। ব্যাসের এই অর্থই প্রচলিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে গীতা ভাগবত কথামৃত আদি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের নিয়মপূর্বক অধ্যয়নকেই স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত মনে করি। জেন্দাবেস্তা, ধম্মপদ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতিকেও বাদ দিই না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও 'স্বাধ্যায়' শব্দটি মোট তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 'স্বাধ্যায়'কে জ্ঞানযজ্ঞ, এবং দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ তা বলা হয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে স্বাধ্যায়কে যথাক্রমে দৈবী সম্পদ ও বাঙ্‌ময় তপস্যা বলা হয়েছে। গীতাপাঠ এমনকি অর্থ না বুঝেও জপরূপে শুধু আবৃত্তি, তাও যে স্বাধ্যায়রূপী জ্ঞানযজ্ঞ এবং ভগবানের প্রীতিকর, 'অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥' গীতার শেষ অধ্যায়ের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি টীকাকাররা এই সিদ্ধান্তই করছেন। এমনকি গীতার অশুদ্ধ পাঠ করেও শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যেতে পারে, যদি তেমন ভক্তি থাকে। এ বিষয়ে একটি সুন্দর ঘটনা রয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করছিলেন, তখন এই ঘটনাটি দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছে—

"সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোকে করে উপহাসে॥
কেহো হাসে কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়!
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।

বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥
যাবৎ পঢ়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥
প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥"

স্বাধ্যায়ের ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন—

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥"

সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রের কৃপায় জীব যদি ভগবন্মুখী হয়, তবেই ভগবানের দুরত্যয়া মায়া তাকে ত্যাগ করে। স্বাধ্যায়ের দ্বারাই শাস্ত্রের কৃপা হতে পারে। সুতোক সাধকেরই নিত্য স্বাধ্যায়ী হওয়া উচিত।

তবে স্বাধ্যায় করতে হবে বলে যে বহু শাস্ত্র পড়তেই হবে এমন কোনও কথা নেই। তাতে বরং ক্ষতিই হয়। যাঁরা আচার্য হবেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের বহু শাস্ত্র পড়ার দরকার হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—নিজেকে মারতে একটা নরুনই যথেষ্ট, অপরকে মারতেই ঢাল-তলোয়ার দরকার। যাঁরা মুখ্যতঃ অধ্যাপনা, বক্তৃতা, সাহিত্য-সাধনা ইত্যাদি নিয়ে আছেন তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। এগুলি যাঁদের দৈনন্দিন জীবনের মুখ্য কাজ নয়, সেই সব সাধকেরই কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের বেশী পড়ার সময়ও নেই, প্রয়োজনও নেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'নানুধ্যায়াদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ'। অর্থাৎ বহু শব্দের অনুধ্যান করবে না, কারণ তা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। এর 'মিতাক্ষরা' টীকায় বলা হয়েছে যে, এখানে বহু শাস্ত্রের অধ্যয়নে দোষ দেখানো হয়েছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—'গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।' বহু গ্রন্থের অভ্যাস করবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে—

"বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥"

তপন মিশ্র নামে পূর্ববঙ্গের একজন ব্রাহ্মণের বহুশাস্ত্রপাঠে ও বহুবাক্যশ্রবণে সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সাধ্য ও সাধন নির্ণয় করতে পারছিলেন না। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি মহাপ্রভুর শরণ নেন। মহাপ্রভু তাঁকে নামসংকীর্তন করতে উপদেশ দেন। নামসংকীর্তনও স্বাধ্যায়।

নেপালরাজের উকীল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কাপ্তেন' বলে ডাকতেন; বলতেন—'কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্-ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম (রামায়ণ)—এ সব কণ্ঠস্থ।' তাঁকেই একদিন তিনি বকেছিলেন বেশী পড়ার জন্য। বলেছিলেন—'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না।'

ভক্তবর বলরাম বসুর পিতৃদেবকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'বই আর পোড়ো না, তবে ভক্তিশাস্ত্র পোড়ো, যেমন চৈতন্য-চরিতামৃত।'

সন্ন্যাসী কবি বিবেকানন্দ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় বীর সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে বহু অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু সুবক্তাই ছিলেন না, সুলেখকও ছিলেন—এ তাঁর দেশবাসীরা এবং দূর বিদেশীরা সকলেই স্বীকার করেন। তবে তিনি যে একজন শক্তিশালী 'কবি' এবং অসামান্য 'সঙ্গীত-শিল্পী'ও ছিলেন, এ হয়তো অনেকেই না জানতে পারেন। অবশ্য স্বামীজীর 'বীরবাণী' গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘটেছে তাঁদের কাছে এ সংবাদ নূতন নয়। তাঁদের সঙ্গে এই বীর সন্ন্যাসী কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছে।

কবি বিবেকানন্দ স্বামী ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী এই চারটি বিভিন্ন ভাষাতেই কবিতা, গান ও স্তবগাথা রচনা করেছিলেন। স্বামীজীর প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির মতো কবিতাও অধিকাংশ ইংরেজীতে রচিত। তবে কিছু কিছু তিনি মাতৃভাষাতেও লিখে গেছেন। তাঁর অনুরক্ত ভক্ত ও সন্ন্যাসী ভায়েরা তাঁর বহু ইংরেজী রচনার সুচারু বাংলা অনুবাদ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা- ও ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

ভারতের সিদ্ধ-সাধকগণের মধ্যে অনেকেই যে বিশিষ্ট কবি ছিলেন এ পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের বিবিধ রচনার মধ্যে। বেদের সূক্ত ও উপনিষদের বাণী থেকে শুরু করে একেবারে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত দেখা যায় দর্শন, ইতিহাস, গণিত, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও বিধিবিধান সব কিছুই সচ্ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় সুললিত কবিতায় বিধৃত।

প্রাচীনোত্তর যুগেও দেখা যায় বহু সিদ্ধ-সাধকের উচ্চ চিন্তাধারা এবং ভক্তিমূলক ভাব-বৈচিত্র্য ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষায় শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর, দাদু, তুকারাম, তুলসীদাস প্রভৃতি। অর্বাচীন কালেরও বহু সাধক, যেমন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ, কমলাকান্ত প্রভৃতি এই ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যাব্দেও আমরা একাধিক বৈষ্ণব সাধকের গীতকাব্য-রসাস্বাদনে তৃপ্ত হয়েছি। বাংলার বাউল সাধকসম্প্রদায়ের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব থেকে দেহতত্ত্ব পর্যন্ত সর্বপ্রকার কঠিন বিষয়ই সুন্দর সহজবোধ্য কবিতায় সিদ্ধ-সাধকদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। দেবদেবীগণের স্তোত্র, বন্দনা, ধ্যান ও প্রণাম সবই প্রায় সুললিত সংস্কৃত কবিতায় রচিত হয়েছিল দেখা যায়।

সাম্প্রতিক কালে এই ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীতেও আমরা পেয়েছি রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, দরবেশ, কাঙাল হরিনাথ, সাধু তারাচরণ প্রভৃতি একাধিক ভক্তগণের রচিত কত অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বলিত গান ও কবিতা, স্তোত্র ও গাথা। বর্তমানেও একাধিক জীবিত সাধক বহু রচনাই ছন্দোবদ্ধে আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ বয়স থেকেই শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই ছিলেন না, তাঁর মতো একজন সুধাকণ্ঠ সুগায়ক সেকালের ছাত্রদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং

সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভক্তিমূলক মাতৃনাম-গান শুনতে শুনতে অনেক সময় ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। স্বামীজী কেবল মাত্র একজন মধুকণ্ঠ সুগায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সঙ্গীত-সুরকার ও গীত-রচয়িতা। তিনি কত গান লিখতেন, সুর দিতেন। আবার পছন্দ না হলে নূতন করেও লিখতেন।

যেমন ধরুন, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 'ভজন' রচনা করেছিলেন, প্রথমটা এই ভাবে :

"খণ্ডন-ভব-বন্ধন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে-ধে-ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার॥"

কিন্তু পরে এ ভজনটি ঠিক তাঁর মনের মতো হয়েছে বলে মনে হয়নি। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন' আরও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত মনে করে স্বামীজী গানটিতে আরও কিছু সংযোজন করলেন সংস্কৃত চম্পাকাবলী ছন্দে :

"খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার॥" ইত্যাদি।

'ভজনখানি' বেশ সুদীর্ঘ, তাই সবটুকু উদ্ধৃত করলাম না। এই অংশটুকু থেকেই বোঝা যাবে তাঁর বাংলা রচনার মধ্যেও সংস্কৃতের উপমা ও অনুপ্রাস প্রচুর। এবং শব্দের ধ্বনি-মাধুর্যের প্রতি এই সন্ন্যাসী কবির কত প্রবল আকর্ষণ ছিল! মঠের সন্ন্যাসীরা আজও মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় এই আরাত্রিক-ভজন নিত্য সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। দূর থেকে শুনলে মনে হয় ঠিক যেন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ হচ্ছে! স্বামীজী বীর সাধক হলে কি হবে, প্রাণ যে তাঁর কবির প্রাণ! কাজেই, ভগবৎ-পূজারী এই সন্ন্যাসী একজন বিশ্বমানব-পূজারী সাধকও ছিলেন। এঁর মধ্যে আমরা একাধারে পাই ভগবদ্‌ভক্ত, গুরুভক্ত, দেশভক্ত ও বাণীর ভক্ত এক বীর্যবান সাধক কবিকে, যাঁর কণ্ঠে বিরাজিত বাণী বিদ্যাদায়িনী বাগীশ্বরী স্বয়ং।

এই সন্ন্যাসী কবির স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশ-বাৎসল্যের যেমন তুলনা মেলে না, তেমনি বন্ধু-প্রীতি ও ভক্তবৎসলতাও ছিল অতুলনীয়। সাধকগোষ্ঠীর প্রতি এঁর আকর্ষণ দেখা যায় অত্যন্ত আন্তরিক। কবিমাত্রেরই প্রকৃতি একটু কুসুমাদপি কোমল বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু সেই কুসুমাদপি কোমলপ্রাণ কবির মধ্যেও যে বজ্রাদপি কঠোরপ্রাণ পুরুষ-সিংহও থাকতে পারে, তার প্রমাণ পাই আমরা এই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চরিত্রের মধ্যে।

কবি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্র নরেন্দ্রনাথরূপেই সঙ্গীতচর্চা ও কাব্য-চর্চা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের বেশী কবিতাই ইংরেজীতে রচিত। ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যের তিনি সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ভগবান পরমহংসদেবের কৃপালাভের পরও স্বামীজী যখন ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও পৃথিবীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় তাঁর সমস্ত ভাষণই তাঁকে ইংরেজী ভাষাতেই দিতে হয়েছিল। তাই স্বামীজীর বিপুল মূল্যবান রচনাসম্ভারও আমরা ইংরেজী ভাষাতেই পেয়েছি। সে তুলনায় তাঁর নিজের

বাংলা ভাষায় লেখার সংখ্যা অল্প। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাতে তাঁর রচনা খুবই কম।*

মাতৃভাষায় স্বামীজী যতই অল্প লিখে থাকুন না কেন, তারই মধ্যে কিন্তু এই দিব্য সাধকের কবি-প্রতিভা আশ্চর্য ঐশ্বর্য নিয়ে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল। এই সন্ন্যাসী কবি সাধারণতঃ তাঁর বক্তব্য চলতি ভাষায় রচনা করতেন। তখন 'সবুজ পত্রে'র অংকুরোদ্গমও হয়নি এবং প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সাহিত্য-জীবনও একটা বিশিষ্ট রূপ পায়নি। স্বামীজীর চলতি ভাষার মধ্যে তাঁর নিজের আন্তরিকতার এমন একটা সবল প্রকাশ দেখা যায় যা তাঁর বীর সন্ন্যাসী আখ্যালাভের সার্থকতা ঘোষণা করে।

আজও বিশ্বের নানা প্রদেশে স্বামীজীর এমন বহু ভক্ত রয়েছেন, যাঁরা তাঁর নাম শোনবামাত্র ললাটে যুক্তকর তুলে সশ্রদ্ধ নমস্কার না জানিয়ে পারেন না। এই দিব্যপ্রাণ মহান কবির সকল প্রকার রচনার বিশদ পরিচয় দেওয়া ক্ষুদ্র এক প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়। সুতরাং এই সন্ন্যাসী কবির ইংরেজী ও সংস্কৃত কবিতাগুলির আলোচনা না করে কেবলমাত্র তাঁর বাংলা কবিতা ও গান এবং হিন্দী পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই সন্ন্যাসী কবির মহতী কাব্য-প্রতিভার সামান্য নিদর্শন উপস্থিত করবো।

সন্ন্যাসী কবি স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মধ্যে বাংলায় একটি 'শিবসঙ্গীত' আছে। রচনাভঙ্গী সংস্কৃতঘেঁষা হ'লেও, ছন্দ তার বাংলা পয়ারের পর্যায়ে পড়ে। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন।

"হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥
ঊর্ধ্ব জলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল।
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥"

এই শিবতুল্য শিবভক্ত কবির আরও একটি বাংলা শিব-সঙ্গীত শুনুন:

'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে
কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল
ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক মৌলিবন্ধ জলে শশাঙ্ক-ভাল।"

ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য যেমন বহু দেবদেবীর স্তবগান সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় সর্বজনবোধ্য করে রচনা করে গিয়েছেন, সন্ন্যাসী কবি স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি একাধিক স্তব স্তুতি ও সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। আমরা অনেকেই হয়ত সে খবর রাখিনি।

দার্শনিকতত্ত্ব-সম্বলিত সঙ্গীত এই সন্ন্যাসী কবি একাধিক রচনা করে গিয়েছেন। কয়েক ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি:

"একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-
কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম
যথায়॥
সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি—'অহমহমিতি'
সর্বক্ষণ॥"

'প্রলয়' বা 'গভীর সমাধি' সম্বন্ধেও স্বামীজী একটি অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সাধন-

---

* ইংরেজীতেও লিখেছেন তিনি কম, তাঁর বক্তৃতার শ্রুতি-লিখনই (সাংকেতিক-লিপিকার গুডউইন কর্তৃক গৃহীত) অধিক।—সঃ

সাম্রাজ্যের স্থর-মণ্ডলে এ গানখানি অনুপম হয়ে থাকবে।

"নহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল ;
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ
বোঝে যার ॥"

এই সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই প্রায় ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত, যথাযোগ্য সুরসহ তানমানলয়ে গীত হয়। স্বামীজীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা 'সখার প্রতি' অনেকেরই প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। সুদীর্ঘ কবিতা। পাঠকদের স্মরণার্থ শেষ চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি :—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর ;
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।"

এমন সহজ সরল সত্য মৈত্রী ও করুণার মূর্ত অবতার বুদ্ধদেবের পর আর কোনও মহাপুরুষ বলতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই। এটি যেন ঈশ্বরসন্ধানী মানুষের দিগ্‌দর্শন! ভগবদারাধনার বীজমন্ত্র! স্বামীজীর কঠোর সাধনলব্ধ জ্ঞান যেন কবিতার ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে।

এই বীর সন্ন্যাসী কবির আর একটি প্রখ্যাত দার্শনিক কবিতার সঙ্গে আশা করি অনেকেরই পরিচয় আছে। সেটি হল শ্যামা-মার সংহার-মূর্তিতে নৃত্যলীলাবিষয়ক। অদ্ভুত রচনা। কবিতাটি সুদীর্ঘ। তবু, কিছু কিছু অংশ তুলে দেবার লোভ অজেয়।

"ভাঙ্গ বীণা—প্রেমসুধাপান,
মহা আকর্ষণ—দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান,
অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া ॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর,
মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥"

সাধক কবি শুধু শ্যামাসঙ্গীতেই তৃপ্ত হননি। বৃন্দাবন-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও কবির আকর্ষণ বড় কম ছিল না। মুরলীধারীর উদ্দেশেও একটি সুন্দর সঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন দেখি অতি সরল সুমধুর হিন্দী ভাষায়। কয়েক ছত্রমাত্র তুলে দিচ্ছি এখানে :

"মুঝে বারি বনোয়ারী
সৈঁইয়া, যানেকো দে—
যানেকো দে রে সৈঁইয়া,
যানেকো দে (আজু ভালা) ॥
মেরে বনোয়ারী,
বাঁদি তুহারি, ছোড়ে চতুরাই
সৈঁইয়া, যানেকো দে (আজু ভালা)
মেরে সৈঁইয়া!"

সন্ন্যাসী কবি যে সঙ্গীত রচনা করে গান করেন সে কার জন্য? কাকে শোনাতে? কবি নিজেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত একটি কবিতায় এর উত্তর দিয়েছেন, "গাই গীত শুনাতে তোমায়।" এটিও সুদীর্ঘ সুন্দর কবিতা, কয়েক

ছত্রমাত্র তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো—কিন্তু তার আগে কবির 'সাগর-বক্ষে' কবিতাটির কিছু পরিচয় না দিলে এই সাধক কবির প্রতি অবিচার করা হবে। 'সাগর-বক্ষে' কবি দেখেছেন—

"শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
বহে বায়ু আপনার মনে,

সমুদ্রবক্ষে যেতে যেতেও এই দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী কবি তাঁর জননী জন্মভূমিকে ভুলতে পারেননি। তাই দেখতে পাই 'সাগর-বক্ষে' কবিতার সমাপ্তি ঘটছে—

"নীচে সিন্ধু গায় নানা তান :
মহীয়ান সে নহে, ভারত!
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার ;
রূপরাগ হ'য়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন ॥"

এইবার এই বীর সন্ন্যাসী কবির কাহিনী শেষ করছি। কিন্তু এ যেন সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল। বিশদভাবে আলোচনা করবার অবকাশ নেই এ সময় আমার হাতে; তাই তিলকাঞ্চনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। কবির এই "গাই গীত শুনাতে তোমায়"—বোধ করি সবাই আমার সঙ্গে স্বীকার করবেন যে বীর সন্ন্যাসী কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এটি। কয়েক ছত্রমাত্র তুলে দিয়ে উপসংহার টানাছ—কী গভীর সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়!

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ!

* * *

আমি আদি কবি,

* * *

মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ, অশনি-নিনাদ,
মৃদুমন্দ মলয়-পবন
আসে যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু
তোলে মুখ শিশিরমার্জিত
ফুল্ল ফুল রবি-পানে।"

ওঁ তৎ সৎ

ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

উনবিংশ শতাব্দীতে পুণ্যভূমি ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে ভগবান মানবদেহ ধারণ করে যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন ভারত-ভূমিতে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর তিনটি যুগধর্ম-স্থাপনে। প্রথমতঃ সকল ধর্মমতের সাধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন ভারতের অনন্ত সত্য প্রচার করলেন—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে মুক্তি,—এই মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছে ভারত ও ভারতেতর ধর্মমতসমূহ। অতএব 'যত মত তত পথ'—এই সত্যপ্রতিষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয়তঃ সকল জীবই ব্রহ্মের প্রকাশ। মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা—অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করলেন—'এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন।' সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় সত্যের নবরূপায়ণ সম্ভব হলো জীবসেবার মাধ্যমেই শিবলাভ। তৃতীয় যুগধর্ম প্রচারিত হলো সহধর্মিণীতে জগজ্জননীরূপে আরাধনায়। পুরাণের অমোঘ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ রূপায়িত করলেন স্বীয় সাধনায়—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' মাতৃজাতি' যে শক্তি-রূপিণী—সেই শক্তিকেই জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই মহিমময় সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—'তাই এ অবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, নারীভাবসাধন, মাতৃভাবপ্রচার।' সর্বত্যাগী সাধক স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনার ভেতর দিয়ে নরনারীর সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করলেন অনন্তমাধুরী ও অবিনাশী পবিত্রতায়, ভোগৈক-লক্ষ্য জড়সভ্যতার কাছে রেখে গেলেন এক অপূর্ব জীবনাদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করলেন, তিনিও শ্রীগুরুর ঐশী প্রেরণায় অনুভব করলেন—সমগ্র জীবজগৎ সেই অখণ্ড ব্রহ্মসত্তারই পূর্ণবিকাশ। অতএব জীবসেবার মধ্যেই মানুষের শিবত্ব বা দেবত্ব-লাভের উপায় নিহিত। এই সত্য বিবেকানন্দ-চেতনায় নবীনালোক সঞ্চার করলো। মানবের দেবশক্তির উদ্বোধনই হলো স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের মূলরহস্য। যে মহাকালীকে, যুগের মহাশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সাধনবলে জাগ্রত করলেন সেই মহাশক্তির উদ্বোধক হবেন স্বামী বিবেকানন্দ যিনি ভাবী কালের কাছে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত আধার।

শ্রীগুরুর মহাপ্রয়াণের পর ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারত পরিক্রমা করে অনুভব করলেন—ভারতের মানুষের মধ্যে প্রয়োজন শক্তিজাগরণ। নির্বীর্য, আত্মবিস্মৃত জাতির উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হলো তাঁর উদাত্ত স্বর—"তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব নারীমূর্তির অবমাননা করা।" যুগাচার্যের বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল "আমার জীবনব্রত দু'টি—স্ত্রীজাতির ও ভারতের নিম্ন সম্প্রদায়ের যথার্থ উন্নতিসাধন।" উন্নয়নের অর্থই হলো আত্ম-

শক্তিতে বিশ্বাস-অর্জন। স্ত্রীশক্তির পুনরভ্যুত্থানের জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে এনেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। প্রাচ্যভাবে তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন স্বামীজী। গুরুর শিক্ষাপ্রণালী শিষ্যার চরিত্রে অপূর্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। স্বামীজীর অনুভূতি—জগতে মহিমময় দেশ ভারতবর্ষ,—তার অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় ধর্ম আর শিবময় জনগণ নিবেদিতার অন্তরে করলো গভীর রেখাপাত। স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, নিবেদিতা প্রচণ্ড কর্মশক্তির অধিকারিণী, কিন্তু সে শক্তির রূপ শান্ত নয়। কুশলী গুরু ধীরে ধীরে নিবেদিতাকে শিক্ষিত করে তুললেন ভারতীয় ভাবাদর্শে। ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণপূর্বক নিবেদিতা স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিতা হলেন। তাঁর জীবন-সুষমা প্রকাশ পেল ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম ভালবাসায়। প্রাচ্যের ভাব-ক্রোড়ে নিবেদিতার মানসসত্তা রূপান্তরিত হলো। মানসিক সকল সংগ্রামের উর্ধ্বে নৈর্ব্যক্তিক সাধনলব্ধ আনন্দলোকে যখন নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিতা তখন ভারতের ধূলিকণার প্রতি পর্যন্ত নিবেদিতার সপ্রেম দৃষ্টি। এই কালের মনোভাব প্রকাশ করে নিবেদিতা লিখছেন—"স্বামীজীর সান্নিধ্যে মানুষ তাহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত। আর দোষত্রুটিগুলির কালিমা অনেকটা মুছিয়া যাইত—মনে হইত জীবনের সম্যক্ বিকাশের জন্য ইহাদের সংঘটন যেন ঠিকই হইয়াছে। স্বামীজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার সম্বন্ধে ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা কতকটা পূর্বোক্ত ধরনের। এইরূপে প্রতিপদেই তাঁহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত ও তাঁহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যেখানে প্রত্যেক নরনারী তাহাদের স্বভাবের অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিত।"

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যই হলো আধ্যাত্মিক জাগরণ—এই জাগরণের অন্য নাম জাতীয়তা। ভারতে জাতীয়তার উদ্বোধনই ছিল নিবেদিতার জীবনব্রত। নিবেদিতার মতে—"জাতীয়তার (nationality) উপাদান হোল পৌরজীবন এবং ঐ জীবনের উপাদান হিসাবে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও স্থায়িভাবে তার (পৌরজীবনের) সঙ্গে যুক্ত। যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশুর গোচারণভূমি দখল করবার জন্য একটি অঙ্গুলি তুলেও গ্রামকে সাহায্য করে না, সে কখনও দেশের জন্য রক্তপাত ও মৃত্যুবরণ করবার মানুষ নয়। যে ব্যক্তি জাতির কল্যাণের জন্য সামান্য বিপদের ঝুঁকি বা অসুবিধা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, তার হাতে বিশ্বাস করে সৈনিকদলের পতাকা অর্পণ করা চলে না।"

ভারতের ইতিহাসপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছিলেন—"যে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে সে ভারতকে নবীন বলিয়া মনে করে—যৌবনসম্পন্না ভারতবর্ষ তার হৃদয়ে পাঁচহাজার বছরের স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র জাতির মধ্যে বস্তুত: ভারতবর্ষ ব্রহ্মচারিণী—নবযৌবনা, বীর্যশালিনী—সংগ্রামের জন্য সদা প্রস্তুত। ভারত এশিয়ার হৃদয়স্বরূপ"।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিবেদিতার উক্তি উল্লেখ-যোগ্য—"জগতের মধ্যে হিন্দুধর্মেরই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সঙ্গতিপূর্ণ বিবৃদ্ধি ঘটেছে। * * *

হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র হিন্দু আচারব্যবহারের রক্ষক নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম হিন্দুচরিত্রের স্রষ্টা। হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্ম বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে পারে না।"

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিতা আনতে চেয়েছিলেন এক বৈপ্লবিক চেতনা। তাঁর মতে অনুভূতির জাগরণই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ভারতের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী ও জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবা—এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই শিক্ষার প্রকৃত পরিণাম।

নিবেদিতা শিল্পী মনের দ্বারা অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের শিল্পকলা অধ্যাত্ম-ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত। প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুকে নিবেদিতাই ভারতীয় শিল্পসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিবেদিতার অভিমত—"ভারত যে শিল্পের ব্যাপারে কেবল পুরাতন রীতিই অনুসরণ করবে এবং নতুনকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তা হয় না। তথাপি ভারতীয় শিল্পরীতিতে ভারতীয় অনুষঙ্গের (association) মাধ্যমে ভারতবাসী উৎকর্ষ-লাভ করতে শিখেছে, সেখানে ইতালীয় অথবা গ্রীসদেশীয় রীতি বা অনুষঙ্গের মাধ্যমে কিছু উপস্থাপিত করার প্রয়াস একান্তই নিষ্ফল। যদি কোন ভারতীয় চিত্রকে প্রকৃত ভারতীয় এবং মহৎ সৃষ্টি হতে হয় তাহলে তাকে ভারতীয় রীতিতে ভারতবাসীর হৃদয়ে আবেদন করতে হবে, তাকে এমন ভাব বা ধারণার ব্যঞ্জনা দিতে হবে যা এদেশীয় সকলের পরিচিত কিংবা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধির যোগ্য। সত্যকারের অতি উচ্চ স্তরের সৃষ্টি হতে গেলে তাকে দর্শকমনে এমন দিব্যানুভূতি বহন করতে হবে যার ফলে সে নিজেকে উন্নততর বলে মনে করবে। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এই উদ্দেশ্যে শিল্পটিকে এমন সব উপাদান দিয়ে রচনা করা প্রয়োজন যা হবে জাতীয়রুচিসম্মত। * * * চিত্রের উপাদান ভাষারই মতো ; যেমন কোন সত্য কবি তাঁর সকল কবিতা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে রচনার কথা ভাবেন না, তেমনি কোন শিল্পীও তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিকে এমন রীতিতে অঙ্কিত করেন না, যা জনসাধারণের বোধগম্য নয়। যে কোন মহৎ অভিব্যক্তি—রচনা, অঙ্কন বা ভাস্কর্য বা ঐ জাতীয় যা কিছু মানুষের হৃদয়ের নিকট সহানুভূতি লাভের জন্য আবেদনস্বরূপ, মানুষ তা কখনও অজানা ভাষায় আবেদন করেন না।"

সমগ্র ভারতের অখণ্ড সত্তার গভীরে নিবেদিতা দেখেছিলেন এক মহাশক্তির জাগরণ। এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার সাধনায় তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। অতএব ভারতবর্ষ ও জগন্মাতা নিবেদিতার ধ্যাননেত্রে অধিকার করেছিল এক অভিন্ন স্থান। দেশমাতৃকা ও জগজ্জননীর অদ্বয়রূপের কল্পনা নিবেদিতার নিকট এইরূপ ছিল—" 'মা' এই মহান শব্দের দ্বারা ভারতবর্ষে কোন্ চিন্তাটির এত উচ্চভাবের অভিব্যক্তি হয়? এ কি সেই ভালবাসারই কল্পনা নয়—যা কোনদিনও অধিকারের দাবী রাখে না, যে কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত, যে ভালবাসা প্রতিদানের অপেক্ষা না করে কেবল দিয়ে যায়, যার জ্যোতি আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করতে অক্ষম—কিন্তু যার আলোকে আমরা অভিসিঞ্চিত হই এবং যা চিরদিনের সূর্যালোকের মতো আমাদের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে। তথাপি মাতৃত্বের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ আর কোন আদর্শ আছে কি যা কোন প্রকার আত্ম-সংযমের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়নি?

সন্তানের নিকট প্রাপ্ত এই দুর্লভ পূজার জন্য কোন্ মূল্য হিন্দু রমণীকে দিতে হয়? * * * প্রকৃতপক্ষে মাতৃপূজার অর্থ পবিত্রতা ও নিষ্ঠার পূজা।"

নিবেদিতার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—"আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত। আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপনিষদের বাণীতে ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে এবং আজিকার দিনে উহারই নাম জাতীয়তা।"

ভারতমাতার বেদীমূলে যিনি নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেছিলেন তাঁকে আমরা জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাবিনম্র অজস্র ভক্তিপ্রণতি এবং প্রার্থনা করি তাঁরই পাদপীঠতলে বসে যেন আমরা দেশমাতৃকাকে ভালবাসার অক্ষয় মন্ত্র লাভ করি।

স্বামীজী

শ্রীশান্তশীল দাশ

বেদান্তের পূর্ণমূর্তি ; ভাস্বর জীবন :
সংসারবিরাগী নহ ; 'জীবে'র মাঝারে
দেখেছ তোমার 'শিবে', যে-দৃষ্টি দিলেন
তোমায় শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই দৃষ্টি নিয়ে
নর-নারায়ণে তুমি করে গেলে সেবা,
আর সেই সেবামন্ত্র দিলে জনে জনে ;
জানালে, দেবতা নেই দূরে বহু দূরে,
লোকালয় হতে দূর নভোচারী হয়ে।
যেখানে মানুষ কাঁদে নানা দুঃখ সয়ে
সেইখানে ব্যথাহত মানুষের মাঝে
রয়েছেন সে-দেবতা, মানবমন্দিরে
অধিষ্ঠান যাঁর নিত্য, সেই মানুষেরে
সেবা কর ; সে-সেবায় তুষ্ট ভগবান :
অভিনব পূজারীতি শিখালে হে যোগী।

মধু বাতা ঋতায়তে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ঋগ্বেদের ঋষি 'মধু বাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে শান্ত হৃদয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব স্তরে নিবিড় একটি মাধুর্য উপলব্ধি করিতেছেন, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সকল কেন্দ্র হইতে সামঞ্জস্য ও শান্তির আবাহন করিতেছেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ৬, ৭, ৮ সংখ্যক মন্ত্র—বড় কবিত্বময় ভাষা, একটি গভীর উদার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মন্ত্রগুলিতে অভিব্যঞ্জিত।

মধু বাতা ঋতায়তে। যজ্ঞের সুফল ঘোষণা করিবার জন্য যেন আজ সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া দিকে দিকে আনন্দ বিকীর্ণ করিতেছে। বাতাসের স্পর্শে আজ এক নূতন মাধুরী অনুভূত হইতেছে। স্বচ্ছ মনে আজ বায়ুর অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্তা প্রতিবিম্বিত। তাই বায়ু আজ শুধু ভৌতিক বায়ু নয়, উহা প্রাণস্পন্দনের প্রতীক, চৈতন্য-সত্তার নির্দেশক।

মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। নদীর প্রবাহে, সিন্ধুর ঊর্মিভঙ্গে মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনার দুটি দিক আছে। একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের। ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়া আমরা বাহিরের অভিব্যক্তিটি অনুভব করি। ভিতরের সত্যটি অনুভব করিতে গেলে আর একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনুশীলন করিতে হয়। আমাদের দৃষ্টি যখন বিক্ষিপ্ত, মন যখন চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে তখন আমরা সব কিছুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে উপলব্ধি করি, বিশ্বসংসারের সকল অভিব্যক্তি যে নিবিড় সাম্যে অধিশ্রিত সে সাম্য তখন আমাদের বোধকে এড়াইয়া যায়। কিন্তু যদি কখনও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কথঞ্চিৎ শান্ত থাকে, মনের চঞ্চলতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে আমাদের চোখ জগতের বস্তু ও ঘটনানিচয়কে ভিন্ন ভাবে দেখিতে পায়। দেখিতে পায় যে সংসারের অজস্র ভিন্নতার মধ্যেও একটি নিগূঢ় ঐক্য সর্বক্ষণেই বিরাজ করিতেছে, অসংখ্য দুঃখ ও তিক্ততা সত্ত্বেও ভগবান এখানে আনন্দ ও মাধুর্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রাখিয়াছেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে সে আনন্দ লুটিয়া লইতে পারে, হৃদয় মধু দিয়া যত খুশি ভরিয়া লইতে পারে। তটিনীর কুলকুল স্রোতে, সাগরের বুকে তরঙ্গের নৃত্যে ঋষি এই আনন্দের ঘোষণা দেখিতে পাইয়াছেন।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, তৃণলতা শস্যাদি আমাদের নিকট মধুময় হউক, অর্থাৎ আমাদের পুষ্টি ও আনন্দবর্ধন করুক। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে। সচরাচর আমরা উহা ধরিতে পারি না। আমরা মনে করি উদ্ভিদজগৎ মানুষের ভোগের জন্যই সৃষ্ট; মানুষ ভোক্তা, উদ্ভিদ ভোগ্য; মানুষ খাদক, উদ্ভিদ খাদ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা উদ্ভিদ হইতে আমরা স্থূল ভোগ আহরণ করিতে পারি কিন্তু যথার্থ পুষ্টি, বীর্য ও মেধা আমাদের দেহমনে সঞ্চিত হয় না উহার জন্য দরকার তৃণলতাশস্যাদির সহিত একটি প্রীতি- ও মৈত্রী-অভ্যাস। বস্তুতঃ উদ্ভিদ ও মানুষ একই সত্যে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সত্যকে স্মরণ রাখিয়া উদ্ভিদের সহিত লেনদেন করিতে পারিলে উদ্ভিদ আমাদের নিকট মধুর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে। সবুজ শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া ফলভারাবনত গাছ-

গুলির তলে দাঁড়াইয়া উহাদের প্রাণবিলাস অনুভব কর। যে প্রাণশক্তি উহাদের লতায় পাতায় ফুলে ফলে অভিব্যক্ত হইতেছে, সেই প্রাণশক্তিকে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া নিজের দেহমনে আবাহন কর। যদি এইরূপ করিতে পার তাহা হইলে লতার প্রাণ-ভঙ্গিমা, পত্রের সবুজ শোভা, পুষ্পের সৌরভ ও বর্ণসুষমা এবং ফলের স্বাদুতা তোমাতে সংক্রমিত হইবে। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতেই ঋষি বলিতেছেন, মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।

মধু নক্তমুতোষসঃ। রাত্রি মধু হউক, প্রাতঃকাল মধু হউক। বেদের ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন কালের নৃত্যভঙ্গ একটি কালাতীত মহিমার পটভূমিকায় পরিনিষ্পন্ন হইতেছে। এ কথা সত্য যে, ক্ষণ, নিমিষ, মুহূর্ত, দিবা, পক্ষ, মাস, সংবৎসর প্রভৃতি কালখণ্ডগুলি অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া চলিয়াছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়। এই কাল ও ঘটনাবলীর দ্রুত সংক্রমণের নামই সংসার। যে মুহূর্তে আমরা জন্মাই তখন হইতেই আমরা সংসারে বাঁধা পড়ি। অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত আমাদিগকে কাল ও ঘটনার সহিত সংযুক্ত থাকিতে হয়। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, এই সংযোগ পূর্ব পূর্ব জন্মেও আমাদের ঘটিয়াছে এবং মৃত্যুর পরেও বার বার ঘটিবে। আমাদের কালবদ্ধতার আদি নাই, অন্তও বোধকরি আপাতদৃষ্টিতে নাই। তথাপি আমাদের জীবনে কালবশ্যতা মানুষের সমগ্র সত্তাকে প্রকাশ করে না। তত্ত্বজ্ঞ ঋষি দেখিয়াছেন যে, মানুষ কালচক্রে ঘুরিলেও তাহার জীবনের একটি বৃহৎ ভাগ কালের ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আছে। উহাই মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা। ঐ সত্তার প্রত্যক্ষ পরিচয় যখন মানুষ পায় তখন সে কালজয়ী হয়। মৃত্যু আর তখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। নিত্য পরিবর্তনশীলের মধ্যে চির অপরিবর্তনীয়কে দেখিয়া সে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যায়। প্রত্যেকটি দিন তখন হয় সার্থকতায় পূর্ণ, প্রত্যেকটি রাত্রি তখন ভরিয়া যায় মধুঝরা সঙ্গীতে। কালপ্রবাহের পারে যে কালাতীত আনন্দ-উৎসব রহিয়াছে উহাকে স্মরণ করিয়াই ঋষি বলিতেছেন, মধু নক্তমুতোষসঃ। মধু—অর্থাৎ অপার্থিব শান্তিস্পর্শ দিয়া দিনের আরম্ভ হউক, মধু দিয়া দিনের শেষ হউক, আবার রাত্রিতেও যেন মধুস্পন্দনের বিরতি না ঘটে।

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥

মাতা পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক; পিতৃতুল্য স্বর্গলোক হইতে মধু বর্ষিত হউক। পৃথিবীর ধূলি যদি মধুময় হয় তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন কিছু কি তিক্ত থাকিতে পারে? ভূলোক-দ্যুলোক ব্যাপিয়া আনন্দের পরিবিস্তার। কালো আর কিছু নাই, সকলই আলো। কুৎসিত আর কিছু নাই, সকলই সুন্দর। ঘৃণা লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। হীন স্বার্থ দূরে পলায়ন করিয়াছে। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা চিরতরে নির্বাসিত। ধরণী হইতে উঠিয়া জ্যোতির্বর্ত্ম ঊর্ধ্বগগনে গিয়া ঠেকিয়াছে। সেই রাস্তা ধরিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ঋষির অনুভবকে অনুসরণ করিয়া সুফী মরমিয়া জাফর গাহিয়াছেন—

অর্শসে লেকর ফর্শ জমীন তক্,
ঔর জমীন সে অর্শ বরী তক্।
জহাঁ মৈঁনে দেখা তুঁহী নজর আয়া,
জো কুছ হায় সো তুঁহী হায়॥

বাঙলার বাউলও ধুয়া ধরিয়াছেন—

প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া,
কিছু বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও
তার মুখে নাই সাড়া,
(আবার) চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও
আসমানেতে বানায় ঘর।
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর॥

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

বনস্পতি আমাদের নিকট মধুমান্ হউক। সূর্যের কিরণ আমাদের দেহমনঃপ্রাণে মধু সঞ্চার করুক। দিঙ্‌মণ্ডল অথবা ধেনুসমূহ আমাদের দিক অভয় ও পুষ্টি।

ঋষি শান্তি, সামঞ্জস্য, শক্তি ও আনন্দের উৎসে পৌছিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি বদলাইয়া গিয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাঁহার নিকট কোনও মোহ, আসক্তি, ভয় এবং বন্ধন আনিতেছে না। উহারা তাঁহার চিত্তে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিরমুক্ত চৈতন্যসত্তার স্পর্শ দিয়া যাইতেছে। মধু বাতা ঋতায়তে প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে ঋষির স্বাত্মানুভূতির সামান্য কিছু পরিচয় আমরা পাই। সম্পূর্ণ পরিচয় তো পাওয়া সম্ভবপর নয়। সম্পূর্ণ পরিচয় কি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা চলে? যেখানে সম্পূর্ণ পরিচয় সেখানে বাক্য থামিয়া যায়, মনও সেখানে নিশ্চল।

'মধু বাতা ঋতায়তে' মন্ত্রত্রয়ে ঋষি মানুষকে ডাকিয়া বলিতে চাহিতেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির গভীরে একটি অব্যাহত শান্তি, শক্তি ও সমতা রহিয়াছে। চন্দ্র সূর্য তারকা আকাশ বাতাস তটিনী সাগর প্রান্তর পর্বত পশু পক্ষী—সব কিছু একটি অসীম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন সত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষও দাঁড়াইয়া আছে ঐ জন্মহীন ক্ষয়হীন অনন্ত সত্যে। মানুষ যদি যথার্থ শক্তি, অভয়, শান্তি ও আনন্দ চায় তাহা হইলে তাহাকে বাহির ধরিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। ঐ সত্যকে আবিষ্কার না করিলে মানুষের দুঃখের অবসান নাই। ঐ সত্যকে জানিতে পারিলে জগৎ-সংসার মধুময় হইয়া যায়, সকল বন্ধন, সকল অন্ধকার কাটিয়া যায়। তখন সর্ব বস্তু হইতে, সকল দিক হইতে মধুর স্রোত প্রবাহিত হয়।

মধু বাতা ঋতায়তে। বায়ুর প্রবাহ মধুর কিন্তু বায়ু শুধু বাহিরের বায়ু নয়। স্পন্দনশীল সূক্ষ্মতর নানা বস্তুকেও আমাদের শাস্ত্রে বায়ু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমাদের মনকে আমরা দ্রুতগতি অসংখ্য চিন্তা, সঙ্কল্প, ইচ্ছা ও আবেগরাশির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বলিয়া দেখিতে পাই। অতএব মনকে বায়ুর সহিত তুলনা করা সমীচীনই। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনঃসংযমের প্রসঙ্গে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্। বায়ুকে আয়ত্ত করা যেমন কঠিন, সদা-চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা সেইরূপই দুষ্কর। সত্য কথা, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ঋষি অনুভব করিয়াছেন - মধু বাতা ঋতায়তে। বহু দুঃখ, বহু ভয়-মোহ শোক আনিয়া যে মন-বায়ু আমাদিগকে সাধারণতঃ বিপর্যস্ত করে উহা একদিন শান্ত হইতে পারে। উহার প্রবাহে ব্যথা-বিক্ষোভের পরিবর্তে একদিন মধু ঝরিতে পারে। সেই শুভদিন যখন আসে তখন আমাদের মন দেখিয়া আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হই। কী পবিত্রতা, কী উদারতা, কী সন্তোষ অভয় ও অনাসক্তি, কী জ্ঞান ও প্রেম, কী সমদৃষ্টি, কী প্রশান্তি! পুরাতন মানুষটি যেন একেবারেই মরিয়া গিয়াছে. মানুষের দেহে জ্যোতির্ময় সর্বশুক্র এক দেবতা বাস করিতেছেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁহার 'ধন্যাষ্টকে' বলিতেছেন,—সর্বাবস্থিতিরস্তু বস্তুবিষয়া। সে মন যে ভাবেই অবস্থান করুক উহা ব্রহ্মকেই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়। কেনোপনিষদের ঋষি শুনাইয়া রাখিয়াছেন প্রতিবোধবিদিতম্— মনের প্রত্যেকটি বৃত্তিতে সত্যের জ্ঞান প্রতিভাত হয়।

মধু বাতা ঋতায়তে। বাতা—বাহিরের বায়ু, প্রাণবায়ু মন-বায়ু, আবার অখিল ঘটনাস্রোত— সারা বিশ্বপ্রপঞ্চ। বিশ্বসংসারকে ঈশোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— যাহা কিছু অনবরত ছুটিতেছে, বদলাইতেছে, তিরোহিত হইতেছে। বাহিরের বায়ুতে যে বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছি, প্রাণবায়ুতে এবং মন বায়ুতে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, বিশ্বজগতেও উহা দেখিতে পাইতেছি—স্পন্দন, প্রবাহ। অতএব সংসারকেও বায়ু বলা বলে। যতদিন আমাদের তত্ত্বদৃষ্টি আসে নাই ততদিন সংসার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় সং—সার, সং-এর ব্যাপার মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদের তৃতীয় নয়ন যখন খুলিয়া যায় তখন বৈদিক ঋষির ন্যায় আমরাও উপলব্ধি করি—মধু বাতা ঋতায়তে। বাতা—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল ঘটনাবলী মধু বিকীর্ণ করিতেছে। কোথাও কিছু অসামঞ্জস্য নাই, ত্রুটি নাই, হানি নাই। জন্মের হাত ধরিয়া মৃত্যু কী সুন্দর তালে তালে নাচিতেছে, আলোকের সহিত আঁধার মিশিয়া কী অপরূপ বিশ্বপট সৃষ্ট হইয়াছে, কান্না ও হাসিতে মিলিয়া কী অনবদ্য সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে!

বেদবাণী আশা ও আনন্দের বাণী। মানুষ অমৃতের সন্তান। জগৎ ব্রহ্মময়। পরিবর্তন অপরিবর্তনীয়ে আশ্রিত। বন্ধন মুক্তিরই নির্দেশক। মানুষ জীবন ও জগতের পরম সত্যকে চিনিয়া, ভালবাসিয়া, ধরিয়া মধুর আস্বাদ করুক, বিশোক বিমোহ বিমুক্ত হউক—ইহাই বেদের ঋষির একতান প্রার্থনা।

'অ্যাপোলো-৮' মহাকাশযানে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ

বিজ্ঞানভিক্ষু

পথের বাধা

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তা দিনে একবার করে নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বছরে একবার করে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবী তার সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে আমাদের চাঁদকেও সঙ্গে নিয়ে চলে। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, চাঁদ তেমনি ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী গ্রহ, চাঁদ উপগ্রহ। চাঁদ আবার নিজের চারদিকেও ঘোরে। কিন্তু এতে তার সময় লাগে ২৯½ দিন। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতেও তার ২৯½ দিনই লাগে, তাই চাঁদের একটা দিকই আমরা দেখতে পাই, অপর দিকটি কোন দিনই নজরে পড়ে না।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৩৩,৮১৪ মাইল। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী সবই গোলাকার। পৃথিবীর ব্যাস ৮,০০০ মাইল, চাঁদের ব্যাস ২,১৬৩ মাইল।

পৃথিবীর চারদিকে (ভূপৃষ্ঠ থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত) বায়ুমণ্ডল ঘিরে আছে; তার

ভেতর পৃথিবীপৃষ্ঠসংলগ্ন ৫০ মাইল ঘন স্তর, বাকীটা খুবই হাল্কা। তারপর আরো চারশো মাইল অতি হাল্কা গ্যাস থাকলেও কার্যত: তা শূন্যেরই মত। তারপর মহাশূন্য। চাঁদের চারদিকে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল বা অন্য কোন বাষ্পীয় মণ্ডল নেই।

পৃথিবী থেকে চাঁদের কাছে পৌঁছুতে চাইলে তাই ২,৩৩,৮১৪ মাইল রাস্তার মাত্র ১৫০ মাইল বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে তারপর মহাশূন্যপথেই যেতে হবে। অর্থাৎ পথে যে-কদিন থাকা হবে, সে-কদিনের জল, খাবার এসব তো চাই-ই, সেইসঙ্গে শ্বাসগ্রহণের জন্য যথেষ্ট অক্সিজেনও সঙ্গে নিতে হবে। তাছাড়া যাবার পথে মানুষের দেহের ওপর চাপও যাতে পৃথিবীতে থাকার সময়কার মতই থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথিবীতে থাকার সময় সমগ্র বায়ুমণ্ডলের চাপ আমাদের দেহের ওপর পড়ে; এই চাপের ভেতর সর্বক্ষণ বাস করার উপযোগী করেই আমাদের দেহযন্ত্র নির্মিত। বায়ুমণ্ডলের মধ্যেও যত ওপরে ওঠা যাবে, এই চাপ তত কমে আসবে। মহাশূন্যে একেবারেই থাকবে না। কৃত্রিম চাপের ব্যবস্থা না থাকলে দেহযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে।

মহাশূন্যে সূর্যের তাপও পৃথিবীপৃষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশী লাগে। সূর্যকিরণ যেদিকে পড়ে না, সেদিকে ঠাণ্ডাও লাগে অনেক বেশী। আরো অনেক বাধা পথে, মহাশূন্যে কত রকমের রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে; সেগুলির হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও থাকা চাই।

আর, সবচেয়ে বড় কথা, পৃথিবীর টান বা অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চলে যাবার মত শক্তিমান যান তৈরী করতে হবে। মহাকাশপথে যানটি চলার সময় তার গতিনিয়ন্ত্রণ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করতে হবে, যানটিকে আবার ফিরিয়েও আনতে হবে পৃথিবীতে।

চাঁদে মানুষ যাবার পথে এত বাধা, কিন্তু মানুষ সে-সব বাধা জয় করে সম্প্রতি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির এবং মানুষের সাহসের এ এক যুগান্তকারী বিজয়ের ইতিহাস। চাঁদ ও পৃথিবী কোনটিই স্থির নয়। দুরকমের গতি আছে প্রত্যেকেরই। কাজেই পৃথিবীর ওপর দূর থেকে কোন লক্ষ্য বেধ করার নিপুণতা, আর পৃথিবী থেকে চাঁদে তা করার নিপুণতায় পার্থক্য প্রচুর। পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেট যেদিন চাঁদের বুকে প্রথম আছড়ে পড়েছিল এবং পূর্ব-নির্ধারিত স্থানের কাছাকাছিই, সেদিন তাই একজন মন্তব্য করেছিলেন: '৬ মাইল দূরে একটি মাছি বসে আছে; এত দূর থেকে একটি খুব সরু সূচ ছুঁড়ে তার চোখ বিদ্ধ করতে হলে যে নিপুণতার প্রয়োজন, এ নিপুণতা তার চেয়েও বেশী।'

প্রস্তুতি

মানুষের মহাকাশ-অভিযানের স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার সূচনা হল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর; এইদিন রাশিয়া মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করে। এটি ৯০ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে থাকে। পরিক্রমা-পথে পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ছিল সর্বনিম্ন ১৪০ মাইল, এবং সর্বোচ্চ ৫৬০ মাইল।

কৃত্রিম উপগ্রহটিকে এত উঁচুতে তোলা এবং পৃথিবীর কক্ষপথে তার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল রকেটের সাহায্যে। রকেট হল, আমরা আকাশে যে হাউই ছুঁড়ি,

তারই অতি-উন্নত সংস্করণ। এই রকেটের সাহায্যে সাফল্যের সহিত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ-উৎক্ষেপ ও তার নিয়ন্ত্রণ মহাকাশ-অভিযানের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। আকাশে যে পাখী উড়ে বেড়ায়, প্রপেলার-চালিত এরোপ্লেন চলে, তা পৃথিবীর ওপর বায়ুমণ্ডল আছে বলেই সম্ভব হয়; যেমন জলে আমরা হাত দিয়ে জল টেনে সাঁতার কাটি, দাঁড় বা প্রপেলার দিয়ে জল টেনে নৌকা বা জাহাজ চালাই, অনেকটা সেই ধরনের। কিন্তু যেখানে বাতাস নেই, সেখানে প্রপেলার ঘোরালেও এরোপ্লেন চলবে না। কিন্তু রকেট বা রকেট চালিত যান চলবে; রকেট চালু হওয়া মাত্র তার ভিতরে গ্যাস সৃষ্ট হয়ে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে, এবং তার পিছনদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে সে গ্যাস বেরিয়ে আসে; এরই প্রতিক্রিয়া রকেটটিকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়; বায়ুমণ্ডল থাকা-না থাকার সঙ্গে এই গতিসৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। তাই মহাশূন্যেও রকেট ছুটতে পারে। এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ-উৎক্ষেপের পর আরো বহু উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে; আমেরিকাও এই অভিযানে যোগদান করে। আমেরিকা থেকে প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে।

এভাবে উৎক্ষেপণের শক্তি ও দক্ষতা ক্রমে বাড়তেই থাকে। মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের বহু অজানা বিষয়ের জ্ঞানও আহরিত হতে থাকে এই সব উপগ্রহের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত যন্ত্রপাতি থেকে প্রেরিত সংবাদের মাধ্যমে। পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া থেকে 'লুনিক-১' যন্ত্রপাতিসহ প্রথম উৎক্ষিপ্ত হয়; ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার 'লুনিক-৩' চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে কাছ থেকে চাঁদের (চাঁদের যে দিকটি আমরা দেখতে পাই না তারও) ফটো তুলে পাঠায়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরিতে রাশিয়ার 'লুনা-৯' এবং ঐ বৎসরেরই জুন মাসে আমেরিকার 'সার্ভেয়ার-১' চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে।

এভাবে মহাকাশ এবং চাঁদের অনেক অজানা তথ্য সংগৃহীত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত যন্ত্রগুলিকে বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার এবং সেগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দক্ষতাও বিপুলভাবে উন্নত হতে থাকে। এই দক্ষতা এখন এত উন্নত হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে যন্ত্রপাতি সহ মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের খুব কাছে কৃত্রিম গ্রহ পাঠিয়ে, পৃথিবী থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিকট থেকে গ্রহ দুটির ফটো তুলে আনা হয়েছে।

মানুষকে চাঁদের কাছে পাঠাতে হলে আরো যেসব প্রস্তুতি এবং মহাকাশযান ও তার নিয়ন্ত্রণের উন্নতির প্রয়োজন, তাও ইতোমধ্যে হয়ে গেছে; মানুষ মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে ওঠেছেও বহু বার।

মানুষের মহাকাশ অভিযান

মানুষ মহাকাশযানে প্রথম আকাশে ওঠে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল; রাশিয়ার 'ভষ্টক-১' মহাকাশযানে গাগারিন ওপরে উঠে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে ১ঘণ্টা ৪৮ মিনিট পরে নেমে আসেন। তারপর ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন রাশিয়ার টিটভ, 'ভষ্টক-২' যানে; এই বৎসরই ৬ই আগস্ট তিনি ওঠেন এবং ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট পরে ৭ই আগস্ট পৃথিবীতে নেমে আসেন। আমেরিকা থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের

৫ই মে শেপার্ড এবং ২১শে জুলাই গ্রিসম মহাকাশে উঠলেও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারেননি, যথাক্রমে ১৫ মিনিট ও ১৬ মিনিট আকাশে থেকে অবতরণ করেছিলেন। আমেরিকা থেকে প্রথমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন গ্লেন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি। তিনি ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট মহাকাশে থেকে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এভাবে 'অ্যাপোলো-৮'-এ চড়ে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ করতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ৩৩ জন মহাকাশচারী (আ: ২১, রা: ১২ জন) মহাকাশে ওঠেছেন ২৭টি অভিযানে (আমেরিকা ১৭, রাশিয়া ১০)। এঁদের মধ্যে আমেরিকার ৬ জন মহাকাশচারী দুবার এবং ১ জন তিনবার উঠেছিলেন। রাশিয়ার একজন মহাকাশচারী ২ বার উঠেছিলেন। ২৭টি অভিযানের মধ্যে (রাশিয়া ও আমেরিকা মিলে) মহাকাশযানে একজন করে মহাকাশচারী উঠেছিলেন ১৪টিতে, দুজন করে ১১টিতে এবং তিনজন করে ২টিতে।* এই অভিযানগুলির মধ্যে মানুষ মহাকাশে একটানা সবচেয়ে বেশী সময় থেকেছে ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (এই সময় পৃথিবীকে একটানা পরিক্রমা করেছে ২০৬ বার), আর সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছে ৮৫৩ মাইল।

* অ্যাপোলো-এর অভিযান নিয়ে পৃথিবীর মহাকাশচারীর সংখ্যা হল ৩৪ জন (২২ জন আমেরিকার, ১২ জন রাশিয়ার)। এদের ভেতর ৭ জন দুবার করে মহাকাশে ওঠেন, তিনবার করে ওঠেন ২ জন; একবার করে ওঠেছেন বাকী ২৫ জন। মোট অভিযানের সংখ্যা হল ২৮—একজনকে নিয়ে ১৪টি, ২ জনকে নিয়ে ১১টি এবং তিনজনকে নিয়ে ৩টি)।

অ্যাপালো-৮ মহাকাশযান

অ্যাপোলো-৮ নামক মূল মহাকাশযানটির (১নং চিত্র—খ) উচ্চতা ১১´ ফিট, ব্যাস ১৩´ ফিট; গম্বুজাকার এই যানটির ভেতরে জায়গা ২১৮ ঘনফুট। এরই ভেতর বসে তিনজন মহাকাশচারী চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে এলেন। যানটি এমন ধাতুতে তৈরী, যা ৬,০০০° ফা: উত্তাপ থেকেও মহাকাশচারীদের বাঁচাতে পারে, বাইরে ৬,০০০° ফা: উত্তাপ হলেও ভেতরের উত্তাপ ৭২° ফা:-এর বেশী না হয়। যানটির বহির্ভাগ অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাষ্টিক-মিশ্রিত একটি মৌচাকের নকসায় গড়া আবরণে ঢাকা। মহাকাশযানের এই অংশটুকুই মাত্র মহাকাশচারীদের নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। যাত্রাকালে রকেট প্রভৃতি সহ মহাকাশযানটি ৩৬৪´ ফিট দীর্ঘ ছিল (১নং চিত্র), ৩৬ তলা বাড়ীর সমান উঁচু।

এই মূল যানের মাথায় ছিল 'লাঞ্চ এসকেপ মডিউল (১নং চিত্র—ক)—এটির কাজ হল, ওঠার সময় মাঝপথে হঠাৎ যদি রকেটে কোন বিপজ্জনক গোলমাল ঘটে, তাহলে এটি মূল যানটিকে নীচের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, যাতে মহাকাশযাত্রীরা নিরাপদ হতে পারেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে ওঠার পরই এটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, কারণ তখন এর আর কোন কাজ ছিল না।

মূল যানটির ঠিক নীচেই ছিল ২৩´ ফিট লম্বা 'সার্ভিস মডিউল' বা অ্যাপোলো-৮ মূলযানের নিজস্ব ইঞ্জিন (১নং চিত্র—গ) এবং অন্যান্য বহু যন্ত্রপাতি। মহাশূন্যে ছুটতে শুরু করার পর থেকে এইটিই হবে মূলযানের একমাত্র সঙ্গী ও সহায়ক। মাঝপথে গতিপথ পাল্টাবার সময়, চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের জন্য যানের

গতিবেগ কমানো ও তার মুখ ঘুরিয়ে দেবার সময়, চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার পর ফিরে আসার জন্য যানের গতিবেগ বাড়ানোর এবং ফেরার পথে কোথাও প্রয়োজন হলে যানের মুখ একটু ঘুরিয়ে তার গতিপথ ঠিক করে নেওয়ার সময় এই অংশে স্থাপিত ইঞ্জিনটিই তা করবে। এটি ঠিক থাকার ওপরই নির্ভর করছে চন্দ্র-প্রদক্ষিণ অভিযানের সাফল্য এবং মহাকাশচারীদের মরণ-বাঁচন। ফিরে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ঠিক আগে এটিকে মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

এর ঠিক নীচে ছিল 'লুনার মডিউল' বা চাঁদে নামার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র (১নং চিত্র-ঘ); এ অভিযানে চাঁদে নামা হবে না, তাই যন্ত্রগুলি ভেতরে নেওয়া হয় নাই, কেবল তার বাইরের খোলটিই রাখা হয়েছিল।

এর নীচে ছিল বিপুলশক্তিশালী ২৮২' ফিট দীর্ঘ 'সাটার্ণ-৫' রকেট। রকেটটির তিনটি অংশ, পরপর জোড়া; রকেটের একেবারে মাথায় মাত্র ৩ ফিট উঁচু একটি অংশে রকেটের 'মস্তিষ্ক' (১নং চিত্র ঙ) বা যন্ত্র-গৃহ, যেখানে রকেটের এই তিনটি অংশকে নীচের দিক থেকে একটির পর একটি চালু করার ও কাজশেষে খুলে দেওয়ার উপযোগী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ছিল।

রকেটের প্রথম অংশটি, একেবারে নীচের অংশটি (১নং চিত্র জ) ১৩৮' ফিট উঁচু, ব্যাস ৩৩' ফিট। জ্বালানি সহ এটির ওজন ২,৪০০ টন; জ্বালানির ওজনই বেশী—১,৬০০ টন তরল অক্সিজেন এবং ৬১০ টন কেরোসিন। এটিতে ৫টি শক্তিশালী 'এফ-১' ইঞ্জিন সংযুক্ত।

রকেটের দ্বিতীয় অংশটি (১নং চিত্র—ছ) ৮২' ফিট লম্বা, ব্যাস ৩৩' ফিট। ৪৭০ টন জ্বালানি সহ (তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন) এটির ওজন ৫০০ টনের কিছু বেশী। এটিতে ৫টি 'জে-২' এঞ্জিন।

রকেটের তৃতীয় অংশটি ৫৯' ফিট উঁচু, ব্যাস ২২' ফিট। ওজন ১১৫ টন জ্বালানি সহ (তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন) ১৩০ টন। এটিতে একটি 'জে-২' ইঞ্জিন।

অভিযান

চন্দ্রপ্রদক্ষিণের জন্য অ্যাপোলো-৮-এর ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হয় গত ২১শে ডিসেম্বর। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি শহরের উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রে পূর্বোক্ত ৩৬৪' ফিট দীর্ঘ মহাকাশযানটি খাড়া করে দাঁড় করানো ছিল; মাথার ওপর মূল যানটির (খ) মধ্যে মহাশূন্যে দেহের আভ্যন্তর চাপ, উত্তাপ প্রভৃতি রক্ষার উপযোগী পোশাক পরে বসে ছিলেন তিনজন মহাকাশচারী—ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস্ এ. লোভেল ও উইলিয়াম এ. এ্যানডারস, তাঁদের সঙ্গে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মহাশূন্য হতে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ছিল। অভিযানের নেতা ছিলেন বোরম্যান, চালক ছিলেন লোভেল। ফটো তোলার দায়িত্ব ছিল এ্যানডার্স-এর ওপর। লোভেল এর আগে আরো দুবার মহাকাশে উঠেছিলেন; প্রথমবার 'জেমিনি-৭' মহাকাশযানে ১৯৬৫-র ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট মহাকাশে ছিলেন, ২০৬ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এই যাত্রায় বোরম্যানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৬৬-র ১১ই নভেম্বর লোভেল দ্বিতীয় বার 'জেমিনি-১২' যানে মহাকাশে উঠেছিলেন, ৯৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ৫৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে নেমে এসেছিলেন।

১৯৬৮-র ২১শে ডিসেম্বর পূর্বনির্ধারিত সময়ে * সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানটির সহিত সংযুক্ত সাটার্ন-৫ রকেটের ৩য় অংশের ৫টি ইঞ্জিনই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল; সে বিপুল শক্তি (৩৩,৭৫,০০০ কিলোগ্রাম চাপের) বিপুলকায় মহাকাশযানটিকে ওপরের দিকে তুলে নিয়ে ঘণ্টায় ৬,০০০ হাজার মাইল বেগ দিল—ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযান শুরু হল। আড়াই মিনিটের মধ্যে যানটিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৮ মাইল ওপরে তুলে দিয়ে রকেটের এই প্রথম অংশটি (জ) খসে গেল; এই আড়াই মিনিটেই তার ৫টি ইঞ্জিন ২,২৫০ টন জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলেছে। রকেটের প্রথম অংশটি খসে যাবার পরেই দ্বিতীয় অংশটি (ছ) সক্রিয় হয়; ৫টি 'জে-২' ইঞ্জিন মিলিতভাবে ৫,০০,০০০ কেজি চাপের শক্তি উৎপাদন করে ৬½ মিনিট সক্রিয় থেকে মহাকাশযানটিকে পৃথিবী থেকে ১১৮ মাইল ওপরে তুলে দিল। তারপর প্রথম অংশটির মতই জ্বালানি-হীন অবস্থায় মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মহাকাশযানটির গতিবেগ তখন বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় ১৪,০০০ মাইল হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশটি বিচ্ছিন্ন হবার পর রকেটের তৃতীয় অংশটি (চ) চালু হয়। এ অংশে মাত্র ১টি 'জে ২' ইঞ্জিন ছিল। এটি মহাকাশযানের গতিবেগ আরও বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল করে দিল এবং এটির মুখ ঘুরিয়ে দিল; যার ফলে এতক্ষণ যেমন মহাকাশযানটি পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছিল, তা না করে পৃথিবীর চার-দিকে ঘুরতে থাকল। পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশযানটিকে স্থাপন করেই এই তৃতীয়

১ নং চিত্র
এ্যাপোলো ৮ মহাকাশযান

অংশের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়; মহাকাশযানটি তখন ইঞ্জিনের শক্তি ছাড়াই

* ভারতীয় সময়; প্রবন্ধের সর্বত্রই ভারতীয় সময় দেওয়া হয়েছে।

নিজের গতিবেগ ও পৃথিবীর অভিকর্ষের মিলিত ফলে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। তৃতীয় অংশটি কিন্তু তখনো মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তার জ্বালানিও ফুরিয়ে যায় নাই ; তার আরো কাজ ছিল। মহাকাশ-যানটি রকেটের এই তৃতীয় অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এই পৃথিবী-প্রদক্ষিণকালে মহাকাশযাত্রীরা খুব ভালভাবে দেখে নিলেন মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা। পৃথিবীর পরিচালন-কেন্দ্রের সহিত বেতারে যোগাযোগের যন্ত্রগুলি ঠিক আছে কি না, তাঁদের মহাশূন্যে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যানের ভেতরকার তাপ, চাপ ইত্যাদি ঠিক রাখার যন্ত্রগুলি, শ্বাসগ্রহণের জন্য অক্সিজেন-সরবরাহের যন্ত্র, বিদ্যুৎ-উৎপাদন-যন্ত্র প্রভৃতি ঠিক কাজ করছে কিনা—ভালভাবে সব পরীক্ষা করে নিলেন। কথা ছিল, কোথাও কোন গোলমাল দেখলে এখান থেকেই তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন বা অন্য কাজ করবেন, পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে যাবার জন্য মহাশূন্যের পথে পা বাড়াবেন না ; কিন্তু তার প্রয়োজন হল না, মহাকাশযাত্রীরা দেখালেন সব যন্ত্রপাতিই ঠিক মত কাজ করছে।

তখন আসল চন্দ্রাভিযান শুরু হল। পৃথিবী ছেড়ে যাবার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, রাত্রি ৯-১১ মিঃ সময়ে রকেটের তৃতীয় অংশের ইঞ্জিনটিকে দ্বিতীয়বার চালু করা হল ; ফলে মহাকাশযানের গতি বেড়ে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইলে উঠল। এই গতিবেগ পেয়ে মহাকাশযানটি পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে, তার অভিকর্ষশক্তিকে উপেক্ষা করে সোজা চাঁদের দিকে ছুটতে লাগল। চাঁদ এই সময় যেখানে ছিল, সেদিকে নয়, কারণ চাঁদের কাছে পৌছুতে যানটির যে সময় লাগবে, ততক্ষণে চাঁদ অনেকখানি সরে যাবে। হিসেব করে মহাকাশযানটির মুখ মহাকাশের এমন একটি স্থানের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, যেখানে যানটি যখন চাঁদের ঠিক পাশে গিয়ে পৌছুবে, চাঁদ ততক্ষণে এগিয়ে এসে সেখান থেকে মাইল ৭০ দূরে থাকবে। সহজেই বোঝা যায় এই হিসেব করে যাত্রা করাটা কত সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক ব্যাপার—একটু এদিক ওদিক হলেই হয় যানটি চাঁদের খুব কাছে গিয়ে তার টানে তার বুকে আছড়ে পড়বে, আর না হয় চাঁদ থেকে যানটি অনেক বেশী দূর দিয়ে চলে যাবে, যার ফলে চাঁদের অভিকর্ষ তাকে টেনে নিজের চারদিকে ঘোরাতে পারবে না, মহাশূন্যে আরও এগিয়ে গিয়ে যানটি পৃথিবী ও চাঁদ দুয়েরই অভিকর্ষের বাইরে গিয়ে সূর্যের টানে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। উভয়ক্ষেত্রেই মহাকাশচারীদের মৃত্যু নিশ্চিত।

মহাকাশযাত্রীরা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সহযোগিতায় যাত্রাপথ ঠিকমতই বেছে নিয়েছিলেন, হিসেবে ভুল হয়নি। কথা ছিল সামান্য ভুল হলে মাঝপথে তা সংশোধন করা হবে, তার ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হয়নি ; পৃথিবী থেকে ৬২,৫০০ মাইল দূরে আসার পর একবার মাত্র তা করতে হয়েছিল।

চাঁদের দিকে মহাকাশযানটিকে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চন্দ্রাভিমুখী করার পরই মহাকাশযানের সঙ্গে সংযুক্ত 'স্যাটার্ন-৫' রকেটের তৃতীয় অংশটি মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন হবার পরও, ইঞ্জিন চালু না থাকা সত্ত্বেও নিজের গতিবেগেই

২নং চিত্র

এ্যাপোলো৮-এর চাঁদে যাবার ও ফিরে আসার পথ

এটি মহাকাশযানের পিছন পিছন চাঁদের দিকেই ছুটতে লাগল, প্রায় একই পথ ধরে। মহাকাশযানের আয়তন তখন খুব ছোট হয়ে এসেছে, মহাকাশযাত্রিবাহী 'অ্যাপোলো-৮' এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত তার নিজস্ব ইঞ্জিনটি মাত্র ছিল; সব নিয়ে ৩৪' লম্বা।

'অ্যাপোলো-৮' তার সঙ্গে সংযুক্ত নিজস্ব ইঞ্জিন সহ তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে। তার নিজস্ব ইঞ্জিনও তখন চালু নয়, নিজের গতিবেগেই ছুটেছে। এই গতিবেগ পৃথিবীর অভিকর্ষে (পৃথিবীর টানে) ক্রমশঃ কমতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর বিকাল ৫-৩০ মিঃ সময়, ভূপৃষ্ঠ ছাড়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে, 'অ্যাপোলো-৮' পৃথিবী থেকে ১,০০,০০০ মাইল দূরে চলে যায়; চাঁদ তখনো ১,৩৩,৮১৪ মাইল দূরে।

'অ্যাপোলো-৮'-এর পিছনে তা থেকে বিচ্ছিন্ন সাটার্ন ৫ রকেটের তৃতীয় অংশটিও ছুটে আসছিল; এখন সেটি 'অ্যাপোলো-৮'-এর ১,২০০ মাইল পিছনে ছিল, তার গতিবেগ ছিল এ-সময় ঘণ্টায় ৪০০ মাইল মাত্র। হিসেব করে দেখা গেল, 'অ্যাপোলো-৮' চাঁদে পৌছে যখন চন্দ্রপরিক্রমা করবে, তখন এটি সেখান থেকে ১,৮০০ মাইল পিছিয়ে থাকবে; কাজেই চন্দ্র-পরিক্রমা-কালে এর সঙ্গে 'অ্যাপোলো-৮'-এর ঠোকাঠুকি লাগার কোন আশঙ্কাই নেই; এটি যতক্ষণে চাঁদের কাছে পৌছুবে, 'অ্যাপোলো-৮' ততক্ষণে চন্দ্রপরিক্রমা শেষ করে পৃথিবীর দিকে রওনা হয়ে যাবে। রকেটের এই তৃতীয় অংশটি চাঁদকেও ছাড়িয়ে চলে যাবে, সূর্যের কক্ষপথে প্রবেশ করে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রহরূপে।

মহাশূন্যের গভীর প্রদেশ দিয়ে যখন 'অ্যাপোলো-৮' ছুটছিল, তখন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটি নিজের চারদিকেও ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছিল। এর কারণ, সেখানে সূর্যের তাপ খুবই প্রখর—রাত ও নাই, বায়ুমণ্ডলও নাই, পৃথিবীর চারদিক ঘিরে বায়ুমণ্ডল থাকার ফলে তার ভেতর দিয়ে সূর্যের তাপের সবটা আমাদের কাছে পৌছোয় না; তাছাড়া পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরে এই তাপ চারদিকে সমানভাবে চারিয়ে নেয়, ক্রমান্বয়ে দিনে তাপ গ্রহণ ও রাত্রে তা বিকিরণের সুযোগ নেয়। মহাকাশযানটি চলার সময় নিজের চারদিকে ঘুরে ঠিক এই কাজটিই করছিল, যাতে যানটির সবদিকই মোটামুটি সমানভাবে উত্তপ্ত থাকে। এরূপ না করলে একটা দিক সব সময় প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে থাকতো, অন্য দিক থাকতো খুব ঠাণ্ডা হয়ে।

মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে অভিযানের সময় সময়মত খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্য এমনভাবে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন যাতে সব সময় অন্ততঃ একজন জেগে থাকেন। মহাশূন্য থেকে তাঁরা সব সময়ই পৃথিবীর সঙ্গে যোগা-যোগ রাখছিলেন; তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, প্রয়োজনীয় সংবাদ নিচ্ছিলেন। কয়েকবার সেখান থেকে সোজাসুজি টেলি-ভিশনে চাঁদের দৃশ্য এবং দূর থেকে পৃথিবীর দৃশ্যও দেখিয়েছিলেন, 'অ্যাপোলো-৮'-এর ভেতরকার দৃশ্যও টেলিভিশনে পাঠিয়েছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ১-৫৯ মিঃ সময়ে 'অ্যাপোলো-৮' পৃথিবী থেকে ২,০৩,৬২৫ মাইল দূরে চলে যায়, চাঁদ সেখান থেকে মাত্র ৩০,০০০ মাইল দূরে। এখানে সে পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চাঁদের অভিকর্ষ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অর্থাৎ তখন যে তাকে পৃথিবী নিজের দিকে টানছিল না তা নয়, তবে মহাকাশযানটি তখন পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের খুব বেশী নিকটে বলে

তার ওপর চাঁদের টানই পৃথিবীর টানের চেয়ে বেশী কাজ করছিল। তার ফলে যতই মহাকাশযানটি চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, ততই তার গতিবেগ বাড়তে লাগল। পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে আসার সময় তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল। তারপর ইঞ্জিন ছাড়াই সে নিজের গতিবেগেই ছুটে আসছে, কিন্তু পৃথিবীর টান এই গতিবেগকে কমিয়ে আনছিল। পৃথিবী থেকে সে যখন ১,২০,০০০ মাইল দূরে এসেছিল, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল থেকে ঘণ্টায় মাত্র ২,৮০০ মাইলে নেমে আসে।

পৃথিবী থেকে ২,০৩,০০০ মাইল এসে চাঁদের অভিকর্ষক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তা আরো কমে গিয়ে হয়েছিল ঘণ্টায় ২,২২৩ মাইল। এর পরই আবার চাঁদের টানে তার গতিবেগ বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ বর্ধিত বেগে, ঘণ্টায় ৫৭০০ মাইল বেগে মহাকাশযানটি চাঁদকে ছাড়িয়ে তার অপর পাশে চলে যায়। চাঁদের ও-পিঠে যখন চলে যায় তখন তার গতিপথ সোজা না থেকে চাঁদের টানে একটু বক্রাকার হল। কিন্তু এ-গতিবেগ না কমালে সে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে পারবে না, চাঁদ থেকে বহুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার চাঁদের টানে তার দিকে ফিরে আসবে ও প্রচণ্ড গতিতে চাঁদের টান কাটিয়ে আবার পৃথিবীর অভিকর্ষক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তাই চাঁদের ও-পিঠে যাবার কিছুক্ষণ পরেই 'অ্যাপোলো-৮'-এর নিজস্ব ইঞ্জিনটি চালু করে এই গতিবেগ কমিয়ে করা হল ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইল। মহাকাশযানটি তখন চাঁদের টানে তার কক্ষপথে ঘোরার পথ ধরতে পারল।

যথাসময়ে ইঞ্জিন চালু করার এই মুহূর্তটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। দিক- বা স্থান-নির্ণয়ে একটু এদিক-ওদিক হলে যানটি চাঁদের ওপর আছড়ে পড়ত বা অন্য পথ ধরে কোথায় হারিয়ে যেত। ইঞ্জিনটি একেবারে যদি না চলতো, তাহলে যানটি চাঁদের চারদিকে ঘুরতেই থাকতো। সবচেয়ে মুশকিলের কথা, যখন এটি করা হল, 'অ্যাপোলো-৮' তখন চাঁদের অপরদিকে—পৃথিবী থেকে বেতারে যোগাযোগস্থাপনের পথ রোধ করে মহাকাশযান ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে। মহাকাশযাত্রীরা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে কোন নির্দেশই তখন পাচ্ছেন না, মহাকাশযানটির অবস্থিতি সম্বন্ধে বা ইঞ্জিনটি ঠিকমত চালু হল কি হল না সে সম্বন্ধে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রও কিছু জানতে পারছে না।

মহাকাশযান ২৪শে ডিসেম্বরের বিকাল ৩-১৮ মিনিট সময়ে চাঁদের অপর দিকে প্রবেশ করে, ৩-৫৫ মিঃ সময়ে বেরিয়ে আসে; তখন আবার পৃথিবী সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং মহাকাশযাত্রীরা খবর পাঠান যে ৩২৮ মিনিটের সময় তাঁরা ইঞ্জিন ঠিকমত চালু করে মহাকাশযানের গতিবেগ কমিয়ে তাকে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করেছেন। ইঞ্জিনটি যখন চালু করা হয়, তখন মহাকাশযান এবং চাঁদ ও পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু প্রায় এক লাইনে ছিল। ইঞ্জিনটিকে এসময় মাত্র চার মিনিট চালু রাখতে হয়েছিল।

এর পর মহাকাশযানটি ২০ ঘণ্টায় ১০ বার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণকালে মহাকাশচারীরা চাঁদের ছবি তুললেন, টেলিভিশনে তার কিছু পৃথিবীতেও পাঠালেন, ভবিষ্যতে চাঁদে নামার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলেন, ইত্যাদি। মাত্র ৬৯ মাইল দূরে থেকে তাঁরা বৃত্তাকারে চাঁদের চারদিকে

ঘুরেছেন। প্রথম দুটি আবর্তন অবশ্য বৃত্তাকার হয়নি, হবার কথাও ছিল না। ইঞ্জিনটি আবার চালু করে পথটি বৃত্তাকার করে নেওয়া হয়।

চাঁদকে দশবার প্রদক্ষিণ করার পর ২৫শে ডিসেম্বর দুপুর ১১-৪০ মিনিট সময়ে মহাকাশচারীরা আর একবার মহাকাশযানের নিজস্ব ইঞ্জিনটি চালু করে তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩,৭০০ থেকে ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইলে বাড়িয়ে দেন, যার ফলে মহাকাশযানটি চাঁদের ওপাশ থেকে এই বেগ নিয়ে বেরিয়ে এসে চাঁদের চারদিকে ঘোরার পথে আর না গিয়ে চাঁদের অভিকর্ষ কাটিয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটতে থাকে। এও একটি বিপজ্জনক মুহূর্ত ছিল; ইঞ্জিনটি চালু না হলে মহাকাশযানটি মহাকাশচারীদের নিয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরতেই থাকতো, যার ফলে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবার পর মৃত্যু ছিল অবধারিত।

পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসার সময় চাঁদের টানে যানটির গতিবেগ আবার কমতে থাকে; এই দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় চাঁদ থেকে ২০ হাজার মাইল আসার পর। পৃথিবী তখন ২,১৩,৫২৬ মাইল দূরে) তার গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ২,৭৬৩ মাইল।

এইদিন (২৫শে ডিসেম্বর) রাত্রি ১১-৪৪ মিনিটের সময় মহাকাশযান চাঁদের অভিকর্ষক্ষেত্র ছাড়িয়ে আসে। তারপর থেকে পৃথিবীর টানে তার গতি আবার বাড়তে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের প্রাক্কালে এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫,০০০ হাজার মাইল।

২৭শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯টার পর অ্যাপোলো-৮ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি আসে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগেই মূলযানটির সঙ্গে প্রথম থেকে সংযুক্ত, সুদীর্ঘ ৪,৮০,০০০ হাজার মাইল পথের সঙ্গী ও সহায়ক নিজস্ব ইঞ্জিন-সংযুক্ত অংশটিকেও ('সার্ভিস মডিউল' 'গ' অংশটিকে অ্যাপোলো-৮ থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। পৃথিবী থেকে যে ৩৬৪' উঁচু যানটি যাত্রা করেছিল, তার ১১ ফুট উঁচু অংশটি মাত্র ('কম্যাণ্ড মডিউল' 'খ') তখন অবশিষ্ট। মূল যানের মধ্যেকার ইঞ্জিন ('রিঅ্যাকসেন কণ্ট্রোল') চালিয়ে তখন মূল যানটিকে উল্টেও দেওয়া হল। যানটির নীচের দিক সমতল, ওপরের দিক সূচল; এতক্ষণ পর্যন্ত যানটি সূঁচল দিকটি সামনে রেখে পৃথিবীর দিকে এগুচ্ছিল, এখন সমতল দিকটি সামনে (পৃথিবীর দিকে) রেখে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল। উল্কাপিণ্ড যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ডবেগে ঢুকেই বায়ুর ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে, যানটিও প্রায় সেভাবে জ্বলে উঠল, জ্বলন্ত উল্কার মত পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে লাগল। তার বাইরের তাপমাত্রা তখন ৬,০০০° ফাঃ, কিন্তু ভিতরের তাপ মানুষের পক্ষে সহনীয়ই ছিল।

যানটির গতিবেগ কমাবার জন্য যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াও প্যারাসুটের সাহায্য নেওয়া হল। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৫ মাইল কাছে এসে একটি প্যারাসুট ('ড্রোগ প্যারাসুট') খুলে দেওয়ায় যানের গতি খুব মন্দীভূত হয়ে এল, ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলের মত হল। পৃথিবী থেকে প্রায় দু মাইলের ভেতর আসার পর এ প্যারাসুটটি খুলে দিয়ে তিনটি 'পাইলট প্যারাসুট' খোলা হল; এই প্যারাসুট তিনটি আরো তিনটি (অবতরণ-প্যারাসুট) প্যারাসুট খুলে নিল। এর ফলে যানটির গতিবেগ ঘণ্টায় ২২ মাইলে নেমে এল। এই গতিতে রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় অ্যাপোলো-৮ তিনজন বিজয়ী মহাকাশ-

যাত্রীকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিছু দূরে 'ইয়র্কটাউন' নামক যুদ্ধ-জাহাজ মহাকাশচারীদের সাগরের বুক থেকে তোলার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। তখনই জাহাজখানি এগিয়ে গিয়ে তীব্র আলো ফেলে অ্যাপোলো-৮কে আলোকিত করল, কয়েকটি হালিকপ্টার উড়ে গিয়ে ঘুরতে লাগল তার ওপর।

তখনো রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই। তাই অবতরণের ৮০ মিনিট পরে মহাকাশ যাত্রীদের হালিকপ্টারএ তুলে জাহাজে নিয়ে আসা হল।

নির্বিঘ্নে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে মহাকাশচারী তিনজন পৃথিবীতে ফিরে এলেন। প্রায় ৫ লক্ষ মাইলের এই বিপদসঙ্কুল, দুঃসাহসিক মহাশূন্য-অভিযানে সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত সময়মত ঘটেছিল, প্রত্যাশিত সূক্ষ্মতা নিয়ে সব যন্ত্রগুলি কাজ করেছিল। এমনকি ছয়দিন মহাশূন্যে ঘুরে আসার পর আপোলো-৮ কখন কোথায় অবতরণ করবে বলে পূর্বে যা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যানটি নেমেছেও ঠিক সেই সময়ে, সেইখানেই।

বিদ্যার বন্দনা

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বিদ্যার মূরতি তুমি, দেবি সরস্বতি!
শুভ্র তব পদযুগে করি মোরা নতি।
তোমার প্রসাদে মাগো, কত গবেষণা,
কত আবিষ্কার হল, কত না সাধনা!

তবু কোথা শুভ জ্ঞান? শুভ্রতা কোথায়?
বিদ্যার শকতি কেন পালিছে হিংসায়?
করুণার মাতৃভূমি, বিদ্যার ভাণ্ডার,
নিঃস্বকে বাঁচাতে কেন নহে সমুদার?
অশুচি হ'ল কি মাগো, মোদের পূজায়
যত উপচার, অর্ঘ্য দম্ভের ছোঁয়ায়?

সমালোচনা

Man in Search of Immortality—স্বামী নিখিলানন্দ। প্রকাশক: George Allen and Unwin Ltd., Ruskin House, Museum Street, London. মূল্য ২৫ শিলিং; পৃষ্ঠা ১০৬।

স্বামী নিখিলানন্দ প্রায় ৪০ বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে ব্রতী আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী এবং হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থরচনায় তিনি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

বর্তমান পুস্তকে ৫টি অধ্যায়ে (১) অমৃতত্ব, (২) মৃত্যুই কি শেষ? (৩) অবস্থাত্রয়, (৪) তত্ত্বমসি, (৫) মানুষের কি স্বরূপ—উপনিষদ্-প্রোক্ত অমৃতের অভিযানে মানুষের প্রচেষ্টার একটি সার্থক বর্ণনা আধুনিক যুগের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে দার্শনিক জটিলতা বর্জন করে গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য পাঠককে লক্ষ্য করে লেখা হলেও এই গ্রন্থপাঠে সকল শ্রেণীর পাঠকরা—বিশেষতঃ উপনিষদের চিন্তাধারার সহিত যাঁরা পরিচিত নন তাঁরা—নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন। গ্রন্থকারের আকর্ষণীয় কৃতিত্ব এই যে, প্রতিটি নিবন্ধে ধর্মালোচনার চরম পরিণতি যে স্বানুভব—এই তত্ত্বটি তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেছেন। —**স্বামী বীতশোকানন্দ**

পত্রাবলী, ১ম খণ্ড: মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক—শ্রীজগদীশ্বর পাল: পঞ্জী প্রকাশনী, ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট (সুইট ১৩, ব্লক ১), কলিকাতা-৩। প্রাপ্তিস্থান: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ২৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকখানি সর্বপ্রকারেই উপাদেয়, মন্তব্য। ইহার কাগজ, ছাপা, প্রচ্ছদপট সুন্দর এবং প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত প্রতীকটি পরম ধ্যেয়, সৃষ্টিরহস্যের উদ্‌ঘাটক। ইহার ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল, ভাব গম্ভীর, প্রশস্ত।

ভারত ও ভারত-বহির্ভূত দেশের যাবতীয় ধর্মমত ও সাধনের অপূর্ব সমন্বয়-চেষ্টা ইহার বৈশিষ্ট্য। মতগুলির উপস্থাপন ও সমালোচন-শৈলী উদার ও বাস্তবনিষ্ঠ; বহু দর্শন ও সাধনের প্রকৃত মর্ম স্বল্প শব্দে উদ্‌ঘাটন করিবার অপূর্ব পাণ্ডিত্য প্রায় প্রত্যেক পত্রেই প্রকাশিত।

তথাপি, সর্বত্র না হউক, কোন কোন ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ দর্শনের অনুকূলে অন্যান্য-গুলিকে দেখা ও আলোচনা করা হইয়াছে—ইহা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পুস্তকখানি শুধু তো পাণ্ডিত্যের নিদর্শন নয়, ইহাতে 'দরদ' যথেষ্ট রহিয়াছে—চিঠিগুলি গ্রন্থকারের প্রাণের জিনিস।

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত ৭১ নং (১৮৫—৮৮ পৃ.) পত্র হইতে দিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে। জন্মান্তর সম্বন্ধে গ্রন্থকার তাঁহার সমাধান বর্ণন করিতেছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতে যাইয়া তিনি শেষে "সাংখ্যের পর বেদান্ত-ভূমিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যতীত কারণ-শরীর অঙ্গীকৃত হয়। **ইহার পর আর কাহারও গতি নাই**। বস্তুতঃ, কারণ-শরীরের পর"... "মহা-কারণ-শরীর, কৈবল্যশরীর এবং হংসশরীর"ও আছে। কিছু পরে বলিতেছেন, "মায়া ভেদ

করিয়া যদি মহামায়াতে স্থিতি হয় তাহা হইলে বিদেহকৈবল্যের অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে" (১৮৭ পৃঃ)। কবিরাজ মহাশয় নিশ্চয় জানেন যে, বৈদান্তিক যাহাকে "মায়া" বলেন তাহা অপরের 'মহামায়া'কেও অন্তরস্থ করিয়া আছে, এবং তাঁহাদের কারণ-শরীরের বাহিরে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া কোন ভেদই নাই, তাহা যতই সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতীত হউক না কেন। অতএব উহার পরে "আর কাহারও গতি নাই" নহে, গতি থাকিতে পারে না। ১৮৮ পৃষ্ঠায় কর্মজনিত ভোগের বিচার করিবার সময় এবং ১৮৯ পৃষ্ঠায় সিদ্ধগণের জীবন্মুক্তি ও বেদান্তের জীবন্মুক্তি তুলনায়ও এই প্রকার পক্ষপ্রেম আসিয়া গিয়াছে। সকল বিচারই যোগীর দৃষ্টিতে বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় গ্রন্থকারের "জ্ঞানগঞ্জ" প্রণালীতেই (১৭৮ পৃঃ) করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা গ্রন্থের দূষণ নহে, ভূষণই।

বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-পথিকৃৎ বলিয়াছেন, পাণ্ডিত্য যদি বিবেক-বৈরাগ্য-মণ্ডিত হয় তবে তাহার মূল্য "হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে মোড়ার" ন্যায় বর্ধিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইহার উপর আবার ঐকান্তিক সাধন অলঙ্কৃত হইয়া গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিদগ্ধসমাজ ও সাধকবৃন্দ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশন-মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল।

—স্বামী সৎস্বরূপানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নতুন পুস্তক

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। প্রকাশক স্বামী বীতশোকানন্দ; ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩; পৃঃ ২৫৬ + ১৪; মূল্য—৩৲ টাকা।

স্বামী ঈশানানন্দ দীর্ঘ এগার বৎসরকাল শ্রীশ্রীমায়ের পূত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে কলিকাতার বাগবাজারস্থ তাঁহার নিজস্ব ভবনে, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী'তে (উদ্বোধন কার্যালয় বা উদ্বোধন বলিয়াও এটি পরিচিত) প্রথম পদার্পণ করেন; সেই সময় জয়রামবাটী হইতে আসিবার পথে কোয়ালপাড়ায় তাঁহার বিশ্রাম লওয়ার বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই উদ্বোধনে তাঁহার লীলা-সংবরণ পর্যন্ত লেখকের মাতৃ-সান্নিধ্যের স্মৃতিগুলি গ্রন্থটিতে বিধৃত। এই স্মৃতিকথার অনেকাংশ পূর্বেই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় স্থান পাইলেও বর্তমান গ্রন্থে সেগুলি লেখকের অপ্রকাশিত স্মৃতিগুলির সহিত সুসম্বদ্ধ ও ধারাবাহিকরূপে উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থটি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। "শ্রদ্ধাশীল ভক্ত নরনারী ইহা পাঠ করিয়া স্নিগ্ধ মাতৃসান্নিধ্যলাভে দিব্য আনন্দ ও শান্তি লাভ করুন"—মাতৃচরণে লেখকের এই প্রার্থনা যে পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৭শে পৌষ (১১.১.৬৯) শনিবার কৃষ্ণা-সপ্তমীতে যুগাচার্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৭তম জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইদিন প্রত্যূষে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি, বেদ-আবৃত্তি, কঠোপনিষৎ পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর ঘরে ভজন হইয়াছিল।

কয়েক সহস্র নরনারী এইদিন স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমাগত হন এবং সারাদিন নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

বিকাল সাড়ে তিনটায় স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি জনসভা হইয়াছিল। সভায় সভাপতি মহারাজ ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় এবং স্বামী বুধানন্দ ইংরেজীতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী বুধানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনের দিশারী। তাঁর কথামত বিজ্ঞান ও জাগতিক উন্নতির সঙ্গে, সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে আজ ধর্মের মিলন ঘটাইতে হইবে। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কে জয় করিয়া অগ্রসর হওয়ার পথেই আমাদের কাম্য এক পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে মহনীয় করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও মানুষের দুঃখে তিনি কেঁদেছেন, মানুষেরই জয় গেয়েছেন, তার সেবায় জীবন দিয়েছেন; তবে যে মানুষের জয়গান গেয়ে ইউরোপে রেনেসাঁ এসেছিল, যে মানুষের কথা আজ আমরা শুনছি, এ মানুষ সে 'বাইওলজিক্যাল ম্যান' নয়, দেহসীমিত মানুষ নয়, এ মানুষ দেবস্বরূপ মানুষ, স্বয়ং ভগবানই তার স্বরূপ। নিজের এই দেবস্বরূপে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।" স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, "স্বামীজীর বাণী কেবল ভারতের প্রাচীন মর্মবাণীর পুনরুক্তিই নয়, নবজীবনের ইঙ্গিতও রয়েছে তার মধ্যে। ভগবানকে তিনি মন্দির শাস্ত্র প্রভৃতি থেকে জীবনের সাবলীল গতির সর্বত্র টেনে এনেছেন - সকল মানুষ সর্বাবস্থায় সবকর্মের মাধ্যমেই যাতে ভগবানের আরাধনা করতে পারে। কর্তা কর্ম ভগবান সবই এক—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলেছেন তিনি। এই-ই নবযুগের বাণী।"

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উত্থানবাটীতে গত ১লা জানুআরি (১৯৬৮) 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ৪ঠা এবং ৫ই জানুআরিও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রথম দিন ১লা জানুআরি বুধবার বিশেষ পূজাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে স্বামী ভূতেশানন্দ কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যার পর স্বামী চিদাত্মানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী উমানন্দ, মুখ্যানন্দ, লোকেশ্বরানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। স্বামী

মুখ্যানন্দ হিন্দীতে এবং সভাপতি মহারাজ ও অপর দুই বক্তা বাংলায় বক্তৃতা করেন। রাত্রে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণ গান হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৪ঠা জানুআরি শনিবার অপরাহ্ণে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। ধর্মসভায় স্বামী পরশিবানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, নিরাময়ানন্দ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা দেন। সকলের বক্তৃতাই সময়োপযোগী। রাত্রে পদাবলী-কীর্তন উপভোগ্য হইয়াছিল।

উৎসবের শেষ দিন ৫ই জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণে বাউল-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। কঠোপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন স্বামী নিত্যানন্দ। সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর রাত্রে রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক 'মুক্তিযজ্ঞ' যাত্রাভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দিয়াছিল।

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিন প্রায় ১৩।১৪ হাজার নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীপূর্ণদাস বাউল প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ সঙ্গীতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১লা জানুআরি বুধবার 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম ও ভজনাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। প্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে যোগোদ্যান সারাদিন আনন্দমুখর থাকে।

স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

উদ্বোধনে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১০ই পৌষ (২৫. ১২. ৬৮) বুধবার শুভ শুক্লা ষষ্ঠীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১০টা হইতে ১১টা স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর পুণ্য জীবনী আলোচনা করেন। পূর্বাহ্ণে ভজন, বাঁশিতে যন্ত্রসঙ্গীত এবং রাত্রে শ্রীশ্যামাদাস চক্রবর্তীর সেতার-বাদন শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিল। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর হইয়াছিল। রাত্রেও বহু ভক্তের সমাগম হয়। সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা : গত ডিসেম্বর, ১৯৬৮, মেদিনীপুর জেলার সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৭,৯৮২ কেজি চাল এবং ২,৩৮,৪৯৩ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪৪,৬০৬।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত ডিসেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি শহরের ১৯নং ওয়ার্ডে,

মণ্ডলঘাটের ৯নং অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে মিশন কর্তৃক ৬,৮৯০ কেজি চাল, ৬০০ কেজি আটা, ৪,৩০০ কেজি ডাল, ১৭৫ কেজি বিস্কুট এবং ৩,৩১২ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—৯,৯৫৯।

এতদ্ব্যতীত ২,৪২৮ খানি ধুতি ও শাড়ী, ১,২১২ খানি তুলার কম্বল, শিশুদের পোশাক ৩৭০টি এবং ৯,২২০ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

জলপাইগুড়িতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দুঃস্থ জনগণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক কুটীর নির্মাণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: সুরাট জেলায় বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য মিশন কর্তৃক কুটীরনির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন কেন্দ্র

আসামে গৌহাটীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম' নামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রটির ঠিকানা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ছত্রীবাড়ী, গৌহাটি-৮, আসাম।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ডিস্পেন্সারীর সম্প্রসারণ

গত ২৪শে নভেম্বর ১৯৬৮ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজ মায়লাপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ডিস্পেন্সারীর নূতন সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সম্প্রসারণকার্যে ৫০,০০০ টাকারও অধিক খরচ হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার

(শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়): উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩:

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার স্থাপিত হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। ইহার প্রধান কার্য দুইটি · শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবা এবং প্রকাশন।

শ্রীশ্রীমা এখানে প্রথম পদার্পণ করেন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে। উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে।

উদ্বোধন কার্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন-এ গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাড়ীতে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বোসপাড়া লেন-এ উহা স্থানান্তরিত হয়, পরে এখানে নিজস্ব ভবনে উঠিয়া আসে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচারকল্পে এখানে ক্লাস এবং আলোচনাদিও নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে। বিশেষ দিনে উৎসবাদিও করা হয়। সাধারণের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি সংবলিত একটি ছোট পুস্তকাগারও আছে।

পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাংলাদেশে একমাত্র প্রকাশনকেন্দ্র ছিল উদ্বোধন কার্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা এবং স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকাবলী প্রভৃতি সবই তখন এখান হইতেই প্রকাশিত হইত। পরে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরেজী পুস্তকাবলীর অধিকাংশ সেখান হইতেই প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের কর্মধারা নিম্নরূপ:

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য সেবা-পূজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর এবং পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উভয় দিনে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তসমাগম হইয়াছিল। ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কালীপূজার রাত্রে প্রতিমায়

শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শিবরাত্রিতে সারারাত্রি শিবপূজা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টমাস ইভ, শঙ্করপঞ্চমী, বুদ্ধপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর অবতারগণের জীবন ও বাণী পঠিত ও আলোচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের জন্মতিথিগুলিও অনুরূপভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসর যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' (মাসিক) পত্রিকার ৭০তম বর্ষ। পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে মাসে প্রায় ৫,০০০ করিয়া ছাপা হয়।

এখানকার গ্রন্থাগারটি—প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে খোলা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২,৩৭৬। আলোচ্য বর্ষে ১,৫৯৫ খানি পুস্তক পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

এখান হইতে আলোচ্য বর্ষে দুইখানি নূতন পুস্তক, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' এবং 'মাতৃসান্নিধ্যে' প্রকাশিত হইয়াছে এই দুইখানি লইয়া ১৯৬৮ খৃঃ পর্যন্ত উদ্বোধন কার্যালয় হইতে ১৬৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মঠের সাধু-কর্মিগণ এখানে এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ৮৬টি ও ১৯৩টি ক্লাস ও বক্তৃতা করিয়াছেন।

ভিত্তিস্থাপন

গত ২৫শে নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের বটানি ব্লকের (Botany Block) ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভবনের উদ্বোধন

গত ২৬শে নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মাদ্রাজে ত্যাগরায়নগর নর্থ ব্রাঞ্চ উচ্চবিদ্যালয়ের নবনির্মিত সায়েন্স ব্লকের উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিজ্ঞানভবনটি নির্মিত হইয়াছে।

অন্ধ ছাত্রের কৃতিত্ব

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের জনৈক অন্ধ ছাত্র এই বৎসর মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়াছে।

সেণ্ট লুইস বেদান্ত সমিতিতে নূতন মন্দিরের উদ্বোধন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি রাজ্যে অবস্থিত সেণ্ট লুইস বেদান্ত সমিতির মন্দির ও বক্তৃতা-গৃহটি নূতন পরিকল্পনানুসারে পরিবর্ধিত ও পুনর্নির্মিত হইয়াছে। এই নূতন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় গত ৪ঠা ও ৬ই অক্টোবর। প্রথম দিন সকালে ৭০ জন ভক্তের উপস্থিতিতে পূজাদি উদ্‌যাপিত হয়। মন্দিরের বেদীর উপরিভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বড চিত্র, নীচে পৃথক পৃথক সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের ফটো শোভা পাইতেছিল। হাওয়াই দ্বীপ হইতে প্রেরিত অর্কিডের মালা প্রতি পটবিগ্রহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। চিকাগো বেদান্ত সমিতির স্বামী ভাষ্যানন্দ উপনিষদ এবং অন্যান্য স্তোত্রাদি পাঠ করেন। পূজা করেন স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। চণ্ডীপাঠ করেন সম্প্রতি আমেরিকায় বক্তৃতাসফরে আগত স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। আরাত্রিক-স্তোত্রও গীত হয়। উপস্থিত ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা ছিল। হোমের পর উপস্থিত ভক্তগণকে ভূরিভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

ঐ দিন সন্ধ্যায় সমিতির সভ্য ও ভক্ত-গণের তরফ হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে

অভ্যর্থনা করা হয়। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দ্বারা সকলের নিকট স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে উপস্থাপিত করেন। তৎপরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরদর্শন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ বাণী অবলম্বনে একটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন। তৎপরে মিসেস এ ভি. রঙ্গরাজন কর্ণাটী ধারায় একটি সংস্কৃত গান গাহিলে স্বামী ভাষ্যানন্দ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরের একটি বিবরণ প্রদান করেন। অতঃপর মিসেস রিচার্ড বার্গম্যান একটি ভক্তিমূলক গান গাহিবার পর 'ধ্যান করবি মনে বনে কোণে'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি অবলম্বনে একটি ভাষণ দেন। ইহার পর ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কয়েকটি গান করেন। পরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সমবেত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

৬ই অক্টোবর রবিবার বেলা সাড়ে দশটায় নূতন মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রায় দুই শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ একটি বৈদিক প্রার্থনা দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী ভাষ্যানন্দ কর্তৃক একত্র মহানারায়ণ উপনিষৎ হইতে আবৃত্তি করা হইলে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সমাগত সকলকে অভিনন্দিত করিয়া সেণ্টলুইস-এর নূতন মন্দিরটি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল অধ্যাত্মপিপাসু নরনারীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, ইহা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন: 'যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখান হইতেই তাহাকে আগাইয়া দাও'—স্বামী বিবেকানন্দের এই জ্ঞানগর্ভ উক্তিটিই হইল এই সমিতির পথনির্দেশিকা। অতঃপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। আমেরিকার অন্যান্য বেদান্তকেন্দ্রের পরিচালক সন্ন্যাসীদের এবং দুইজন স্থানীয় ধর্মযাজকের শুভেচ্ছাবাণীও পড়া হয়। ইহার পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একটি গান গাহিয়া শুনান। অতঃপর অধ্যাপক হিউস্টন স্মিথ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানীয় জনৈক চিত্রশিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত আটটি ধর্মের প্রতীকের একটি সুবৃহৎ চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। পরে স্বামী ভাষ্যানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বক্তৃতা করেন। মিসেস রিচার্ড বার্গম্যান এবং মিসেস এ. ভি রঙ্গরাজন বক্তৃতাদ্বয়ের অন্তরালে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভাষণগুলির পর অধ্যাপক হিউস্টন স্মিথ কর্তৃক সঙ্কলিত 'তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে একটি রঙীন চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ডক্টর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য মীরাবাঈ-এর একটি ভজন সমাপ্তি-সঙ্গীতরূপে গান করেন। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হয়। বক্তৃতাগৃহের প্রবেশদ্বারের পাশে পৃথিবীর আটটি প্রধান ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন রাজ্যের প্রধান শহর পোর্টল্যাণ্ডে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে। স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ এবং স্বামী দেবাত্মানন্দ পর পর এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন। স্বামী দেবাত্মানন্দের চেষ্টায় ১৯৩৪

সালে শহরে সমিতির স্থায়ী বাড়ী ক্রয় করা হয় এবং কয়েক বৎসর পরে শহর হইতে ২২ মাইল দূরে পাহাড়ে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে একটি আশ্রমও স্থাপিত হয়। বর্তমান পরিচালক স্বামী অশেষানন্দ ১৯৫৫ সাল হইতে পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালের পোর্টল্যাণ্ড স্টেট কলেজের সম্প্রসারণ-পরিকল্পনায় বেদান্ত সমিতির জমির প্রয়োজন হওয়ায় বাড়ীসহ জমি তাঁহারা উপযুক্ত মূল্যে সমিতির নিকট হইতে কিনিয়া লন।

সমিতি শহরের আর একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত অঞ্চলে এক একর জমি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একটি মনোরম দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। একতলায় ঠাকুরঘর, লাইব্রেরী, অফিস, বক্তৃতা হল, রান্নাঘর প্রভৃতি এবং দোতলায় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অতিথিদের থাকিবার ঘর। বেদান্ত সমিতির এই নূতন বাড়ীর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী অতি সুন্দর। সমিতির জমিতে অনেকগুলি ফলের ও অন্যান্য গাছ আছে। একটি চমৎকার পুষ্পোদ্যানও আশ্রমের সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছে।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীশ্রী৺দুর্গা মহাসপ্তমীর দিন পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির এই নূতন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন বিশেষ পূজার্চনাদির দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সিয়াটল বেদান্ত কেন্দ্র হইতে স্বামী বিবিদিষানন্দ এবং স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পোর্টল্যাণ্ডে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং রাজা মহারাজের বিশেষ পূজা স্বামী অশেষানন্দ সম্পন্ন করেন। পৃথক বেদীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার অর্চনা নির্বাহ করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বামী বিবিদিষানন্দ স্তবস্তোত্রাদি পাঠ করেন। বক্তৃতা-গৃহের বেদীতে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় চিত্রের আবরণ-উন্মোচন এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূজান্তে ভোগ, আরতি ও হোম হয়। উপস্থিত ষাটজন ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পরে সকলকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরের দিন ২৯শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, বেলা ১১টায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাধারণ উৎসব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, সর্বসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রের পরিচালক সন্ন্যাসী মহারাজদের শুভেচ্ছা-বাণী স্বামী অশেষানন্দ পড়িয়া শুনান। তৎপরে সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ স্টুয়ার্ট বুশ একটি প্রারম্ভিক ভাষণে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া সমিতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। অতঃপর স্বামী বিবিদিষানন্দ 'যোগের অনুশীলন' এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'আত্মবিদ্যা' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সর্বশেষে স্বামী অশেষানন্দ 'অতীন্দ্রিয় জ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। সমিতির গায়ক- ও গায়িকামণ্ডলীর ভক্তিমূলক সঙ্গীত খুবই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। প্রায় দুইশতাধিক ব্যক্তি এই সাধারণ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর: গত ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও চণ্ডীপাঠের আয়োজন হইয়াছিল। ভোরে মঙ্গলারতির পরে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয়। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আশ্রম ও বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীগণ কর্তৃক গীত ভজন একটি বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা দশটায় প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধ-প্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহ-কারিণীগণ ভজন-কীর্তন পরিবেশন করেন। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত প্রায় দুই হাজারের বেশী ভক্ত-মহিলার সমাগম হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর মঠবাসিনীগণ কর্তৃক রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাতৃসঙ্গীত গীত হইয়াছিল। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বারাসত: স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১১৩তম জন্মোৎসব বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর সাতদিন ধর্মসভা, ভজন-কীর্তন, গীতি-আলেখ্য, ছায়াচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, শ্রীরমণী-কুমার দত্তগুপ্ত, অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয় মজুমদার ও অধ্যাপক অমূল্য গুপ্ত। আশ্রম-সম্পাদক শ্রীহেরম্ব-চন্দ্র ভট্টাচার্য আশ্রমের কার্যবিবরণী বিবৃত করেন। শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করেন স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী চিৎপ্রকাশা-নন্দ ও শ্রীকিরণ ঘোষাল। রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'মুক্তিযজ্ঞ' নাটক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। কয়েক সহস্র নরনারীর এক শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, বিবেকানন্দ ও শিবানন্দের প্রতিকৃতি সহ ভজন গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করেন। এই কয়দিনে পনর হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৫ (১৮. ২. ৬৯), মঙ্গলবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার, ১১ই ফাল্গুন (২৩.২.৬৯) বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান হইবে।

দিব্য বাণী

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩য় অধ্যায়

অজ্ঞান-তমসা-পারে সর্বব্যাপী যে পুরুষ—যে পূর্ণস্বরূপ
সূর্যসম প্রভাময়—স্বপ্রকাশ হয়ে বিদ্যমান
তাঁরে আমি জানি—আমি করিয়াছি প্রত্যক্ষ তাঁহারে,
তাঁহারেই জানি' শুধু পারে লোকে জিনিতে মরণ;
অমৃতত্ব লাভে আর নাই কোন দ্বিতীয় অয়ন।

(আপন প্রত্যক্ষ হতে সত্যদ্রষ্টা পুরুষেরা), ব্রহ্মবাদিগণ
জন্মহীন, জরাহীন, অবিনাশী বলেন যাঁহারে,
সকলেরই আত্মা যিনি—সবার স্বরূপ, বিভু তাই
সর্বগত ওতপ্রোত সর্বভূতে এ বিশ্বসংসারে—
তাঁরে আমি জানি—আমি করিয়াছি প্রত্যক্ষ তাঁহারে।

কথাপ্রসঙ্গে

বাস্তবতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

বাস্তবতা ও যুক্তি

'বাস্তব' কথাটি আজকাল বহুল প্রচলিত। সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে—সর্বক্ষেত্রেই এই শব্দটির প্রয়োগ আমাদের মনে একটি প্রভাব বিস্তার করে। যাহাকিছুকে বাস্তবধর্মী বলিয়া শুনি, মন তাহাই মানিয়া লইতে চায়।

বাস্তব কথাটির বহুবিধ সংজ্ঞা বহুজন দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া দার্শনিকগণ। সাধারণভাবে বলা চলে, যাহা সত্য তাহাই বাস্তব, ইহার বিপরীত কল্পনা।

কিন্তু বাস্তব বলিতে সত্যকে সব সময় বুঝি না আমরা, যদিও মনে করি তাহাই বুঝিতেছি। আমাদের দেখার ও বোঝার শক্তির সীমার ভিতর যাহা ধরা পড়ে, তাহাকেই বাস্তব বলি; সে-সীমার বাহিরে সত্য কিছু থাকিলেও, তাহা অপরের প্রত্যক্ষ করা হইলেও, সাধারণতঃ তাহাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু তাহাও আবার সর্বক্ষেত্রে সমভাবে করি না।

এই দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা লইয়া আমরা বস্তুকে যাচাই করি, তাহা কিন্তু বাস্তবধর্মী নহে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা পক্ষপাতদুষ্টও। ফলে আধুনিক যুগে বাস্তবতার দোহাই দিয়া আমরা আপেক্ষিক সত্যগুলির নিম্নতর স্তরের দিকেই নামিয়া চলিয়াছি, কতকগুলি কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে যাইয়া কতকগুলি সত্যকেও কুসংস্কার বলিয়া ভাবিতেছি এবং নূতন কতকগুলি কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া পড়িতেছি।

বাস্তবতা-নির্ণয়ে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলির প্রভাব অপরিসীম। 'বিজ্ঞানসম্মত' কথাটি আমাদের মনে গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি করে। কিন্তু বিজ্ঞান বাস্তবতা সম্বন্ধে যে কথা বলে, যেসব সত্য সে আবিষ্কার করিয়াছে সেগুলির মধ্যে কয়টিকেই বা আমরা জানি? কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানীরা নিজে পরীক্ষা না করিয়া, সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হইয়া কোন সত্যকে স্বীকার করিয়া লন না, এবং যেহেতু যোগ্যতা অর্জন করিয়া সকলের জন্যই সে সত্যকে নিজে যাচাই করিয়া লইবার দ্বার উন্মুক্ত এবং ফলিত-বিজ্ঞান জড়প্রকৃতির বহু সত্যকে আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধিতে লাগাইতেছে দেখিতেছি, সেজন্য তাহাদের সব কথাকেই আমরা বাস্তব বলিয়া মানিয়া লই, কল্পনা ভাবি না; এমন কি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া কেহ কোন যুক্তিবিরোধী বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিলেও তাহা বিচার না করিয়াই চোখ বুজিয়া মানিয়া লই। একটা উদাহরণ দিতেছি, যাহা আজকাল বহুভাবে শোনা যায়, 'ঈশ্বর নাই।' কারণ?—বিজ্ঞান এখনো তাহার পরীক্ষাগারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান নাই; আমরা সকলেই যেমন ইট পাথর প্রভৃতি দেখিতেছি, ঈশ্বরকে সেভাবে দেখিতে পাই না। কাজেই ঈশ্বর অবাস্তব; কাজেকাজেই, শাস্ত্রের কথা, আচার্যাদির কথাও সব অবাস্তব, কল্পনা মাত্র।

এ দুটি যুক্তিই অবশ্য অত্যন্ত হালকা।

বস্তু—বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে এখনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধরা পরে নাই বলিয়া ঈশ্বর অবাস্তব, আজ আর ইহাকে যুক্তি বলা চলে না। সত্যান্বেষণের পথে বিজ্ঞানীরা অতীব সজাগ থাকিয়া চলেন, খুব ভালভাবে না যাচাইয়া-বাজাইয়া কোন কিছুকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু তাঁহারা কখনো

একথাও বলেন না যে, আমরা এ পর্যন্ত যাহা জানিয়াছি তাহার পরে আর কোন সত্য নাই। বরং ঠিক ইহার বিপরীত কথাই তাঁহারা বলেন, সত্যান্বেষণের প্রচেষ্টায় যতটুকু তাঁহারা জানিয়াছেন তাহারও পরে কি আছে তাহা জানিবার জন্যই পৃথিবী জুড়িয়া বিজ্ঞানীরা গবেষণায় রত। বিশ্বের রহস্যোদ্ঘাটনে চরম সীমায় আমরা পৌঁছিয়াছি, একথা কোন বিজ্ঞানীই বলেন না, বলিতে পারেন না। আমাদের বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতি স্থূল জাগতিক বস্তুগুলির মূলে আজ তাঁহারা বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর অতি সূক্ষ্ম শক্তিকেই 'বস্তু' হিসাবে পাইয়াছেন। এখানে বস্তু বলিতে বুঝায় যাহা দুই বা ততোধিক পদার্থের মিশ্রণ নহে, যাহা ঘটনার সমাবেশ নহে, যাহাকে দুই বা ততোধিক পদার্থে ভাঙ্গা যায় না। যেমন একদা 'এলিমেন্টের' ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণুকে এই-জাতীয় 'বস্তু' বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন, এখন আর তাহা করেন না, তেমনি শক্তিকে এখনো পর্যন্ত 'বস্তু' বলিয়া ভাবিলেও আসল বস্তু যে আরো সূক্ষ্ম প্রদেশে থাকিতে পারে না, একথা কেহই বলেন না।

বস্তু—সত্যদ্রষ্টাদের দৃষ্টিতে

ইহারও বহু পরের সত্যের কথা, চরম সত্যের কথাই হাজার হাজার বছর ধরিয়া অগণিত সত্যদ্রষ্টা নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া আসিতেছেন। সেই সত্যকেই ঈশ্বর বলা হয়; সেই সত্যই জগতের সব কিছুর মূলে একমাত্র 'বস্তু'। সেই 'বস্তু' অদ্বয়, অবিনাশী, চেতন সত্তা। বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যাচাই করিয়া ইহাতে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা না করিতে পারেন, তাঁহাদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য পথ ধরিয়া চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ইহা স্বীকার না-ও করিতে পারেন, কিন্তু সত্যান্বেষণের মাঝপথে দাঁড়াইয়া 'ইহা সত্য নহে' একথা বলিবেন কিরূপে? 'আমরা জানি না', ইহাই হইল বিশুদ্ধযুক্তিসম্মত কথা। আমরা যাহা জানিতে পারি নাই, অপর কেহ তাহা জানিতে পারেন না, ইহাও যুক্তি নয়। ডাল্টন যাহা জানিতেন না, আইনষ্টাইন তাহা জানিতে পারেন না, ইহা যেমন কোন কথাই নয়, তেমনি এখনো বিজ্ঞানীরা যেহেতু জানেন না, উপনিষদের ঋষিরা, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ কেহই তাহা জানিতে পারেন না—বিজ্ঞান ঈশ্বরের কথা জানে না, কাজেই শাস্ত্র ও আচার্যাদির কথা সব অসত্য—ইহাও তেমনি কোন কথাই নয়।

বস্তু ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

আমরা দ্বিতীয় যে যুক্তিটি ঈশ্বরের অবাস্তবতা সম্বন্ধে দিই, তাহা আরও হাস্যকর। আমরা সবাই ইট দেখিতেছি, গাছ দেখিতেছি, মানুষ দেখিতেছি, এগুলি বাস্তব: ঈশ্বরকে সবাই সেভাবে দেখিতে পাই না, কাজেই তিনি অবাস্তব। ইহা যুক্তি নয়, যুক্ত্যাভাস। একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। একটি স্কুলে ইনস্পেক্টর আসিয়াছেন। কোন ক্লাসে ঢুকিয়া ছেলেদের প্রশ্ন করিলেন, "উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিলাতে আসিয়া ছয় বৎসর ছিলাম। সেখান হইতে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া ছয় বৎসর চাকরী করিতেছি। আমার বয়স কত বল দেখি?" ছেলেরা কেন, শিক্ষকগণও প্রশ্ন শুনিয়া হতবাক। শেষে একটি ছেলে, যে আগে কিছুই শোনে নাই, শেষের বেঞ্চে বসিয়া লুকাইয়া একখানি গল্পের বই পড়িতেছিল, জিজ্ঞাসিত হইয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্নটি আর একবার শুনিয়া বলিল,

"চল্লিশ বছর।" ইনস্পেকটর খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে কিভাবে সে হিসাব করিল, শিক্ষকগণের এই প্রশ্নে ছেলেটি বলিল, "আমার ছোড়দা আধ-পাগলা; তার বয়স কুড়ি বছর। এঁর প্রশ্ন শুনে মনে হল, ইনি বদ্ধ পাগল, পুরো পাগল। তাই হিসেব করে দ্বিগুণ করলাম, চল্লিশ বছর বললাম।" এখানেও সে যুক্তি একটা দেখাইল, কিন্তু আমাদের কাছে তা হাস্যকরই। ঈশ্বরকে সকলে দেখিতে পাই না বলিয়া তিনি অবাস্তব, একথা বলাও ঠিক সেই ধরনেরই যুক্তি।

আমাদের সত্যকে দেখিবার শক্তি কতটুকু? সেই অতি-সীমিত দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে পড়ে না বলিয়া অপরের পরীক্ষিত কোন বাস্তবতাকে অবাস্তব বলা শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকর। আমরা কয়টা সত্যকে, বাস্তবতার কতটুকু অংশকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি? আমাদের সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান এক জিনিস, সে-সত্যকে প্রত্যক্ষ করা আলাদা জিনিস। কোন বৈদ্যুতিক পাখা যখন চলে না, দেখি উহার তিন বা চারটি ব্লেড আছে। এটা প্রত্যক্ষ করি। যখন খুব জোরে পাখাটি চলে, উহার ব্লেডগুলি ঘোরে, আমরা জানি ইহা সত্য, উহার ফল দেখিয়া ইহা অনুমান করি, কিন্তু ব্লেডগুলির ঘোরাটা তখন দেখিতে পাই না, ব্লেডগুলিকেও না; দেখি, প্রত্যক্ষ করি একটি অর্ধস্বচ্ছ গোলাকার বস্তু রহিয়াছে, যে বস্তুটিই অবাস্তব। রামধনু প্রত্যক্ষ করি, সমুদ্রের জল নীল প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু জানি এ সবই অবাস্তব। অথচ আমাদের দেহমন যেভাবে বিন্যস্ত তাহাতে শক্তির খেলায় ইহা দেখিতেই হয়। পরমাণুকেই আজ পর্যন্ত কেহ, কোন বৈজ্ঞানিকও দেখেন নাই; কিন্তু উহার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়। শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াই আমাদের মনে বিভিন্ন রূপ-রসাদি প্রত্যক্ষের অনুভূতির সৃষ্টি করে।* ইহার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য হই—সত্যকে নয়, বিভিন্ন অবস্থায় শক্তির ক্রিয়া-জনিত যে ছাপ মনে পড়ে, তাহাকেই।

এই হইল আমাদের বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। উহার রূপ রস প্রভৃতি গুণের বৈচিত্র্য বস্তুতে নিহিত নয়, মনে। জগতের পিছনে 'বস্তু' কি আছে বিজ্ঞানীরা এখনো সঠিকভাবে তাহা জানেন না। বাহিরে বস্তু যাহাই থাকুক, আমাদের মনের অনুভূতিই আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎ। অবশ্য সত্য সম্বন্ধে আমরা আমাদের সীমিত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র ছাড়াইয়াও জ্ঞান লাভ করিতে পারি প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করিয়া এবং তদ্‌ভিত্তিক যুক্তি-অনুমানাদি সহায়ে।

বাস্তব বলিতে আমরা যাহা সাধারণতঃ বুঝি, তাহা 'বস্তু'কে আপেক্ষিক অবস্থায় যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহাই। সত্যের বিচার তাহা দিয়া করা যায় না, এবং আমি এখন যাহা দেখিতেছি, তাহা ছাড়া আর সব অবাস্তব, ইহাও বলা চলে না। বলা চলে তখন, যখন মূল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন অন্যান্য বহু সত্যদ্রষ্টার সঙ্গে একবাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ভাষায় বলিয়াছেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাস্তবতা

বাস্তবকে যাচাই করিতে হইলে তাই মনের প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিকে না বাড়াইলে চলে না। ঈশ্বরদর্শনের জন্য যত ধর্মপথে যত অনুষ্ঠান, যত সাধনা রহিয়াছে তাহার সব-কিছুরই উদ্দেশ্য এইটিই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ধর্মাচরণেরই উপর জোর দিয়াছেন সর্বাধিক; সর্বাধিক জোর দিয়াছেন মনের এই প্রত্যক্ষ করার শক্তিকে বাড়াইয়া জগতের উচ্চতর

বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করার উপর, শাস্ত্রপাঠাদির উপর নহে, বৌদ্ধিক ধারণার উপর নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একভাবে নয় বহুভাবে; ঔপনিষদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যতভাবে মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তিনি সে সব ভাবেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই চরম সত্তাকে বা ঈশ্বরকে কেবল চরম অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, সর্ববিধ আপেক্ষিক অবস্থাতেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চরম অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে সেই সত্তার সঙ্গে তিনি এক, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। আবার যে-অবস্থায় নিজের পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন। জগৎকে একটি ভাবসমুদ্র-রূপে দেখিয়াছেন, আবার যে অবস্থায় জগৎকে স্থূলরূপে আমরা সকলেই দেখি, সে অবস্থায়ও দেখিয়াছেন। কিন্তু সর্বাবস্থাতে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর অন্য-কিছুকে নহে—'মা দেখিয়ে দিলেন কোশাকুশি, মন্দিরের মেজে, মার্বেল, চৌকাঠ সব চৈতন্যে জ'রে রয়েছে।' এ অবস্থার কোশাকুশি, মার্বেল, চৌকাঠ দেখিতেছেন, কিন্তু উহার বাহিরের রূপটিকে শুধু নয়, একই সঙ্গে তাহার মূলে 'বস্তু'কেও—চৈতন্যকেও দেখিতেছেন। আমাদের সীমিত দৃষ্টি বস্তুর বেশী ভিতরে যাইতে পারে না—তাহার জড়রূপে প্রতিভাত অবস্থারও সূক্ষ্মতম জড়কণাগুলিকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না—সেই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষলব্ধজ্ঞানমাত্র লইয়া জগতের সর্বযুগের সর্বদেশের সত্যদ্রষ্টাদের প্রত্যক্ষের মিলনভূমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষকে কল্পনা বলিবার অধিকার আমাদের কী আছে? আমাদেরই অযৌক্তিক সন্দেহের মূর্তি ধরিয়া নরেন্দ্রনাথও একদিন বহু কথা বলিয়াছিলেন; সোজাসুজিই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়াই বলিয়াছিলেন যে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করেন তাহা অবাস্তব, তাহা কল্পনা মাত্র, তাঁহার 'মাথার খেয়াল'—কোন কিছু সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে মানুষ এরকম হ্যালুসি-নেশন দেখে।

কিন্তু সেই নরেন্দ্রনাথই মা-কালীকে প্রত্যক্ষ করার পর বুঝিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-বিষয়ক প্রত্যক্ষগুলি বাস্তব না কল্পনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আগে মনকে উহা প্রত্যক্ষ করার উপযোগী করিতে হইবে; সেই-মনের প্রত্যক্ষই এবিষয়ে বাস্তবতা-অবাস্তবতা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি—কেবল যুক্তি নয়। মনের এই প্রস্তুতির নামই ধর্মাচরণ বা সাধনা। ঈশ্বর বাস্তব কি অবাস্তব তাহা এই সূক্ষ্মদর্শী মনের প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভরশীল, সাধারণ মনের প্রত্যক্ষের উপর নহে। যাঁহারা মনকে ইহার উপযোগী করিয়া গড়েন না, তাঁহাদের বুদ্ধি যতই উন্নত হউক, মনের স্থূল-সীমিত প্রত্যক্ষের সীমায় তাঁহাদের অনুসন্ধান যতই সুদূরপ্রসারী হউক, জগতের চরম সত্যের, ঈশ্বরের বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই এই মনকে বস্তুর সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করার উপযোগী করিয়া গড়িবার দিকেই জোর দিতেন সর্বাধিক। মনকে এভাবে গড়িবার একমাত্র পথ মনকে একাগ্র করার ও পবিত্র করার প্রচেষ্টা—যাহার যেভাবে তাহা করিতে পছন্দ হয় এবং যাহার শক্তিতে যেভাবে ইহা করা সহজসাধ্য। জপ ধ্যান ভজন পূজা প্রার্থনা অনুষ্ঠান—এসবই মনকে একাগ্র ও পবিত্র করার সহায়ক। আর, তিনিই সব হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার

ইচ্ছাতেই সব হইতেছে—তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতির নিয়ম—এই সত্যকে যথাসাধ্য সর্বক্ষণ স্মরণে রাখিতে বলিতেন। তিনিই যে সব হইয়া রহিয়াছেন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া, এবং ঈশ্বরেচ্ছাই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, মথুরবাবুকে তাহার প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের মনের সংশয় অপনীত করিয়াছিলেন। তাই নিয়মিতভাবে অন্ততঃ সকালসন্ধ্যায় জপ-ধ্যান-ভজনাদির মাধ্যমে মনকে সত্যাভিমুখী করার কথা বারেবারে তিনি বলিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আত্মীয়স্বজনকে, সকলকেই ঈশ্বর-বোধে সেবা করিতে।

ঈশ্বর বাস্তব কি অবাস্তব তাহা সত্যই যদি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অপ্রত্যক্ষ-দর্শীদের যুক্তিবিচারের অরণ্য হইতে বাহির হইয়া মনকে উহার প্রত্যক্ষের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার এই পথে চলার মতো 'রিয়ালিষ্টিক অ্যাপ্রোচ', বাস্তবানুগ উপায় আর কিছু আছে কিনা জানি না।

চলার পথে একটু অগ্রসর হইয়া পথের দু-একটি নিদর্শন দেখিলেই মনে সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস সহজেই আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অবলম্বনে বলা যায়: কোন অজ্ঞাত শহরের বর্ণনা শুনিলাম। সেখানে যাইবার পথের নির্দেশ পাইলাম। শহরের বর্ণনা শুনিয়া উহাতে আমার বিশ্বাস না আসিতে পারে, গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে। উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে পথে না নামিলে এ বিষয়ে কোন মীমাংসাই কোন দিন আমার হইবে না। কিন্তু পথে নামিলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে শহরে পৌছানো যাইবে না; কিন্তু পথের বর্ণনা যাহা শুনিয়াছি সামান্য কিছুদূর চলিবার পরও তাহার মিল দেখিতে পাইলেই বাকী সবগুলির উপরই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, আমাকে আরো অগ্রসর হইবার প্রেরণা জোগাইবে। (এ কথাটি রাজযোগের আলোচনাকালে স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন।)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, এপথে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই মন অধিকতর প্রশান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে, ততই মানুষের স্বার্থপরতা কমিবে, ততই সে সকলকে সমান বলিয়া অধিকতরভাবে অনুভব করিবে। শান্তি, অবিচ্ছেদ আনন্দ, বিশ্বপ্রেম, সাম্য প্রভৃতি যাহা আমরা সবাই চাই, অথচ যাহা এখনো আমাদের নিকট যুক্তি ও কথাতেই আবদ্ধ, যাহার বাস্তবতা নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথই কেবল ঈশ্বরের বাস্তবতায় নয়, ইহারও বাস্তবতায় আমাদের পৌছাইয়া দিবে। বিজ্ঞানের সত্য যাচাই করার মতই সকলেই ইহার সত্যাসত্য নিজে পরীক্ষাও করিয়া লইতে পারেন। এ পথ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত এবং ইহা মনকে উন্নত করার পথ বলিয়া বিশ্বসমস্যাগুলির সমাধানে স্বার্থহীন, মানব-প্রেমিক, সাহসী ও শক্তিমান মানুষ গঠনের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় ইহাতে।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত]

১

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

ময়মনসিং
সোমবার, ২৪।১।১৬

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহারাজ, আজ এখানে আপনার পত্র পাইলাম। মহারাজ দয়া করে কামাখ্যাদেবী দর্শন করাইয়া ৪।৫ দিন এখানে আনিয়াছেন। ঠাকুরের খেলা দেখে অবাক্ হয়েছি। দু'বৎসর আগে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এবার তার ১০।১৫ গুণ ভক্ত বেড়ে গেছে। ছেলে মেয়ে যুবক ভক্তের ছড়াছড়ি। মহারাজকে পেয়ে আনন্দে বিভোর। দেশ মেতে গেছে। দেখছি সেই ডুবু-ডুবুর ভাব, আর বোধ হয় ঢাকা ভেসে যাবে। কি সুন্দর ভাব! আপনি দেখলে খুব আনন্দ পেতেন, কেবল মাধুর্যময়। ছেলেরা এখানে নিজেরা খেটে এক লম্বা ঘর তুলেছে, তাইতে গতকল্য ঠাকুর বসিলেন। মহারাজ কল্লেন পূজা, আরতি, আর ভোগও দিলেন। গান ও স্তোত্রপাঠ হল, আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ছেলেরা মনে মনে বলেছিল যে, যদি মহারাজ আসেন তবেই জানিব ঠাকুর আছেন, নতুবা সব মিথ্যা। কল্পতরু প্রভু আমার তাই কামাখ্যা-দেবী দর্শন উপলক্ষে মহারাজকে এখানে আনিলেন। ভক্ত যে চুম্বক, তাই ঠিক দেখলুম। কি কাণ্ড যে ঠাকুর কচ্ছেন তা লিখে জানাবার নয়! যারা দেখছে, কিছু কিছু বুঝছে। ২।৪ দিন পরে ঢাকায় যেতে হবে, সেখান হতে বোধ হয় বরিশাল। মহারাজও খুব আনন্দে আছেন। বলুন—আরও বেড়ে যাক্ সহস্রগুণ, লক্ষগুণ ভক্তি বিশ্বাস। কৃপা করুন আরও ভক্তি বিশ্বাস যাতে হয়। সকলকে ভালবাসা জানাইবেন, আর আপনি আমাদের অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম ও হৃদয়ের ভালবাসা জানিবেন। ইতি

দাস
বাবুরাম

২

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

Ramkrishna Mission
Belur P.O Howrah Dt.
সোমবার, ১৫।৩।১৬

পরম পূজ্যপাদেষু

গতকল্য, অপর অপর বৎসর যেমন হয় এ বৎসর তাহা অপেক্ষা যেন আরও উৎসাহে উৎসব হইয়া গেল। যেমন যেমন হয়, তাছাড়া কিরণবাবু পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি আর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী গণকে আনাইয়া বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। স্থান হয়েছিল গিরিশবাবু ও কালীবাবুর স্মৃতিমন্দিরের উত্তরে, সময় ৩টা হইতে ছয়টা। লোকে এই মহামেলার মধ্যেও আনন্দে স্থির হইয়া শুনিয়াছিল, এক-দিকে কালীকীর্তন, মধ্যে তরজা, অন্যদিকে বক্তৃতা। সকল শ্রেণীর লোকই আনন্দ পাইয়াছিল। গোয়ালের পশ্চিমের জমিখণ্ড জমা করে লওয়াতে এইস্থানে নারায়ণগণের বেশ সুবিধায় সেবা হইয়াছিল। কিছু কম ৫০ মণ চাল ডাল ছিল। পরিবেশন করেছিল কলেজের ছেলেরা, কি অদ্ভুত উৎসাহ তাদের মধ্যে, মহাশয়। কিছুমাত্র ক্লান্তি কি অবসাদ নাই, এই আশ্চর্য!

নিত্যই ভক্তপরিবার বাড়িতেছে। মঙ্গলবার শিলং হইতে প্রসন্নবাবু আসিয়া অনুরোধ কচ্চেন তথায় যাইবার জন্য। এ দিকে রাঁচীতে কাহাকে যাইতেই হইবে। এইরূপ আরও কত নিমন্ত্রণ রয়েছে। আবার আপনার চরণদর্শনেও আমার ইচ্ছা; যেদিকে প্রভু নিয়ে যান, তাঁর ইচ্ছা।

উৎসবদিন আশ্চর্য দেখিলাম—সমস্ত দিন মেঘলা, চন্দ্রাতপের কাজ করিল, কিন্তু কাল ও আজ ভীষণ রৌদ্র। প্রভুর অদ্ভুত লীলা। কত দেশের কত লোকই এসেছিল, ভাষা বোঝে না, কিন্তু যা দেখে তাই যেন আনন্দে পূর্ণ। আপনি আমাদের অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। সকল ভক্তদের ভালবাসা কহিবেন। আপনার শরীর ভাল থাকুক—ইহা ঠাকুরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা। অতুল কেমন আছে? সাজিদের খবর কি? তাহাদিগকে আমার স্নেহ-সম্ভাষণাদি জানাইবেন। গঙ্গাধর ভায়া উৎসবের পূর্ব হতেই মঠে আছে। সে বলছে, হরিভায়াকে লিখে দাও, "মঠে আমার আশ্রমের সব ভার দিয়েছি, আর হয়ত আপনার কাছেও যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়, সং, তার মুখে; সে তার আশ্রম কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না বোধ হয়…। যে-ছেলেমানুষ, সেই ভাবটাই আছে। আমরা তাকে নিয়ে খুব রগড় করি।

…ভায়া আমার পত্রের উত্তর দিলে না, তবু সে ঠাকুরের। প্রভু তাকে ভাল রাখুন!

ইতি

আপনার কৃপাপ্রার্থী

ভৃত্য বাবুরাম

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এ যোগ পুরাকাল থেকে চলে আসছে। আমিই প্রথমে বিবস্বান্‌কে এ যোগের উপদেশ দিয়েছিলাম ; বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এভাবে এ যোগ পরম্পরাগত হয়ে আসছিল। কালক্রমে তা লুপ্ত হয়েছে। সেই কর্মযোগই আজ তোমাকে উপদেশ করছি ; তুমি আমার সখা ও প্রিয় বন্ধু বলে এর গুপ্তরহস্য তোমাকে বলছি।"

একথা শুনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে বললে তুমি বিবস্বান্‌কে বলেছিলে, তা হয় কি করে? বিবস্বান্ কত আগে জন্মেছিলেন, আর তোমার জন্ম তো ইদানীং।" শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুনের মনে দুটি সংশয় জেগেছিল। প্রথম, তুমি যদি আমার মতো জীব হও, তাহলে পূর্বজন্মের স্মৃতি তোমার থাকতে পারে না। দ্বিতীয়, তুমি যে পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হওনি, এতে বোঝা যাচ্ছে তুমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ; কিন্তু তাহলে তো তোমার জন্ম বা মৃত্যু কোনটাই হতে পারে না ; কারণ যে অদৃষ্টের জন্য সাধারণ মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে হয়, ঈশ্বরের তা কিছুই নাই —তাঁর কোন কর্তব্য নাই, ধর্ম-অধর্মাদি কিছুই নাই, তিনি সমস্ত কর্মের অতীত। এই দুটি সংশয়ের জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "আগে আমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমারও হয়েছে। আমি ঈশ্বর বলে সে-সব জন্মের কথা আমার মনে আছে ; তুমি সাধারণ জীব বলে তোমার কোন কথাই মনে নেই।" জন্মমৃত্যুহীন ঈশ্বরের আবার জন্ম হয় কি করে?— অর্জুনের এই সংশয় দূর করার জন্য তিনি বললেন, "আমার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, ঠিকই ; তবু আমি আমার প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করে নিজ মায়া দ্বারা মানুষের রূপ ধারণ করি- এদিক থেকে আমি ঠিক সাধারণ মানুষ নই। এটি আমার মায়িক রূপ।" শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে স্তব করতে গিয়ে তুলসীদাস যেমন বলেছেন, 'মায়ামনুষ্যং হরিম্'- শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বললেন ; তিনি যে ঠিক আমাদের মতো মানুষ নন, এই কথাই অর্জুনকে বললেন। এই 'মায়া-মনুষ্য' হয়ে পূর্বে বহুবার তিনি এসেছেন, এভাবেই এসে পূর্বে বিবস্বান্‌কে উপদেশ দিয়েছেন।

তারপর কি জন্য তিনি এভাবে আসেন তাই বলছেন—"আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন অধর্ম খুব বেড়ে যায়, ধর্মের গ্লানি হয়, তখন আমি সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্টলোকদের শাসন করবার জন্য অবতীর্ণ হই।" অর্থাৎ ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য—ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ—আমি আসি। কিন্তু এজন্য তাঁকে আসতে হবে কেন? ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান—মনুষ্যরূপ না ধারণ করেও তো তিনি দুষ্টলোককে বিনাশ ও ভাল লোককে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু ধর্মস্থাপন সেভাবে হতে পারে না ; ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে মানুষরূপে আসতে হয় ; আমাদের ধর্মপথে নিয়ে যাবার জন্য, পথ দেখিয়ে দেবার জন্য আমাদের চোখের সামনে

* গত ২৪. ৮. ৬৮ তারিখে পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

তিনি লীলা করে যান। তাঁর জীবন দিয়ে আদর্শ দেখান আর উপদেশ দেন, যাতে আমরা সহজে সব বুঝতে পারি। ভগবান করুণাময়, আমাদের পরম হিতৈষী। মানুষ যাতে ঠিক পথে গিয়ে তাঁর দর্শনলাভ করতে পারে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেইজন্যই তিনি অবতাররূপে, মনুষ্যরূপে এসে লীলা করে আদর্শ জীবনটা দেখিয়ে যান—আমাদের কাছে আদর্শকে সহজবোধ্য করার জন্য ডিমন্‌স্ট্রেশন দিয়ে যান; আজকালকার অডিও ভিজুয়্যাল (সবাকচিত্রযোগে) শিক্ষার মতোই আমাদের চোখের সামনে লীলা করে যান।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন "আমার এরূপ দিব্য জন্ম-কর্ম যারা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। মৃত্যুর পর তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

এখন, আমরা সাধারণতঃ বলি, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য এসেছিলেন।

একটু বিচার করে দেখা যাক, কিভাবে তিনি ধর্মস্থাপন করলেন। বিচার করে আমরা যদি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে ভগবানের বাক্যানুসারে আমাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার হতে পারে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখে আমরা হয়ত বলতে পারি, ধর্মসংস্থাপন কোথায়? আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সময় যেটুকু ধর্ম ছিল, এখন তো তাও নেই—এখন চারদিকে অধর্মেরই তাণ্ডব-নৃত্য চলছে। ধর্মস্থাপনের জন্য তিনি কোথায় কি করে গেলেন?

বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখি।

রোম-সভ্যতা এক সময় খুব বড় সভ্যতা ছিল। কিন্তু যখন তার ভেতরের শক্তি ক্ষয় হয়ে গেল, তখন সে সভ্যতা বিনষ্ট হল। তার সেই চিতাভস্মের ওপর যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠল, সে হচ্ছে এই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, যাকে ইউরোপীয়ান সভ্যতা বলে। এ সভ্যতার পেছনে কী শক্তি ছিল? —যীশুখ্রীষ্ট, যীশুখ্রীষ্ট যে জীবন দেখিয়েছিলেন এবং যা উপদেশ করেছিলেন তারই ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে এই নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে।

এর পর প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপে একটা শান্তি ছিল, ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস ছিল, লোকে আনন্দে ছিল। ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুরু হল। বিজ্ঞানের জন্ম হল, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিচারের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। মানুষ দেখল, ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর তিনি নন। এরকম ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এভাবে তারা খ্রীষ্টের জীবন ও বাণী থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। আপনারা জানেন, এই করতে করতে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! মানবসভ্যতার গতি যে অধোমুখী হয়েছে, এখন অনেক মনীষী সেটা বুঝতে পারছেন। বুঝতে পেরে, কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে এটাকে একেবারে তলিয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আর তারই ফলে সোস্যালিজম, কম্যুনিজম প্রভৃতির উদ্ভব। বিচার করলে দেখা যায়, এগুলির ভেতর কিছু সত্য, কিছু ভাল জিনিস আছে; কিন্তু শুধু এই জিনিস মানুষকে পুরোপুরিভাবে তৃপ্ত করতে পারে না। তাই আমাদের যা সব সমস্যা, তার পুরো সমাধান এগুলি করতে পারছে না। কোনরূপ রাজনীতি বা অর্থনীতির দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ মূলে একটা মস্ত ভুল করা হচ্ছে—

মানুষকে জড়মাত্র বলে, দেহমাত্র বলে ভাবা হচ্ছে; তার যে আত্মা আছে, এ সত্যটি অবহেলিত হচ্ছে। আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে গেলে মানুষের এই আত্মায়, তার অন্তরে রেভোলিউশন, আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অন্তরের এই পরিবর্তনই সব সমস্যার সমাধান করতে পারে, কেবল বাইরের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটালে হবে না। আর অন্তরে সে পরিবর্তন আনতে গেলে ধর্ম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা আনা যাবে না। সেজন্য আবার ধর্মের একটা অভ্যুত্থান প্রয়োজন।

কিভাবে এই অভ্যুত্থান সম্ভব হতে পারে? আমরা দেখি যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মেছেন, আর তাঁদের বাণী শুনে বড় বড় সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছে। এমন কি আজও এই সব মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী অনেকের হৃদয়ে শান্তি ঢেলে দিচ্ছে। এরূপ কোন মহাপুরুষের জীবন ও বাণী অবলম্বন করেই এই অভ্যুত্থান ঘটে।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের বিজ্ঞানের মহাবীরেরা বলবেন, তোমরা যে ধর্ম ধর্ম করছ, তার মূলে যে ভগবান, সেই ভগবান আছেন কি না তারই তো ঠিক নেই। তাছাড়া, মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তোমাদের ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই দেখছি। তোমরা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। এ ধর্মে আমাদের দরকার কি? মানুষ না খেতে পেয়ে, নানা রোগে, মহামারীতে মরছে। এসব বিষয়ে উদাসীন থেকে তোমরা ধর্ম ধর্ম করছ। এ ধর্ম দিয়ে হবে কি? আর একটি কথা—ধর্মমত সম্বন্ধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল নেই, তোমরা পরস্পর ঝগড়া করে মর; অর্থের জন্য, জমি-জায়গার জন্য লড়াই করে পৃথিবীতে যত লোক না মরেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মরেছে তোমাদের ধর্মের জন্য পরস্পর ঝগড়া করে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান পরস্পর ঝগড়া করে। আমরা এর ভেতর কোন্ ধর্মটা নেব? আর নিয়ে করবই বা কি? অতএব তোমাদের ঘর তোমরা সামলাও, আমাদের উপদেশ দিতে এসো না।

এই হচ্ছে তাঁদের যুক্তি, আধুনিক যুগের মনোভাব। এই মনোভাব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক ধারায় বিচার করতে শিখেছে, সে বিচার অনুযায়ী ভগবানে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের যে সব পুরনো বুলি আছে, সেগুলি এ বিচারের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। সেজন্য ভগবান আছেন কি না, মানুষ তা ঠিক বুঝতে পারছে না, ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু এ বিশ্বাস হারানোতে ফল কি হচ্ছে?—মানুষ মনে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মন হাহাকারে ভরে যাচ্ছে; মনে করছে, অনেক কিছু হারিয়েছি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, আদর্শ কি, তার কোন হদিসই সে পাচ্ছে না।

এ সব সমস্যার সমাধান কে করবে? ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে লোকের মনে ভগবানের ওপর বিশ্বাস আবার কে এনে দেবে? এই ছিল আধুনিক যুগের একটা বিশেষ সমস্যা।

আধুনিক কালের আর একটা ব্যাপার হল, চারদিকে আমরা দাবীর কথা শুনছি, কর্তব্যের কথা কোথাও শোনা যাচ্ছে না। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের ভেতরও মানবীয় অধিকার, আমাদের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি পাশ্চাত্য জগতের অনেক অধিকারের কথা এসেছে। আমাদের দাবী কি কি, সে বিষয়ে আমরা খুবই সজাগ, কিন্তু আমাদের কর্তব্য কি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছি না, সেদিকে কারো দৃষ্টি

নেই। গোটা জগতেরই দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে আদর্শ ছিল, তাতে দাবীর কথা কিছুই ছিল না, সব সময় কর্তব্যের কথাই ছিল। রাজার কি কর্তব্য, প্রজার কি কর্তব্য, রাজকর্মচারীদের কি কর্তব্য, আমাদের শাস্ত্রে তা বলা আছে। আবার ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের কি কর্তব্য, গৃহীর, সন্ন্যাসীর কি কর্তব্য, ছাত্রের কি কর্তব্য ইত্যাদি সবই বলা আছে। সকলেরই কর্তব্য কি, তারই ওপর নজর ছিল। কোন দাবী কিন্তু ছিল না। ফলে সকলেই ছিল সেবাপরায়ণ; ভাব হল— আমার নিজের যে ধর্ম, নিজের যে জীবন, তা আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়—পরহিতায়, অপরের সেবার জন্য। সমাজে থাকতে গেলে সমাজের কিছু সেবা আমাকে করতে হবে—এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখন সে দৃষ্টিভঙ্গী উল্টে গেছে, সেবার পরিবর্তে তার স্থান নিয়েছে দাবী।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই বা কি ভাবে হতে পারে?

এসব সমস্যা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সমস্ত জগতের। বর্তমান সভ্যতা এসব সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, যার ফলে সভ্যতা পতনোন্মুখ হয়েছে। বাস্তবিক, বেশী দিন এভাবে চলতে পারে না; নতুন করে সভ্যতাকে গড়তেই হবে। নতুন সভ্যতা গড়ার জন্য আমাদের কি শক্তি, কি আদর্শ আছে, সেটাও দেখে নেওয়া যাক। আমরা এখন একটা সন্ধিক্ষণে আছি—একটা যুগের শেষে, আর একটা যুগের প্রারম্ভে; এর ফলে আমরা দু-দিকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে নতুন যুগের ধ্বংসের দিকটাই আমাদের নজরে বেশী পড়ে, অন্যদিকে পুনর্গঠনের যে সব শক্তি ধীরে ধীরে কাজ করে চলেছে, তা দেখতে পাই না। এগুলি খুব ভালভাবে দেখে বিচার করলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো।

এখন দেখা যাক, এই যুগপরিবর্তনের সময় নতুন যুগ প্রবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের কি দান। ঠাকুর কি দিয়ে গেছেন আমাদের? প্রথমেই আমাদের যা চাই, ভগবানে বিশ্বাস, যা না থাকায় আমাদের মনে শান্তি আসছে না, অথচ যে বিশ্বাস আনতেও পারছি না, ঠাকুর সেই ভগবদ্-বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। সাধন-ভজন করে তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন। স্বামীজী যখন প্রথম পাশ্চাত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন সব শিখে তাঁর মনেও ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনি সন্দেহ জেগেছিল। অর্জুন যেমন সমস্ত জগতের হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বামীজীও ঠিক সেই রকম আধুনিক যুগের পৃথিবীর সব মানুষের হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন, "আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন "হ্যাঁ, ভগবানকে আমি দেখেছি। তোমার সঙ্গে যেমন কথা বলি, ভগবানের সঙ্গেও ঠিক সেই ভাবেই কথা বলি; আর শুধু তাই নয়, তোমাকেও আমি দেখিয়ে দিতে পারি।" ফলে স্বামীজীর মন থেকে ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ চিরতরে চলে যায়। এতে যে শুধু স্বামীজীরই সন্দেহ চলে গেল তা নয়, সমস্ত জগতের মানুষের সন্দেহের নিরসন করা হল—ঠাকুর নিজে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ক'রে, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণিত করলেন—ভগবান আছেন, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এর চেয়ে, আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে? কাজেই ভগবদ্-

বিশ্বাস সম্বন্ধে মানুষকে তিনি আবার খুব আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

সমগ্র জগতে আজ যে মারামারি-কাটাকাটি চলছে, তা প্রতিরোধের জন্য অনেক মনীষী চেষ্টা করছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য, এক-পৃথিবী গড়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন তাঁরা, যাতে সবাই পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালবাসা নিয়ে জগতে বাস করতে পারে। কিন্তু এরূপ করতে হলে যে ভিত্তির প্রয়োজন, যার ওপর তা গড়ে উঠবে, সে ভিত্তি কোথায়? কিসের ওপর বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হবে? আমরা দেখছি, জগতে নানা জাতি ও নানারকমের লোক রয়েছে; তাদের সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে গেলে, সকলকে এক-পরিবারের ভেতর আনতে গেলে একটা সাধারণ সূত্রের প্রয়োজন। সে সূত্রটি যে কি, তা কেউ ধরতে পারছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই সূত্রটি দিয়ে গেছেন—প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতরেই ভগবান রয়েছেন, বাইরের চেহারা যার যেমনই হোক না কেন, সকলেরই অন্তরে একই ভগবানের প্রকাশ। এখানেই সব মানুষের একত্ব নিহিত। মানুষের এই ঈশ্বরস্বরূপতা-রূপ একত্বকে ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে, এক-পৃথিবী গড়ে উঠতে পারে। আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান তিনি করে গেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলে বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপন সম্ভব হতে পারে।

তারপর, ধর্মে-ধর্মে যে বিরোধ, যার জন্যে কত সংঘর্ষ, তারও তিনি মীমাংসা করে দিয়ে গেছেন। তিনি প্রত্যেকটি ধর্মপথ ধরে সাধনা করেছিলেন এবং প্রত্যেক সাধনার, প্রত্যেক পথের শেষে ভগবদ্দর্শন করেছিলেন; আর প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, একই ভগবানকে বিভিন্ন ধর্মপথে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে ডাকা হয়। এভাবে অনুষ্ঠান করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে, সব ধর্মই ভগবদ্দর্শনের অনুকূল, যে কোন ধর্মপথ ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক না কেন, পথের শেষে ভগবানলাভ হবেই। এজন্য ধর্মমত নিয়ে—পথ নিয়ে—ঝগড়া করবার দরকার নেই। যার যে রকম মনোভাব, যার যে রকম প্রবৃত্তি, সে সে-ভাবেই ধর্মের অনুষ্ঠান করুক; শেষে সকলে একই ভগবানের কাছে গিয়ে পৌছুবে। এ ভাবে ধর্মে-ধর্মে মত নিয়ে যে বিরোধ, তারও একটা মীমাংসা তিনি করে দিয়ে গেলেন।

তারপর, আমরা একটু আগে যা বলেছি, সর্বত্র মানুষের দৃষ্টি এখন দাবী'র দিকে, 'কর্তব্যে'র দিকে নয়। ধর্মের নামে অভিযোগ—মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি ধর্মের কোন সহানুভূতি নেই; যাঁরা ধার্মিক তাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি উদাসীন; এরকম ধর্মে কি প্রয়োজন?

ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনে এ অভিযোগের সদুত্তর পাওয়া যায়। স্বামীজী বলতেন, "যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, স্বর্গে অনন্ত সুখ দেবেন—সে ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না।" স্বামীজী এটা খুব জোর দিয়েই বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি থেকে নেমে এসে একদিন বলেছেন, "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। এ ভাবটি আজ সারা জগতেরই পক্ষে প্রয়োজন। ঠাকুরের এই ছোট্ট কথাটিকে স্বামীজী খুব ব্যাপকভাবে প্রচার করে গেছেন। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশ থেকে ঘুরে এলেন, ওদেশের বিপুল ঐশ্বর্য এবং ভারতের অন্নাভাব দেখে স্থির করলেন, ভারতের মানুষকে যদি পেটভরে খেতে না দিই, তাদের জাগতিক সম্পদ যদি একটু না

থাকে, তাহলে ধর্মপ্রচার করে কোন লাভ হবে না। আবার এরকম জাগতিক উন্নতি করতে গিয়ে সেদিকে বেশী দৃষ্টি গেলে আমরা যদি আমাদের আদর্শ—ধর্মের আদর্শ—পাশ্চাত্য জগতের মতোই ভুলে যাই, তাহলে আমাদের অবস্থাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। সেজন্য তিনি একটা বিশেষ আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ", একই সঙ্গে নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের হিতসাধনে লেগে পড়।

আমাদের দেশে প্রত্যেক অবতারপুরুষ, আচার্য মহাপুরুষ জন্মাবার পর একটা করে মঠ স্থাপিত হয়। সেখানে তাঁদের শিষ্যেরা থাকেন এবং তাঁদের আদেশ-উপদেশ প্রচার করেন। এবার ঠাকুর-স্বামীজী যে মঠ স্থাপন করলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন—এটা কি ঠিক সেই-রকম, না আগের মঠগুলি থেকে এর কিছু পার্থক্য আছে? আগে যে সব মঠ হয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্য ভগবানলাভ, স্বামীজী যে মঠ করে গেছেন তারও মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। এ দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই; আমাদের সনাতন যে আদর্শ তা ঠিকই আছে। কিন্তু সাধারণ মঠ থেকে স্বামীজীর মঠের একটু পার্থক্যও আছে। আগের সব মঠে মঠবাসীরা শুধু জপধ্যান করতেন, পূজা শাস্ত্রপাঠ শাস্ত্রা-লোচনা করতেন; ভক্তদের শাস্ত্রোপদেশ দিতেন—বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ঐটুকু মাত্র, সমাজের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বামীজী এর একটু পরিবর্তন করেছেন—দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য মঠবাসীদের সবরকম কাজ করতে হবে, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে, যারা অশিক্ষিত তাদের শিক্ষাদান করতে হবে—এই রকম নানাবিধ কাজ করে সমাজকে আবার ভাল করে গড়তে হবে। আর এই কাজ বেশ ব্যাপকভাবেই করতে হবে। সমাজ চিরদিন সাধুদের সেবা করে এসেছে, তাদের সাধন-ভজন করার সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। আজ সে সমাজ গ্লানি-যুক্ত; অতএব সাধুদের কর্তব্য হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে এসে সমাজকে আবার গ্লানিমুক্ত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। কার্যক্ষেত্রে নামলে আবার আদর্শ ভুল হবার ভয় আছে; তা যাতে না হয়, সে-দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সেজন্য স্বামীজী একটা নতুন সাধন-পথ তৈরি করে গেলেন। সাধুরা আগের মতোই জপ ধ্যান পূজা পাঠ করবে, ভগবানের যে নামরূপাতীত সত্তা, তার ধ্যান করবে। কিন্তু ভগবান যে জগৎরূপেও প্রকাশিত। প্রত্যেক লোকের মধ্যেও যে তিনিই রয়েছেন! এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষের সেবা করলে—মানুষের সেবায় ভগবানেরই সেবা হচ্ছে, এই ভাব নিয়ে সেবা করলে—সেটা উপাসনাই হয়ে যায়। জপধ্যানের সময় আমরা যে-ভগবানের চিন্তা করি, তিনিই মানুষ হয়ে রয়েছেন—এ বুদ্ধি নিয়ে সেবা করলে সে-সেবায় ভগবানের ধ্যানও হয়ে যায়। তাহলেই ভগবানের পূজায়, তাঁর ধ্যানে এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে মানুষের সেবায় কোন প্রভেদ আর থাকে না, সব সময়েই আমরা ভগবানের চিন্তাতেই লিপ্ত থাকতে পারি। এতে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

সেজন্য স্বামীজী কর্তৃক প্রবর্তিত এই কাজকর্মের সঙ্গে ধ্যান-ধারণার কোন তফাত নেই—"work is worship," কর্মই পূজা। স্বামীজী বলেছেন, ভগবানের পূজা জ্ঞানে কাজ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এর ভেতরকার মূল ভাবটি যেন আমরা বিচার করে দেখি। এর অর্থ কাজকে শুধু জগতের

উপকার করা হিসাবে, মানুষের উপকার করা হিসাবে, শুধু 'সোস্যাল ওয়ার্ক' হিসাবে নেওয়া নয়: এর অর্থ—ভগবানলাভের জন্যই কাজকে সাধনারূপে নেওয়া, জগতের, সমাজের মানুষের সেবার মাধ্যমে ভগবানেরই সেবা করা। কাজ উদ্দেশ্য নয়, শুধু মানুষের সেবা, 'সোস্যাল ওয়ার্ক' উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। কাজ তার উপায় মাত্র। যেমন কোন কারখানার মূল উদ্দেশ্য ষ্টীল তৈরি করা; তা করতে গিয়ে তার 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে আরো পাঁচটা জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে, বাজারে সেগুলির দামও আছে: কিন্তু সেই 'বাই-প্রোডাক্ট'গুলির উৎপাদনকে তো আর কারখানাটির আসল উদ্দেশ্য বলা চলে না। ঠিক সেই রকম আমাদেরও এই কাজকর্ম, লোকসেবা, সমাজ-সেবা—এগুলি উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। এই ভগবানলাভের জন্য এমন একটি সাধনা স্বামীজী দিয়ে গেছেন যে, সে-সাধনা দ্বারা ভগবানলাভ করতে গেলেই তার 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে সমাজের সেবা, সমাজের উন্নতি সাধিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই সাধনা দ্বারা একদিকে ভগবান-লাভের সুবিধা হচ্ছে আর অন্যদিকে জগতের কল্যাণও হয়ে যাচ্ছে। তাই স্বামীজী বলেছেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

শুধু আমাদের নয়, সারা জগতেই এর প্রয়োজন রয়েছে। কেন না, এর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে—সেবাই পরম ধর্ম।

বর্তমান জগতে আমাদের যা যা সমস্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ তার সব গুলিরই সমাধানের উপায় দিয়ে গেছেন। কি কি দিয়ে গেছেন তিনি? তিনি ভগবানের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন, সর্বজীবে ঈশ্বরদর্শন দ্বারা জগতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ দূর করেছেন, জগতের লোকের দুঃখকষ্টে উদাসীন না থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে শিখিয়েছেন, ধর্মের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছেন—ভগবানলাভই যে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, তা শিখিয়ে গেছেন। এ সব আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন। এই আদর্শগুলির ভেতর এত শক্তি নিহিত আছে যে, তা দিয়ে একটা নতুন যুগের প্রবর্তন, একটা নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারটা স্থূলদৃষ্টিতে আমাদের নজরে পড়ছে না; কিন্তু দেখা যায়, বড় বড় মনীষীরা ঠাকুর-স্বামীজীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে, এই আদর্শই বর্তমান জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে।

ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব, ব্যাপকভাবে না হলেও, সারা জগতে যে ছড়াচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে! ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছে কত দেশে কত জন!

এই আদর্শের জন্য সব জায়গাতেই একটা আকর্ষণ হচ্ছে; এই আদর্শের দ্বারাই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে, জগতে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

ধর্মের ওপর এখন যে উদাসীন ভাব দেখা যায়, তার কারণ যথার্থ ধর্ম আমাদের নজরে পড়ছে না; লোহায় মরচে ধরার মতো ধর্মের ওপর যেন একটা আবরণ পড়ে গেছে। এই আবরণটাই—মরচেটাই—আমাদের নজরে পড়ছে। আসল ধর্ম হল শাস্ত্রোক্ত সত্যগুলির উপলব্ধি, স্বামীজী বলেছেন, "Religion is realisation"—'উপলব্ধিই ধর্ম', আর যা কিছু সবই গৌণ, উপলব্ধির

সহায়ক মাত্র।

ধর্মের ওপর মরচে পড়েছে ঠিক কথা; কিন্তু তাই বলে সবসুদ্ধ ধর্মকেই ত্যাগ করতে হবে কেন? এ যেন মাথা ধরেছে বলে মাথা কেটে ফেলার মতো। ধর্ম থেকে তার ওপর জমা এই মরচেটাকে—কুসংস্কারগুলোকে—বাদ দিয়ে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে তার যথাযথ রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্যই ঠাকুর-স্বামীজী এসেছিলেন। স্বামীজী সারা জগতের কাছে সেটা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন যে, যথার্থ ধর্মকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, মরচে ধরা—গ্লানিযুক্ত—ধর্মকে নয়।

এইটি জীবনে দেখিয়ে আমাদের বোঝাবার জন্যই ঠাকুর-স্বামীজীর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীমাও এইজন্যই এসেছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে।

শ্রীশ্রীমা আমাদের কি দিয়ে গেলেন, তা একটু দেখা যাক। এমনিতে তাঁর জীবনের ভেতর কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না; তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করে গেছেন। অবশ্য তার ভেতর একটা মাধুর্য ছিল। আমরা প্রথমে তা ধরতে পারি নাই। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ১ম ও ২য় ভাগ যখন বেরুল, দুটো ভাগই পড়ে ফেললাম। একজন ভক্ত-মহিলা প্রতিদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে সারাদিনের ঘটনাগুলি লিখে রেখেছিলেন; ১ম ভাগে সেই কথাই, মায়ের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিই বেশী। ২য় ভাগে মায়ের উপদেশই বেশী আছে। দুখানি বই পড়ে আমি ২য় ভাগটিকেই বেশী পছন্দ করেছিলাম। ১ম ভাগে সবই ভাল, কিন্তু ওর ভেতর কি বিশেষত্ব আছে, তা তখন বুঝিনি। কিন্তু বইগুলি যখন ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে আমেরিকায় গেল, সেখানকার মেয়েরা সবাই প্রথম ভাগটিকেই পছন্দ করলেন বেশী। তাঁরা নিজেদের যে জীবনাদর্শ, তাতে শান্তি পাচ্ছিলেন না; ভারতবর্ষের মেয়েরা আগে কিভাবে জীবনযাপন করতেন, সেইটে তাঁরা খুঁজছিলেন। মায়ের জীবনে সেটা পেয়ে গেলেন, শান্তিলাভের পথ খুঁজে পেলেন। সেজন্যই ১ম ভাগটি তাঁদের এত ভাল লাগে।

আমাদের দেশের মেয়েরাও ভারতের প্রাচীন আদর্শ ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের দেশেও এ আদর্শের প্রয়োজন রয়েছে এখন। আমাদের দেশের মেয়েরা ভারতের নিজস্ব আদর্শ যে ভুলে যাচ্ছেন, পাশ্চাত্যের মেয়েদের জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে চাইছেন, তা মেয়েদের কনফারেন্স-এ যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তা দেখলেই বোঝা যায়; তাঁদের চিন্তাধারা কি রকম তা বোঝা যায়। অথচ যেটা তাঁরা অনুকরণ করতে যাচ্ছেন, সেই পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মেয়েরাই এখন বিরক্ত হয়ে গেছেন। আদর্শ জীবন, শান্তিলাভের যে জীবন, সে জীবন দেখিয়ে গেছেন শ্রীশ্রীমা। ভারতের মেয়েদের সেই জীবনাদর্শই গ্রহণ করতে হবে।

মায়ের বিশেষত্ব ছিল তাঁর মাতৃভাব। তাঁর কাছে যাঁরাই গেছেন তাঁরাই তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কাছে যাঁরা ধর্মলাভের জন্য, তাঁর উপদেশ লাভের জন্য থাকতেন শুধু তাঁরাই নন, যারা তাঁর দেশের বাড়ীতে মজুরের কাজ করত, বাড়ীর কাজ-কর্ম করত, ক্ষেতের কাজ করত, তারাও মায়ের এই ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছিল। মায়ের শরীর যাবার বহু বছর পরও তারা মায়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করত। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হত, 'তোমরা এখনো এরকম আস কেন?' তাহলে

বলত, 'মায়ের ভালবাসা ভুলতে পারছি না।' এখনো মায়ের কথা উঠলেই তাদের চোখে জল আসে। এতেই বোঝা যাচ্ছে মায়ের প্রতি তাদের এখনো কী টান! মায়ের যে ভালবাসা, তাঁর যে মাতৃভাব তা তারা ভুলতে পারছে না। ভগবানের প্রতি জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, একবার যদি কারো ভালবাসার টান আসে তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের প্রতি ভালবাসার জন্য এই সব মেয়েরাও যে মুক্ত হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের এই সঙ্ঘে মায়ের দান অপরিসীম। মা না থাকলে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্র থাকতেন কি না সন্দেহ। হয়ত তাঁরা বাইরে গিয়ে তপস্যায় সারাজীবন কাটাতেন। মায়ের ভালবাসা তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছিল। তাছাড়া মা যখন গয়া গিয়েছিলেন, বোধগয়ায় মঠ দেখে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তাঁর ছেলেদেরও এরকম একটা মঠ হয়, যেখানে তারা একসঙ্গে থাকতে পারে। আজ এই যে মঠ মিশন দেখছেন, এ সবই মায়ের সেই প্রার্থনার ফল। আর, মা যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে, স্বামীজীকে বুঝেছিলেন, বাস্তবিকই অন্য আর কারো পক্ষে সেভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখে সাধারণ গ্রাম্য মহিলা বলে মনে হলেও সবকিছু বোঝার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপূর্ব। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে সাধুদের দ্বারা সেবাকার্যের প্রবর্তন করলেন, তখন অনেকেরই, তাঁর গুরুভাইদের ভেতরও অনেকেরই মনে হয়েছিল, এটা পাশ্চাত্যের ভাব, ঠাকুরের ভাব নয়। অবশ্য তাঁর গুরুভাইরা স্বামীজীর ভাবই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কথাটা রয়ে গেল। মাস্টার মশায়ও এই ভাব পোষণ করতেন। মাস্টার মশায়ের কথা শুনে এই নিয়ে উদ্বোধনের কোন কোন সাধুব্রহ্মচারীর ভেতরও সন্দেহ এল। তখন তাঁরা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন, "মাস্টার যা বলে বলুক, নরেন যা করেছে সেইটাই ঠাকুরের ভাব।" তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, বই ছাপা হচ্ছে—এসবও কি ঠাকুরের কাজ?" মা উত্তর দিলেন, "হাঁ, সবই ঠাকুরের কাজ।" —এই বলে তিনি এক কথায় স্বামীজীর "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" মূলমন্ত্রটির সমর্থন করলেন। মা যখন কাশী যান, সেবাশ্রমের নিকটেই একটি বাড়ীতে থাকতেন। একদিন সেবাশ্রম দেখতে যান; ফিরে এসে বলেছিলেন, "হাসপাতাল দেখে এলাম। দেখলাম ঠাকুর ওখানে বিরাজমান, সর্বত্রই ঠাকুর!" সেবাশ্রম দেখে ফিরে এসে মা সেবাশ্রমের জন্য দশটাকার একখানি নোট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে নোটখানি আজও রক্ষিত আছে। এভাবে সঙ্ঘের বহু প্রশ্নের মীমাংসা মা করে দিয়েছেন।

এই জগতের জন্য মা কি দিয়ে গেলেন?—তিনি মাতৃভাব দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন দেখে যাতে আমাদের মেয়েরা আদর্শ জীবন যাপন করতে শেখে, সেজন্য মা ভারতের প্রাচীন আদর্শকে নিজ জীবনে মূর্ত করে গেছেন, নিজে সে জীবন যাপন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা আগেকার মতো কেবল রান্নাঘরে আবদ্ধ না থেকে বাইরের কাজকর্মে নানাদিকে এগিয়ে আসছেন। কেউ রাজনীতিক্ষেত্রে, কেউ ডাক্তারীতে, কেউ নার্সিং-এ—এমনি সর্বত্র তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রয়োজন আছে ঠিক-ই, কিন্তু এই সব করতে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব আদর্শ ভুলে

যাবার ভয়ও আছে। সেইজন্যই মা আদর্শ জীবন দেখিয়ে গেলেন—যেন আদর্শের একটি ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেলেন। আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ হল মাতৃত্ব, পবিত্রতা। আমাদের মেয়েদের আজ মায়ের জীবনের ছাঁচে জীবন ঢেলে নিতে হবে; ভারতের নিজস্ব আদর্শকে জীবনে আঁকড়ে ধরতে হবে, আবার সেই সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েও চলতে হবে। মা যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, তা শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা জগতের জন্যই প্রয়োজন। তাই মায়ের আদর্শকে আঁকড়ে জীবনপথে চললে তাতে নিজেরও কল্যাণ হবে, সারা জগতেরও কল্যাণ হবে।

এভাবে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী - এই তিনজন এসে লীলা করে আধুনিক জগতে যা যা প্রয়োজন, তা সবই দিয়ে গেলেন, আধুনিক কালের আদর্শগুলিকে নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেলেন। সেটা যেন আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। তাঁদের ভাব, তাঁদের আদর্শ অবলম্বন করে একটা নতুন যুগ প্রবর্তিত হবে, নতুন একটা সভ্যতা গড়ে উঠবে। কাজ শুরু হয়েছে, ধীরে ধীরে সব হবে। স্বামীজী বলেছেন, "ঠাকুরের এই আদর্শ সারা জগৎকে নিতেই হবে।"

এখন আমি আলোচনা শেষ করার আগে মায়েদের কাছে একটা আবেদন জানাব। কোন ছেলে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীশ্রীমা খুব খুশী হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যে-সব কাজ আমরা করি, আপনারা এ কাজের প্রশংসা করেন, আমাদের কাজে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও করেন। কিন্তু এ কাজ করছে কারা? সাধু-ব্রহ্মচারীরাই করছে। সাধু-ব্রহ্মচারী ছাড়া এ কাজ চলতে পারে না। আমাদের কাছে আপনারা বলেন, এখানে মঠ করুন, ওখানে স্কুল করুন ইত্যাদি। কিন্তু এসব করার জন্য অত লোক কোথায়, অত সাধু-ব্রহ্মচারী কোথায়? সেজন্য আপনাদের কাছে আবেদন, আপনাদের ছেলে-মেয়েরা যদি সাধু হতে চায়, বাধা দেবেন না। বরং তাদের ইচ্ছা দেখলে উৎসাহই দেবেন। শ্রীশ্রীমা যেভাবে ছেলেদের উৎসাহ দিতেন, ঠিক সেইভাবে দেবেন। ছেলেবেলায় তাদের যদি এ আদর্শ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেন, এ আদর্শ তাদের মনে থাকবে। মদালসা যেমন তাঁর ছেলেদের ঘুম পাড়াবার সময় ব্রহ্মবিদ্যার সার কথাগুলি তাদের শোনাতেন—গান গেয়ে শোনাতেন "ত্বমসি নিরঞ্জনঃ"। এর ফলে তাঁর ছেলেরা এমন ভাবে তৈরী হয়েছিল যে, একটু বড় হতে না হতে তারা সন্ন্যাস নিয়ে চলে যেতো; প্রায় ৬-৭টি ছেলে এভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আপনারা আপনাদের ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে যেমন শিক্ষা দেবেন, তাদের ভবিষ্যৎ সেভাবেই গড়ে উঠবে। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ যদি আপনারা পছন্দ করেন এবং এ কাজের দ্বারা ভারতের কল্যাণ হবে বলে মনে করেন, তাহলে আপনাদের ছেলেদেরও একাজে সহায়তা করার মতো করে শিক্ষা দিতে হবে, যে-সব ছেলেমেয়েরা সাধু হতে চায়, তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

আর একটা কথা ভেবে দেখুন। আমাদের সঙ্ঘের কাজের জন্য না হলেও ভারতবর্ষের অন্য কাজের দিক থেকেও এই ত্যাগের প্রয়োজন আছে। দেশের অনেক ছেলে আজকাল মিলিটারীতে যোগ দেয়; তাদের অনেকের মা তা পছন্দ করেন না। আমার মনে হয়, এভাব স্বার্থপ্রসূত। সে-সব মা ভাবেন, নিজের ছেলে-মেয়েরা কাছে থাকবে, চাকরি করবে, ডাক্তারি প্রোফেসারি প্রভৃতি করবে; লড়াই করতে যাবার, তোপের মুখে যাবার দরকার নেই।

এ ভাব হলে ভারতের স্বাধীনতা থাকবে কি করে? ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করা তো দরকার, আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাই তো তা করবে। দেশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করার ভাব, ক্ষত্রিয়ের ভাব, অখণ্ড দেশাত্মবোধ—এ সব যদি আমাদের না থাকে, তাহলে চলবে কি করে? পাশ্চাত্য দেশে গত যুদ্ধের সময় এক বীরহৃদয়া মা কি করেছিলেন, শুনুন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটিকে যুদ্ধে যেতে হল। তাঁর মা তখন খুব খুশী হয়ে বললেন, "যাও, দেশের জন্য যুদ্ধ কর।" ছেলে বলল, "হ্যাঁ মা, যাব; তবে প্রতি সপ্তাহে আমাকে একখানা করে চিঠি দিও।" মা তাতে রাজী হলেন। ছেলে যুদ্ধে গেল, মা-ও নিয়মিতভাবে বহুদিন পর্যন্ত তাকে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বুঝলেন যে এ অসুখ সারবে না, তিনি আর বাঁচবেন না। ভাবলেন, তিনি মারা গেলে ছেলে আর চিঠি না পেয়ে লড়াই ছেড়ে ফিরে আসতে পারে; এটা তিনি মোটেই চান না। তাই করলেন কি, মৃত্যু হবার আগেই ভবিষ্যতের জন্য অনেকগুলো চিঠি লিখে রাখলেন- তখন থেকে এক সপ্তাহ পর পর তারিখ দিয়ে; আর একজন প্রতিবেশিনীকে বললেন, "দেখ, এই চিঠিগুলি আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমি মরে যাবার পর প্রতি সপ্তাহে একখানি করে চিঠি তুমি ডাকে দেবে।" চিঠিগুলির ভেতর লেখা ছিল, 'আমি ভাল আছি। আমার জন্য তুমি কিছু ভেবো না। তুমি দেশের জন্য লড়াই করছ, নিশ্চিন্ত হয়ে লড়াই কর', ইত্যাদি। মা তো এভাবে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে মারা গেলেন। ছেলের কাছে চিঠিও ঠিকমত যেতে লাগল, সে ভাবল মা ভালই আছেন। পরে যখন বাড়ী ফিরে এল তখন সব কথাই শুনল।

এরকম মা না হলে এরকম ক্ষত্রিয়, বীর্যবান ছেলেমেয়ে হবে কি করে?

আমাদের দেশে আগে এরকম সব বীর-রমণী ছিলেন। পুরাণে আপনারা তাঁদের কথা পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই একবার এক রাজার বিরোধ হল, লড়াই করতে হবে। সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য বহু রাজার কাছে সাহায্য চাইতে গেলেন, কিন্তু কেউ তাঁর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়তে রাজী হলেন না; তাঁরা বললেন, "তুমি কি পাগল? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কি আমাদের সর্বনাশ করবে?" তিনি তখন দেবতাদের সাহায্য চাইলেন, অনেক দেবতার কাছে গেলেন। কিন্তু দেবতারাও একই ভাবে অসম্মতি জানালেন—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিও বললেন, "বাবা, তুমি যাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ, তাঁর সঙ্গে তো আমরা যুদ্ধ করতে পারব না! এভাবে স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরে কোথাও তিনি আশ্রয় পেলেন না। শেষে একদিন তিনি দ্রৌপদীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন; দ্রৌপদী তখন নদীতে স্নান করে ফিরছিলেন। সেই রাজা দ্রৌপদীর কাছে সব কথা বললেন, শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলেন। বীরহৃদয়া ক্ষত্রিয়রমণী দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ তাঁকে আশ্রয় দিলেন। গৃহে ফিরে পাণ্ডবদের কাছে বললেন, "ইনি শরণাগত হয়েছিলেন, এঁকে আশ্রয় দিয়েছি।" পাণ্ডবরা জিজ্ঞেস করলেন, "কার সঙ্গে এঁর বিরোধ?" দ্রৌপদী বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে।" শুনে পাণ্ডবরা বললেন, "এ কি বলছ তুমি! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সুহৃদ। তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব কি! আর যুদ্ধ করলেও কি জিতব?

তাছাড়া এ লোকটির জন্যে আমরা এসব করতে যাবই বা কেন?" শুনে দ্রৌপদী বললেন, "তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্! এই কি তোমাদের ক্ষাত্রবীর্য? যে শরণাগত তাকে আশ্রয় দেওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্যে দরকার হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ করবে না কেন—হলেনই বা তিনি সুহৃদ? আর হেরে যাওয়ার ভয়ে যুদ্ধ করতে চাইছ না? ভয়ে আশ্রয় দিতে চাচ্ছ না? তাহলে তোমরা কিসের ক্ষত্রিয়? তোমাদের ধিক্!" দ্রৌপদীর এ কথা শুনে পাণ্ডবগণ রাজাকে আশ্রয় দিলেন।

মেয়েদের ভেতর এ রকম ক্ষত্রিয়ের ভাব যদি না জাগে, তাহলে ভারতের উন্নতি হবে কি করে? ভারত তাহলে রক্ষা পাবে কি করে? স্বামীজী বলেছেন, আবার ক্ষাত্রবীর্য না জাগলে দেশের কোন উন্নতি হবে না। মিলিটারীতে যোগ দেওয়াই হোক বা সাধু হওয়াই হোক, দুয়ের পিছনে রয়েছে ত্যাগ। স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের উন্নতির জন্যই হোক বা দেশরক্ষার জন্যই হোক—ছেলেবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের যদি সে রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে ঠিক হবে। এ শিক্ষা মায়েরাই দিতে পারবেন। সেজন্যই আপনাদের কাছে বিশেষ করে বলছি, ছেলেমেয়েদের ত্যাগের পথে যেতে বাধা দেবেন না, বরং ত্যাগের আদর্শে উৎসাহিতই করবেন।

রোমান ক্যাথলিক সমাজে প্রতি পরিবারে অন্ততঃ একজন করে সাধু হয়ে যান, ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক। তাঁরা এটি চান। কোন পরিবার থেকে কেউ সাধু না হলে সে পরিবারের সকলে নিজেদের শাপগ্রস্ত বলে মনে করেন; কেননা যীশুখৃষ্ট তাঁদের পরিবার থেকে নিজের কাজের জন্য কাউকে উপযুক্ত মনে করলেন না। ঠাকুরের কাজের জন্য আপনারা কি সেরকম ভাবেন? তাই আশা করি, আপনাদের ছেলে বা মেয়ে কেউ যদি ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শে জীবন গঠন করতে চায়, আদর্শ জীবন যাপন করতে চায়, আপনারা তাকে বাধা দেবেন না। বরং ছেলেবেলা থেকে তাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করবেন, সেভাবে শিক্ষা দেবেন। আপনাদের কাছে এই আরজি আমার। ত্যাগের মতো পরম কল্যাণ আর কিসে হতে পারে? দেশের যুবশক্তিকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন, "তোমাদের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ কর্ম।"

দেশসেবা, সমাজসেবা, সমগ্র মানবজাতির সেবায় ত্যাগই মূলমন্ত্র। ত্যাগই যুগধর্ম। ঠাকুর মা ও স্বামীজীকে সঙ্গে এনে জীবনে তাই-ই দেখিয়ে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনেঃ ধর্মদাস লাহা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পূর্বকথা

'নাম ধর্মদাস লাহা বড় কারবারি।
বহু ধনেশ্বর তেঁহ বহু টাকাকড়ি॥
...
অগণ্য গো-ধনেশ্বর গোকুল মাঝারে।
এবে ধর্মদাস লাহা কামারপুকুরে॥
...
কি বড় করিব বন্দি যুগলচরণ।
যাঁর ঘরে খেলে পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ধর্মদাস লাহা একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। অবতারবরিষ্ঠের আছ-লীলা-কাণ্ডে এই পুণ্যকীর্তি পুরুষের ভূমিকা সবিশেষ স্মরণযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-সাহিত্যে ইনি সংক্ষেপে 'লাহাবাবু' নামেও প্রসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহা ছিলেন মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিকটতম প্রতিবেশী ও একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। এই সূত্রে চাটুয্যে-পরিবারের সঙ্গে লাহা-পরিবারের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় হৃদ্যতা দেখা যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের আছলীলা-রঙ্গে কেবল ধর্মদাস লাহাই নন, তাঁর পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিও বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিজড়িত।

জীবনবৃত্তান্ত

ধর্মদাস লাহা ছিলেন কামারপুকুরের অধিবাসী এবং তথাকার স্বনামধন্য জমিদার। বিবিধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত বিত্ত ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ধনাঢ্য ও মহানুভব ব্যক্তিরূপে কামারপুকুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীর পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট হতে তাঁর জমিদারি ও তথাকার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি তিনি ক্রয় ক'রে নেন। তিনি অগণিত গো-ধনেরও অধিকারী ছিলেন; প্রত্যহ প্রচুর দুগ্ধ পাওয়া যেত। ঘরে তাই ঘৃত-ক্ষীর, সর-ননী প্রভৃতির অভাব ছিল না।

লাহাবাবু বিবিধসদ্‌গুণসম্পন্ন অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল ধীর-স্থির ও নম্র-মধুর। তিনি ছিলেন উদার-সরল ও দয়ার্দ্র-কোমল। তাঁর মধ্যে ধন-ঐশ্বর্যের দম্ভ-মোহ আদৌ ছিল না। তিনি ছিলেন অতিশয় সজ্জন, ধর্মপ্রাণ ও পরহিতব্রতী। দেব-দ্বিজ ও সাধু-বৈষ্ণবগণের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ ও সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। বিবিধ ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদাই পরম উৎসাহী ছিলেন। তাঁর ভবনে বারমাসে তেরপার্বণের বিপুল সমারোহ লেগে থাকত. বিশেষতঃ দোল-দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী-রাসযাত্রা, গাজন-রথ, নবান্ন-পুণ্যাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রচুর ধুমধাম ও আনন্দোৎসব হত। ঐ সকল পাল-পার্বণে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করতেন। দীন-দুঃখী ও আর্ত-পীড়িতদের সেবায় এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও অতিথি-অভ্যাগতগণের সমাদর-সৎকারে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। এ-ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক বিবিধ ক্রিয়া-কর্মাদি উপলক্ষ্যে দান ধ্যানাদি-বিষয়েও তাঁর প্রচুর উৎসাহ দেখা যেত।

'গ্রামেতে বর্ধিষ্ঠ গোষ্ঠী লাহা নামে খ্যাত।
নানা কাজে অর্থব্যয় প্রচুর করিত॥'—পুঁথি

শিক্ষাবিস্তার-বিষয়েও লাহাবাবুর অনুরাগ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা যায়। পল্লীর বালকদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে স্বীয় ঠাকুরবাটীর প্রশস্ত নাটমণ্ডপে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। কামারপুকুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই পাঠশালাটি 'লাহাবাবুর পাঠশালা' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। যাহোক, উক্ত পাঠশালায় নিযুক্ত শিক্ষক মহাশয়ের বৃত্তি এবং তার পরিচালনের অন্যান্য ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।

অতিথিসৎকার-বিষয়েও লাহাবাবু বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কামারপুকুর পল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব-প্রান্তে শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম গমনাগমনের পথের পার্শ্বে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকগণের জন্য তিনি নিজব্যয়ে এক বৃহৎ অতিথিশালা নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্যহ এই অতিথিশালায় দেশ-দেশান্তরের বহু সাধু-বৈষ্ণব ও অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম হত। আগন্তুকগণের জন্য তিনি তথায় বিশ্রাম ও আহারাদির অতি উত্তম বন্দোবস্ত করেছিলেন। তথায় আতিথ্য গ্রহণ ক'রে সমাগত সকলেই পরম আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত হতেন। লাহাবাবুর অতিথিশালার সুবন্দোবস্তের খ্যাতি চারদিকে সুপ্রচারিত হয়েছিল।

ধর্মদাস লাহা স্বীয় প্রকৃতিগত মহৎ গুণাবলী ও বিবিধ সৎকর্মের জন্য পল্লীবাসিগণের পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অগাধ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তিনি লাহাবাবু এবং তাঁর পরিবারবর্গের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। লাহাবাবুও মহাত্মা ক্ষুদিরামকে সর্বদাই অশেষ ভক্তি-মান্য করতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও মধুর সম্প্রীতি দেখা যায়। লাহাবাবু ক্ষুদিরাম চাটুয্যে অপেক্ষা সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

কামারপুকুরের এই ধর্মপ্রাণ লাহা-পরিবার অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-বৃত্তান্তে এই পরিবারের মাত্র সামান্য কয়েক-জনের উল্লেখ দেখা যায়। লাহাবাবু এবং তাঁর ভক্তিমতী পত্নীর প্রসঙ্গ কচিৎ উল্লেখিত রয়েছে। আর তাঁদের পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে কেবল প্রসন্নময়ী ও গয়াবিষ্ণুর খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এই বিখ্যাত পরিবারের উল্লেখিত মাত্র এই কজন ছাড়া আর অপর কারও বিবরণী উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়।

লীলাবার্তা

[গদাধরের অন্নপ্রাশনে ধর্মদাস]

শ্রীমান গদাধর ক্রমশঃ ষষ্ঠমাসে পদার্পণ ক'রলে মহাত্মা ক্ষুদিরাম নিজ সঙ্গতি অনুসারে তার অন্নপ্রাশনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি মনস্থ করেন, শুভদিনে ঐ উপলক্ষ্যে শাস্ত্রবিহিত আবশ্যিক কৃত্যগুলি যথানিয়মে সম্পাদন ক'রে ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে মাত্র দু'চারজন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করাবেন।

কিন্তু ধর্মদাস লাহার উৎসাহে ও প্রেরণায় ঐ অনুষ্ঠান কার্যকালে মহাসমারোহপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর গোপন পরামর্শে কামারপুকুর পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ ক্ষুদিরামকে ধরে বসেন, ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁদেরও ভোজন করাতে হবে। তখন ক্ষুদিরাম হাসিমুখে 'রঘুবীরের ইচ্ছা', বলে তাঁদের সাদর

আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পরক্ষণে তিনি ভাবেন, গ্রামবাসী কেবল কয়েকজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করা তাঁর পক্ষে আদৌ সমীচীন হবে না, কারণ গ্রামস্থ সকলকেই তিনি সমান প্রীতির চক্ষে দেখেন এবং সকলেরই সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন। অতএব তিনি কাদের বাদ দিবেন এবং কাদের নিমন্ত্রণ করবেন, ভেবে স্থির করতে পারলেন না। তাছাড়া, আশানুরূপ ব্যবস্থা এবং সমারোহ করার মতো তাঁর সামর্থ্যই বা কোথায়? যা হোক, এ-জন্য তিনি স্বভাবতই কিছুটা চিন্তিত হলেন। এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে যুক্তি-পরামর্শ করার জন্য অবশেষে তিনি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার নিকট গমন করেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনাদি ক'রে তিনি সহজেই বুঝতে পারেন যে, ঐ বন্ধুবরেরই গুপ্ত প্রেরণায় ও উৎসাহে উক্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁর নিকট ঐরূপ মধুর আবদার করেছেন।

পরিশেষে ক্ষুদিরাম ৺রঘুবীরের উপর সমুদয় ভার অর্পণ ক'রে ঐ অনুষ্ঠানে ভোজন করার জন্য নিজের সকল আত্মীয়বর্গ, গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সকল প্রতিবেশীকে সাদর নিমন্ত্রণ জানান। ফলে নির্ধারিত দিনে গদাধরের শুভ অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠানে অভাবনীয় সমারোহ হয়।

'গরীব ব্রাহ্মণবাড়ী কিন্তু আজি দিনে।
চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পায় চারিবর্ণে॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ আর যতেক সজ্জাতি।
বৈষ্ণব ভিখারী প্রতিবাসী জোলা তাঁতি॥
সমভাবে সকলে উদর পূরি খায়।
কুলের ঠাকুর রঘুবীরের কৃপায়॥'—পুঁথি

বস্তুতঃ লাহাবাবুরই আন্তরিক অভিপ্রায়ে ও উৎসাহে এই অনুষ্ঠান এরূপ বিরাট আকার ধারণ করে এবং বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্য তিনি অন্তরালে থেকে নানাভাবে সাহায্যও করেন।

[লাহাভবনে গদাধর]

'এইরূপে দুই তিন বর্ষ গেলে পরে।
সমান বয়স শিশু সঙ্গে খেলা করে॥
লাহা নামে ধনাঢ্যবংশীয় সেই গ্রামে।
যাওয়া আসা হয় তার তাঁহার ভবনে॥'
—পুঁথি

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার ভবন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদ্যলীলা-বিলাসের একটি বিশিষ্টতম ক্ষেত্র। শৈশব ও বাল্যে তিনি তাঁর অঙ্গনে যে কত শতবার পদার্পণ করেছেন, এবং কত লীলা-খেলা করেছেন, তার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

গদাধরের বয়স ক্রমশঃ দু'তিন বছর হলে, সে তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মধুর খেলা-ধুলা আরম্ভ করে। ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু ছিল তার সমবয়সী এবং একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গয়াবিষ্ণুর টানে এবং লাহাগিন্নী ও প্রসন্নময়ী প্রমুখ স্নেহশীলা রমণীগণের প্রীতি-আকর্ষণে, এখন হতে লাহাভবনে তার ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয়।

বালক গদাধরের প্রতি ধর্মদাস লাহার অগাধ অপত্যস্নেহ, বাৎসল্য-প্রেম দেখা যায়। তিনি তাকে নিজ পুত্রাধিক স্নেহ-আদর করতেন। তাকে দেখে তিনি স্বভাবতই পরম আহ্লাদিত হতেন এবং তার প্রতি এক অনির্বচনীয় প্রেমাকর্ষণ অনুভব করতেন। স্বীয় বিবিধ কারবারের জটিল হিসাব-নিকাশে এবং খাতা খতিয়ান প্রভৃতি বিশেষ জরুরী কার্যে তিনি নিবিষ্ট থাকলেও গদাধরকে দেখা মাত্রই যেন কিরূপ ভাব-বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

তখন তাঁর ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেত।

'আর না হইত তাঁর হিসাবেতে মন।
কি জানি কি করিতেন তাহে দরশন॥
বলিতেন ধর্মদাস শিশু গদাধরে।
যাও বাপ খাও গিয়া কি রেখেছে ঘরে॥'

—পুঁথি

তিনি পরম স্নেহভরে তাকে নিজ সকাশে আহ্বান করতেন এবং নির্নিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকতেন। তাকে দেখে এবং তার আধ আধ মধুর কথাবার্তা শুনে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়তেন। তাকে অজস্র স্নেহ-আদর ক'রেও তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হত না। অবশেষে তিনি তাকে মিষ্টান্নাদি উপহার গ্রহণের জন্য অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিতেন।

অন্তঃপুরবাসিনীরাও তার আগমন-প্রতীক্ষায় বিশেষ ব্যাকুল থাকতেন। তাকে পেয়ে তাঁরাও পরম উল্লসিতা হয়ে উঠতেন। তাকে কোলে-পিঠে নিয়ে তাঁরা কত আদর-স্নেহ করতেন। তার মধুর খেলাধুলা দেখে এবং আধ আধ কথা-বার্তা শুনে তাঁরা আত্মহারা হয়ে পড়তেন। তাঁরা প্রত্যহ তাকে গৃহজাত ক্ষীর-সর, নাড়ু-ননী প্রভৃতি উপহার দিতেন। ঐ সকল উপাদেয় মিষ্টান্ন পেয়ে গদাধর মহা আনন্দিত চিত্তে ঐগুলি ভোজন করত। দেখে তাঁদেরও আনন্দের অবধি থাকত না।

[গদাধরের সঙ্গে গয়াবিষ্ণুর মিত্রতা]

'আপন নন্দন গয়াবিষ্ণু নাম খ্যাতি।
সমবয়ঃ গদায়ের সঙ্গে বড় প্রীতি॥
...
সঙ্গে নানারূপ খেলা বালকের সনে।
সসঙ্গী কানাই যেন নন্দের অঙ্গনে॥'

—পুঁথি

ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু গদাধরের সমবয়সী ছিল। শৈশবাবধিই এই বালকদ্বয়ের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা ও নিবিড় ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়।

বালকদ্বয়ের অদ্ভুত সৌহার্দ্য লক্ষ্য ক'রে ধর্মদাস তাদের উভয়ের মধ্যে ধর্মসম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত হন। অবশেষে তিনি ঐ বিষয়ে সুহৃদবর ক্ষুদিরামের সহিত পরামর্শ করেন। ক্ষুদিরাম হৃষ্টচিত্তে তাঁকে সম্মতি দেন। অতঃপর লাহাবাবু শুভদিনে এক আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান ক'রে গদাধরের সঙ্গে গয়াবিষ্ণুর 'স্যাঙাৎ' বা মিত্রতা পাতিয়ে দেন। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তিনি বিশেষ আনন্দোৎসবও করেন। বস্তুতঃ এই ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তিনি গদাধরকে একান্ত নিকটতম আত্ম-সম্পর্কে লাভ ক'রে চির চরিতার্থ হন। মনে হয় এই জন্যই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'কার লাহাবাবুকে কৃষ্ণলীলায় বিজড়িত মহারাজ নন্দের সহিত তুলনা করেছেন।

[লাহাবাবুর পাঠশালায় গদাধর]

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলার আর একটি বিশেষ চিহ্নিত ক্ষেত্র। পাঁচ বছর বয়সে পিতার নিকট হাতে খড়ি হওয়ার পর গদাধর শ্লেট-পাততাড়ি নিয়ে এই পাঠশালেই প্রবেশ করে। তার বিদ্যালয়ের পাঠ এইখানেই আরম্ভ এবং এইখানেই সমাপ্ত হয়। পাঁচ বছর বয়স হতে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই পাঠশালার সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখা যায়।

এই পাঠশালে তার প্রবেশকালে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার নামে একজন শিক্ষক তথায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। যদুনাথের নিকট তার বিদ্যারম্ভ হয়। বছর কয়েক পরে তিনি অবসর গ্রহণ করলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার

তথায় তাঁর স্বলাভিষিক্ত হন। এই পাঠশালে গদাধর উল্লিখিত উভয় শিক্ষকেরই নিকট হতে পুত্রাধিক স্নেহ-আদর লাভ করে। তথায় তার সহপাঠিগণের মধ্যে মাত্র তিন জনের নাম প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। তাদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু, আর দুইজন কামারপুকুরের গঙ্গাবিষ্ণু লাহা ও শ্রীরাম মল্লিক। এদের সঙ্গে বাল্যকালে তার প্রগাঢ় সম্প্রীতি এবং নিবিড় অন্তরঙ্গতা লক্ষিত হয়। সাধকোত্তর জীবনেও শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপটে এদের স্মৃতি সমুজ্জ্বল দেখা যায়।

এই পাঠশালে প্রবেশের স্বল্পকাল মধ্যেই গদাধর নিজ সরল-মধুর প্রকৃতির গুণে শিক্ষক ও ছাত্রগণের সকলেরই অশেষ প্রীতিভাজন হয়ে ওঠে; বাল্যাবধি তার মধ্যে বিচিত্র প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। শৈশব কাল হ'তেই সে ছিল অত্যাশ্চর্য শ্রুতিধর ও মেধাবী। তার স্মৃতিশক্তিও ছিল অদ্ভুত প্রখর। তাছাড়া, তার কণ্ঠস্বর ছিল সুললিত এবং বাচনভঙ্গিমাও ছিল অতি সরস ও মনোমুগ্ধকর। সঙ্গীতে এবং অভিনয়েও তার বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। সে স্বল্পকালের মধ্যেই মধুর সঙ্গীতে এবং সরস হাস্য-কৌতুক ও অভিনয়ে পাঠশালা মাতিয়ে তোলে।

'আপনি করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে॥
গীত-বাদ্য-নৃত্য তার অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ত্রুটি॥
হেসে হেসে মরে গুরুসহ ছাত্রগণ।
কতই আনন্দ তাঁর নাহি নিরূপণ॥
শুনি হাসি-রোল যারা থাকিত নিকটে।
তেয়াগিয়া কার্য-কর্ম পাঠশালে জুটে॥'—পুঁথি

[লাহাবাবুর অতিথিশালায় গদাধর]

লাহাবাবুর অতিথিশালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-কৈশোর-লীলা-রঙ্গের আর একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। গদাধর বাল্যাবধি কখন একাকী, কখন বা গয়াবিষ্ণু, শ্রীরাম মল্লিক প্রমুখ বন্ধুগণ-সহ এই অতিথিশালায় উপস্থিত হত। এখানে সাধুদের ধুনির নিকট বসে সে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও পূজার্চনাদি দর্শন করত এবং তাঁদের ভজন-কীর্তন শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশাদি শ্রবণ করত। তাঁরা ধুনির আগুনে কিভাবে ভোজ্যাদি প্রস্তুত ক'রে ঐগুলি ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্বক ভোজন করতেন—এ-সকল অনুষ্ঠানও সে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করত। সাধু-সন্ন্যাসিগণের অনাড়ম্বর বেশ-ভূষা এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যময় পবিত্র জীবনধারা দেখে সে পরম আকৃষ্ট হত।

গদাধরের নয়নাভিরাম মূর্তি এবং বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতি দেখে তাঁরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁরা তাকে অশেষ আশীর্বাদ ও স্নেহ-আদর করতেন। ভোজনের পূর্বে তাঁরা পরমপ্রীতিভরে তাকে প্রসাদ দিতেন। সে ঐ প্রসাদের কিছু অংশ মহানন্দে উপস্থিত বন্ধুদের বিতরণ ক'রে অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করত।

এইভাবে ক্রমশঃ যতই দিন যেতে থাকে, গদাধরের অন্তরে সাধুসঙ্গলাভের অনুরাগ ততই প্রবল হতে থাকে। অতঃপর সে এই অতিথিশালায় প্রতিদিন ঘন ঘন গতায়াত শুরু করে এবং সাধু-বৈষ্ণবগণের পূত সন্নিধানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করতে থাকে। কখন কখন সে কাষ্ঠ-পানীয়, ফল-মূল, পুষ্প-বিল্বপত্র প্রভৃতি আহরণ ক'রে এনে তাঁদের উপহার দিত। আবার কখন কখন সে নিজ জননীর নিকট হতে চাল-ডাল, আটা-আলু প্রভৃতি ভোজ্য সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁদের ভিক্ষা দান করত। তাঁর

এরূপ আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ সেবায় তাঁরা অত্যন্ত প্রীত হতেন এবং তার মঙ্গল কামনা ক'রে তাকে অজস্র আশীর্বাদ করতেন।

গদাধর তাঁদের বেশ-ভূষায় আকৃষ্ট হয়ে কোন কোন দিন তাঁদের নিকট বসে তিলক-চন্দনাদিতে নিজ দেহ চর্চিত করত, কোন কোন দিন সর্বাঙ্গে ধুনির ভস্ম মেখে পরম আহ্লাদিত হত। ঐরূপ বেশ ভূষা ধারণ ক'রে মহানন্দে নৃত্য করতে করতে সে কখন কখন নিজ জননীর নিকটও আগমন করত। তার ঐরূপ মতি-গতি ও ভাব-প্রকৃতি দেখে চন্দ্রাদেবীর হৃদয় সময় সময় বিষম আশঙ্কায় ভরে উঠত।

গদাধরের বয়স তখন প্রায় আট বছর। একদিন চন্দ্রাদেবী তাকে একখানি নতুন বস্ত্র পরিয়ে এবং তার মনোহর কেশদাম সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে তাকে বেশ মনোমত ক'রে সাজিয়ে দেন। তারপর সে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা-ধুলা করতে করতে ক্রমশঃ অতিথিশালায় উপস্থিত হয়। তথায় সেদিন একদল নাগা সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। সন্ন্যাসিগণের জটাজুট ডোর-কৌপীন-পরিহিত বিভূতিভূষিত সৌম্য মূর্তি দেখে তার অন্তরে ঐরূপ বেশ-বাস ধারণের বাসনা জন্মায়। সে তখন তার ঐ নতুন বস্ত্রখানি খণ্ড খণ্ড ক'রে ডোর-কৌপীন ও ভিক্ষার ঝুলি ক'রে এবং সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে—সন্ন্যাসীর বেশে মহানন্দে জননীর নিকট উপস্থিত হয়।

'কহে মায়ের আগে নাচিয়া নাচিয়া।
অতিথি হয়েছি মাগো দেখ না চাহিয়া॥
...
সন্ন্যাসীর বেশ অঙ্গে দেখিয়া নয়নে।
শেলের সমান লাগে জননীর প্রাণে॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবন গভীরে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, তাঁর অভিনব জীবন-দর্শনে লাহাবাবুর এই অতিথিশালার প্রভাবের একটা বিশেষ অংশ ছিল। তিনি বাল্যকালে এখানে বিভিন্নপন্থী বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্ত ও সাধক-গণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, বহু জনকে বহু বিভিন্ন পথ অবলম্বনে ভগবানকে আরাধনা করতে দেখেছিলেন। (ক্রমশঃ)

'তুমি বিগ্রহ আর আমি তব পায়ে ফুল'

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

তুমি বিগ্রহ আর
আমি তব পায়ে ফুল,
জীবনসায়রে ভাসিতে ভাসিতে
এইখানে পাই কূল।
জনমে জনমে তোমার দেউলে
কতরূপে গেনু পূজাবেদীমূলে
আবার সেথায় লভিয়াছি ঠাঁই—
একি মিছে, একি ভুল?
তুমি বিগ্রহ আর
আমি তব পায়ে ফুল।

আমার মনের যত নিবেদন
বাঁধা হয়ে এক সুরে
কবিতা হইয়া ফুটিয়া উঠে যে
সকল জীবন জুড়ে।
চিরজনমের ভাব-পারাবার তুমি,
সকল মনের ভাবের ধারার নিত্য মিলন-ভূমি।
যুগে যুগে তাই যত গান গায়
মরমিয়া বুলবুল
মূল কথা তার: তুমি বিগ্রহ আর
আমি তব পায়ে ফুল।

উপনিষদের কথা

ডক্টর অণিমা সেনগুপ্তা

সাধারণতঃ উপনিষদ্ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, এই গ্রন্থগুলি কেবল জীব, জগৎ, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক বিচার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আমরা মনে করি কেবল মোক্ষশাস্ত্র-সংগঠনেই উপনিষদ্ সহায়ক; মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপনিষদের বাণী কোন কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না! সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু, এবং বিশ্বের সকল বস্তু তাঁরই অভিব্যক্তি—এ তো হ'ল সাংসারিক-জীবনবিমুখ নিছক ধর্মকথা! এই বাণীর ব্যবহারিক সার্থকতা কতটুক্! এরূপ দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও উপনিষদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হ'য়ে থাকে। এ অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। সেজন্য, উপনিষদের গভীর ভাবধারায় অবগাহন ক'রে এবং উপনিষদের প্রকৃত ভাবামৃত মন্থন ক'রে জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধনের ব্রত আজও আমাদের দেশে অসমাপ্ত রয়েছে। সাধারণ শিক্ষিতের দৃষ্টিতে উপনিষদের সম্পর্ক কেবল সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গে, ত্যাগীর জীবনের সঙ্গে। মানবকে তার গার্হস্থ্য জীবনে বা ব্যবহারিক জীবনে যোগক্ষেমলাভে উপনিষদ্ কোনরূপ সহায়তা করতে পারে না বলেই সাধারণের বিশ্বাস। উপনিষদের গভীরতায় যে অল্পসংখ্যক ঋষিতুল্য মনীষী ডুব দিতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের দৃষ্টির রূপায়ণ হয়েছে কিন্তু একেবারে ভিন্নভাবে। তাঁদের দৃষ্টিতে উপনিষদে নিহিত আছে সত্যকার জীবন-সমস্যার বাণী এবং তার সুন্দর সমাধান। মানবকে মনুষ্যত্বলাভের পথে পরিচালিত করতে এবং জগতের আনন্দ ও শান্তি বিশুদ্ধভাবে ভোগ ক'রে, তা থেকে একটা দিব্য তেজ সঞ্চয় করতে, বর্তমান জগতে একমাত্র উপনিষদই সহায়ক হ'তে পারে।

আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তি সহজাত বলেই মানবের আত্মপ্রসারের পথে তা প্রবল ও প্রধান অন্তরায়। সেজন্য, আত্মকেন্দ্রিকতায় যে সুখ নাই, সুখ আছে আত্মত্যাগে—উপনিষদের এই গভীর তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনই সর্বাপেক্ষা লাভবান হবে। আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি কেবল নিজের দেহ-মনকে আশ্রয় ক'রে জেগে ওঠে এবং তাতেই সীমিত হয়ে যায়। ফলে, মানুষ হয় স্বার্থপর এবং স্ব-ভোগলালসায় উন্মত্ত। এই উন্মত্ততা যেমন পারিবারিক জীবনে ধ্বংসের বীজ বপন করে, তেমনি জাতীয় জীবনকেও সর্বনাশা পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যোগক্ষেম এক নিমিষে তলিয়ে যায় কোন্ অন্ধকার অতল গভীরতায়!

কিন্তু একটা মহৎ আবেগে যদি আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জীবনটা গোড়াসুদ্ধ নড়ে উঠতে পারে,—যদি আমরা এই জীবনটাকে পরাভূত করতে পারি,—তাহ'লেই দেখতে পাই আমি আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থেকে অনেক বড়, এদের তুচ্ছ বন্ধন থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, আমার আনন্দ সবার আনন্দে মিশে আছে, আমার আত্মবিসর্জনই আমার আত্মপ্রাপ্তি।

এই মহৎ আবেগটি প্রতি মানবের অন্তরে সঞ্চারিত ক'রে দেবার জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে:

"ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ ধনম্।"

অর্থাৎ, হে মানব, পরম চৈতন্যের দ্বারা এই চলমান জগতের সমস্ত সম্পদ উদ্ভাসিত হয়েছে বলে অনুভব করতে চেষ্টা করো। তাহ'লেই তোমার ভোগ হবে ত্যাগবিদ্ধ। যে ধন অন্যের, তার প্রতি লোলুপ হ'য়ো না। গৃধ্নুতা সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ কর।

এক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজিত। সকলেই ঈশ। সকলেই এক এবং অভিন্ন। সুতরাং আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র মানবমাত্র নই। আমি সকল জগতের। সকলের সুখভোগ আমারই পরম ভোগ, আমারই পরম আনন্দ।

বাস্তবিকপক্ষে জগতে শান্তি ও সুখ রক্ষা ক'রে কর্ম করতে হ'লে পরকল্যাণের মধ্যেই স্ব-কল্যাণের অনুসন্ধান করতে হবে। তাহ'লেই হিংসা, লোলুপতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি নিম্নগামী প্রবৃত্তির প্রভাব হ'তে ব্যবহারিক জীবনটাকেও মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। জীবনের সর্বস্তরে আসক্তি ও লোলুপতা বর্জনের জন্য উপনিষদের ঋষি বার বার মানবকে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বান শাশ্বত জীবনের আহ্বান; সর্বকালে সর্বদেশে মানবকে সুস্থ, সবল ও মহান্ হবার সাধনায় দীক্ষিত করার আহ্বান। এই আহ্বান নিমৃত্যু ও বিশুদ্ধ।

সমস্ত জগৎ ও জীবন আবিষ্ট ক'রে আছে অন্তর্যামী পরম চৈতন্য, যাঁর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু।

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।"
"কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ।"

এই বিরাট বিস্ফারিত চৈতন্য একদিকে বিশ্বাতীত, অন্যদিকে বিশ্বানুগ। একদিকে তিনি "নেতি", অন্যদিকে তিনি "ইতি"। তিনি অরূপ হ'য়েও "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" বস্তু-বিশ্ব তাঁরই প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত। উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে তাঁদের বাণী সর্বাধিক ধ্বনিত হলেও সর্বসাধারণের জন্য জগৎ-প্রত্যাখ্যানের বাণী ধ্বনিত হয় নাই, বরং জগৎভোগকে সুন্দর, সুসমঞ্জস ও শুদ্ধ করে তুলে অমৃতলাভের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার মহৎ ব্রতে উপনিষদ্ আমাদের দীক্ষিত করে। অখণ্ড চৈতন্যে পৌঁছাতে হ'লে যেমন জাগতিক পদার্থকে 'নেতি, নেতি' ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়, তেমনি উপলব্ধির পরম মুহূর্তে আবার জগতের সকল পদার্থ তাঁরই অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশমান হয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"—তিনিই যে বিশ্ব হ'য়ে রয়েছেন। বিশ্বকে তবে প্রত্যাখ্যান করা যায় কেমন করে? পরম চৈতন্য আত্মস্বরূপ, আবার বিশ্বরূপও। তিনি বিশ্বের অন্তরে আবার বিশ্বের বাইরেও। সুতরাং বিশ্বকে তুচ্ছ করলে, তাঁকেই তুচ্ছ করা হবে। উপনিষদের ঋষি জগৎকে ত্যাগ করতে বলেন নাই, বলেছেন জগতের প্রতি যে আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সংসারী মানুষ দুঃখগ্রস্ত হচ্ছে, সেই অজ্ঞানলব্ধ অশুদ্ধ দৃষ্টিটিকে ত্যাগ করতে। আসক্তির আবরণ মানবকে ক্ষুদ্র করেছে, সংসারকে কণ্টকাকীর্ণ করেছে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে সীমিত করেছে, পীড়িত করেছে, ক্লেদাক্ত করেছে।

আসক্তির প্রভাবে প্রত্যেকে মনে করে জগৎ কেবল তারই ভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য জগৎকে চূড়ান্তভাবে ভোগ করা, জীবনধারণ কেবল ভোগের জন্য এবং জ্ঞানের, কর্মের সার্থকতাও

কেবল ভোগের সহায়করূপে। মানুষ যখন স্ব-ভোগ-কামনা ভিন্ন জগৎ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তাই করতে পারে না, তখনই তাকে জগতে দুঃখভোগ করতে হয়।

ভোগে আসক্তি বা স্বার্থপরতাই দুঃখের কারণ, জগৎ দুঃখের কারণ নয়। আসক্তি-জনিত দৃষ্টি এবং আসক্তিজনিত প্রেমই জাগতিক জীবনে দুঃখ বহন ক'রে আনে। জগৎ দুঃখরূপ নয়; দুঃখের বীজ রয়েছে আমাদের আসক্তিপূর্ণ অবিশুদ্ধ চিত্তে। চিত্তনদী "বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায় চ।" কল্যাণের পথে, মহৎ আবেগের পথে যদি মনকে পরিচালনা করা যায়, তবে চারদিক মধুময় হ'য়ে ওঠে। 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' তাই উপনিষদের বাণী:

লোলুপতা ত্যাগ কর, শুদ্ধ চিত্ত নিয়ে যথার্থ আনন্দ উপভোগ কর। চির জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিতে অন্তর পূর্ণ কর; সকল কালো নিঃশেষে মুছে ফেলে আলো হ'য়ে আপনাকে প্রকাশ কর।

"আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি; কতম আত্মেতি; যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।"

জ্যোতিতে অবগাহন করছে সমস্ত বিশ্ব-সংসার। এখানে অভাবজনিত বেদনা বা বিক্ষোভের স্থান কোথায়?

"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

দৃষ্টি, কর্ম ও ভোগকে জ্যোতিঃসিক্ত ক'রে শুদ্ধ করতে হবে। আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থ-পরতার স্থূল আবরণটি ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে। যখনই মনুষ্য স্বার্থের দাস হ'য়ে সংসারে কর্ম করে, তখনই তাকে প্রতি পদক্ষেপে কেবল দুঃখ ও দুর্দশা ভোগ করতে হয়। স্বার্থপর মনুষ্য কেবল নিজের জীবনেই দুঃখ ভোগ করে না, অন্যের জীবনেও দুঃখের দাবদাহ জ্বালিয়ে দেয়। এরূপ মনুষ্যের হৃদয়ে কেবল স্বার্থহানির ভয়ই জেগে থাকে না, সেই সঙ্গে অন্যকে বঞ্চিত করার দুর্বুদ্ধি, অন্যের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কলহভাবনার দ্বারাও তার চিত্ত সর্বদাই পীড়িত হ'তে থাকে।

আত্মকেন্দ্রিক প্রেমও মনুষ্যজীবনে কেবল দুঃখের শিখাই জ্বালিয়ে রাখে। যে ভালবাসা কেবল স্বার্থপর সম্ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই কামনা জর্জরিত ভালবাসার পরিণতি হয় ঘৃণা, ঈর্ষা ও হতাশায়। কিন্তু ভালবাসা যেখানে অনাসক্ত, সেখানে কেবল অনাবিল আনন্দই উৎসারিত হয়।

জগতের সর্বপ্রকার ভোগে ও কর্মে উদার অনাসক্ত দৃষ্টির স্বার্থকতাই ঘোষিত হয়েছে উপনিষদের মন্ত্রে। সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত ক'রে আপনাকে দেবত্বে উন্নীত করার সাধনা এবং শুদ্ধ দৃষ্টির প্রসন্নতা দ্বারা আপন কর্ম ও ভোগকে অনাসক্তিতে রূপান্তরিত করার সাধনাই হ'ল উপনিষদ্‌ বর্ণিত পুরুষার্থ। শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ কর্ম, শুদ্ধ প্রেম যেমন অধ্যাত্মিক জীবনে মুক্তির সাধন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও সমৃদ্ধি-প্রাপ্তির সহায়ক। মানব যখন লোভ ও স্বার্থপরতাকে সংযম দ্বারা অতিক্রম করে, তখনই ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, প্রেম ও মৈত্রী তার জীবনে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের গৌরব বহন ক'রে আনে। বর্তমান জগতের ভোগলোলুপতা এবং তার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল দেখে এ কথাই বার বার মনে হচ্ছে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ তৃষ্ণাতর্পণের নীতির আমূল পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। উপনিষদ্-বর্ণিত তৃষ্ণাক্ষয়ের সাধনা যদি আজ আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরও সাধনা হ'য়ে না ওঠে, তবে প্রলয়ঙ্কর সর্বনাশকে রোধ করা আর কোন প্রকারেই সম্ভবপর হবে না। আমরা যেন পরমচৈতন্যের অমৃতজ্যোতির ভাবনা দ্বারা তৃষ্ণা- ও আত্মকেন্দ্রিকতা-নাশের তপস্যায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হ'তে পারি—বর্তমান যুগে উপনিষদের এই হ'ল প্রকৃত অনুশাসন।

ভারতের নব জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের দান

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার

নিবেদিতা তাঁর সুন্দর বই 'The Web of Indian Life'-এর মধ্যে বলেছেন যে, fundamental rights নিয়ে মানুষ ঝগড়া করে, franchise এর কথা মানুষ বলে, কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষ বলছে যে, মানুষের fundamental right—মৌলিক অধিকার হলো ত্যাগ করতে পারা—to renounce the world—জগৎকে ত্যাগ করতে পারা। মানুষের কল্যাণের জন্য বহুজনহিতায়—বহুজনসুখায়—নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতে পারা যায়, একথা ভারতবর্ষ প্রথম বলেছে। একথা বুদ্ধ বলেছেন, বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। সেজন্য নিবেদিতা বলেছেন এই যে আমাদের fundamental right বা মৌলিক অধিকার সেটা ভোগের নয়—ভোট দেওয়ার কথা নয়—ত্যাগ করতে পারা। আমি যদি ত্যাগ করতে চাই তুমি আমাকে বাধা দেওয়ার কেউ নও। কিন্তু সে ত্যাগ করছি কেন? আমি আমার ক্ষুদ্র 'আমি'কে ত্যাগ করছি—যাতে করে পারা আমি, বৃহৎ আমি সমস্ত পৃথিবীর সকল আমির মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে।

স্বামীজী এই প্রথম সূত্র দিলেন যে, তুমি নিজেকে বিশ্বাস করো, নিজের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনো। একবার একজন রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক স্বামীজীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার ইচ্ছে করে আমি ব্রহ্মচর্য নিই, সন্ন্যাস নিই, আমার জগৎ আর ভাল লাগছে না, আমি সাধন-ভজনের পথে এগুতে চাই।' স্বামীজী তার কাঁধ দুটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মিছে কথা বলতে পারবি?' সে তো অবাক! এ কি কথা! স্বামীজী বললেন, 'হাঁ মিছে কথা বলার জন্য যে শক্তি দরকার তোর তো তাও নেই। তুই যা, ব্রহ্মচারী হওয়া চলবে না।' একথার তাৎপর্য কি? কেন স্বামীজী বলেছিলেন ফুটবল খেলার কথা!— "You will understand the Gita, the Upanishads better through your biceps." 'গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেল'—এর মানে এই নয় যে, দোকানে, বাজারে, লাইব্রেরীতে, পুরোহিতদের কাছে গীতা দেখলেই সরিয়ে নিয়ে এসে সেখানে একটি করে ফুটবল রেখে দাও। এর মানে "অধিকতর সবল হলে গীতা আরো ভাল বুঝবে।" স্বামীজী যে মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে অখণ্ড মানুষ, তার দেহ, তার মন, তার বুদ্ধি, তার আত্মা, তার চৈতন্য, তার আনন্দ—এ সমস্ত একেবারে একটা সত্যের মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে। এগুলি আলাদা নয়।

সেজন্য দেহকে বাদ দিয়ে মন নয়, মনকে বাদ দিয়ে প্রাণ নয়, প্রাণকে বাদ দিয়ে চৈতন্য নয়, চৈতন্যকে বাদ দিয়ে আনন্দ নয়। সেইজন্য ফুটবল খেলা মানে হোল দেহকে পুষ্ট করতে হবে, স্নায়ুকে সবল করতে হবে, তবেই মন একাগ্র হবে। মন একাগ্র হলে গীতার আদর্শ ভাল করে বোঝা যাবে। মানুষের এই যে একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড রূপ স্বামীজী দেখলেন তা জগৎকে ত্যাগ করার মধ্যে নয়। মায়াবাদ মানে জগৎ মরীচিকা মিথ্যা মতিভ্রম নয়। মায়াকে স্বামীজী বললেন, 'a statement of

facts'—যা ঘটছে, তারই বিবৃতি। মানুষ অহর্নিশ মরছে, তবু সে নিজেকে অমর ভেবে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, প্ল্যান করে; স্বামীজী বললেন, এইটি মায়া। একই জিনিস ভাল এবং মন্দ দু'রকম ফল সৃষ্টি করতে পারে—এই মায়া। যে আলোতে মুদীর দোকানে মুদী বসে বসে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, সেই আলো দেখে দেখে ডাকাত পাশের বাড়ীতে ডাকাতি করছে—একই আলো। এই ব্যাপারটির নাম হল মায়া।

স্বামীজী মানুষের যে জয়গান গাইলেন, সে মানুষ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। "Christs and Buddhas are but waves of the ocean which I am." 'অয়ং অহং ভোঃ'—এই জয়গান গাইলেন স্বামীজী। সেখানে বললেন, আমিই সব চাইতে বড়, আমার চাইতে বড় কেউ নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই আমিকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে আমিই হলাম আসলে ব্রহ্ম—আমি সচ্চিদানন্দ—নতুবা এত বড় শক্তি আমি পেলাম কোথা থেকে? নতুবা এত বড় ঐশ্বর্য আমাকে দিল কে? নতুবা অঘটন-ঘটন করতে আমি পারলাম কি করে? যদি আমি খর্ব, ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র হতাম তাহলে পারতাম না। তাই তিনি বিদেশে গিয়ে বললেন, It is a sin to call man a sinner. বেদান্ত কখনও পাপের কথা বলেনি, কখনও বলেনি মানুষ পাপী। বেদান্ত বলছে মানুষ অমৃতের সন্তান। এত বড় আশ্বাসের কথা, এত বড় বিশ্বাসের কথা, এত বড় সম্মানের কথা মানুষ আর কোথাও শোনেনি। বিবেকানন্দের কণ্ঠে প্রথম শুনল; তার কাছে জনজাগরণের প্রথম সূত্রটি পেলাম—মানুষই ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্মাস্মি।

কিন্তু স্বামীজী একথা বললেন না যে, এই কথা কেবল বেদান্ত বলেছে—তিনি debating club খুললেন না। ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি বললেন যে, সকল ধর্মই সমান। যেমন জৈনদর্শনে আমরা অনেকান্তবাদের কথা পেয়েছি—স্যাদ্‌বাদের কথা পেয়েছি—ঠিক সেই সত্যটি একটি অপূর্ব উদাহরণের দ্বারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বোঝাচ্ছেন। একটি গাছের উপরে একটি বহুরূপী থাকত, সে কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো কালো, কখনো বেগুনী। যারা সেই বহুরূপীকে দেখেছে—তাদের মধ্যে ঝগড়া হলো। একজন বলল, বহুরূপীর রঙ লাল, একজন বলল হলদে, আর একজন বলল নীল। কিন্তু সেই ঝগড়ার মীমাংসা করতে হবে। মীমাংসা করবার জন্য তারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের কাছে গেল না, টোলের পণ্ডিতের কাছে গেল না, তারা বৈদান্তিকের কাছে গেল না, তারা debating club খুললো না, তারা parliament-এ গেল না, তারা গেল সেই লোকটির কাছে, যে লোকটি চিরকাল ঐ গাছের নীচে বাস করছে, যে লোকটি বহুরূপীটিকে সবাবস্থায় দেখেছে। অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের—প্রত্যক্ষদর্শীর কথার—সাহায্য তারা নিল। তারা গিয়ে বললো, "মশাই, আপনি তো বরাবর এখানে বাস করেন, এ বহুরূপীর রঙটা কি বলুন তো? আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। আমি বলছি হলদে, ঐ লোকটা বলছে লাল, আমার বন্ধু বলছে নীল।" সেই লোকটি, যিনি বরাবর গাছের নীচে থাকেন, যাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়েছে, তিনি বললেন যে তোমরা সকলেই ঠিক বলেছ; বহুরূপীটি কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো হলদে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন, কখনো আবার তার কোন রঙই থাকে না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে "যে রাম, যে কৃষ্ণ,

সেই-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”—একথা বলার পরই বলেছেন, “তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।” যেমন বলা হয়েছিল যে, আমরা যেদিক দিয়ে যাই না কেন—একই সত্যে পৌঁছুবো সে কথার তাৎপর্য এখানে দেখতে পাবেন। যেমন ঠাকুর বলছেন যে ঈশ্বর বেদবিধির পারে; নিজের অনুভূতি সম্বন্ধেও বলেছেন যে, তা বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে। শাস্ত্রের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না; অনুভূতি চাই। আমরা উপনিষদে বারবার পড়েছি পরাবিদ্যা, আর অপরাবিদ্যার কথা। সেখানে অপরাবিদ্যার মধ্যে কিন্তু বেদান্তও রয়েছে—বেদান্ত পরাবিদ্যা নয়। পরাবিদ্যা হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি—আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি। সেই জ্ঞান বা উপলব্ধির জন্য পুঁথির দরকার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জীবনই ছিল একমাত্র পুঁথি। সেই পুঁথি চিরকাল খোলা ছিল; তার অক্ষর কালিতে ছাপা নয়, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে লেখা ছিল। সেই পুঁথি খোলা পুঁথি বলেই আজও সেই পুঁথি পড়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ প্রেরণা পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, শান্তি পাচ্ছে। এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেননি যে, সকল ধর্মের synthesis করতে হবে। আমরা প্রায়ই বলি সর্বধর্মসমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ synthesis-এর কথা বলেননি। কেননা লক্ষ্য করুন তিনি বলেননি যে, বহুরূপীর সব রঙগুলো মিশিয়ে নতুন রঙ হলো। তিনি বলছেন, বহুরূপীর প্রত্যেকটা রঙই সত্যি। কখনও বা তার কোনও রঙই নেই, এও সত্যি। অর্থাৎ তিনি সগুণও, নির্গুণও এবং সগুণ-নির্গুণের পারেও। আসল কথা হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান; যে কথা উপনিষদ্ আমাদের বলছেন, ‘বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।’ খবরের কাগজে পড়েছি বলছেন না, ইতিহাসে দেখেছি তাও বলছেন না, ‘বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্’—সেই মহান্ পুরুষকে আমি দেখেছি, আমি জেনেছি। আমি পরের মুখে শুনেছি?—না, খবরের কাগজে পড়েছি?—না; thesis-এ পেয়েছি? —না, তাও নয়—আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি—যিনি অন্ধকারের পরপারে আছেন। আদিত্যবর্ণ কেন? সূর্য যেমন স্বয়ম্প্রকাশ—তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন, অপর সকলকেও প্রকাশিত করেন। সূর্যকে দেখাবার জন্য আমরা প্রদীপ জ্বালি না, টর্চলাইট ধরি না, নিজের আলোকে সূর্য প্রকাশিত। ভগবানও ঠিক সেই রকম। এই কথাই স্বামীজী বলতে চাইলেন। তিনি কোন্ ধর্ম বড়, কোন্ ধর্ম ছোট, এই বিতর্কে গেলেন না; বললেন, সকল ধর্ম সমান, শুধু তাই নয়, বললেন, “I would rather welcome as many religions as there are human beings.”—যত মানুষ আছে, তত রকমের ধর্ম হোক, আমি বরং তাই-ই চাই। কেন? কারণ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যই হল—unity in diversity. আমি ‘বহুর’ মধ্যে যখন ‘একের’ সন্ধান পেয়েছি তখন আমি কিছুতে বিচলিত হব না। ‘এক’কে ধরেছি আমি। বহু বিচিত্র রূপে যদি বিচ্ছুরিত হয় সেই এক, বহুভাবে প্রকাশিত হয়, কোন আপত্তি নেই। এক যদি তার মূলে থাকে, তবেই বহু একের মধ্যে বিধৃত। সেই একক আমি বুদ্ধির দ্বারা পাবো না। অনুভূতির দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সেবার দ্বারা পাবো। ‘তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।’ সেবা হলো সবচেয়ে বড় কথা। প্রণিপাতের দ্বারা, পরিপ্রশ্নের দ্বারা, জিজ্ঞাসার দ্বারা, সেবা দ্বারা তাঁকে জানো।

দ্বিতীয় স্তরে আসা যাক। যে মানুষের জয়গানের কথা রামমোহন বললেন, যে মানুষের কথা আমরা কংগ্রেসের মধ্যে শুনলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে শুনলাম, তারই কথা কিভাবে বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ! যে বছর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন, ১৮৯৭ সাল, ঠিক সেই বছর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের যে constitution, সংবিধান, রচিত হল, তার মধ্যে বলছেন যে, আমাদের ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন দাঁড়িয়ে আছে।

উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে, ব্যবহারিক উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক উজ্জীবন দুইয়ের মধ্যে যতক্ষণ সমন্বয় না হচ্ছে ততক্ষণ আমার জীবন কিছুতেই সমৃদ্ধ হচ্ছে না। নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয়—উভয়েরই প্রয়োজন। আমাকে যদি ত্যাগ করতে হয় তবে ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'নদীতে জল আছে, কিন্তু সেই বহনের দুঃখের দ্বারা তাহাকে আপনার করিতে হইবে।' বলছেন, 'ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করা যায়, ক্ষেত তো উর্বর, কিন্তু কর্ষণের দুঃখের দ্বারা তাহাকে আপনার করিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিচ্ছেন যে, অসীম অনন্ত জল চলে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে যখন তৃষ্ণার্ত লোক জল চায়, তুমি বল না যে, 'যান না মশাই নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আসুন।' তুমি একটি পাত্র করে তাকে জল দাও। অর্থাৎ অনন্ত যে নদী চলে যাচ্ছে, অসীম যে নদী তাকে সীমিত করে একটি ঘটিতে বা একটি বাটিতে করে তাকে জল দাও। সেইজন্য অসীম আমাদের কাছে সীমিত হবেই। যতক্ষণ আমরা সীমার মধ্যে রয়েছি, ততক্ষণ তিনি সীমার মধ্যে প্রকাশিত না হলে তাঁকে আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করে যখন তাঁকে দেখব তখন আনন্দের আর পরিসীমা থাকবে না। সেই জীবনকে যখন পেতে হবে তখন এই ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়ে পেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ একথা তো বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে একটি বড় কথা তিনি বলেছেন, যা আজকে আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। তিনি বলেছেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেশমাতৃকাই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন। এই কয় বৎসর অন্যান্য দেবতাদের ভুলিয়া থাকিলেও ক্ষতি নাই।"

"তোমার সামনে একমাত্র দেবতা তোমার স্বজাতি। সর্বত্র তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার পদযুগল প্রসারিত। তিনি সব কিছু ব্যাপিয়া আছেন"—এ অপরূপ উক্তি! যে বছর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সে বছর তিনি কেন বললেন আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তোমার একমাত্র আরাধ্য-দেবতা জননী জন্মভূমি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী একথা বলেছেন; তার সঙ্গে ৫০ বৎসর যোগ করুন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, ঠিক ৫০ বৎসর পরে ভারত স্বাধীন হল। স্বামীজী ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই ৫০ বৎসর ধরে আমাদের সাধনা করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে, যাতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি আসে। কেন তিনি বলেছিলেন, "গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও নরক?" কেন তিনি বলেছিলেন, "Freedom is the condition of growth?" কেন তিনি বলেছিলেন, "Freedom is the song of the soul?" এর বেশী কিছু বলেননি। যা বলেছেন তাতেই স্পষ্ট যে,

বাইরের বন্ধন থেকে মুক্ত না হতে পারলে জাতির চিন্তার মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি, সর্বাঙ্গীণ মুক্তি হয় না। এই জাগরণের দ্বিতীয় সূত্র।

মানুষের মর্যাদা দিতে পারা যায় তখনই যখন সেই মানুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। একথা রামমোহন পূর্বে ইঙ্গিতে বলেছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ পরে গান গেয়ে স্বদেশীযুগে বলেছিলেন, তাঁর স্যার উপাধি পরিত্যাগ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, হিজলী ডিটেনসন্ ক্যাম্প-এর অত্যাচারের প্রতিবাদে বলেছিলেন ; কিন্তু একথা স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে বলে গেছেন, সেভাবে আর কেউ বলেননি। সে সূত্র অনুসরণ করেছিলেন নিবেদিতা। সেজন্য তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন যে, the queen of his adoration was his motherland. স্বামীজীর আরাধনার সম্রাজ্ঞী ছিলেন এই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা জানেন, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের কথা। সেই মারাঠী ব্রাহ্মণ 'দেশের কথা' নামক একটি বই লিখেছিলেন, যে-বই ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে দেন। পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর একদিন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনার কাছে বেদান্তের শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি।" প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী নানারকম কথাবার্তা হল। সখারাম গণেশ দেউস্কর ফিরে গেলেন। যাবার সময় আক্ষেপ ক'রে বললেন, "স্বামীজী, আপনার কাছে আমি বেদান্ত শিখতে এসেছিলাম। কিন্তু সারাক্ষণ আপনি কী বললেন ? আপনি ভারতবর্ষের দুর্গতির কথা বললেন, ভারতবাসী কী ক'রে উজ্জীবন লাভ করতে পারে তাই বললেন, তার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবনতির কথা বললেন, তার অজ্ঞান, অশিক্ষা, কুসংস্কারের কথা বললেন। কিন্তু একবারও তো বেদান্তের কথা বললেন না, ধর্মের কথা বললেন না!" স্বামীজীর চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল, দৃপ্তকণ্ঠে স্বামীজী বললেন, "একটি কুকুর যতক্ষণ আমার দেশে অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ সে কুকুরকে আহার্য প্রদান করা আমার একমাত্র ধর্ম—আর সব অধর্ম।"

আবার স্বামীজী ধর্মের এক অপূর্ব ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন: ধর্ম বলতে আমি fearlessness বুঝি। আমি পুঁথি বুঝি না, কোন অনুষ্ঠান বুঝি না; আমি বুঝি—মানুষের ভেতরে যে অখণ্ড সত্তা আছে, যে মহিমা লুকিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করতে হবে। যখন মানুষ বুঝতে পারবে তার ভেতরে অনন্ত শক্তি আছে, তখনই তার ধর্ম আছে। ধর্মকে তাই স্বামীজী নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন : 'মানুষ যেমন একমুহূর্তকাল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে না, তেমনি ধর্মকে বাদ দিয়ে সে একমুহূর্ত থাকতে পারে না—ধর্ম রবিবারের গীর্জায় যাওয়া নয়, মসজিদে বিশেষ দিনে যাওয়া নয়, মন্দিরে বিশেষ তিথিতে প্রার্থনা করা নয়—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্ম আমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। মানুষের ধর্ম বলতে আমি বুঝছি মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। সেই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আমাদের বিচ্যুতি ঘটেছে—কেন ঘটেছে তা আমরা জানি না, তাতে আবার ফিরে যাওয়ার নাম ধর্ম। স্বামীজী বলেছেন : তোমরা কখনও ভেবেছ যে, হিমালয় থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছেন, তার সে স্রোতকে, গঙ্গার গতিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ হিমালয় থেকে প্রবাহিত যে গঙ্গা তাকে

উল্টো ক'রে দেওয়া যাবে? সেই গঙ্গাকে আসমুদ্র প্রবাহিত ক'রে হিমালয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায়? অসম্ভব। ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের ধারায় সবকিছু প্রবাহিত হচ্ছে—তার রাজনীতি বলুন, শিক্ষানীতি বলুন, সমাজনীতি বলুন সব ধর্মকে কেন্দ্র করে। সেইজন্য তাকে অন্যপথে ফেরানো যাবে না। তাই স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি: Deluge the country with spiritual ideals before all else—সবকিছু করবার আগে দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের একটা প্লাবন বইয়ে দাও। প্লাবন কথা ব্যবহার করলেন কেন? প্লাবন যখন আসে তখন যা কিছু মালিন্যময়, যা কুৎসিত, যা ভঙ্গুর, যা ক্ষয়িষ্ণু তাকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং সেই জিনিসকে সে রেখে যায় যা দৃঢ়, যা শাশ্বত, সনাতন, স্থায়ী। প্লাবন তাকে নষ্ট করতে পারে না। বিরাট বটবৃক্ষকে সে রাখে--বিরাট একটি বাড়ীকে সে নষ্ট করতে পারে না, কিন্তু কুটীরকে সে ফেলে দেয়—সেইজন্য স্বামীজী প্লাবনের কথা বললেন। জীবনে যা ভঙ্গুর, যা ক্ষয়িষ্ণু, তাই আধ্যাত্মিক প্লাবনে শেষ ক'রে দিক। কিন্তু জীবনে যা শাশ্বত, সুন্দর, সনাতন তাকে ভালো ক'রে দিক, তাকে রাখুক। এখানে আমাদের সংশয় জাগতে পারে—স্বামীজী কোন্ জিনিসটা আগে চেয়েছিলেন? আগে ধর্ম, না আগে ব্যবহারিক অভ্যুদয়? এই জাগরণের মধ্যে কেন, আমেরিকায় যখন গিয়েছেন, বিদেশে যখন গিয়েছেন, বারবার বলেছেন ভারতবর্ষের এখন প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে অভ্যুদয়—সমৃদ্ধি। তাকে শিল্পে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে উন্নত হতে হবে। জামশেদজী টাটাকে স্বামীজী অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে, এমন একটি শিল্পের ব্যবস্থা করা যায় না যে আমাদের বেকার পুরুষেরা কিছু শিখতে পারে—জাপান থেকে কিছু শিখিয়ে আনা যেতে পারে? স্বামীজী শিল্পোন্নয়নের কথা বলেছিলেন। তিনি প্রথম বলেছিলেন, আমি বেদান্তের সহিত বিজ্ঞানের মিলন চাই—উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই। একথা বলেছিলেন যে, আমি ইসলামের দেহ (সংহতি) এবং বেদান্তের মস্তিষ্ক চাই, বুদ্ধের হৃদয় ও সংঘশক্তি চাই—মানুষকে তিনি অখণ্ড-রূপে দেখেছিলেন। মানুষের জয়গান গাইতে গিয়ে কোন কিছুকে তিনি বর্জন করেননি। তাই বলেছিলেন: 'Not rejection but assimilation, এইটি হচ্ছে আমার মন্ত্র। Not toleration but acceptance is my creed. এতকাল আমরা বলেছি 'পরমত-সহিষ্ণুতা'। স্বামীজী বলেছেন: Tolerance অত্যন্ত ছেঁদো কথা, বাজে কথা। Toleration মানে হচ্ছে যেন অনুকম্পা করা আর কি! কিন্তু না, not toleration but acceptance is my creed. আমার যে জগৎ, আমার যে world view, আমার যে বিরাট পটভূমিকা তাতে আমি সকলকে আহ্বান করছি, নাস্তিককেও আহ্বান করছি। নাস্তিক কেন? কারণ, যে যথার্থ নাস্তিক তার তো আত্মবিশ্বাস আছে। সে জোর গলায় বলতে পারছে যে, ঈশ্বরকে দেখিনি, তাই মানি না। আমিও তো একসময় বলেছিলাম—I would rather welcome an atheist than a religious man, who believes in thousand and one deities without understanding what religion means. এই স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজকে যে প্রশ্নটা জেগেছে সেটি বলেই আমার কথা আমি শেষ করব। অনেকের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, এমনকি বহু গ্রন্থও

এই বিষয়ে লেখা হয়েছে যে, স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদ একটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা—আসলে তিনি একজন সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি বলেছেন: I am a socialist, not because socialism is a perfect system, but half a loaf is better than nothing. কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে, স্বামীজীর socialism মার্কসীয় socialism নয়—উপরতলার মানুষকে—ঘৃণা সেখানে প্রধান কথা নয়, সেখানে আসল কথা প্রেমের কথা। সেখানে সংঘাত এবং সংঘর্ষ প্রাণবিন্দু নয়, সেখানে co-operation, সমন্বয়ের কথা—যে সমন্বয়ের স্বপ্ন রামমোহন দেখেছিলেন, স্বামীজী ঠিক সেই কথা বলেছিলেন—give and take। একটা জাতি একটা জাতির সঙ্গে লেনদেন করবে, বিনিময় করবে, তবে তো বড় হবে। সংঘাত নয়, সংঘর্ষ নয়, have and have-nots-এর মধ্যে সংঘাত নয়, ধর্মঘট নয়, রক্তাক্ত বিপ্লব নয়, প্রেমের মধ্য দিয়ে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে, বৈদান্তিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে—যে বৈদান্তিক ঐক্য বলছে মানুষ, পশুপক্ষী এবং কীটপতঙ্গের মধ্যে একই ব্রহ্ম, একই সচ্চিদানন্দ, একই চৈতন্য প্রবাহিত—সেদিক থেকে বলেছেন—not because soclialism is a perfect system but half a loaf is better than nothing. কিন্তু স্বামীজীর যে socialism বা সমাজতন্ত্রবাদ সেটা বৈদান্তিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একথা ভুললে চলবে না—কেননা যেখানেই বলেছেন I am a socialist, পরের বাক্যেই বলেছেন—every man is potentially divine, man is potentially divine এই কথাটি গানের ধুয়ার মতো বারবার ফিরে ফিরে আসছে। কখনও এই গানের ধুয়া স্বামীজী ত্যাগ করেননি। যখন সেখানে বলেছেন তখনই গানের ধুয়ার মতো বার বার ফিরে এসেছে, man is potentially divine. সেই ভেতরকার যে মানুষ 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তাকে জানবার কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন। America-য় গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, তোমরা আমাদের দেশে মিশনারী পাঠিয়ো না—it is a mockery to teach a starving nation religion and ethics. বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু আবার দেশে ফিরে বলেছেন: Deluge the country with spiritual ideals before all else. এর মানে কি? কোন্‌টা আগে হবে? আগে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করব, তারপর ধর্ম—না আগে ধর্ম অনুসরণ করব, তারপর দেশকে সমৃদ্ধিশালী করব? একটি ছোট উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে—পাহাড়ের উপর থেকে জলপ্রপাত পড়ছে—জল পড়ছে—ঝর্ণার জল—আপনি সমতল ভূমিতে হাঁটছেন—আপনি জলকে প্রথম দেখবেন সমতল ভূমিতে, আস্তে পাহাড় বেয়ে বেয়ে উপরে চলে যান, তারপর দেখবেন পাহাড়ের চূড়ায়। আপনার দেখার যে ক্রম বা order of knowledge-এ জলকে প্রথমে দেখবেন সমতলে, তারপর পাহাড়ের চূড়ায়। কিন্তু সত্যি কি? সত্যি হ'ল জল আগে পাহাড়ের চূড়ায়, তারপর এসে সমতলে নামছে। ঠিক সেইরকম ধর্ম তো কোন অনুষ্ঠান নয়, আচার নয়, ধর্ম মোক্ষ ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য সব এক কথা—অভিন্ন, কাজেই ধর্ম আগে, পাহাড়ের চূড়ায়—সেখান থেকেই তো সমৃদ্ধি আসবে, তাকে কেন্দ্র না করলে সমৃদ্ধি চিরস্থায়ী হ'তে পারে না, কিন্তু জানবায় বেলায় সমৃদ্ধির ভেতর দিয়ে—অভ্যুদয়ের ভেতর দিয়ে নিঃশ্রেয়সে যেতে হচ্ছে, তাই স্বামীজী ধর্ম এবং সমৃদ্ধিকে পাশাপাশি রেখেছেন। কেন? না, ধর্ম শক্তি দেবে

আমাকে। আমি যদি ধর্মের বর্ম বুকে না রাখলাম, তাহলে দেশের উন্নতি করব কি করে? পিছিয়ে পড়বো তো? আঘাত সংঘাত আসবে, বারবার হেরে যাব, পিছিয়ে পড়ব, ভয়ে পিছিয়ে যাব—অত্যাচার হবে, অবিচার হবে, দুর্জন লোক আমার অপমান করবে, যশ অপহরণ করবে—আমি পিছিয়ে যাব, কিন্তু যদি ধর্মের বর্মকে বুকে বাঁধি তাহলে দেশসেবার কাজে জীবনকে আমি বিসর্জন দিতে পারব- পিছিয়ে যাব না, সেজন্য স্বামীজীর যে world view, তাঁর যে জীবন-তত্ত্ব তার মধ্যে দেশসেবা ও ধর্ম, অদ্বৈতবাদ ও দেশপ্রেম অভিন্নতা লাভ করেছে। এটি না বুঝলে স্বামীজীকে একেবারেই বোঝা হবে না। তিনি বলেছেন: আমার নতুন ভারত বেরুক ঐ ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, মুদীর দোকানের ভেতর থেকে—পাহাড়, পর্বত, ঝোপ, জঙ্গল ভেদ করে—ঠিকই বলেছেন একথা। তোমরা উচ্চবর্ণের পুরুষেরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাও। তোমাদের যে সামনে দেখছি মনে হচ্ছে যেন অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন দেখছি—মনে হচ্ছে যেন ঠাকুরমার মুখের রূপকথা শুনছি—তোমরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাও—আমার নতুন ভারত বেরুক ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, মুদীর দোকানের ভেতর থেকে, চাষীর লাঙ্গলের বুক ভেদ করে, পাহাড় পর্বত নদী জঙ্গলের ভেতর থেকে। সত্যি কথা, বলেছেন শূদ্ররাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—nobody can resist it. কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন সেই শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত ক'রে নিতে হবে। তাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী করতে হবে। সেই একটি নতুন ভারতের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে ভারতবর্ষ কলুষতামুক্ত—স্বাধীন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ, যে ভারতবর্ষের মধ্যে আনন্দ সত্য এবং ন্যায়ের সামঞ্জস্য ঘটেছে, যে ভারতবর্ষ ব্রহ্মকে, চৈতন্যকে, পরম-পুরুষকে বাদ দিয়ে নয়, তাঁকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। তারই যে রশ্মি চারদিকে বিকীর্ণ তাতে সেই ভারতবর্ষ সমুজ্জ্বল এবং ভাস্বর হয়ে উঠবে। সেই ভারতবর্ষেরই স্বপ্ন দেখেছেন স্বামীজী। তাকে সার্থক করতে হ'লে আজকে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে স্বামীজী যে পতাকা আমাদের দিয়েছেন সেই পতাকা বহন করা; সেই পতাকায় তিনি বলেছেন not dissension, but harmony, not hatred but love, ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, জয় করতে হবে—ঘৃণাকে প্রেমের দ্বারা জয় করতে হ'বে—সেই প্রেম এবং ভালবাসার যে পতাকা তিনি দিয়েছিলেন সেই পতাকা আমাদের হাতে তুলে নিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হ'লে জীবন-পণ করতে হবে।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রিক চেতনা

ডক্টর যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জড়বাদ যখন জীবনের সর্বস্ব—অতিলৌকিক বিশ্বাস যখন প্রতীচ্যের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত, যন্ত্র যখন জীবনের মানদণ্ড—তখন উদাত্ত কণ্ঠে উৎসারিত সঞ্জীবনী সুধার প্রয়োজন হয়েছিল—যে কণ্ঠ বার বার বিঘোষিত করেছিল সেই সনাতন তত্ত্ব—"ঈশ্বর সত্য", "অলৌকিক বা অতিলৌকিক সত্যই সে সত্য ও অনুভূতি-সাপেক্ষ।" উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন হয়েছিল ভারতাত্মার এই বাণীকে সঞ্জীবিত করার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশের নেতারা সেদিন সূচনা করেছিলেন একটা ধর্মসংস্কার-আন্দোলন, যার ফলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মসমাজ', পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে 'আর্য-সমাজ', বম্বের প্রার্থনা-সমাজ ও দক্ষিণের 'Theosophical Society' হ'ল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই আন্দোলনটির শ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা-স্থাপনা। এই পরিবেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ রাষ্ট্রীয়তার একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে, যা সমগ্র দেশে সৃষ্টি করলো একটা নব জাগরণ। স্বামীজীর ভাবধারা সেদিন জাতীয় জীবনে যুগিয়েছিল গভীর প্রেরণা। Roman Rolland (রমাঁ রলাঁ) বলেছেন, "The Indian Nationalist Movement smouldered for a long time until Vivekananda's breath blew the ashes into flame and erupted violently three years after his death in 1905."[১] স্বামীজীর জীবনী-লেখক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "All the militant nationalist movements culminating in Gandhiji's movement for independence of India, were launched after Swamiji's thundering roar, 'Arise Awake.'"[২] এই সব উক্তির তাৎপর্য-নির্ণয়ে স্বামীজীর রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রচেতনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

স্বামীজীর রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্র-চেতনার আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনীতির লোক বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনও দিনই ছিলেন না। তথাকথিত রাজনীতিতে তিনি ছিলেন না আস্থাশীল। প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর পত্রাবলীতে লেখা কয়েকটি চিঠি। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে তিনি একবার লিখেছিলেন, "আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।"[৩] স্বামীজী নিজে কখনও রাজনৈতিক নেতার আখ্যায় বিভূষিত হ'তে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজকে জাগাতে, মানুষকে বেদের মহামন্ত্র 'অভীঃ' শোনাতে। দৃষ্টির বৈচিত্র্য ছিল

---

১ Roman Rolland—Prophets of New India, P. 497.

২ Dutta, B. N.—Vivekananda—Patriot Prophet, pp 212-13.

৩ পত্রাবলী—১ম ভাগ, পৃঃ ৪১০

স্বামীজীর। আত্মদৃষ্টি ও ভাবীকালের সব সমস্যার সমাধান ছিল তাঁর অবগতিতে। জনজাগরণের প্রচেষ্টা ও জনমানসে প্রেরণা যোগানোর দক্ষতা সমসাময়িক কালের মানুষকে করেছিল চেতনান্বিত। তাই তৎকালীন কোনও মুদ্রিত পুস্তকে স্বামীজী রাজনীতিক আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন জেনে বড়ই মর্মব্যথা পেয়েছিলেন। সেই আহত চিত্তে দৃঢ় মতবাদ তিনি আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে এইভাবে লিখে জানান, "আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে। সেইটে যদি ঠিক হ'য়ে যায়—আর সব ঠিক হয়ে যাবে। এই আমার মত। অতএব তুমি কলকাতার লোকেদের অবশ্য সাবধান করে দেবে যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত না হয়।"[৪] স্বামীজী তথাকথিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন, এই সব পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ স্বামীজী ছিলেন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জাতিকে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য তিনি একটি নতুন সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন, যাকে রাষ্ট্রীয়তার আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। এই সিদ্ধান্তের মূল কথা হ'ল—"ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনের সংগঠন।" স্বামীজীর বাণী ছিল, "ভারতে ধর্ম জাতীয় হৃদয়ের মর্মস্থল। এই ভিত্তির উপর জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত।...রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনে অত্যাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হয় নাই ; কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বলে ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে।"[৫] আর একস্থানে স্বামীজী বলেছেন, "ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।"[৬] স্বামীজীর মতে ধর্ম হ'ল এমন একটা সঞ্জীবনী শক্তি, যা ভারতীয় জাতিকে কর্মজীবনে পরিচালিত করতে পারে। তিনি বলতেন, "প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-প্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য রূপে অবলম্বন করিয় কাজ করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই।"[৭] এইখানেই স্বামীজীর মতে ভারতবাসীর সহিত অন্য জাতির রয়েছে পার্থক্য। তার কারণ অন্য জাতিরা প্রথমে রাজনীতি বোঝে, তারপর ধর্ম, কিন্তু ভারতবাসীরা প্রথমে ধর্ম বোঝে, তারপর রাজনীতি। এই রাজনীতিও ভারতবাসী বুঝতে পারে কেবলমাত্র ধর্মের মাধ্যমে। স্বামীজী বলেছেন যে, বিস্তৃতিই হ'ল জীবনের লক্ষণ, তাই বিভিন্ন জাতি একটা বৈদেশিক নীতি অবলম্বন ক'রে নিজেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। এই নীতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের সহিত বিবাদসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে তারা সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে। ভারতকে কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করলে চলবে না। ভারতের লক্ষ্য হবে আধ্যাত্মিক বিজয়। সাম্রাজ্য-বিস্তারের পরিবর্তে ভারতকে করতে হবে আধ্যাত্মিক

---

৪ পত্রাবলী—১ম ভাগ

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড পৃ: ৯১

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১১

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড

জ্ঞানবিস্তার। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস হ'ল ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি; বেদান্ত বা উপনিষদ হ'ল এদের মধ্যে প্রধান। এই সব ধর্মগ্রন্থের প্রতি স্বামীজীর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি বলতেন যে, এদের মধ্যে রয়েছে অমূল্য সম্পদ। সুতরাং এই সব গ্রন্থের মূল তত্ত্বগুলিকে আমাদের প্রচার করতে হবে দেশ-বিদেশে এবং এই প্রচারকার্যটি হবে ভারতের চিরন্তন বৈদেশিক নীতি। তাঁর পাশ্চাত্যে গমনও ভারতের এই চিরন্তন সনাতন বাণী প্রচারের জন্যই। তিনি নিজেই একস্থানে বলেছেন, "গৌতম বুদ্ধ যেমন প্রাচ্যের জন্য একটা বার্তা এনেছিলেন, আমি তেমনি পাশ্চাত্য দেশের জন্য একটা বার্তা এনেছি।" স্বামীজী এর নাম দিয়েছিলেন 'আধ্যাত্মিক বিজয়-অভিযান'। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবের রূপ দিতে হ'লে ভারতকে কিছু দিতে ও নিতে হবে। অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম অন্য জাতির মধ্যে প্রচার করতে হ'লে তাদের মধ্যে যা ভাল তা ভারতকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে নিজেকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত করা চলবে না। এখানে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্য দেশের ভাবধারাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা নইলে ভারতের উন্নতির পথ কখনও উন্মোচিত হবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার, জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে নাই।"[৮] সুতরাং স্বামীজীর মতে ভারতকে অন্যান্য জাতির সহিত নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ করতে হবে। এখানে থাকবে না শুধু গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ। এখানে হতে হবে সমভাবাপন্ন। এরই দ্বারা বিদেশের সহিত সখ্য স্থাপিত হবার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এই সৃজনী প্রতিভাকে লক্ষ্য করে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রকাশ করেছেন, "বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরকাল সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নয়। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু-রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল"[৯] আমেরিকায় অবস্থানকালীন স্বামীজী এই সত্যটি খুব গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেখানকার কয়েকটি প্রথা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তাই বলে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে কখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধানুকরণ করার বা স্বদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার উপদেশ দেননি। কোনও একসময় জনৈক ইংরেজ বন্ধু স্বামীজীকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন যে, চার বৎসর পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণান্তে স্বদেশকে তাঁহার কেমন লাগিবে। স্বামীজী আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলেছিলেন, "আমি পাশ্চাত্য দেশে আসার আগে ভারতকে ভালবাসতাম। এখন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার কাছে পবিত্র; ভারত আমার কাছে একটা মহাতীর্থ"।[১০] ভগিনী

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা - ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩

৯ স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

নিবেদিতা লিখেছেন, "পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে আমরা হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছিলাম এবং তাহাতে নিখিল মানবের মধ্যে সেই একই আত্মার মহিমা-ঘোষণাই ছিল তাঁহার উপদেশের সারমর্ম, তাঁহার সেই কর্মের অন্তরালে ভারতবর্ষের জন্য কোন ভাবনা বা তাহার হিতসাধনের জন্য কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত না। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহনজ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি, সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।"[১১] স্বদেশকে স্বামীজী কল্পনা করেছেন দেবীরূপে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দেশবাসীকে বলেছিলেন তার পূজা করতে। এ শুধু তাঁর উপদেশ ছিল না—এ ছিল তাঁর মর্মানুভূতি। এই প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে বলেছেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত…। যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।"[১২] এই সব মন্তব্যে স্বামীজীর জাতীয়তাবোধের আদর্শগুলি খুব সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

১১ মোহিতলাল মজুমদার—বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯০

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯

স্বামীজী জানতেন, সমাজের উন্নতি না হ'লে জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয়। কিন্তু এজন্য তিনি সমাজের বহির্দেশের সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হননি, তার "মূলদেশে" অগ্নিসংযোগ করতে চেয়েছিলেন—মানুষের অন্তরকে উন্নত করতে বলেছিলেন। একাজ তিনি করতে চেয়েছেন একেবারে নিম্নস্তর থেকে যেখানে অধিকাংশ নরনারী দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কাল-যাপন করতো। তাদের এ শোচনীয় অবস্থা জাতীয় উন্নতির পথে সৃষ্টি করেছিল প্রধান বাধা। এ ছাড়া জাতিভেদ-প্রথাটিও সমাজের মধ্যে গভীর অসমতা সৃষ্টি ক'রে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের অবস্থা আরও শোচনীয় করে দিয়েছিল। এই কারণে স্বামীজী এই সব প্রথাগুলির বিরুদ্ধে জানান তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু জাতি-বিভাগকে স্বামীজী একেবারে পরিত্যাগ করতে বলেননি। জাতি বিভাগের প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে বলেছেন, জাতি শব্দের অর্থ হ'ল শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলে ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা সৃষ্টির মূলেই রয়েছে।

স্বামীজী জাতি বিভাগ বলতে বুঝতেন শ্রমবিভাগ, অর্থশাস্ত্রে আমরা যাকে বলি 'division of labour' অর্থাৎ যেমন ঋগ্-বৈদিক যুগে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারত এই ভাবটি পরিত্যাগ করে; সমাজসংগঠনে পেশাগত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে বংশানুগত সিদ্ধান্তটি স্থান পায়। এর ফলে সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কালক্রমে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হ'লেন সমাজপতি, তাঁদের অধিকার বৃদ্ধি পেতে লাগলো আর শূদ্রের অবস্থা হ'ল অত্যন্ত শোচনীয়। এই শূদ্র-সম্প্রদায় সমাজে নিকৃষ্ট- ও ঘৃণিত-রূপে পরিগণিত হ'ল। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের ওপর

হ'তে লাগলো বহু নির্যাতন। সে ধর্মও ছিল ছুতমার্গপ্রধান। তাই স্বামীজী বলেছেন, "এখানকার ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই। ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। এখানকার ধর্ম 'বিচার'-মার্গেও নয়, 'জ্ঞান'-মার্গেও নয়, ছুতমার্গে—আমায় ছুঁয়ো না। এই ছুতমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না···এটা হ'ল একটা মানসিক ব্যাধি।"[১৩] বস্তুতঃ স্বামীজী অধিকার ও ভোগ-বৈষম্যকে ধ্বংস করে (জাতিপ্রথাকে নয়) সমাজে আনতে চেয়েছিলেন সমতা। তাঁর মতে সমাজের এক প্রান্তে বসে আছে ব্রাহ্মণ আর এক প্রান্তে চণ্ডাল। সমতা সৃষ্টি করতে হ'লে, এই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করতে হবে। তাই নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করার প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষক আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করে নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।"[১৪]

স্বামীজীর চিন্তাধারার মধ্যে সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত যেন স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি আছে, বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একেই বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের বাহিরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালো। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুতমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হ'তে পারে ব'লে নয়—তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সেই অপমান আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।"[১৫] স্বামীজীর এই ভাবধারা পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীকে যুগিয়েছিল গভীর প্রেরণা। বেলুড় মঠে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, স্বামীজীর সিদ্ধান্তগুলি তাঁর মনে আরও গভীরভাবে দেশপ্রেম জাগায়।

সমাজের অধিকাংশ লোকের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন নিরক্ষরতা দূর করে তাদের মধ্যে একটা চেতনার সৃষ্টি করতে। এই চেতনা সৃষ্টি করার জন্য তিনি উপনিষদের বাণীগুলি তাদের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক চিন্তা জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে। শুধু তাই নয়, সবসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য স্বামীজী একটা নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন। এখানে তিনি গ্রামে কেবল কয়েকটি অবৈতনিক শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা করতে বলেননি। তার কারণ তিনি বলতেন, গ্রামের নিরক্ষর লোকেদের এই সব বিদ্যালয়ে পড়তে আসা কঠিন, সময় পাবে না। তাদের শিক্ষা দিতে হলে তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শিখিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দেরই অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। একটি চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, "দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মানুষের কারখানায় এবং অন্য অবস্থানে পৌঁছুতে হবে।"[১৬] নিরক্ষরতা ছাড়া জাতীয়

১৩ পত্রাবলী, ১ম ভাগ—পৃঃ ৭৩-৭৪.

১৪ পত্রাবলী, ১ম ভাগ—পৃঃ ৩৭২

১৫ স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

১৬ পত্রাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬-৬৭

জীবনের উন্নতির আরও একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল দেশের অধিকাংশ লোকের দারিদ্র্য। স্বামীজী বলতেন যে, দেশের কোটি কোটি লোক যুগ যুগ ধ'রে অনাহারে মরছে এবং আমাদের কর্তব্য হ'ল সর্বাগ্রে তাদের এই দুঃখ দূর করা। তাঁর মতে স্বদেশহিতৈষী হবার প্রথম সোপান হ'ল জনগণের এই দুঃখ আন্তরিকভাবে অনুভব করা, তাদের সঙ্গে নিজেকে এক ভাবা। এই একাত্মতাবোধ-সঞ্জাত আকুল বেদনায়, অসীম ভালবাসায় তিনি বলেছেন, "হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পারাপার করিতেছে।...যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে—ছিদ্র হইয়া থাকে তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই এই ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, যদি আমরা বন্ধ করিতে না পারি তবে মরিতে হইবে।"[১৭] স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছেন, ভগবানই মানুষ হয়ে রয়েছেন; তাই দেশের দরিদ্র জনগণকে তিনি 'দরিদ্রনারায়ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নারায়ণের পূজা জ্ঞানে একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর সেবা করতে বলেছেন আমাদের। তাঁর বাণী ছিল, "দেশের অজ্ঞ, দরিদ্র, পদদলিতই হোক্ তোমার ঈশ্বর.... দিবারাত্র তাঁরই পূজা কর।"[১৮] এই কাজটি আমাদের সকলকেই, বিশেষ করে দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই যুবক-বৃন্দকে করতে হবে এবং তার জন্য তাদের 'ত্যাগ ও সেবার' ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, এই "ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ," ইহাই জাতীয় জাগরণের মূলসূত্র। আশার কথা, তাঁর এই বাণীকে কার্যে রূপ দেবার পরিকল্পনা স্বামীজী নিজেই করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে। কিন্তু স্বার্থত্যাগকে ভিত্তি করে নারায়ণজ্ঞানে দেশ-বাসীকে সেবা করার ভাব কেবল সেখানেই সীমিত রাখলে চলবে না, চাই আরও জাতীয় সংগঠন, আরও আত্মত্যাগ বা আত্মবলি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই জাতীয় আদর্শের বিস্তার প্রয়োজন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদে আমাদের "নিজের কল্যাণের জন্য দেশের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য" আমাদের অন্তরে জ্বলে উঠুক এই আত্মত্যাগের প্রেরণা, ধ্বনিত হোক সর্বত্র, বিশ্বের সর্বস্তরে চকিত হোক, অনুপ্রাণিত হোক, "Arise! awake! and stop not till the goal is reached." 'ওঠো জাগো, লক্ষ্যলাভের আগে কোথাও থেমো না; এগিয়ে চলো।'

১৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮

১৮ পত্রাবলী—১ম ভাগ, পৃ. ৩৭৩

অমরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যাকে ডাকল তোমার চিরচরণ তার কোথা নাথ, ভয় ?
তোমার রাঙা পায়ে চায় যে শরণ অপারশান্তিময় ?
পরি আশার বাঁধন কতই সাধে !
সুখের খাঁচায় প্রাণ যে কাঁদে !
কামনার গোলাপ ফুটিয়ে গাই রঙিনের জয় ঃ
হায়, দমকা হাওয়ায় হয় পলকে ফুলের বাগান লয় ।

তবু নয় যে জীবন মায়া কালো
জানি তোমায় বাসলে ভালো,
ঝরাও তোমার সেই কৃপা যে নয়কে করে হয়
নিঠুর মরণ-আড়াল ঘুচিয়ে যে দেয় প্রেমের পরিচয় ।

কে ঐ উদাস সুরে সাগর পানে
সব নদীকেই এমন টানে ?
গায় সে ঃ "কৃপার ডাকেই প্রতি ঢেউ নদী তোর বয়
আমার সিন্ধুকোলে ঝাঁপিয়ে হবে আনন্দতন্ময় ।"

মর্মবাণী

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

বিন্দুরে যদি সিন্ধুর পটে
রাখো সযতনে ধ'রে—
বিন্দুর বুকে সিন্ধুর দোলা
আবেশেতে যাবে ভ'রে।

সীমাতেই যার অসীম জগৎ
তারই পথ হয় সত্যের পথ
শতদল হোয়ে অমিয় সেথায়
জেগে উঠে থরে থরে—
চলা-বলা ভাসে ছন্দের মত
কথনেতে কুহু ঝরে!

নিজ হাতে জ্বালা আপন জীবন
যে ক'য়েছে, তুই নে রে ভুবন
মুক্তি তাহার বলেনি কখন,
ভাঙো স্বপ্নের পাঁতি—
দ্বারে দ্বারে সে যে করেছে অটন
আলোর নেশায় মাতি!

সে যে পঙ্কের স্রোতে পেয়েছে গাঙ্গ্য বাণী
ভাঙা 'নাও' তার ছুটেছে সাগর ছানি'
বন্ধন শেষে হোয়েছে অবন্ধন—
মরণ জিনিয়া অদম্য হাসে
হেসেছে যে সে-জীবন!

আবেদন

কাশীপুর উদ্যানবাটী

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আটমাস ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তদের মধ্যে ইতঃপূর্বে আরব্ধ শিক্ষা-দীক্ষাদি কার্যের পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত ছিলেন। এই স্থানেই প্রতিদিন বৈকালে নরেন্দ্রনাথকে নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিকতা, ভাবী সঙ্ঘগঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। এইখানেই তাঁহার দেব-মানবত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং এইখানেই তাঁহার কল্পতরুলীলা। এই উদ্যানবাটীতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম সম্পদ ও শক্তি স্বামীজীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার চিহ্নিত সন্তানগণকে গেরুয়া বসন ও রুদ্রাক্ষমালা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সূত্রপাত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বহুস্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটি লইয়া মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৯৭-র ১৩ই জুলাই-এর পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি একথা জানান; ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ও-বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি জড়িত)। বাস্তবিক ওটাই আমাদের প্রথম মঠ। ওটা তো নিতেই হবে ···।" স্বামীজীর সেই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষ এই উদ্যানবাটীটি ক্রয় করিয়া ১৯৪৬ সালে এখানে একটি মঠকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে সমগ্র উদ্যানবাটী যেমনটি ছিল—বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাগান, পুকুর প্রাচীর প্রভৃতি পুনর্নির্মাণপূর্বক ঠিক সেই ভাবে উপযুক্ত স্মৃতিভবনরূপে সুরক্ষিত করা। আনন্দের সহিত জানাইতেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে গৃহে বাস এবং মহাসমাধিলাভ করিয়াছিলেন, উহা জনৈক ভক্তের সাহায্যে কয়েক বৎসর পূর্বে পুনর্নির্মিত হইয়াছে।

এখন সাধুদের বাসস্থান এবং সমগ্র পরিকল্পনাটির বাকী অংশগুলির রূপায়ণের জন্য আনুমানিক পাঁচলক্ষ (৫,০০০০০) টাকার প্রয়োজন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি পূত এই বাগানটির সংরক্ষণার্থে সমগ্র ভারতের সর্বসাধারণের নিকট মুক্তহস্তে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। দান যত সামান্যই হউক উহা ধন্যবাদের সহিত সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। আমাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে সাহায্য পাঠাইতে হইবে। চেক পাঠাইলে "Ramakrishna Math, Cossipore" এই নামে লিখিবেন।

স্বামী সাধনানন্দ

অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

৯০, কাশীপুর রোড, কলিকাতা ২

১০ই ফেব্রুআরি,

১৯৬৯

সমালোচনা

সূফী-গাথা : শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রমন্দির (পোঃ বারাসত)। **প্রকাশক :** ভারত-প্রকাশ-ভবন, ২৪বি বুধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা-৩৩৬ (১০৮+১৪০+৮৮), মূল্য—২৲ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ ইসলামধর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : "ইসলামধর্ম তদন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। এইখানেই মুসলমানধর্মের বিশেষত্ব।...মুসলমান-ধর্ম জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে তাহা সকল মুসলমানধর্মীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব ; ইহাই মুসলমানধর্মের অত্যাবশ্যক সারাংশ..."

সূফী-সাধক মহর্ষি জালালুদ্দিন রুমি সাধারণ মুসলমানকে এই প্রেমের ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন :

আজল বা আন নূরশুদ কিবলাহ একরম।
কিবলাহ্ বে আন নূরশূদ কুফর এসনম॥

ভগবৎপ্রেমে রঞ্জিত হইলে গোবৎসেরও পূজা করা চলে। আর ভগবৎপ্রেমের অভাবে নমাজের বেদীও অপবিত্র হইয়া যায়।

আর বলিয়াছেন :

ইন সিফাল্ ও ইন পলিতা দিগর অস্ত্।
লেক নূর অশ নিস্ত্ দিগর জান সব অস্ত্॥

এই সলিতাটি পৃথক বটে, দীপশিখাটি নয়—সকল প্রদীপের শিখাই অভিন্ন। প্রত্যেক পয়গম্বর সিদ্ধযোগীর পথ ভিন্ন, তাঁহারা সকলেই খোদার নিকট পৌছান, তাঁহারা সকলেই এক।

এই সূফী সম্প্রদায়েরই অন্যতম সাধক গোবিন্দ রায়ের নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে আল্লামন্ত্র জপ করিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম।" সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'সর্ব ধর্ম সত্য, যত মত তত পথ।'

আলোচ্য গ্রন্থটিতে আমরা এই সূফী সম্প্রদায় ও তাঁহাদের মতবাদের বিশদ বিবরণ পাই। সূফী-সাধকগণের প্রতি মর্মবাণীতে সর্বজনীন ভাবের অনুরণন রহিয়াছে। কোরান-বিরুদ্ধ ভাব প্রচার করিতেছেন বলিয়া প্রথম দিকে সূফী-প্রধানগণকে বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। পরে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, যতদিন না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, সূফীতত্ত্ব কোরানের অনুমোদিত ততদিন এই ধর্ম পালন বা প্রচার তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। ইমান গজ্জালি এবং জালালুদ্দিন রুমির চেষ্টায় তা ফলবতী হইল। কোরানের বাণী উদ্ধৃত করিয়া, ইহার নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা দেখাইলেন যে, সূফীধর্ম কেবল কোরানের অভিপ্রেত নহে, উহাই কোরানের সত্য। গজ্জলি সূফীবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন সুতীক্ষ্ণ দার্শনিক যুক্তিজাল দ্বারা, আর তাহাতে কাব্যরসের মূর্ছনা দিলেন জালাল।

সূফীরাজ জালালেই সূফী-সাধনার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। তাঁর প্রণীত মসনবীই সূফীদের গুরুগ্রন্থ। মুসলমানের কোরান, খৃষ্টানের বাইবেল, পারসিকের জেন্দ আবেস্তার মতো মসনবীই সূফীদের প্রধান শাস্ত্র। সূফী-ধর্মকে প্রথম বাস্তব রূপ দেন আবুলখৈর (৯৪৭-১০৪৯)। পারসী ভাষায় রচিত তাঁহার কারিকা-গুলিই মসনবীর আকরগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। মসনবী রচিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন: সুফীধর্ম এক বিশ্বজনীন ধর্ম। জমদগ্নি জরথুশত্র-প্রবর্তিত সু-প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রভাব ইহাতে যথেষ্ট, ভারতীয় দর্শনের প্রতিধ্বনি প্রতিপদেই শোনা যায়। কারণ বৈদিক ধর্মের দুটি ধারা—একটি ইরানীয়, আর একটি ভারতীয়। ইরানীয় ধারা অথর্ব তথা ভার্গব বেদকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। নিরাকার উপাসনার পুরোহিত শুক্রাচার্য বা ভৃগুই সেই বেদের ধারক ও বাহক। ভার্গব বেদের প্রচলিত নাম ছিল ছান্দ উপস্থা—পারসিক ভাষায় জেন্দ আবেস্তা—বা বৈদিক উপাসনার মন্ত্র। ছান্দ উপস্থা চারিটি সংহিতায় বিভক্ত—যস্ন, যস্ত, বিশ্বরতু ও বিদৈবধাত। যস্ন সংহিতাই ইহাদের মুখ্য গ্রন্থ ইহাতে ৭২টি সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ১৭টি মহাবতু জরথুশত্রের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া কথিত—এই বাণীর নাম গাথা।

লেখকের মতে এই গাথাই সুফীসাধনার মূল উৎস। যস্ন সংহিতার গৌণ অঙ্গ বাদ দিয়া উহার যাহা রাগাত্মিকা ভক্তি তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি জালাল তাঁহার মহাগ্রন্থ মসনবী রচনা করিয়াছেন। যস্ন সংহিতার সারসত্য সর্বভূতে সমদর্শন (অষা), ব্রহ্মবাদ (হু), রাগাত্মিকা ভক্তি (চিস্তি), প্রেম (ইশ্ক), কর্মফল, জন্মান্তর এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব সুফীধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক কথায় বলিতে গেলে ইহা মাধুর্যরসের সাধনা। "খেত্বর দাত" বা স্বাত্মার্পণ, প্রেমের আবেগে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধনই যস্ন সংহিতার ও মসনবীর মূলকথা।

জান এ মন কোড় অস্ত্ বা আতশ্ খোশ অস্ত।
কোড় বা ইন্ বস্ কি খানা এ আতশ্ অস্ত।।

আমার মনটা একটা চুলা—আগুনেই আমার আহ্লাদ। সে যে আগুনের আধার তাতে চুলারই গৌরব। অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমের আগুন যদি হৃদয়ে জ্বলে তাহাতেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। পার্শীরা এই প্রেমাগ্নিরই উপাসক। তাদেরই অনুবর্তী সুফীরাও ভগবানকে প্রিয় বা প্রিয়ারূপে ভাবনা করিয়া উপাসনা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম জীব- ও জগৎ-রূপে পরিণত, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, হঠাৎ সৃষ্ট বাহির হইতে উদ্ভূত কোন পদার্থ নয়। তাই অংশের সঙ্গে অংশীর মিলনে কোন বাধা নাই। সুফীগণ এই পরিণামবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। সুফীধর্মের আর একটি প্রধান কথা আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন।

যস্ন সংহিতার দুটি পর্যায়—একটির নাম চিস্তি, ইহাতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা, রাগাত্মিকা ভক্তি প্রভৃতি তথ্যের সমাবেশ। অপরটির নাম দীন—ইহাতে আছে একেশ্বরবাদ, নিরাকার উপাসনা ও জাতিভেদরাহিত্য। সুফী পন্থায়ও এই দুটি বিভাগ। হাপেজ বলিয়াছেন:

মুরীদ এ পীর এ ময়ান অম
সে মন মা রনজ্ অয় শেখ

হে শেখ, আমি মখগুরুর (জরথুশত্রের) শিষ্য বলিয়া আমার উপর রুষ্ট হইও না। আর জালাল বলিয়াছেন, খোদাকে আমি যদি কান্তাভাবে ব্যাখ্যা করি তোমরা আমার অপরাধ মার্জনা করিও। এ সাধনা প্রেমের সাধনা। মসনবীর পাতায় পাতায় রহিয়াছে খোদার সহিত মিলনের আকুল আগ্রহ, মিলনের প্রস্তুতি ও বেদনা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রেমের ধর্ম সুফীধর্মের বিকাশ ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সুফী সম্প্রদায়ের গুরুগ্রন্থ মসনবীর শ্লোকগুলির সটীক অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলাভাষাভাষীর পক্ষে সেই মানসলোকে প্রবেশের পথ রচনা করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গ সরস্বতীর মণিহারে তিনি

আর একটি অমূল্য মণি সংযোজন করিয়াছেন। ভারতেও সুফীধর্মের দ্বারা বহু ধর্ম অনুপ্রাণিত হয়েছে। খাজা মইনুদ্দিন চিস্তিই ভারতে সুফীধর্মের প্রধান ধারক ও বাহক। ১১৯২ খ্রীঃ তিনি সাহবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা কবীরও এই সুফীধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা রামভক্ত বলিয়াই জানি—কবীর সম্পর্কেও গ্রন্থকার নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। সামর্থ্য-বিচারে পুস্তকটির অতি অল্প মূল্যই ধার্য হইয়াছে। এইরূপ একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই। —**দেবব্রত রায়চৌধুরী**

ভজন-সঙ্গীত (প্রথম ভাগ)—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক: স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, পোঃ জয়রামবাটী, বাঁকুড়া। প্রাপ্তিস্থান: রামকৃষ্ণ মিশন সারদা-পীঠ সেলস্ রুম (বেলুড় মঠ) এবং প্রকাশকের ঠিকানা। পৃষ্ঠা ২৮+৮; মূল্য আড়াই টাকা।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার গানগুলি ভাষা ও ছন্দের সম্মিলনে মাধুর্য-মণ্ডিত; সুর-লয়-তানে গীত হইলে ভক্তি-ভাবের উদ্রেক করে।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ ১৭টি গান স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের অধিকাংশ সঙ্গীতই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে এবং কয়েকটি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অবলম্বনে রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শী-পূজার ভাব অবলম্বনে অঙ্কিত একখানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র গ্রন্থটিতে সংযুক্ত। লখনৌ ন্যাশন্যাল একাডেমি অব হিন্দুস্থানী মিউজিক-এর অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকার-লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থখানিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ ভক্তগণের নিকট 'ভজন-সঙ্গীত' পুস্তিকাটির যথাযথ সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মহাভারত কাহিনী—স্বামী অমলানন্দ। প্রকাশক, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৬। পৃঃ ১৫৬; মূল্য ২৲ টাকা: বোর্ড বাঁধাই—২·৫০ টাকা।

জাতির সর্বোচ্চ চিন্তাগুলিকে সর্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে যুগ যুগ ধরিয়া পরিবেশনের কাজে প্রধান মাধ্যমগুলির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান সর্বোচ্চে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, আমাদের জাতিগঠনের জন্য একটি বিশেষ কাজ হইল রামায়ণ-মহাভারতাদি বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া, যাহাতে প্রথম হইতেই তাহারা ভারতীয় চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে পারে।

স্বামী অমলানন্দ-লিখিত মহাভারত কাহিনী দেখিয়া তাই আমরা খুব তৃপ্তি পাইলাম। অতি সহজ ভাষায় পুস্তকটি রচিত। ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতকে অনুসরণ করিয়া এবং উহার পর্বানুসারে ভাগ করিয়া পুস্তকটি লিখিত। বলা বাহুল্য এত ক্ষুদ্র আয়তনে মহাভারতের সব আখ্যানগুলি কেবল স্পর্শ করাও অসম্ভব; লেখক মূল কাহিনীকে সাবলীল-ভাবে অগ্রসর করাইবার সময় নিপুণতার সহিত কয়েকটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষামূলক আখ্যানকেও এই সচিত্র পুস্তকটিতে স্থান দিতে পারিয়াছেন।

পুস্তকটি বালক-বালিকাদের উপযোগী তো বটেই, খুব সংক্ষেপে যাঁহারা মহাভারতের আখ্যায়িকার সারাংশ জানিতে চান, তাঁহারাও পুস্তকটিকে সহায়করূপে পাইবেন। বালক-বালিকাদের মধ্যে পুস্তকটির বহুল প্রচলন একান্ত কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা : গত ডিসেম্বরের শেষভাগে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মেদিনীপুর জেলার সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যার্ত জনগণের মধ্যে ২৩,৫৪৫ কেজি চাল, ৬৮,১৪৮ কেজি গম এবং ৬,০০০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩৪,৭২২।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত জানুআরি ১৯৬৯ জলপাইগুড়ি শহরের ১৯নং ওয়ার্ডে, মণ্ডলঘাটের ৯নং অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে মিশন কর্তৃক ৭,১৮৩ কেজি গুঁড়া দুধ, ৬০২ কেজি স্যুপ-মিক্সচার ১,৭২৪ খানি ধুতি ও শাড়ী, ১,৩৩৩ খানি কম্বল, ১০১টি বেনিয়্যান, ৬,৯৫৭টি পুরাতন পোশাক, ৮,২৭১টি বাসনপত্র, ৮৫টি কৃষিকার্যের সরঞ্জাম (farm implements), ৬টি লণ্ঠন এবং ১,৪৭০ খানি পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১২,৩৬৯। ৬১১ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

জলপাইগুড়িতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দুঃস্থ জনগণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক কুটীর-নির্মাণকার্য এবং স্কুল-কলেজসমূহে শিক্ষা-সরঞ্জাম (educational appliances) দেওয়ার কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : গুজরাটে বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য মিশন কর্তৃক কুটীরনির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে।

উৎসব ও অন্যান্য সংবাদ

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী ১৯৬৮ ২৫শে নভেম্বর পারিতোষিক বিতরণ এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

মাদ্রাজ : গত ১লা জানুআরি, ১৯৬৯ মাদ্রাজে মায়লাপুরস্থ ছাত্রাবাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর করণ সিং বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

মাদ্রাজ শহরে অবস্থিত বিবেকানন্দ কলেজে, মায়লাপুর ছাত্রাবাসে ত্যাগরায়নগর উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে, সারদা বালিকা বিদ্যালয়ে, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী বালিকা বিদ্যালয়ে এবং দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিকাগো ধর্মমহাসভার ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চণ্ডীগড় : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১২ই জানুআরি চণ্ডীগড় আশ্রমে হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রীবি. এন. চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বক্তৃতা দেন।

দিল্লী : গত ১২ই জানুআরি দিল্লীর লে. গভর্নর ডক্টর এ. এন. ঝা নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত সাধারণ সভায় স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

ভুবনেশ্বর : গত ১৯শে জানুআরি ভুবনেশ্বর আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে ডক্টর করণ সিং সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

দেওঘর: গত ২২শে জানুআরি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে স্বামী গম্ভীরানন্দজী নবনির্মিত গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করিয়াছেন। সাধু-ভবন এবং ভোজনালয়ের সম্প্রসারিত অংশেরও উদ্বোধন হইয়াছে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনোৎসবেরও উদ্বোধন করেন। ২২শে, ২৩শে, ২৪শে জানুআরি মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, দ্বিতীয় দিন স্বামী বুধানন্দ ও শেষ দিন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ।

আমেরিকা: গত ২০শে জানুআরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের জন্য ওয়াশিংটনে আয়োজিত প্রাথমিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে চিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

২৫.৭.৬৮ তারিখে চিকাগো আসার পর হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কানাডা পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সম্মেলনে, বেদান্ত সমিতিতে, চার্চে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করিতেছেন। ১৯৬৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রায় ১৬০টি বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বার্ষিক (১৮.৫.১৯৬৭ হইতে ২২.৫.১৯৬৮ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী নিখিলানন্দ।

আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রের নির্ধারিত কর্মধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে। ২.৬.৬৭ তারিখে আমেরিকার বস্টন কেন্দ্রের স্বামী সর্বগতানন্দ এই কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ধর্মসভা পরিচালনা করেন।

কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেন্দ্রের কাজকর্ম ১১.৬.৬৭ হইতে কিছুদিন স্থগিত রাখা হয়। হাসপাতালে সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভান্তে ফিরিয়া তিনি ২৪শে এপ্রিল সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) গমন করেন। সেখানে বিবেকানন্দ-কুটির উপাসনা-মন্দিরে সারা গ্রীষ্মকাল যাবৎ প্রায় ২৪ জন বন্ধু ও ছাত্রগণসহ সন্ধ্যায় নিয়মিত ধ্যানধারণা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী নিখিলানন্দ ফিলাডেলফিয়া টেম্পল ইউনিভারসিটিতে হিন্দুধর্মের অধ্যাপক-পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ১৯৬৭ সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি সোমবার বেলা ৩টা হইতে ৫-৩০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণের জন্য হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিতে শুরু করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে স্বামী নিখিলানন্দের সর্বশেষ গ্রন্থ 'অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ' (Man in Search of Immortality) প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ২২শে অক্টোবর গ্রেস চার্চের তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার্থী একদল ছাত্র নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উপাসনা-সভায় যোগদান করেন।

গত ৩রা নভেম্বর মহিলা সেন্‌টিনারি কলেজ চ্যাপেলের ডীন ডক্টর এম. অর-এর 'বিশ্বধর্ম' বিষয়ক ক্লাসটি এখানে অনুষ্ঠিত হয়; স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে ভাষণ দেন।

গত ১৯শে নভেম্বর ভ্যান উইক জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক মি: গ্রীনবার্গ একদল ছাত্র লইয়া এখানে আসেন।

গত ২৭শে নভেম্বর মাউন্ট ভারনন-স্থিত চার্চ-অ্যাসোসিয়েশন-এর যাজক মারতিন এ. গার্ডনার ১২ জন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র লইয়া

'আধ্যাত্মিকতার সাধন ও ঐহিক বাসনা' সম্বন্ধে ভাষণ শুনিতে আসিয়াছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর ইউনিটেরিয়ান গ্রুপের কিশোর-বয়স্ক বালকগণের তত্ত্বাবধায়ক কতক-গুলি ছাত্র লইয়া রবিবাসরীয় প্রাতঃকালীন উপাসনা-সভায় যোগ দেন।

গত ১১ই ফেব্রুআরি ওয়াটচুং-এর উইলসন মেমোরিয়াল ইউনিয়ন চার্চের রেভারেণ্ড রোল্যাণ্ড এইচ. ওস্ট ৩৫ জন ছাত্রসহ রবিবারের সভায় যোগদান করেন।

গত ১২ই মে এই কেন্দ্রের সভ্যগণ ও বন্ধুবর্গ ভারতে লখনৌ-গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ওয়েলদী এইচ. ফিশারের মনোজ্ঞ ভাষণ শুনিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি 'পুনরুজ্জীবন: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহাকে ঐদিনের বক্তৃতায় প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ভারতের গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য উপহার দেন।

আলোচ্য বর্ষে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উপাসনা-মন্দিরে নিম্নলিখিত বিশেষ অনুষ্ঠান-গুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল:

বুদ্ধ-জয়ন্তী, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে জগজ্জননীর পূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব, খৃষ্টজন্মদিন, গুডফ্রাইডে ঈস্টার সারভিস ও বুদ্ধদেবের জন্মতিথি-উৎসব। প্রতিটি অনুষ্ঠান ভজনাদি সহায়ে মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে রবিবাসরীয় ও অন্যান্য সাপ্তাহিক সভায় মোট শ্রোতৃসংখ্যা—৩,৭৫১। রবিবারের সভায় গড়ে উপস্থিতি—৭১, সাপ্তাহিক সভায় ৩২। নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের বর্তমান সভ্য-সংখ্যা—১৩৫।

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) বার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা-উপাসনাদি ছাড়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং মহাপুরুষগণের পুণ্য জন্মতিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে নূতন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন করা হয়। গ্রন্থাগারে ৫ খানি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৪৭ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগারে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৩৫।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৮০। পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক। আলোচ্য বর্ষে ১২ জন ছাত্র জাতীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছে। স্কুল লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৬,১২২; ৩,৪৭৭ খানি বই ছাত্র ও শিক্ষকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ২,৪৬,৭৩১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে; ২৬৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়; ৩০,২১৬টি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরীতে ১৮৮টি নমুনা পরীক্ষিত হয়। এক্স-রে বিভাগে ৯০ জন রোগীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

কানপুর কেন্দ্রটি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে জনসাধারণের নানাভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ ১৯৬৮) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই আশ্রম কর্তৃক একটি দাতব্য আউটডোর ডিসপেন-সারী, একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মোট ২৫,৯৩০ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৫,৭০১ এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ১০,১৫৯।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছয় শতের অধিক। বিগত ৫ বৎসরে ছাত্রগণ স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রতিবৎসরই ভাল ফল দেখাইয়াছে এবং ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে চারজন ছাত্র জাতীয় বৃত্তি পাইয়াছে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় ২,১০০ খানি পুস্তক আছে। পাঠাগারে ২টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ১৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

ছাত্রাবাসে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ জন ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনা, স্বাস্থ্যচর্চা ও নৈতিক চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং স্বাবলম্বী হইতে শিখানো হয়।

পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত রিক্ত জনগণের জন্য বীরেশ্বর পল্লীতে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি সমবায়-বিপণি করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত এবং অন্যান্য পুণ্যদিনগুলিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা হয়।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

এই সোসাইটি কর্তৃক একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। পাঠাগারে বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্র পত্রিকা রাখা হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে সোসাইটির ৩৫২ জন নূতন সদস্য করা হয়। ১২৯টি ধর্মশাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের জীবন অবলম্বনে আলোচনা ৭৭টি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা, ১১টি সঙ্গীত অধিবেশন, ৮টি কৃষ্টি- ও শিক্ষামূলক আলোচনা, একটি নাট্যাভিনয় এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন হইয়াছিল। শহরে ও শহরের বাহিরে অন্যান্য স্থানেও ধর্মবিষয়ে ৪২টি বক্তৃতা ও ১৯৭টি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

বিনা-বেতনে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্য সপ্তাহে দুইদিন করিয়া ক্লাস করা হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাধুগণের স্থায়িভাবে থাকার অনুমতি প্রদত্ত না হওয়ায় মিশনের স্থানীয় বন্ধুগণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করিতেছেন।

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। ভারতের বাহিরে মিশনের এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহা জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা-বিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস, আলোচনা ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানেও ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেন। সিঙ্গাপুরে ও মালয়েশিয়ায় তিনি আলোচ্য বর্ষে ৩২টি ভাষণ প্রদান করেন।

বিদ্যালয় : 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুপরিচালিত এই বিদ্যায়তন দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২২৫ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী- ১৬৫) অধ্যয়ন করিয়াছে।

কলাইমঙ্গল (Kalaimangal) তামিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯ ও ১০৯।

তামিলভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীগণকে জাতীয় ভাষা (মালয়) এবং ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে উপরি-উক্ত তিনটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৩ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রাবাস : মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ৫৫টি ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা ভজনাদি, খেলাধুলা ও পড়াশুনার মাধ্যমে মানুষ হইয়া উঠিতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকগণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। একজন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং একজন পলিটেকনিক ডিগ্রীকোর্সের ছাত্রও ছাত্রাবাসে থাকে। ছাত্রাবাসে একটি শিশু-গ্রন্থাগার করা হইয়াছে এবং গ্রন্থাগারটির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার : ইংরেজী, তামিল, মালয়লম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ৫,১১৮ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ১০ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৩৪টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি পূজা, পাঠ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রামনবমী, কৃষ্ণজয়ন্তী, নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, খৃষ্টজন্মদিন এবং অন্যান্য পুণ্যতিথিও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামী আত্মারামানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২২.১.৬৯ বেলা ১-টায় বারাণসী সেবাশ্রমে স্বামী আত্মারামানন্দ (ফণী মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। আন্ত্রিক গোলযোগের জন্য কিছুদিন পূর্বে তাঁহার একটি অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অনিদ্রা প্রভৃতিতে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। তিনি কিষেণপুর ও জামতাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন ; প্রথম দিকে বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া প্রধানতঃ গৃহনির্মাণাদি দেখাশুনা করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘের একজন কর্মঠ সন্ন্যাসীর অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নববারাকপুর—গত ১৯শে জানুআরি বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মোৎসব পূজাপাঠাদির মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যায় স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন এবং স্বামী নিত্যানন্দ পরিষদ-কর্তৃক স্থাপিত বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের (শিশু শিক্ষাভবন) উদ্বোধন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার।

আরামবাগ স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ও স্বামী গদাধরানন্দজীর পৌরোহিত্যে গত ২৯শে জানুআরি কালীপুর অঞ্চলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন সকালে শোভাযাত্রা ও স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। বিকালে স্বামী অদ্বয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, সভাপতি মহারাজ, শ্রীযুগলকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা এবং নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

ইম্ফল—শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিতে গত ১২ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব প্রতি-পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শ্রীকালীপদ শর্মা শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন। পরে রামায়ণ-গান পরিবেশিত হয়।

গত ২৪শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস উৎসব উপলক্ষে ভাষণ দেন রেঃ ফাথার যোসেফ ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন।

অখিল-ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের দ্বিতীয় বার্ষিক যুবশিক্ষণশিবির অনুষ্ঠিত হয় গত ৪ঠা হইতে ৮ই জানুআরি পর্যন্ত। বারাকপুরে ৪ঠা জানুআরি শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং বিভিন্ন দিনে স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবধারা বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ অধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ শরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, শ্রীনীলমণি দাস ও মহামণ্ডলের সভাপতি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। প্রত্যহ বেদপাঠ, একাগ্রতা বিষয়ে আলোচনা ও অভ্যাস, ব্যায়াম, স্বামীজীর বাণী পাঠ ও প্রশ্নোত্তর, খেলাধুলা, সান্ধ্য প্রার্থনা প্রভৃতি এবং স্বামীজীর ভাবধারা লইয়া প্রত্যহ তিনটি করিয়া আলোচনা শিবিরের কার্যসূচী ছিল। ৯টি জেলা হইতে বিদ্যার্থী ও শিক্ষকগণ ইহাতে যোগদান করেন। ২২০ জন বিদ্যার্থী শিবিরে যোগ দেন; ইহা ছাড়া একদিন প্রায় ৫০০ জন বিদ্যার্থী বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্বামীজীর জন্মোৎসবপালন উপলক্ষে গত ১১ই জানুআরি মহামণ্ডলের উদ্যোগে কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিদ্যার্থীদের পাঁচটি শোভাযাত্রা ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে আয়োজিত সভায় সমবেত হন। সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রমা চৌধুরী, স্বামী চিদাত্মানন্দ ও অধ্যক্ষ

অমিয়কুমার মজুমদার এই সভায় ভাষণ দেন। তাঁহারা স্বামীজীর আদর্শে যুবজীবন-গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।

মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য স্বামীজীর আদর্শে যুবসম্প্রদায়ের জীবনগঠন; ৩২টি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া মহামণ্ডল এই কাজ করিয়া চলিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতা, হাওড়া হুগলী, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইয়া মহামণ্ডলের সভ্যগণ খাদ্য-বস্ত্র-ঔষধাদি-বিতরণ প্রভৃতি সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

নেহেরু পুরস্কার

মার্কিন নিগ্রো-আন্দোলনের নেতা, শান্তির দূত ডঃ মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৬ সালের জন্য মরণোত্তর নেহেরু পুরস্কার পাইয়াছেন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ড. কিং-এর অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। গত ২৪শে জানুআরি সকালে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে ড. কিং-এর পত্নী শ্রীমতী কোরেটা কিং রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে স্বামীর হইয়া এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পরলোকে রজনীকান্ত প্রামাণিক

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৪. ১১. ৬৮ তারিখ রাত্রি পৌনে তিনটার সময় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য রজনীকান্ত প্রামাণিক ৭৪ বৎসর বয়সে তমলুকে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

দেশসেবক রজনীকান্ত প্রামাণিক চিরকুমার থাকিয়া দেশের জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীর আদর্শানুগ ছিলেন, কেবল রাজনীতিতেই নয়, জীবনেও। অনাড়ম্বরজীবন, আদর্শনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ রজনীকান্ত প্রামাণিক স্বামীজীর ভাবে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শেষ-দিন পর্যন্ত তিনি এই আশ্রমটির সেবা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

পরলোকে গিরিজা দেবী

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, ঢাকা জেলার আউটশাহীর ভক্ত রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্তের পত্নী গিরিজা দেবী ৮৯ বৎসর বয়সে গত ৮ই জানুআরি কলিকাতায় সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। গিরিজা দেবী মৃত্যুকালে চার পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; প্রখ্যাত চিত্রকর ৺মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পুত্র ছিলেন।

সন ১৩২৫ সালের ১৩ই শ্রাবণ গিরিজা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত পৌষ, ১৩৭৫ সংখ্যার ৫৫৯ পৃষ্ঠা, ১ম কলম, ২৮ লাইনে 'প্রভাত-কর বাবু' স্থলে 'প্রভাকর বাবু' এবং মাঘ, ১৩৭৫ সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠা, ১২ লাইনে 'শ্রীসুধাংশুকুমার দাস' স্থলে 'শ্রীসুধাংশুকুমার দাম' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২

কত না তোমার নাম (কতজন ডাকে কত নাম ধ'রে)!
প্রতিটি নামেই তোমার সর্ব শক্তি দিয়েছ ভ'রে
(যে-কোন নামের তরী নিয়ে যায় ভবসিন্ধুর পার)!
সে-নাম কখন করিবে স্মরণ বিধিও নাহিক তার!
এত তব কৃপা! হেন দুর্ভাগা তবু ভগবান আমি
অনুরাগ মোর হল না জীবনে সে-নামে, হৃদয়-স্বামী!

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩

—শিক্ষাষ্টকম্ (শ্রীচৈতন্য)

তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে থেকে, সহ্য করিয়া তরুরও চেয়ে,
মানের কাঙাল হইয়া না ঘুরে, অপরেরে মান সদাই দিয়ে
করিতে হয় যে হরিনাম-কীর্তন!
(করে তা যে জন তাহার 'অহং' নিঃশেষে মুছে গিয়ে
অবাধিত করে হৃদি-মন্দিরে শ্রীহরির দর্শন।)

কথাপ্রসঙ্গে

সংস্কার

সংস্কারমুক্ত কথাটি আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের জাতির যাহা কিছু প্রাচীন সংস্কার তাহার প্রায় সবকিছুকেই আধুনিকগণ কুসংস্কার আখ্যায় ভূষিত করিতে চাহেন এবং সেগুলির মধ্যে যাহা শুভ তাহা হইতেও মুক্ত হওয়াকেই সভ্যতার, মানবতার উচ্চতর স্তরে আরোহণ বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন সংস্কারগুলিকে বর্জন করিবার প্রবণতা প্রায় সব দেশেই জনচিত্তে, বিশেষ করিয়া যুবমনে প্রকট হইতেছে।

কিন্তু সত্যই কি ইহা আমাদিগকে, মানুষকে উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর করাইতেছে, না উহা হইতে পিছু হটাইয়া আনিতেছে? উহা কি সত্যই সংস্কারমুক্তি, না শুভ-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া কেবল অশুভ সংস্কারকে বরণ করিয়া লওয়া? যথার্থ সংস্কারমুক্তি ঘটে মনের অতি উন্নত অবস্থায়, এবং সেরূপ উন্নত মনের অধিকারীর সংখ্যা চিরদিনই বিরল।

সংস্কার কি?

আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি অনুভূতি মস্তিষ্কে, এবং মনেও, সূক্ষ্মাকারে একটি করিয়া ছাপ রাখিয়া যায়। সেজন্য কোন চিন্তা বা কাজ, সৎ বা অসৎ যাহাই হউক, পর পর কয়েকবার করিলেই ঐ ছাপগুলি ক্রমে দৃঢ় হইয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস খুব দৃঢ় হইলেই তাহাকে সংস্কার বলে।

অভ্যাসের প্রভাব যে কতখানি, তাহা আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই দেখিতে পাই। যে-সব খাদ্যে আমরা শৈশব হইতে অভ্যস্ত, পরবর্তী জীবনে সেগুলিকে ভাললাগার ছাপ প্রায় আজীবন স্থায়ী হয়। ছেলেবেলায় অনেক অভ্যাস হয়ত করিয়াছি; পরে অকল্যাণকর জানিয়া সেগুলি ছাড়িবার সময় বুঝা যায় কী গভীরভাবে সেগুলি মনে গাঁথিয়া গিয়াছে। যে-সব চিন্তা আমরা বহুবার করিয়াছি, সে-সব চিন্তা করিতে আমাদের কোনপ্রকার কষ্টবোধ হয় না; কিন্তু যে-চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় নাই বা কম, তাহা শুনিতে বা সেই চিন্তাসমন্বিত বই পড়িতে মস্তিষ্কে চাপ লাগে, মনও উহা সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। কিন্তু দিনকতক জোর করিয়া অভ্যাস করিলে উহাকেই আবার মন ও মস্তিষ্ক সহজভাবে গ্রহণ করে। ইহার একমাত্র কারণ, বারবার একইভাবে চিন্তা ও কাজ করার ফলে মস্তিষ্কের ও মনের উপর উহার ছাপ ক্রমে গভীরতর হইতে থাকে, যেন চিন্তাধারার জন্য এক একটি গভীর খাদ কাটিয়া দেয়, যাহার মধ্য দিয়া উহার প্রবাহ সাবলীল হইতে পারে।

এই অভ্যাসই আরো গভীর হইলে সংস্কারে পরিণত হয়। আমাদের এ জন্মে অর্জিত অভ্যাসের প্রভাব হইতেই অনুমান করিতে পারি, বহু বহু জন্ম ধরিয়া যেগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে সে-অভ্যাসগুলির ছাপ কত গভীর হইতে পারে! অবশ্য যদি মন এক জন্মের ছাপগুলি অন্য জন্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, ইহা সত্য হয়।

মন—প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, তাহাই ঘটে। মনের এই ছাপগুলি দেহনাশের সঙ্গে নষ্ট হয় না, কারণ দেহের মৃত্যুর সঙ্গে মনের নাশ হয় না।

মন স্থূলদেহের সঙ্গে জাত এবং দেহের বিনাশের সঙ্গেই বিলুপ্ত দেহের পরমাণুবিন্যাসের ফলে উৎপন্ন মস্তিষ্কের ধর্মমাত্র নহে ; মন পৃথক একটি পদার্থ। স্থূলদেহের মতোই জড়-উপাদানে গঠিত হইলেও আমাদের দেহ যে-সব উপাদানে গঠিত, মনের উপাদান তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। সেজন্য স্থূলদেহ যত সহজে বিনষ্ট হয়, মন তত সহজে বিনষ্ট হয় না। মনের মতো প্রাণ প্রভৃতিও (যে শক্তি শরীর গঠন ও পালনাদি করে) এই-জাতীয় উপাদানে গঠিত বলিয়া সেগুলিও স্থূল দেহের বিনাশে বিনষ্ট হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল উপাদানে গঠিত দেহকে স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত মন, প্রাণ প্রভৃতির সমষ্টিকে সূক্ষ্মদেহ বলে। একটি স্থূলদেহ নাশের পর এই সূক্ষ্মদেহ থাকিয়া যায় এবং উপযুক্ত পরিবেশে অপর একটি স্থূলদেহ গঠন করিয়া লয়। গীতার ভাষায় দেহী যেন পুরাতনদেহরূপ জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নবদেহরূপ নূতন বসন পরিধান করেন। অক্ষয়ের দেহত্যাগ দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বের করে নিলে ; তলোয়ারের কিছুই হল না,—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল।" দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশের সময় মন পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সমস্ত অনুভূতির ছাপই সঙ্গে লইয়া আসে ; সূক্ষ্মদেহের কাছে মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, তাহার সুদীর্ঘ জীবন-পথের মাঝে মাঝে জন্মমৃত্যু পরিবর্তন মাত্র। (অবশ্য পূর্বজন্মের স্মৃতি আমাদের মনের চেতন স্তরে থাকে না, অবচেতনে থাকে। গভীর একাগ্রতার অভ্যাসে এই স্মৃতিকে চেতন স্তরেও আনা সম্ভব)। মনের উপর জন্ম-জন্মান্তরের এই ছাপগুলির সমষ্টিকেই পূর্ব-জন্মার্জিত সংস্কার বা সাধারণভাবে সংস্কার বলা হয়। বর্তমান জন্মে আমরা এই সংস্কারের পুঁটলি'তে আবার নতুন কিছু ভরিয়া দিই, পুরাতন সংস্কারগুলিকে অনুকূল অভ্যাসের দ্বারা কখনো দৃঢ়তর এবং প্রতিকূল অভ্যাসের দ্বারা কখনো বা ক্ষীণতর করি। (স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, আমাদের বর্তমান ব্যক্তিত্ব এই সংস্কারগুলির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং যেহেতু আমরাই ইহা গড়িয়াছি, আমরা ইচ্ছা করিলে ইহাকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতেও পারি।)

মন ও মস্তিষ্ক পৃথক পৃথক পদার্থ

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। মস্তিষ্ক ও মনকে আমরা যেন একই পদার্থ না ভাবি ; স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকিবার সময় মস্তিষ্কের সাহায্য অবশ্য তাহাকে গ্রহণ করিতেই হয় বিষয় আহরণের সময়। যেমন ছেলেরা ভাবে চোখই দেখে, কিন্তু দেহতত্ত্ব-বিদ্‌গণ জানেন, আসল দেখা মস্তিষ্ক না থাকিলে হয় না, তেমনি দেখা শোনা চিন্তাকরা প্রভৃতির জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন থাকিলেও আসলে এ-সব মনই করে। চোখ নষ্ট হইয়া গেলে যেমন মস্তিষ্কের দেখার কেন্দ্রটিও নষ্ট হইয়া যায় না, মস্তিষ্কের কোন অংশ নষ্ট হইয়া গেলেও তেমনি মনের কিছু হয় না। একটি ঘরে আবদ্ধ আছি, একটি কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের যেটুকু দেখা যায় সেটুকুই দেখিতে পাইতেছি। কাঁচটি যে রঙের, আমাদের কাছে বাইরের জগৎটিও সেই রঙের বলিয়া মনে হইবে ; কাঁচটির গঠন বিকৃত হইলে আমাদের দর্শনকেই বিকৃত বলিয়া মনে হইবে ; কাঁচটি ময়লা লাগিয়া অস্পষ্ট হইলে

বাহিরের জিনিস অস্পষ্ট দেখিব, একেবারে কালো হইয়া গেলে বাহিরের আর কিছুই দেখিতে পাইব না। কিন্তু এই-জাতীয় কোন ক্ষেত্রেই আমাদের দেখার শক্তি বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে বলা যায় না; কাঁচটি পাল্টাইয়া দিলে, বা ঘর হইতে বাহিরে আসিলে, বা সে-ঘর ছাড়িয়া ভাল কাঁচের জানালাসংযুক্ত অন্য ঘরে আমাকে ঢুকাইয়া দিলে আমি আবার ভাল-ভাবেই সব দেখিতে পাইব। মন ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধও ঠিক এই রকম। মস্তিষ্ক হইতে মনের পৃথক অস্তিত্ব না জানার জন্যই মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রকাশিত চিন্তা প্রভৃতিকেই আমরা মন বলিয়া ধরিয়া লই।

মন যে মস্তিষ্ক হইতে আলাদা, সূক্ষ্মতর পদার্থে গঠিত পৃথক সত্তা, তাহা অনুমান নয়, বহুজনের প্রত্যক্ষ করা সত্য। চেষ্টা করিলে আমরাও স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই মনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। মনকে এভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহারা মনস্তত্ত্ব লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, মন সম্বন্ধে তাঁহাদের কথাই প্রামাণ্য। যাঁহারা মনকে এভাবে প্রত্যক্ষ না করিয়াই কেবল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রকাশিত তাহার ক্রিয়াদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মন সম্বন্ধে অভিমত দেন, তাহা অনুমান মাত্র, এবং মন সম্বন্ধে তাঁহাদের এ-প্রকার অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান মস্তিষ্ক ও বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় এগুলির মাধ্যমে মনের যেটুকু প্রকাশ তাহাতেই সীমাবদ্ধ। মস্তিষ্কের খবর না রাখিয়া কেবল চোখের গঠন ও কার্যাবলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা মস্তিষ্কের দেখার কেন্দ্র সম্বন্ধে অনুমান করার মূল্য যতখানি, মনসংযুক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখিয়া মন সম্বন্ধে অনুমান করার মূল্য তাহার অধিক নহে।

তাই কেবল এ-জাতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করিলে আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সমূহ সম্ভাবনা। যেমন মথুরবাবু একবার শ্রীরামকৃষ্ণের মনের উচ্চাবস্থা না বুঝিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিজনিত লক্ষণগুলিকে একবার মাথা গরম হওয়ার জন্য বলিয়া এবং আর একবার অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের কুফল বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। যেমন প্রথমদিকে নরেন্দ্রনাথই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতেন যে, তাঁহার দিব্যদর্শনসমূহ মাথায় খেয়াল ছাড়া আর কিছু নহে। তাঁহাদের এ ভুল অবশ্য পরে ভাঙিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই উচ্চতর সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিবার পরে স্বামী বিবেকানন্দ মনস্তত্ত্বপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন: মন কি, তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াই মন সম্বন্ধে অনুমান করিয়া কেহ মনস্তত্ত্বের বই লিখিলেন, সেই অনুমানের উপর অনুমান করিয়া অপর একজন আর একখানি বই লিখিয়া বাজারে ছাড়িলেন—এভাবে বিভ্রান্ত মানুষের বিভ্রান্তি আরও বাড়াইয়া দিলেন।

মন—জড়বাদিগণের মতে

মস্তিষ্কের মাধ্যমে মনের যেটুকু প্রকাশ তাহার অতিরিক্ত বা তাহা হইতে পৃথক মনের কোন অস্তিত্ব জড়বাদিগণ স্বীকার করেন না। জড়বাদিগণ এবিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে আজ যাহা বলিতেছেন, ভারতে একদা চার্বাকপন্থিগণ তাহাই প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। চার্বাক-মতে মন, চেতনা প্রভৃতির দেহাতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই জন্মান্তর নাই। ঈশ্বরও নাই। কারণ এগুলির কোনটিই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ তাঁহারা মানিতেন না—"প্রত্যক্ষ-মেবৈকং প্রমাণম্", "মানন্ত্বক্ষজমেবহি।" অনুমান তাঁহাদের মতে প্রমাণই নহে—"অনুমানম-প্রমাণম্"। তাঁহাদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি ভূত বা মূল উপাদানেই

(কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার জড়কণা এবং শক্তি) জগৎ গঠিত, আমাদের দেহাদিও (আকাশ ইন্দ্রিয়গোচর নহে বলিয়া 'আকাশ'কে তাঁহারা গ্রহণ করে নাই)। আমাদের দেহে এই চারিটি মূল উপাদানের বিশেষ বিন্যাসের ফলেই চিন্তা, চৈতন্য প্রভৃতি গুণের উদয় হয়, মন বা আত্মা বলিয়া কোন কিছুর দেহাতিরিক্ত পৃথক সত্তা নাই—"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে" "চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।" দেহের সঙ্গেই চিন্তা ও চৈতন্যের জন্ম, দেহের বিনাশেই এ সবের বিনাশ ঘটে। আর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্ষিতি প্রভৃতির যে গুণ তাহারই ফলে ঘটে—ঈশ্বর বলিয়া কেহ ইহা করেন না। কল্পিত ঈশ্বর, আত্মা, মন প্রভৃতিতে—যাহার অস্তিত্বই নেই তাহাতে—বিশ্বাসী হওয়া মূর্খতা মাত্র। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা দেহসুখ-সম্ভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন। কাজেই শাস্ত্র, নীতি প্রভৃতিতে বিশ্বাসী না হইয়া (আধুনিক ভাষায় সংস্কারমুক্ত হইয়া) বেপরোয়া ভাবে ভোগ কর। শাস্ত্র প্রভৃতি যাঁহারা লিখিয়াছেন, লোক-ঠকানোই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা স্বার্থান্বেষী পিশাচতুল্য লোক—"ধূর্ত-ভণ্ড-নিশাচরাঃ"।

চার্বাকপন্থিগণ যাহা বলিয়াছেন, আধুনিক জড়বাদিগণের কাহারো বক্তব্য তাহার অধিক কিছুই নয়। একদা চার্বাকপন্থীরা এই মতই ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের উচ্চতর সত্যের অসংখ্য প্রত্যক্ষ-দর্শীর জন্মভূমি এই ভারতে, এই 'মহামানবের সাগরতীরে' তাহা দাঁড়াইতেই পারে নাই।

ভারতের জাতীয় সংস্কার

ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের নিয়ামকগণ নিজেদের প্রত্যক্ষ-করা সত্যের ভিত্তিতেই ভারতের সমাজজীবন পরিচালনা করার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে মানুষ যথার্থ উন্নতির পথে চলিতে পারে, তাহাদের মন ক্রমোন্নত হইতে পারে, উচ্চ উচ্চতর সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া, জীবনের গভীরতর রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিয়া পরম শান্তি, আনন্দ ও অমৃতত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

সেই ব্যবস্থানুযায়ী ভারতীয় সমাজ হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক। ফলে, সমগ্র জাতিরই কতকগুলি শুভসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া শুভ চিন্তা ও সৎকর্ম আচরণের ফলে। বলা বাহুল্য, একটা কয়েক সহস্রবৎসরব্যাপী জীবন্ত সভ্যতার ইতিহাসে বহু স্বার্থান্বেষীরা বিভিন্ন সময়ে উহার সমাজ-ব্যবস্থায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু কুসংস্কারও ঢুকাইয়া দিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আমাদের শুভসংস্কারগুলি আজিও জাগ্রত।

আজ আমরা অনেকেই জড়বাদভিত্তিক চিন্তায় প্রভাবান্বিত হইয়া অল্পকয়েকটি কুসংস্কারের সঙ্গে জাতির অজস্র শুভ সংস্কারকে ভাঙিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছি; ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজকে জড়বাদভিত্তিক করিতে চাহিতেছি। ভাবিতেছি ইহাই বুঝি প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু আসলে ইহা পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। যুগ-যুগান্তের সদভ্যাসের ফলে জাতির যে শুভসংস্কারগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের, যথার্থ প্রগতির পথনির্দেশক, মানুষের জীবনকে তাহা অতি নিম্নস্তরের সত্যের, প্রাণিজগতের সাধারণ সত্যের স্তর হইতে উচ্চতর সত্যের স্তরে উন্নীত করে। যেমন ভগবদ্‌বিশ্বাস, যেমন পবিত্রতা, যেমন সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও সেবা। এ সংস্কারগুলি থাকিলে তাহা মানুষকে ক্রমে

উপরের দিকেই টানিয়া তোলে। মনকে শান্ত করার, একাগ্র করার, বলিষ্ঠ করার একটি উপায় হইল নিয়মিতভাবে উহার জন্য অভ্যাস করা। সকাল-সন্ধ্যায় ভগবচ্চিন্তা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। একাগ্রতার সাধনা এবং কায়-মনোবাক্যে পবিত্রতা-পালনের চেষ্টায় যে মনের বল, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া যায় দেহমনে একটা প্রশান্তি আসে, বলিষ্ঠ উন্নততর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, তাহা আমরা অল্প কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা সত্য কিনা কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলেই আমাদের এ বিষয়ে সন্দেহের নিরসন হইবেই। আমাদের জাতির এই-জাতীয় যে-সব সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এমনিতে হয় নাই, বহু যুগের সাধনায় তাহা জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক হইয়াছে। পরিবেশ অনুকূল হইলে এগুলি ক্রমবর্ধিত হয়, বিপরীত অভ্যাসের ফলে এই স্বাভাবিক শুভ সংস্কারগুলি স্তিমিত হইয়া অশুভ সংস্কার প্রবল হয়। অবশ্য আমরা চেষ্টা করিয়াও ভারতের এই শুভসংস্কারকে বিনষ্ট কখনোই করিতে পারিব না, সাময়িকভাবে উহা স্তিমিত হইবে মাত্র এবং আমাদের প্রচেষ্টার ফল এইটুকু হইবে যে আমাদের আরো কিছুদিন বেশী দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

এই সংস্কারের রক্ষণই মানব সভ্যতাকে বাঁচাইতে পারে

আজ শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের চিন্তাকে জড়বাদের স্তরে নামাইয়া রাখিবার, মানুষের অস্তিত্ব যে দেহসীমিত, দেহাতীত তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা মনে গভীরভাবে আঁকিয়া দিবার স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াসও বহু স্থানে হইতেছে। কিন্তু শুভ সংস্কারগুলি গড়িয়া তোলার বা যাহাদের মধ্যে উহা আছে তাহা রক্ষা করিবার প্রয়াস ছাড়া মানবজাতি কিছুতেই যথার্থ উন্নতির লক্ষ্যাভিমুখী হইতেই পারে না। আমরা যেন না ভুলি, আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা ও কর্মই অভ্যাসে ও ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়। ছেলেবেলা হইতে পৃথিবীর সর্বত্র যদি সকলকে চিন্তায় ও কর্মে চার্বাকবাদ শেখানো যায় তাহা হইলে উহা ক্রমে মানবজাতির সংস্কারেই পরিণত হইবে, যেটুকু শুভসংস্কার এখনো আছে, তাহাও ক্রমে লোপ পাইবে। তখন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে বুদ্ধির স্তরে বিপুল পার্থক্য থাকিলেও মানসিক স্তরে পার্থক্য বিশেষ কিছুই থাকিবে না—এতকালের পরিশ্রমে মানুষ যতদূর আগাইয়া আসিয়াছে, তাহা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে।

অবশ্য তাহা হইবার নহে। সবদেশেই কিছু কিছু করিয়া, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে বিপুল-সংখ্যক মানুষের মনে শুভসংস্কার এত বেশী যে উহা মজ্জাগত, উহাকে সাময়িকভাবে কিছু দমিত হয়ত করা সম্ভব, উহার বিলোপসাধন কখনই সম্ভব নহে। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে অগণিত সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের এই শুভ সংস্কারই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য হারানো মানেই ভারতের মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে সমগ্র মানব-জাতিরও; কারণ তাহাকে পথ দেখাইবার আর কেহই থাকিবে না।

বর্তমান জগতের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, আজ প্রায় সর্বত্রই জড়বাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে।

ভারতেও আমরা কেহ কেহ ইহার বিস্তারে সহায়তা করিতেছি। মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করায় বৌদ্ধিক সমর্থন জড়বাদের মত আর কেহই দেয় না; তাই যুবমনকে ইহা সহজে আকৃষ্ট করে। প্রবৃত্তির তাড়না সমস্ত প্রাণি-

জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ভালমন্দ-বিচার, বিবেক একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। ইহাকে বিদায় দেওয়া অতি সহজ, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমর্থন যদি পাওয়া যায়; কিন্তু গড়া কঠিন। কারণ প্রথমটি নামিবার ঢালু পথ, দ্বিতীয়টি ওঠার।

যুগসমস্যার সমাধান ভারতকেই করিতে হইবে

আজ মানুষের কাছে অতি বড় একটি সমস্যা আসিয়াছে : সাম্যবাদ জগতের সর্বত্র আসিবেই, আজ বা দুদিন পরে। ভোগ-সাম্য ও অধিকার-সাম্য আজ বা কাল পৃথিবীর সব মানুষই চাহিবে। যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া নিষ্পেষিত হইয়া আসিতেছে, ভোগ ও বহুবিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা আজ জাগিয়াছে। এতদিন যে জাগিতে পারে নাই, স্বামীজী বলিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। আজ পৃথিবীর সবত্রই এই সঙ্ঘবদ্ধতা আসিয়াছে বা আসিতেছে।

সাম্যবাদ সর্বত্র আসিবেই—কিন্তু বর্তমানে তাহা যে আকারে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সে ইহার উপযোগী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠনের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ভাবিয়া মানুষের শুভ সংস্কারগুলিকেও চূর্ণ করিয়া চলিতেছে। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের সংশোধন প্রয়োজন; তাহা না হইলে উহা মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের উপযোগী হইবে না। মানুষের ভোগ- ও অধিকার-সাম্যের জন্য অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামোয় একটি মূর্তি আজ গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা এখনো হয় নাই, উহা এখনো যন্ত্রচালিত প্রাণহীন প্রতিমার মতো। উহার সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস, পবিত্রতা বা সংযম, মানুষের উচ্চতর অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করার প্রচেষ্টা প্রভৃতি শুভ সংস্কারগুলির গঠন, রক্ষণ ও বর্ধনের ব্যবস্থা বা যথার্থ ধর্ম সংযুক্ত হইলেই উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। সাম্যের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিতেও সহায়ক হইবে এই শুভসংস্কার-গুলি। ডেমোক্র্যাসি, সমাজবাদ প্রভৃতির ভিতরকার যথার্থ কল্যাণকর ভাবগুলি লইয়া শুভসংস্কারগুলির বা ধর্মের ভিত্তির উপর একটি প্রাণবন্ত প্রতিমা গড়িয়া তুলিতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ—বহু যুগের বহু রাজনীতির ও বিপরীত আদর্শের ঝঞ্ঝায় যাহার শুভসংস্কার বিলুপ্ত কখনো হয় নাই; এবং তাহাই হইবে নবযুগের আদর্শ মতবাদ।

সংস্কারমুক্ত হইবার নাম করিয়া ভারতীয় জাতির শুভ সংস্কারগুলি হইতেও মুক্ত হইবার সময় একথা যেন ভালভাবে আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, কেবল কতকগুলি অগভীর যুক্তির ধোঁয়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি বা আপাতমনোরম কোন প্রলোভনের মোহে গ্রস্ত হইয়া অগ্রসর না হই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র*

[১]

মঠ,

পোঃ—বেলুড়

জেলা—হাওড়া

৪. ৬. ৯৮

প্রিয় লালজী,

তোমার পোস্টকার্ড যথাসময়ে পাইয়াছি। জানিয়া খুবই সুখী হইলাম যে, তুমি ও তোমার পরিবারস্থ সকলে বেশ ভালই আছ। আশা করি তুমি যে পবিত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছ তাহা বেশ উপভোগ করিতেছ। তুমি স্বামীজীদিগকে তোমার স্বভাবসুলভ শ্রদ্ধার সহিত যেরূপ অক্লান্ত সেবা-যত্ন করিতেছ সে সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায়ই সংবাদ পাইয়া থাকি।

খুব সম্ভবতঃ মিস নোবল এত দিনে বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রোতারা তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ পছন্দ করিল তাহা জানিতে চাই। তোমার নিকট হইতে তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে একটা বিবরণ পাইলে খুবই খুশী হইব। গত এক পক্ষের মধ্যেই দুইবার সাইক্লোন (প্রচণ্ড ঝড়) হইয়া গেল, শেষবারের ঝড় অল্প সময় মাত্র স্থায়ী হইলেও উহাতে মঠের অনেক গাছ হাওয়ার বেগে ধরাশায়ী হইয়াছিল। প্রথমবারের ঝড় অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল এবং উহাতে অনেক ক্ষতিও হইয়াছিল; গঙ্গায় অনেক নৌকাডুবি হওয়ায় বহুলোকের প্রাণহানি হইয়াছিল।

সহরে প্লেগের ভীতি এখনও রহিয়াছে। আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু প্লেগহাসপাতালে দেখিতে গিয়াছিলেন কলিকাতার প্লেগ আসল প্লেগ কি না। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্লেগের লক্ষণের সঙ্গে আসল প্লেগের মিল আছে।

ভগবান না করুন, এখন আশঙ্কা হয় এই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে চারিদিকে উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

তোমরা সকলে ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদের

ব্রহ্মানন্দ

---

* ইংরেজী হইতে অনূদিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা*

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বাংলার নব যুগের ভাববিগ্রহ, ভাগবত-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন। এ নাম আজিকার দিনে বহু মানুষের ইষ্টনাম। তাঁরা প্রতিদিন তাঁদের পূজার আসন থেকে এই নাম স্মরণ করে প্রণাম নিবেদন করেন, আজও করেছেন। সেই সমস্ত মানুষের প্রণামের সঙ্গে আমার প্রণাম যুক্ত করি। তিনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

বিশ্ববিধাতার এই অতি বিশাল, অপরিমেয় সৃষ্টিশালায় আর কোথায় কোথায় প্রাণলীলার আশ্চর্য মহিমা ও বৈচিত্র্য প্রকটিত তা আজিও মানব-জ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু আমাদের চোখের সম্মুখেই এই মর্তলোকে প্রাণলীলার আধুনিকতম পর্যায়ে যে নরলীলা প্রকটিত, তার দিকে তাকিয়ে বা তাকে রচনা করে বিশ্ববিধাতা, মনে হয়, এক আশ্চর্য আনন্দ-লীলারস উপভোগ করেন। আর তার সঙ্গে নরদেহধারী আমরাও এই সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টাকে যুক্ত করে যে এক আশ্চর্য আনন্দ-রস উপলব্ধি করি মনুষ্য-উপলব্ধির মধ্যে তা বোধহয় তুলনা-রহিত।

এই মর্তলোকে অচ্ছিন্ন নরলীলার ধারায় পৃথিবীর এক এক প্রান্তে মানব-ইতিহাস যেন এক একটি বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করবার বাসনায় ব্যাকুল। পাশ্চাত্য দেশে ইউরোপ ও আমেরিকা ভূখণ্ডে মানবশক্তি বস্তুবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে নিজেকে একটি বিশেষ স্বরূপে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ইতিহাস তিন-চার শো বৎসরের অধিক নয়। আবার অন্যদিকে রাশিয়া ও চীনে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ইতিহাসের আর এক আশ্চর্য পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। লৌকিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল মনুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সার্থক হলে মানব-ইতিহাসে আরও একটি আশ্চর্য সার্থক অধ্যায় সংযোজিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পর্বত-সমুদ্রবেষ্টিত আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে ইতিহাস-পুরুষের অভিপ্রায়টি যেন ভিন্নরূপ এবং আরও স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করি। মানব-সভ্যতা তার সার্থক অভিব্যক্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে পৃথিবীর যে যে অংশে অভিব্যক্ত হয়েছিল আমাদের মাতৃভূমি তার অন্যতম। অন্য সমস্ত অংশেই সভ্যতার প্রদীপ্ত উদিত সূর্য কবে অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। সেই সব ভূখণ্ডে মানুষ যেমন সেদিনও ছিল, আজও তেমনি আছে; কিন্তু তারা সভ্যতার সেই দীপ্তির উত্তরাধিকারী নয়, সে সভ্যতার সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই, তারা মাত্র সেই দেশের অল্পকালের অধিবাসী। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষে বেশ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে যে সভ্যতার সূর্যোদয় হয়েছিল আজও তার দিনান্ত হয়নি। সেই সূর্যোদয়ই একটি দিনের যামে যামে অগ্রগতির মত পর্যায়ে পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। হয়তো পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল আমরা তারই উত্তরাধিকারী। ইতিহাসের যে অভিপ্রায়টি বহুদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করতে

---

* বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসব সভায় (১৮।২।৬৯) প্রদত্ত ভাষণ।

চেয়েছিল সেই অভিপ্রায়টি অচ্ছিন্নরূপে আমাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ আজও খুঁজে চলেছে। ইতিহাসের পক্ষে একে এক বিস্ময় বলেই মনে করি।

ইতিহাসের সেই অভিপ্রায়টির স্বরূপটি কি? পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ইতিহাস যে স্বরূপে প্রকাশিত হচ্ছে বা হতে চাচ্ছে তার থেকে সে স্বরূপটি অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইউরোপ যেখানে বস্তুবিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে বস্তুকণাকে বিভাজন করে আশ্চর্য এক শক্তিকে আবিষ্কার করে তাকে করায়ত্ত করেছে, ভারতবর্ষে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে মানবমন ও চৈতন্যকে নিয়ে, আরম্ভ হয়েছে সেই তার সভ্যতাবিকাশের আদি মুহূর্ত থেকে। এরই প্রমাণ মিলবে আমাদের লৌকিক জীবনের দিকে তাকালে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা বিদেশে অভিযান করিনি, বহির্ভারতের কোন দেশ জয় করিনি, কদাচিৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, বিদেশে বাণিজ্য করে মণিমাণিক্য বা অর্থসম্পদ নিজের দেশে বহন করে আনবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠিনি। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা এবং সৌরাষ্ট্র থেকে মণিপুর পর্যন্ত অঞ্চলে আমাদের জীবন কাল থেকে কালান্তরে বড় নিস্তরঙ্গ, বড় মন্থর, বড় ঘটনাহীন। হয়তো এরই মধ্যে কোন রাজা বা ভূস্বামী পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের রাজা বা ভূস্বামীর সঙ্গে সাময়িকভাবে কিছু কলহ বা কিছু সংগ্রাম বা কিছু রক্তপাত করেছেন এই মাত্র। আমাদের জন-সমাজের বৃহৎ ব্যাপক যে জীবন তা বরাবরই সমান নিরুত্তাপ ও নিস্তরঙ্গ ছিল। তবে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিদেশী অভিযানকারীর অত্যাচার ও অস্ত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা একদা বিদেশ থেকে অভিযানকারী হয়ে অস্ত্রহাতে এই ভূমিখণ্ডে এসেছিল, তারাই পরবর্তীকালে এই মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করে প্রতিবেশী হয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে। এমনটি একবারই ঘটেনি, বারবারই ঘটেছে। এই রাজবৃত্তের অন্তরালে, আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে, জীবনের সত্যকে জানবার ও উদ্ঘাটনের আকুল তৃষ্ণায় তাপিত হয়ে, নচিকেতার মত, বহু মানুষ লৌকিক সংসারের সুখ ও সঙ্গ পরিত্যাগ করে গৃহস্থ জীবনের সমান্তরালে, লোকচক্ষুর অগোচরে প্রবাহিত সন্ন্যাস জীবনে গিয়ে প্রবেশ করেছেন। রাজপুত্র গৌতম, মহাবীর এমনি ধারার পুণ্য নাম। সেই চির-প্রবাহিত প্রবাহে আজও ছেদ পড়েনি।

মানুষ থেকে, জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে এঁরা জীবনের সত্য ও অর্থকে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। এই কাজে কেউ স্রষ্টা ঈশ্বরকে তাঁদের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন, কেউ করেননি। এই প্রচেষ্টায় কত পরীক্ষা, কত নিরীক্ষা! কত বিচিত্র পথ, কত বিচিত্র মত! এরই ফলে কেউ নিরীশ্বরবাদী, কেউ ঈশ্বরবাদী, কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী ব্রহ্মবাদী; কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ সৌর-উপাসক; কেউ তান্ত্রিক, কেউ বীরাচারী, কেউ বামাচারী। কেউ ঈশ্বরকে ভজনা করেছেন প্রিয়রূপে, কেউ সখারূপে, কেউ পিতারূপে, কেউ প্রভুরূপে, কেউ বা জননীরূপে। এই সাধকরা অনেকেই সত্যসন্ধান করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মত গলে হারিয়ে গিয়ে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। কেউ বা সেই আশ্চর্যকে জেনে সেই অমৃতময় আস্বাদকে মরণশীল, পীড়িত মানুষের জন্য মানবসমাজে বহন করে এনেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই চলমান জ্যোতিষ্ক-সমাজের অন্যতম প্রধান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তবে তাঁর ক্ষেত্রে যেন এই লীলাটি একটু পৃথক ও বিচিত্র ভঙ্গীর। অবশ্য সব মহৎ সাধকের সাধনার ধারাটি সশ্রদ্ধ অনুরাগের সঙ্গে চর্চা করলে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তার বিশেষত্ব নিবেদন করি। তার পূর্বে একটি সর্বজনবিদিত বিষয় পুনরুক্তি করছি: বঙ্গদেশে ঈশ্বর কালিকা-মূর্তিতে প্রকটিত, সর্বভারতীয় ধরনের বিভিন্ন সাধনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মত বাংলাদেশে প্রচলিত থাকলেও, বাংলাদেশে ঈশ্বরকে মাতৃমূর্তিতে সাধনাটিই বিশেষ স্ফূর্তি-লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণও ঈশ্বরকে প্রধানত মাতৃভাবেই আরাধনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে হয় ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য আকুল হন, ভগবানও ভক্তের সঙ্গলাভের ও সাধনার জন্য তেমনি আকুলভাবে যেন অপেক্ষা করছিলেন। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে এই সুমহান সাধক ও ঈশ্বরভক্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, সেখান থেকে পুণ্যতোয়া গঙ্গাধারার উজানে, কিছু উত্তরে, গঙ্গার অপরতীরে ঈশ্বররূপিণী জননী শ্রীশ্রীভবতারিণী যেন ভক্ত সন্তানের জন্য খেলার আঙিনা পেতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন পরম আগ্রহে। সেই আগ্রহ পরিপূরণের জন্যই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের অঙ্গনে সন্তানের মূর্তিতে আবির্ভূত হন। ভক্ত-ভগবানের আশ্চর্য প্রেমের লীলা আরম্ভ হল।

ঈশ্বর ও ভক্তের ব্যক্তিগত সাধনার কথাটি মাত্র উল্লেখ করেই এখানে বলতে পারি দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে এই আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, লৌকিক সংজ্ঞায় যাকে পণ্ডিত বলে তা তিনি ছিলেন না, ধনীও ছিলেন না, কিন্তু তাঁকেই সেদিন জাতির প্রয়োজন ছিল। সেই দিক থেকে এ আবির্ভাব ঐতিহাসিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, এবং অনেক পরিমাণ অন্তঃস্রোতচারী এবং সর্বোপরি তা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত। এই অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় মধ্যে মধ্যে মন্থরতা আসে কালের করস্পর্শে তার বেগই শুধু মন্দীভূত হয় না তাতে সহস্র ভয়ার্ত ও ক্ষুদ্র-চিত্তের আবিলতা ও আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়। জীবনজগে বিষ-জর্জরতা অনুভব করি। তখনই যেন কোন ঐশ্বরিক প্রসাদে অথবা এই ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের বিশিষ্ট প্রয়োজনে এক বা একাধিক পুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের সাধন-মহিমার শক্তিতে সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনা ও আবিলতাকে দূর ও পরিষ্কার করে তাকে কালোচিত মুক্তি দান করে যান। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সামান্য কিছুদূর উজানে গেলেই তার বহু উদাহরণ দৃষ্টিতে আসবে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে আর একজন তেজস্বী পুরুষ এই বাংলাদেশেই ভাগীরথীর ধারার আরও খানিকটা উত্তরে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হয়ে হরিচরণস্রুত নামের পুণ্য ধারায় বাঙালীর জীবনের আবর্জনা একবার পরিষ্কার করে দিয়ে হরিনামের পাদপীঠ রচনা করে গিয়েছিলেন। তার সঞ্জীবনীতে বাঙালী জাতি তখনকার মত বেঁচে গিয়েছিল। শুধু বাঁচা নয়—নতুন করে সঞ্জীবিত হয়েছিল। আজও তার রেশ অনুভব করি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার একবার এমনি আবির্ভাবের যেন প্রয়োজন ঘটেছিল। তার কিছুকাল পূর্বে দেশের পুরাতন রাজশক্তি বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়েছে; তার স্থলে আবির্ভূত হয়েছে সমুদ্রপার থেকে

আগত নবীন এক আগন্তুক রাজশক্তি। তার হাতে শুধু কঠিন শাসনদণ্ডই ছিল না, তার সে শাসনযন্ত্র ছিল সুশৃঙ্খল। সেই সঙ্গে সে সমুদ্রপার থেকে নিয়ে এসেছিল পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদ ও এক অভিনব দর্শন। তার সম্মুখে আমাদের প্রাচীন সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, সবই প্রবল আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চলেছে। আমাদের ধ্যান-ধারণা সেদিন এক দিকে সংস্কারের অন্ধকারে আবৃত, সমাজদেহ জীর্ণ। অন্য দিকে নবীন বিদেশী সংস্কৃতির জয়ধ্বজা আমাদেরই এক অংশ সগৌরবে, সদম্ভ মূঢ়তার সঙ্গে বহন করে চলেছি। আমাদের অপরাংশ মূক, পঙ্গু; সমস্ত বিশ্বাস সংশয়ে বিমূঢ়। সেই মুহূর্তে ইতিহাসের অমোঘ অভিপ্রায়ে সর্বগ্রন্থি-মোচনকারী, সর্বসংশয়-ছেদনকারী উপলব্ধি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিকে যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এক নবধর্মের প্রবর্তন করলেন, অন্যদিকে আমাদের সনাতন ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধির অঙ্গ থেকে সঞ্চিত মালিন্য ও আবর্জনাকে বিদূরিত করে তাকে কালোচিত নবীন এক অম্লান মূর্তিতে তিনি স্থাপন করলেন। ভারতের সনাতন উপলব্ধি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর শ্রীপদপ্রান্তে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বাণীমূর্তি লাভ করল। পরবর্তীকালে এরই কর্মকাণ্ড রচিত হল তাঁর প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাণী প্রচার করেছেন তা ভারতের শুধু কেন, তা মনুষ্যসভ্যতার নির্মলতম ও সরলতম বাণী। তাই এক দিকে সে তাঁরই জীবনের বাণী। তিনি নিজে তাঁর কোন বাণী লিপিবদ্ধ করেননি, করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। গঙ্গোত্রীর উৎস-মুখ কি গঙ্গাধারার অঞ্জলিকে কমণ্ডলুতে ধারণ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করে? তিনিও করেননি। তবে আমাদের মহাসৌভাগ্য, তাঁরই এক ভক্ত আমাদের জন্য তার কিছু কিছু গ্রন্থাকারে গ্রন্থন করে গিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কয়েকখণ্ড 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মতই আমাদের কাছে মহা শ্লাঘার সামগ্রী এবং আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মহামূল্য সংযোজন। যাঁরা এই মহাগ্রন্থ পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন—এই গ্রন্থগুলির মধ্যে যে অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও গূঢ় উপলব্ধির কথা রয়েছে তা কতখানি শিশুপাঠ্য, কত সরল, কত সহজ ও কত কাব্যময়! পড়ামাত্র অনুভব হয় যে, যিনি এই বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন তাঁর উপলব্ধি কত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী, তা কত সরল ও সহজ! এগুলি যিশুর বাণীর সমতুল্য বলে মনে করলে অন্যায় হবে না। এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের হৃদয় শুকিয়ে গেলে এই বাণীর ভৃঙ্গারের কাছে সশ্রদ্ধ অঞ্জলি পাতলে এক মুহূর্তে সকলসংশয়-নিরসনকারী অমৃতধারা পেতে বিলম্ব হবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্ত গ্রন্থ-কর্তা শ্রীমকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসংশয়-মোচনকারী, সর্বগ্রন্থি-ছেদনকারী অমৃতবাণী আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার কল্যাণে সনাতনকে নবীন, নির্মল মূর্তিতে আবিষ্কার করে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সমাজদেহের বহু গ্লানি বিদূরিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদিকে স্বামী বিবেকানন্দকে আশীর্বাদস্বরূপ দান করে গিয়েছেন—এ সবই সত্য, অতি সত্য। তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি আমাদের মনে যে

প্রেমের আসনে আজও অসীন তা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা থেকে পৃথক।

ব্যক্তিহিসাবে তাঁর মূর্তি কল্পনা করতে গেলেই তাঁকে এক অতি সাধারণ, কিন্তু এক আশ্চর্য মূর্তিতে দেখতে পাই। সেখানে তিনি এবং শ্রীশ্রীভবতারিণী অচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন। সে এক আশ্চর্য ভালবাসার লীলা! সেই লীলায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজ-রাজেশ্বর, জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তিতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাতের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করে নিজে তৃপ্ত হয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-বিগ্রহের আধারে যে সন্তানরূপী শিশু অনন্তকাল মায়ের জন্য ব্যাকুল হস্ত সম্প্রসারিত করেছে তাকে কৃতকৃতার্থ করেছেন। কল্পনা করি—সকল মানবদৃষ্টির অন্তরালে তিনি মাকে অনুরোধ করেছেন—যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি, একবার তেমনি করে নাচ দেখি মা! মা সন্তানের সে অনুরোধ শিরোধার্য করে কন্যারূপে নেচেও হয়তো পরম প্রীতিলাভ করেছেন।

বিবেকানন্দ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

জীবন আসিয়াছিল সীমাবদ্ধ লোকে দিকে দিকে ফেলিয়া চরণ।
ক্লান্তসিংহসম দেহ'পরে পরম সুষুপ্তি দিল টানি আবরণ।
স্থূলদেহ হয়ে গেল অন্তর্হিত! ওকি মৃত্যু? ওকি মৃত্যুময়!
কালের মুহূর্তে ধরা জীবনের পঞ্চপাত্রে অমর বিজয়! আর অগাধ বিস্ময়!

* * *

কণ্ঠের গভীর ধ্বনি ফিরাইয়া নিল সহসা আকাশে
সে ধ্বনি ভরিয়া রবে পৃথিবীর কানে চিরকাল!
চল্লিশ-অনতিক্রান্ত ক্লান্ত জীবনের পবিত্র নিঃশ্বাস
মিশিয়া বায়ুতে রবে চিরদিন আকাশপাতাল।
যে দীপ জ্বালিয়াছিলে জানি কখনোই তাহা হইবে না ক্ষীণ
জ্বালা রবে লোকে লোকে গ্রহে গ্রহে আকাশে তারার।
পদচিহ্ন'পর তব ফুটিয়া উঠিবে ফুল জানি চিরদিন
বিশ্বভরা দেশে দেশে যাত্রাপথ ভরিয়া তোমার।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র*

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

এক

ব্রহ্মবাদিন ও আলাসিঙ্গা পেরুমল

॥ ১ ॥

স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তা ও কর্মের আলোচনা অল্পবিস্তর হলেও একটি বিষয়ে আমরা যতদূর দেখেছি স্বতন্ত্র মূল্য দিয়ে আলোচনা হয়নি, তা হল, সাময়িক পত্রের প্রবর্তক বিবেকানন্দ। অথচ সাময়িক পত্র পরিচালনার ব্যাপারটি স্বামীজীর মনের বেশ কিছু অংশ অধিকার করেছিল,—তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টার অন্যতম ক্ষেত্র তাঁর পত্রিকাগুলি।

স্বামীজী, এক কথায় বলতে গেলে, ভারতবর্ষে তিনটি সাময়িক পত্রের প্রবর্তক, এবং তাঁর জীবনকালের মধ্যেই কয়েক বৎসরের পরিধিতে পত্রিকাগুলি বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বাইরেও ক্ষুদ্র প্যামফ্লেট জাতীয় পত্রিকা বার করার চেষ্টা করেন তাঁর ভাবানুরাগীরা; ইংলণ্ড বা আমেরিকায় তা প্রকাশিত হয়ও, যদিও পত্রিকাগুলির আয়ু দীর্ঘ হয়নি। পরে অবশ্য পাশ্চাত্যখণ্ডে বেদান্ত-প্রচারক উৎকৃষ্ট পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে, যার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত 'Vedanta and the West',—স্বামী প্রভবানন্দের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত আশ্রম থেকে এই দ্বৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, এবং ক্রিস্টোফার ঈশারউড প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে—ঠিক বর্তমান মুহূর্তে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকার সংখ্যা অল্প নয়, এবং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা যথেষ্ট।[১]

পত্রিকা-প্রকাশ সম্বন্ধে স্বামীজীর ইচ্ছার সূত্রপাত ঠিক কোন্ সময়ে, তার যথার্থ ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সহজেই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচারের সঙ্কল্প যখন তিনি গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই প্রচার-বাহন পত্রিকার কথা নিশ্চয় তাঁর কল্পনায় উদিত হয়েছিল। ভারতে নবোদ্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত-প্রচারে পত্রিকার বড় ভূমিকা তিনি বাল্যকাল থেকেই দেখেছেন, আবার ঐসব পত্রিকার শূন্যগর্ভতার রূপও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, পাশ্চাত্য-

১ কয়েকটি পত্রিকার নাম—

'প্রবুদ্ধ ভারত,' 'উদ্বোধন,' 'বেদান্তকেশরী,' 'প্রবুদ্ধ কেরলম্,' 'জীবনবিকাশ,' 'বিশ্ববাণী,' 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্,' 'বেদান্ত মান্থলি বুলেটিন,' 'বেদান্ত দর্পণ', 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট,' 'বেদান্ত ফর দি ইস্ট অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট,' 'দি মেসেজ অব দি ইস্ট', 'বিবেক জ্যোতি' প্রভৃতি।

বন্ধ হয়ে গেছে—'ব্রহ্মবাদিন,' 'দি মর্ণিং স্টার,' 'সমন্বয়,' 'বেদান্ত প্যাসিফিক,' 'ভয়েস অব ফ্রিডম।'

এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। জাপানী ভাষাতেও পত্রিকা দেখেছি। ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাসমূহ বাদ দিয়ে অন্য ভাষাতেও ক্ষুদ্র পত্রিকা থাকতে পারে বা ছিল, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এমন হতে পারে।

*"ভারতীয় পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ: (১৮৯৩—১৯০২)" নামক গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

পন্থায় শিক্ষিত কতকগুলি লোকের সাম্প্রদায়িক বা স্বার্থগত চীৎকার কিভাবে পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ছে, যার মধ্যে কাজের আহ্বান নেই, আছে শুধু কথার রাশি—জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সেই পত্রিকাগুলি জনসাধারণের মতপ্রকাশের ভঙ্গি করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ এই প্রাণ-ও প্রাতভাহীন সংবাদপত্রের কোলাহলকে ঘৃণা করেছিলেন, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে তিনি জানতেন, ভারতীয় সভ্যতার বিকৃত অথবা আংশিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তার প্রাণদ সত্যকে তুলে ধরতে সত্যসন্ধ পত্রিকার দরকার কতখানি। আমেরিকায় থাকাকালেই ভারতবর্ষের জন্য বেদান্ত আন্দোলনের সমর্থক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে। স্বামীজী সংবাদপত্রের সংবর্ধনা যে-পরিমাণে পেয়েছিলেন, সেই পরিমাণেই সংবাদপত্রে তাঁর মত বা চরিত্রকে বিকৃত করার চেষ্টাও দেখেছিলেন। ভারতবর্ষের কতকগুলি কাগজ তাঁর মতের যথেষ্ট পাবলিশিটি দিয়েছিল, কিন্তু স্বামীজী জানতেন, সংবাদপত্রের এই সমর্থন ততক্ষণ, যতক্ষণ সংবাদপত্রের মনোমত তিনি, —কিন্তু মতপার্থক্য আসবেই; সে ক্ষেত্রে এই সকল পত্রপত্রিকার সমর্থন পেয়ে যেতে হলে স্বামীজীকে নিজের মতের স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে। কোনো বিবেকানন্দের পক্ষে নিশ্চয় তা করা সম্ভব নয়! সুতরাং স্বামীজী স্থির করলেন, বেদান্ত আন্দোলনের মুখপত্র না হলে চলবে না।

পত্রিকা-প্রকাশে স্বামীজীর **সক্রিয় ইচ্ছার** সূত্রপাত পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্মের আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করার পর থেকেই। তাঁর কীর্তি-কথা সংবাদপত্র-মারফত ভারতে পৌঁছে প্রবল আবেগের সৃষ্টি করেছিল, সেই ভাবাবেগকে নিছক বন্দনাগানের মধ্যে নিঃশেষিত হতে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে চাইলেন। সংঘস্থাপন এবং সংঘের মুখপত্র-প্রতিষ্ঠায় তাই আগ্রহী হলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনে প্রথমেই সেই মানুষটির মুখ ভেসে ওঠল, যিনি তাঁর আমেরিকা-গমনের নিমিত্ত হয়েছিলেন। আলাসিঙ্গা পেরুমল! ধন্য চরিত্র! রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় স্থানের অধিকারী এই মানুষটি বিবেকানন্দের বিদেশ-গমনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং বিবেকানন্দ-আদিষ্ট প্রধান বেদান্ত-পত্রিকার পরিচালক-সম্পাদক। ভগিনী নিবেদিতা ভিন্ন স্বামীজীর কাজে এত বড় ভূমিকা স্বামীজীর আর কোনো শিষ্যের নেই, এবং সেই জন্যই নিবেদিতার কাছে "No one like him, Dear Alasinga !"[২]

আর একটি ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষের অপরিসীম ঋণ আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে—তাঁকে সম্বোধন করেই স্বামীজীর অগ্নিময় পত্রের অধিকাংশ লিখিত, ভারতবর্ষ তার আত্মবোধ ও আত্মপ্রসারের মহাবাণী যে-পত্রগুলি থেকে সংগ্রহ করেছিল তার সংগ্রামের কালে।

পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা স্বামীজীর মতই আলাসিঙ্গাও অনুভব করেছিলেন। স্বামীজীর কাছে সম্ভবত তিনিই প্রথম পত্রিকা-প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজী সে ইচ্ছার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও গোড়ায় মানব-সেবামূলক কর্মের অধিক মূল্যের কথা লিখে পাঠান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে চিকাগো থেকে আলাসিঙ্গাকে উদ্দীপনাময় এক চিঠিতে ঐ কথা লেখেন:

> "আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া

২ মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৩১শে আগস্ট, ১৯০৪-এর চিঠি।

একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা কর। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই সংঘ বাড়াইতে থাকো—উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পারো, কর। নদীতে যখন জল থাকিবে না, তখন পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। **পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পরিচালন ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য—যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল।** ভট্টাচার্যের গৃহে একটি সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। **পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য।** যে কোনরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না, কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।"

এই পত্রের রচনাভঙ্গি থেকে মনে হয়, আলাসিঙ্গা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কোনো অভিপ্রায় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষা-বিস্তারের অধিক মূল্যের বিষয়ে অধিক জোর দিয়েছেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই দেখতে পাব, স্বামীজীই আলাসিঙ্গাকে পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছেন, যা ক্রমে তাগিদে পরিণত হবে। স্বামীজীর মনোভাবের এই ঈষৎ দিক-পরিবর্তনের কারণ কি?

যতদূর মনে হয়, স্বামীজী আলাসিঙ্গা ও মাদ্রাজী ভক্তগণের প্রকৃতি ও সামর্থ্যসীমা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আর একবার চিন্তা করে নিয়েছিলেন। যে মানবসেবা ও দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা তিনি ভাবছিলেন, সে কার্য সিদ্ধ করার উপযোগী মানুষ সম্ভবতঃ আলাসিঙ্গারা ছিলেন না। আলাসিঙ্গা ধর্ম-প্রচারে উৎসাহী। এ-ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করতে পারেন। আলোচনা-চক্র, প্রচার, জনসংযোগ, পত্রিকা ও পুস্তিকা-প্রকাশ—এ সকল তাঁর প্রিয় কার্য। স্বামীজী সে কথা বুঝে আলাসিঙ্গাকে তাঁর স্বধর্মেই শেষ-পর্যন্ত নিয়োগ করলেন। আমরা দেখতে পাব, আলাসিঙ্গা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই 'স্বধর্মে' নিরত ছিলেন।

এ ছাড়া, শ্রীমতী লুই বার্কের গবেষণা অনুযায়ী বলা যায়,—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বামীজীর মনে বেদান্তকে বিশ্বধর্ম করে তোলার ইচ্ছা জাগে। মনে হয়, তদনু-যায়ী ঐ বেদান্তের ভারতীয় প্রচার-পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন ও সে বিষয়ে আলাসিঙ্গাকে উৎসাহ দেন।

॥ ২ ॥

এইখানে পত্রিকা-বিষয়ক বর্ণনা কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে আমরা আলাসিঙ্গার জীবনতথ্যের মধ্যে অল্পভাবে প্রবেশ করতে চাই। স্বামীজী কেন পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন, তা এই জীবন-তথ্যের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হবে।

দুঃখের বিষয়, আলাসিঙ্গার জীবন সম্বন্ধে বেশী উপাদান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে—(১) তাঁর দেহত্যাগের পরে 'ব্রহ্মবাদিনে' প্রকাশিত শোক-প্রবন্ধে; (২) 'দিনমণি' পত্রিকা থেকে (১৯৩০ বার্ষিক সংখ্যা) 'বেদান্ত কেশরী'তে অনূদিত একটি রচনায় (বেদান্ত কেশরী, ডিসেম্বর, ১৯৪১); (৩) 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ১৯৪৭, অগস্ট সংখ্যায় আলাসিঙ্গার নাতি এম জি শ্রীনিবাসন-এর প্রবন্ধ থেকে।

আলাসিঙ্গার শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর নাতি শ্রীনিবাসনের লেখা থেকে তথ্য সংকলন করে দিচ্ছি:

"মহীশূর রাজ্যের চিকমাগালুরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাসিঙ্গার জন্ম। পিতা নরসিমাচার্য ধনী না হলেও সম্ভ্রান্ত। তাঁরা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মহীশূরের মাণ্ড্য গ্রামে তাঁদের আদি বাস। স্থানীয় এক মিউনিসিপ্যালিটিতে পিতা কেরাণী ছিলেন। পরে মাদ্রাজে চাকরি নেন। আলাসিঙ্গার শিক্ষা প্রথমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরে মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে। শেষোক্ত কলেজে তিনি সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ডাঃ উইলিয়ম মিলারের এক প্রিয় শ্রেষ্ঠ ছাত্র। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানে ডিগ্রি নেবার পরে আলাসিঙ্গা ল' কলেজে সামান্য কিছু সময়ের জন্য পড়েন। অনিবার্য কারণে আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁকে অল্প বয়সেই চাকরির সন্ধান করতে হয়। প্রথমে কুম্ভকোনমের এক স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন; তা ছেড়ে দিয়ে ১৮৮৭ সালে চিদাম্বরমে পচিআপ্পা স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এমনই যোগ্যতার পরিচয় দেন যে, তিন বছরের মধ্যে মাদ্রাজে প'চআপ্পার হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি তাঁর অল্পায়ু জীবনের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর কিছু আগে পচিআপ্পা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ অবধি তিনি 'পচিআপ্পা ট্রাস্ট'-এর সেবা করে গেছেন পরম আনুগত্যের সঙ্গে। ছাত্র ও সহকর্মীদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তিনি প্রচুর লাভ করেছেন।"[৩]

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন অতঃপর জানিয়েছেন, বিজ্ঞানশিক্ষা দান করাই আলাসিঙ্গার জীবনোদ্দেশ্য ছিল না, কিংবা রাজনৈতিক বীরত্বও তিনি কামনা করেননি, ভারতের জীবনসঙ্গীত যে ধর্মেই ঝঙ্কৃত তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন; ক্রীস্টান মিশনারীরা ভারতীয় ধর্মের যে-সব বিকৃত ব্যাখ্যা বা কুৎসা করত, তা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। আলাসিঙ্গা যখন প্রতিকারের উপায়-সন্ধানে ব্যাকুল, তখনি তাঁর সঙ্গে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পরিচয়। স্বামী বিবেকানন্দ (তখন স্বামী সচ্চিদানন্দ) কন্যাকুমারিকায়

---

৩ আলাসিঙ্গার দেহান্ত হয় ১১মে, ১৯০৯ তারিখে। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৪৪ বৎসর। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নীচের চোয়ালে ক্যানসার হয়। তাতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল এর চার বছর আগে।

দিব্যানুভূতিলাভ ও ভবিষ্যদ্দর্শন করবার পরে তিরুবনান্দপুরমে যান। সেখানে সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক রায় বাহাদুর এম রঙ্গাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি আলাসিঙ্গার ভগিনীপতি। এই সূত্রেই স্বামীজীর সঙ্গে আলাসিঙ্গার—'মহান গুরুর সঙ্গে মহান শিষ্যের পরিচয় ঘটে।'

১৮৯৩ সালের শেষ দিকে চিকাগোয় বিরাট আকারে ধর্মমহাসভা বসছে, আলাসিঙ্গা এই সংবাদে বিশেষ চঞ্চল হন। ডাঃ বারোজ, ডাঃ উইলিয়ম মিলারকে ধর্মমহাসভার বিষয়ে লিখেছিলেন। আলাসিঙ্গার কাকা বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত যোগী পার্থসারথি আয়েঙ্গার আমেরিকার 'হিন্দু লীগের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনিই আলাসিঙ্গাকে ধর্মমহাসভার সংবাদ দেন। হিন্দুধর্মের উত্থানের ভাবনায় আলাসিঙ্গা পূর্বাবধি ব্যাকুল আন্তর্জাতিক এমন একটি অধিবেশনের গুরুত্ব তাঁর চোখে স্বভাবতই ধরা পড়ে—হিন্দুধর্মের পক্ষে একজন যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ভাবনায় তাই খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন, অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্যকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি রাজী হননি। আলাসিঙ্গা কিছুটা হতাশ হলেও চেষ্টা ছাড়েননি। এই সময়ে একদিন তিনি তাঁর ছোট ভাই এম সি কৃষ্ণমাচারের কাছ থেকে শুনলেন, একজন তরুণ সন্ন্যাসী মাদ্রাজে এসেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে আছেন, হিন্দুশাস্ত্র এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল। কৌতূহলী আলাসিঙ্গা, জি জি নরসিমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। "প্রথম দর্শনেই আলাসিঙ্গা যেন পূর্বসংস্কারে বুঝলেন—এই সেই প্রার্থিত পুরুষ। ... স্বামীজীর চোখে যে আলো জলছিল তা যেন আলাসিঙ্গাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই অজানা সন্ন্যাসীকে ভালবাসবার, গুরুরূপে বরণ করবার অনিবার্য আবেগে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন।"

আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বামীজী, চিকাগোয় যাচ্ছেন না কেন?' 'কেন নয়? ঠিক তো!'—স্বামীজী বলেছিলেন। আলাসিঙ্গা ক্রমেই অনুরোধের পরিমাণ বাড়াতে লাগলেন; তিনি অনুভব করেছিলেন, বহির্জগতে সনাতন হিন্দুধর্মের উপস্থিত হবার এই পরম সুযোগ, বোধহয় চরম সুযোগ। স্বামীজীর মনস্থির করতে সময় লেগেছিল। কিন্তু আলাসিঙ্গার নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। "১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শিবরাত্রির দিন; সারাক্ষণ স্বামীজী প্রায় মৌন, গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন, সেই রাত্রেই স্বামীজী স্থির করলেন—তিনি আমেরিকায় যাবেন।"

এর পরে স্বামীজীর যাত্রার জন্য আলাসিঙ্গা কিভাবে অর্থসংগ্রহ করেছেন, কিভাবে তাঁকে বিদায় দিয়েছেন, সেকথা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন বলেছেন তাঁর লেখায়। অন্য রচনায় আমরা বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করেছি, এখানে পুনঃ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। আলাসিঙ্গার বিষয়ে উপরে যে-সব তথ্য পেলাম তার সঙ্গে 'দিনমণি' পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত আর একটি সংবাদ যোগ করে দেওয়া উচিত—আলাসিঙ্গা ভারতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন! তাঁরা আলাসিঙ্গাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শ্রীনিবাসনের লেখায় এবং 'দিনমণি' পত্রিকার লেখায় অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে আলাসিঙ্গার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পাওয়া যায়।

॥ ৩ ॥

সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলাসিঙ্গার মিশবার ক্ষমতা, কর্মপটুতা ও নিষ্ঠাশক্তির দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের সামর্থ্যের কথা স্বামীজীর জানা ছিল। এই ক্ষমতার জন্য আলাসিঙ্গার পক্ষে পত্রিকা চালানোই যে সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ কাজ, তা বুঝলেন। তদনুযায়ী তিনি একাজে আলাসিঙ্গাকে উৎসাহিত করে চললেন। কয়েকটি চিঠির অংশ পরপর উদ্ধৃত করা যাক :

"পত্রিকাখানা বার কর —আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাব।...কাগজ ছাপানো ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা করব।...মাদ্রাজ থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল ?... কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাকো, তাতেই তার মেজাজ ঠিক থাকবে।"

(আলাসিঙ্গাকে। ১১ জুলাই, ১৮৯৪)

"একটা ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কমপক্ষে কত খরচ পড়ে, হিসেব করে আমাকে জানাবে, আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানা জানাবে। আমি তাহলে তার জন্য টাকা পাঠাব, শুধু তাই নয়, আমেরিকায় আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা করব। কলকাতায়ও ঐ রকম করতে বল।...

"আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কাজ আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বার করে দাও, এবং আর আর আনুষঙ্গিক যা আবশ্যক, তার তোড়জোড় কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের মধ্যে গোপন রেখো।...

"এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সংঘবদ্ধ হতে পারো, এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার করতে পারো, ততই তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটি শীঘ্র করে ফেলে আমাকে লেখো। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাকে হিন্দুদের মনে কোনো আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতে ('প্র+বুদ্ধ') বুদ্ধ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ আছে—তার সঙ্গে 'ভারত' জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে।"

(আলাসিঙ্গাকে। ৩১ অগস্ট, ১৮৯৪)

"...তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার কথা ছিল ছাড়িও না।...

যদি পারো তবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র উভয়ই বাহির কর।

আমার যে সকল ভ্রাতা চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন। আমিও অনেক গ্রাহক জোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব।"

(আলাসিঙ্গাকে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)

"যদি বৈদান্তিক ভাবধারার একটি পত্রিকা বার করতে পারো, তা আমাদের কাজকে এগিয়ে দেবে কাজে লেগে পড। অপরকে সমালোচনা করো না। যদি সত্যকার কিছু বাণী দেবার থাকে দাও, শেখাবার থাকে শেখাও তার বেশী দরকার নেই।… একটা কিছু করে আমায় দেখাও। একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, থাকবার জন্য একখানা বাড়ি করে আমায় দেখাও।"

(আলাসিঙ্গাকে। ১৮৯৪)

স্বামীজীর যে-সকল পত্রাংশ উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে দেখা যায়, স্বামীজী প্রস্তাবিত কাগজের পূর্ণ কর্তৃত্ব আলাসিঙ্গার উপরে দিয়েছিলেন; এবং কাগজের অর্থের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন। আরও দেখতে পাওয়া যায়, কাগজের সঙ্গে স্বামীজী একটি সংঘ ও একটি মন্দিরের পরিকল্পনাও করেছেন। সংঘের নামকরণ করেছেন 'প্রবুদ্ধ ভারত'। ঐ নামকরণের কারণও জানিয়েছেন: ঐ নামের মধ্যে ভারতের জাগরণের ঘোষণা থাকবে, এবং 'বুদ্ধ' শব্দ থাকার জন্য ঐ নামের দ্বারা 'হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন সূচিত' হবে। নামটি স্বামীজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। পত্রিকার নাম 'প্রবুদ্ধ ভারত' করতে হবে একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি, কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় হয়ত তাই ছিল; পরে দেখা যাবে, দ্বিতীয় পত্রিকাটির ক্ষেত্রে এই নামটিই গৃহীত হয়েছিল।[৪]

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে আর একটি জিনিস দেখা যায়, স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, সাময়িক পত্রিকার মত সংবাদপত্রও প্রকাশিত হোক। তাঁর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়নি, তখন বা পরে।

স্বামীজীর পরিকল্পনা এখানেই শেষ নয়—ইংরাজির মত দেশীয় ভাষাতেও পত্রিকা চাইলেন। ১৮৯৫, ৩রা জানুয়ারী বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখলেন:

"প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে. ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে। … ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্র-স্বরূপ একখানি ইংরাজি ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।"

যতদূর পেয়েছি, ১১ জুলাই, ১৮৯৪-এর পরে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে পত্রিকা বার করার চেষ্টা করতে প্রথম বলেন। পত্রিকার অভিপ্রায় যে আলাসিঙ্গার মাথায় তার পূর্ব থেকেই ছিল, তাও দেখেছি। তাহলেও, স্বামীজীর নির্দেশ পাবার পরেও আয়োজন করতে বছরখানেক কেটে গেল। স্বামীজী ১৮৯৫ র ৬ মে আলাসিঙ্গাকে যে চিঠি লেখেন, তাতে মনে হয়, তিনি জেনেছেন যে, আলাসিঙ্গা পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। স্বামীজী ঐ চিঠিতে প্রস্তাবিত কাগজের উচিত-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বিস্তারিত লিখে পাঠালেন—

"এখন কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে আমার। এই পত্রিকায় গুরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে

৪ প্রবুদ্ধ ভারতের সঙ্গে আলাসিঙ্গার যোগের কথা প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ইতিহাসে আলোচিত হবে।

আলোচিত না হয়, এর সুর ধীর-গম্ভীর উচ্চ গ্রামে বাঁধা চাই। আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখক ধর। তোমার ভগিনীপতি তো একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস ভাই, খেতড়ির রাজা, লিমডির ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেবো, তাঁরা কাগজটার গ্রাহক হবেন—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ ক'রে যাও। আমরা বড় বড় কাজ করব—ভয় পেও না। এই একটি নিয়ম কর যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের (দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত) মধ্যে কোন না কোন একটির খানিকটা অনুবাদ থাকবে। আর এক কথা—তুমি সকলের সেবক হও, অপরের উপর এতটুকু প্রভুত্ব করতেও চেষ্টা করো না। তাতে ঈর্ষার উদ্রেক হবে ও সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ কর। তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত-ভাষ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাকবে, আর চারধারে খুব ভাল প্রবন্ধগুলি ও ওদের লেখকদের নাম থাকবে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাচ্ছি।"

পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব যে স্বামীজী এই পর্যায়ে নিজে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা এই পত্রেই রয়েছে—

"এখন কাজে লাগো—কাগজখানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগো। আমি কলকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি, মাস-খানেকের ভেতর কাগজটার জন্য তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, পরে নিয়মিত-রূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগো। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেও না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং সবল দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব করব। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কলকাতা ও মান্দ্রাজ দু জায়গায় কাজের জন্য যা টাকার দরকার, তা নিজেই রোজগার করব।"

স্বামীজী অতঃপর প্রথম দফায় টাকা পাঠালেন ১০০ ডলার (২৮ মে, ১৮৯৫ চিঠি), মাসখানেক পরে আরও টাকা পাঠাচ্ছেন লিখলেন (১ জুলাই), সেই সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের জন্য আবার তাগিদ দিলেন, আরও মাসখানেক পরে এক পত্রে পত্রিকার নাম ও মটো অনুমোদন করলেন (৩০ জুলাই), নাম **ব্রহ্মবাদিন**, মটো "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", —এবং উৎসাহ দিয়ে লিখলেন—"'সন্ন্যাসীর গীতি' এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিস থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না। আমি দিন দিন

হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।"

কিন্তু যখন আরও এক মাসের উপর কেটে গেল, অথচ পত্রিকা বেরুল না, তখন স্বামীজী বিশেষ বিরক্ত হলেন। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আরও টাকার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁকে লেখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতে মাউকস্ প্রভৃতি মিশনারীদের কুৎসা-প্রচারে আতঙ্ক প্রকাশ করেও আলাসিঙ্গারা চিঠি দিয়েছিলেন এইকালে। স্বামীজী ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মিথ্যা মিশনারী-নিন্দায় কর্ণপাত করার জন্য তীব্র ধিক্কার দিয়ে আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখলেন, তার শেষাংশে পত্রিকা-ব্যাপারে লিখেছিলেন —"আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার ক'রব, মনে করছি। সুতরাং কাগজের জন্য যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর কর, তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস আছে দেখবার।"

অবশেষে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশিত হল, 'প্রথম সংখ্যা ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। এটি তখন পাক্ষিক পত্র। ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত স্বামীজী পত্রিকা বার হওয়ার সংবাদ পাননি। অত্যন্ত হতাশ হয়ে ঐ তারিখে কলকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—

> "মান্দ্রাজীরা দেখছি, কাগজ বার করতে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দু-জাতির যে একেবারেই নাই! যে সময়ে যে কাজ প্রতিশ্রুত হও ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়।"

এই চিঠি লেখার অল্পদিনের মধ্যে, ২৪ অক্টোবরের ভিতরে, স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেয়ে যান। সংখ্যা দুটির উপর সংক্ষেপে তিনি যে-সকল মন্তব্য করেন, এক কথায় বলা যায় সেইগুলিই ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে স্বামীজীর স্থায়ী সমালোচনা। ২৪ অক্টোবর তিনি লেখেন—"ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চলো। কাগজের কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য-গুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার করবার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও।" একই চিঠিতে তিনি কাগজটার দিকে 'পুরোপুরি নজর' দিতে বলেন, এবং জানান, হাতে টাকা না থাকায় তখনি তাঁর পক্ষে আরও টাকা পাঠানো শক্ত।

এর পরে বহু চিঠিতে ব্রহ্মবাদিনের প্রসঙ্গ থাকবে। তার একটা বড় অংশ ব্রহ্মবাদিনের অর্থসংগ্রহ নিয়ে। স্বামীজী তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের ব্রহ্মবাদিনের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে অনুরোধ করবেন, নিজে যথাসম্ভব টাকা পাঠাবেন, এবং 'বিজ্ঞাপনের জোরে পত্রিকা চলে', একথা জানিয়ে আলাসিঙ্গাকে বিজ্ঞাপন-সংগ্রহে মনোযোগ দিতে নির্দেশ দেবেন।

ব্রহ্মবাদিনে কি জাতীয় রচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্বামীজী ১৮ নভেম্বর, ১৮৯৫ লিখলেন—"ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে - একটু যাতে স্বচ্ছ, সরস ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ানো হয়েছে, পরের সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুশী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাকো; আর এখন যেরূপ বাধাই

আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে।" এই পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁর কি ধরনের নজর থাকত, তার নমুনা আছে এই একই চিঠির শেষাংশে—"ব্রহ্মবাদিনে বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত। একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।" পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর অনেক আশাই গড়ে উঠেছিল, এবং তিনি কতখানি তীব্র প্রীতি ও আগ্রহের সঙ্গে এর অগ্রগতি লক্ষ্য করছিলেন তার নিদর্শন আলাসিঙ্গাকে লিখিত ২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫-র পত্রটি, যার সবটাই ব্রহ্মবাদিনের আলোচনায় পূর্ণ। প্রায় সম্পূর্ণ অংশটিই উদ্ধৃত করছি—

"এই সঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব থেকেই পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সঙ্কেতলিপিকর নিযুক্ত করেছে এবং আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেগুলি টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চল। স্টার্ডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বের করবে মনে করছে, 'ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য তাই বেশী কিছু করতে পারিনি। কাগজটার বাইরে একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বলো দেখি? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর; কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক—আমি এটা দেখতে দৃঢ়সংকল্প। ধৈর্য ধরে থাকো এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাকো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা-কড়ির লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না—ও-সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ করবো জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠানো হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে, ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী ডাকে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখবে।

"বৈদিক সূক্তগুলির অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো; প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের কথায় এতটুকু মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না, নীরস ভাষা-তত্ত্ববিদেরা ধর্ম বা দর্শন বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদের 'আনীদবাতং' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে—'তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন।' প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্যপ্রাণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং 'অবাতং' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ—অবিচলিতভাবে অর্থাৎ অস্পন্দভাবে। কল্পারম্ভের পূর্বে প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তি যে অবস্থায় থাকে, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (ভাষ্যকারগণ দ্রষ্টব্য)। আমাদের ঋষিদের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা কর, তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতানুসারে নয়। তারা কি জানে?

"ভক্তিযোগ সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে; কিন্তু ক্লাসে যে-সব বলা হয়েছে, সেগুলি অমনি এলোপাতাড়ি—সুতরাং সেগুলি

একটু দেখে-শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলির ওপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'ভক্তিযোগ'টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাপিও। ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বইটি খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো, থিওসফিস্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো এবং ধৈর্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আমরা আরও খুব বড় বড় কাজ করতে পারব! হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড; মনে রেখো, ইতিহাসের এই একমাত্র সাক্ষ্য যে, গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি জি. জি.-র চিঠি পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি। বিশ্বাসই মানুষকে সিংহতুল্য বীর্যবান্ করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখন কখন দিনে দু-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। এইভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছি—কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম প্রকৃতির লোক হ'লে এতেই মরে যেত। স্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মিঃ কৃষ্ণ মেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখবে; কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লেখেনি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি; এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, সে দেশে ফিরছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাকো। সত্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও, আর নিজেদের ভেতর বিবাদ করো না। ঈর্ষাই আমাদের জাতির ধ্বংসের কারণ।"

॥ ৪ ॥

স্বামীজীর এই বিপুল আশা ও আগ্রহ প্রচণ্ডতম ধাক্কা খেল একটি ব্যাপারে—তিনি ব্রহ্মবাদিনে থিয়জফিস্ট অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করলেন। থিয়জফির সম্বন্ধে তাঁর কঠিন মনোভাব অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। স্বামীজী সম্ভবতঃ অনেকদিন ধরেই এই ভয় করছিলেন। বহু চিঠিতে তিনি আলাসিঙ্গাকে গুরুভক্তিতে দৃঢ় হতে বলেছিলেন, তার একটা কারণ অবশ্যই আলাসিঙ্গার কর্মোদ্দীপনা জাগ্রত করা, কিন্তু অন্য একটা কারণও ছিল বলে অনুমান,—তিনি জানতেন, তাঁর মাদ্রাজী ভক্তেরা বেদান্ত ও থিয়জফির মধ্যবর্তী একটি অংশে রয়েছেন। থিয়জফিকে স্বামীজী যতখানি বেদান্ত-বিরোধী বলে মনে করতেন, এই মাদ্রাজী ভক্তেরা তা করতেন না। স্বামীজীর আশঙ্কার বিশেষ কারণ, মাদ্রাজ থিয়জফিস্টদের কেন্দ্রভূমি, এবং থিয়জফিস্টদের সঙ্গে আলাসিঙ্গাদির ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এই সময়টি ভারতবর্ষে অ্যানী বেশান্তের বিপুল প্রভাবের কাল। বেশান্তের ব্যক্তিত্বের ও বাগ্মিতার আকর্ষণ দারুণ। স্বামীজীর আশঙ্কা হল, আলাসিঙ্গারা বেশান্তের মোহে পড়েছেন। যখন ব্রহ্মবাদিনে বেশান্তের বক্তৃতার বিবরণ ও বিজ্ঞাপন

বেরুল তখন স্বামীজী দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য।[৫]

পূর্বে উদ্ধৃত ২০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে তিনি থিয়জফিস্টদের সম্বন্ধে আলাসিঙ্গাকে সতর্ক করেছিলেন, এই ঘটনার পরে কঠোরতম তিরস্কার করলেন—তীব্র ভাষা প্রয়োগে অভ্যস্ত বিবেকানন্দের পক্ষেও সে ভাষা তীব্র—

"আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের শেষ সংখ্যা পেয়েছি।

"ব্রহ্মবাদিন্-এর গত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ জাগছিল, তোমরা থিওসফিষ্টদের দলে যোগ দেবে নাকি? এবারে তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছ। তোমাদের মন্তব্যের স্তম্ভে থিওসফিষ্টদের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন? থিওসফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোনরকম যোগ আছে, সন্দেহ করলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্র আমার কাজের ক্ষতি হবে, আর তা হতেই পারে। সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা সকলেই তাদের ভ্রান্ত মনে করে; আর তারা যে এরূপ মনে করে, তা ঠিকই। তোমরা তা ভালরূপেই জানো। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা ক'রছ। তোমরা মনে ক'রছ থিওসফিষ্টদের নামে বিজ্ঞাপন দিলেই ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাবে। তোমরাও যেমন আহাম্মক।

"আমি থিওসফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না; কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া। তারা কি বিজ্ঞাপনের জন্য তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমরা আগ-বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি আবার যখন ইংলণ্ডে যাব, তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় ক'রব।

"আমি বিশ্বাসঘাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট ব'লে রাখছি, কোন ধূর্তের পাল্লায় আমি পড়ছি না। আমার সঙ্গে কপটতা চলবে না।…আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বলছি। একজন—মাত্র একজন যদি আমায় অনুসরণ করে, সেও ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকে। সফলতা বা বিফলতা আমি গ্রাহ্যই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্যের বৃথা কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি তাদের কেউ আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল? পাগল আর কি! আমি হয় আমার আন্দোলন-টিকে সম্পূর্ণ খাঁটি রাখবো, তা না হয় মোটেই আন্দোলন চালাব না।…

"তোমরা কি ঠিক করলে তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বার নয়।…

---

৫ বিজ্ঞাপনটি এই প্রকার:

Notes

The subjects of Mrs. Besant's four (free) lectures at the Adyar Head-quarters of the Theosophical Society, December 27, 28, 29, and 30, will be as follows;

The future that awaits us

Lecture I—First steps. Karma. Yoga. Purification.

Lecture II—Qualification for discipleship. Control of the mind. Meditation. Building of character.

Lecture III—The life of the disciple. Stages on his path. The awakening of the sacred fire. The Siddhis.

Lecture IV—The future progress of humanity. Methods of future science. Man's increasing powers. His coming development. Beyond.

Each lecture will begin at 8 A.M.

(ব্রহ্মবাদিনের ১৮৯৫, ২১ ডিসেম্বরের সংখ্যা থেকে)

"'ব্রহ্মবাদিন' বেদান্ত প্রচারের জন্য, থিওসফি প্রচারের জন্য নয়। তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা উচিত ছিল। স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্যকালে অন্যরূপ করতে দেখলে আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি।…

"এই হচ্ছে জগৎ! যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ঘৃণিত সংসার!!!"[৬]

গুরুর রূঢ় তিরস্কারে শিষ্য কতখানি আহত হয়েছিলেন, অনুমান করতে পারি। লজ্জিতও হয়েছিলেন নিশ্চয়। তিনি অবিলম্বে পত্রে উত্তর দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে নিশ্চয় আলাসিঙ্গা পত্রিকা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রিয় শিষ্যের আহত অভিমানে স্বামীজী ব্যথিত হলেন, তৎক্ষণাৎ নিজের ত্রুটি স্বীকার করে অনুতপ্তভাবে লিখলেন (স্বামীজীর মধ্যে 'রুদ্র' ও 'আশুতোষ' অঙ্গাঙ্গী)—

"এই মাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্পে দৃঢ়ব্রত আছ জেনে খুব খুশী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; সেজন্য তুমি কিছু মনে ক'রো না, কারণ তুমি জানই তো মাঝে মাঝে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর যতই তা বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম।

"ধৈর্য ধরে থাকো, বৎস! কাজ এত বাড়বে যে, তুমি ভাবতেও পার না। আমরা আশা করছি এখানে শীঘ্রই বহু সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানেও অনেক পাব। স্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিন'-এর জন্য তোড়জোড় করছে। সবই সুন্দর, খুব সুন্দর চলছে। **তুমি পত্রিকাখানিকে একটা কমিটির হাতে দেবার যে সঙ্কল্প করেছ, আমি তা মোটেই অনুমোদন করি না। ও-রকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত পরিচালনা নিজ হাতে রাখো এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাকো।** পরে কি করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ ক'রব। কমিটি করা মানে—নানা রুচির লোক আসবে তাদের বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে সবটা পণ্ড করবে। **তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন,** তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে।[৭] সকল কাজেই কৃতকার্য হবার পূর্বে শতশত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাবে।" (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬)

(ক্রমশঃ)

---

৬ স্বামীজীর কঠোর তিরস্কার হস্তগত হবার পূর্বেই বোধহয় অধিকন্তু অ্যানী বেশান্তের বক্তৃতায় 'সামারি' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৬, ৪ জানুয়ারী 'কর্মযোগ সম্বন্ধে বেশান্ত-বক্তৃতার অংশ ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত হয়।

৭ ব্রহ্মবাদিনের সম্পাদক হিসাবে মনে হয় প্রথমাবধি আলাসিঙ্গার নামই দাখিল করা ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'বিলাতযাত্রীর পত্রে' স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ব্রহ্মবাদিনের 'এডিটর' বলেছেন। কিন্তু মনে হয়, প্রথম দিকে মূল সম্পাদনার কাজ এম. রঙ্গাচার্য করতেন। শ্রীনিবাসন লিখেছেন, প্রথম দু' বৎসর রঙ্গাচার্য নিয়মিত লেখা দিয়ে গেছেন। "পরবর্তী দশ বৎসর তাঁর সম্পর্কের ভাই জি জি নরসিমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার এবং আরও কয়েকজন ব্রহ্মবাদিন-পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করেন। পরবর্তী চার বৎসর, ১৯০৯-এ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটি এককভাবে পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্ররা পাঁচ বছর চালান। তারপরে ১৯১৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।"

রূপ-সনাতন

শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতা প্রায় সকলেরই জানা—'নদীতীরে বৃন্দাবনে, সনাতন একমনে জপিছেন নাম, হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে করিল প্রণাম।' ব্রাহ্মণ স্পর্শমণির প্রার্থী হয়ে সনাতনের কাছে এসেছিল, সেই স্পর্শমণি হাতে পেয়ে ব্রাহ্মণ ভাবল সনাতন কী এমন রত্নের খোঁজ পেয়েছেন যার জন্য স্পর্শমণির মত মণিকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না, সেই রত্নের অধিকারী তাকে হ'তে হবে।

সনাতন সম্বন্ধে এই কাহিনী যখন লেখা হয়েছে তখন সনাতন বৈষ্ণবচূড়ামণি সাধক। কি করে তিনি আর তাঁর ভাই রূপ সাধক হলেন, সেই গল্পই এখানে বলা হয়েছে। গৌড়ের সিংহাসনে রাজত্ব করছেন নবাব হুসেন শাহ। মুসলমান নবাব হয়েও হুসেন শাহ ছিলেন সুবিচারপরায়ণ ও ধার্মিক। তাঁর দুজন প্রধান অমাত্য হলেন অমর ও সন্তোষ। এই দুজন হিন্দু কর্মচারীর জন্যই হুসেন শাহের দরবারের এত সুনাম। তাই অমর ও সন্তোষের উপর নবাবের অগাধ বিশ্বাস, আদর করে নবাব তাঁদের নাম দিয়েছেন দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। গৌড়ের কাছেই রামকেলি গ্রাম। এই গ্রামে বাস করেন অমর ও সন্তোষ। দুই ভাই পরম বৈষ্ণব, রাজকাজের অবসরে তাঁরা ধর্মচর্চা করেন আর করেন বৈষ্ণবের সেবা। কিন্তু অবসর তাঁদের কোথায়? নবাবের কাছারিতে হাজির থাকতে হয় প্রায় সময়। এজন্য তাঁদের মনঃকষ্টও যথেষ্ট।

এই সময় তাঁরা খবর পেলেন নবদ্বীপে নদীয়া নগরে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বয়ং বিষ্ণু। এবার তাঁর নাম শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য বলে বেড়াচ্ছেন 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে। বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥' তাঁর লীলার কথা সবই ভক্তমুখে শুনতে পাচ্ছেন অমর ও সন্তোষ। তাঁদের প্রাণটাও শ্রীচৈতন্যের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল। তাঁদের এজন্মও কি বিফলে যাবে? কিন্তু উপায় নেই, নবাবের বিরাট রাজকাজের মাঝে এতটুকু ছুটি মিলবে না। তাঁরা দুভাই তখন চিঠি লিখে শ্রীচৈতন্যের কাছে তাঁদের প্রাণের আকুতি নিবেদন করলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের অভয় দিলেন, বললেন যে-কাজ তারা করছে সেই কাজই করুক, তবে হরিস্মরণ ও বৈষ্ণবসেবা যেন বন্ধ না থাকে। তিনি আরও জানালেন, তিনি তাদের সঙ্গে শীঘ্রই মিলিত হচ্ছেন রামকেলি গ্রামে। অমর আর সন্তোষের আনন্দ আর ধরে না। তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করলেন আর দিন গুনতে লাগলেন প্রভুর আগমনের। তারপর এল সেই শুভ দিন। প্রভু এলেন রামকেলি গ্রামে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এক তমাল-গাছের তলায় এসে প্রভু বসলেন। মিলিত হলেন অমর ও সন্তোষের সঙ্গে। প্রভু তাঁদের সঙ্গে ধর্মচর্চা করলেন আর অমর ও সন্তোষের নামকরণ করলেন—সেই বিখ্যাত নাম-রূপ ও সনাতন। তাঁদের আহ্বান জানালেন তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য। এইরকম কথাবার্তা যখন চলছে তখন তাঁরা সংবাদ পেলেন, স্বয়ং নবাব হুসেন শাহ আসছেন প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। প্রভু

আর সেখানে দাঁড়ালেন না, রাতারাতি সেখান থেকে চলে গেলেন।

অমর ও সন্তোষ এর পর থেকে প্রভুর দেওয়া নাম রূপ-সনাতন হিসাবেই লোকের কাছে পরিচিত হতে থাকলেন। প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর তাদের বৈরাগ্য আরও বেড়ে গেল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা নবাবের কাছে চাকরী ছাড়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু নবাব সে কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বললেন, 'কাজের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করা যায়।'

তারপরের এক ঘটনা। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। রূপ সনাতন বেরিয়েছেন নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। পথের ধারে এক ভিখারীর কুঁড়ে, ভিখারীর স্ত্রী ভিখারীকে বলছে 'ভিক্ষে না করে আনলে আজ দিন চলবে কিসে?' ভিখারী বলছে, 'তুই পাগল হয়েছিস? এই দুর্যোগে মানুষ রাস্তায় বেরুতে পারে?' এমন সময়ে রাস্তায় রূপ-সনাতনের পদধ্বনি পাওয়া গেল। ভিখারীর স্ত্রী বলল, 'রাস্তায় পায়ের শব্দ পাচ্ছি, মনে হয় লোকজন পথে বেরিয়েছে।' ভিখারী বলছে, 'পাগল হয়েছিস? মনে হয় শেয়াল-কুকুর যাচ্ছে।' রূপ-সনাতন তাঁদের কথাবার্তা সবই শুনতে পেলেন; ভাবলেন, আর না, খুব হয়েছে। তাঁরা যবনের অন্নদাস হয়ে শেয়াল-কুকুরেরও অধম হয়েছেন। রূপ সেখান থেকেই ফিরলেন, সনাতনকে দিয়ে নবাবকে বলে পাঠালেন—নবাবের চাকরী তিনি করবেন না।

রূপ তো রেহাই পেলেন। কিন্তু সনাতন? তাঁর উপর রয়েছে নবাবের কোষাগারের ভার, এর দায়িত্ব না বুঝিয়েও তো যাওয়া যায় না। তিনি আবার নবাবের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। এবার সনাতন নিলেন ছলনার আশ্রয়, নবাবকে জানালেন তিনি অসুস্থ। ইতিমধ্যে সনাতন খবর পেলেন রূপকে প্রভু বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন সেখানকার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য আর তিনি অপেক্ষা করে আছেন সনাতনের জন্য। সনাতনের অসুখ শুনে স্বয়ং নবাব এলেন সনাতনকে দেখতে, বুঝলেন রোগ সনাতনের দেহে নয়, মনে। নবাব তখন এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন! সনাতন ইচ্ছা করে রাজকার্যে অবহেলা করছেন—এই অজুহাতে সনাতনকে বন্দী করলেন। কিন্তু সনাতন পেয়েছেন প্রভুর আশ্রয়, তাই তাঁর কাছে সুখ দুঃখ সমান হয়ে গেছে। অমন যে প্রতাপশালী অমাত্য, যার হুকুমে মানুষ মরে বাঁচে, সে আজ অন্ধকার বন্দিনিবাসে বন্দী। একেই বলে ভাগ্য। নবাব দেখলেন বন্দী করেও সনাতনের কোন পরিবর্তন হ'ল না, বরং প্রভুর জন্য ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেছে। সব সময় চোখে ধারা বয় আর হরিনামের আনন্দে সনাতন আত্মহারা। তার ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই, এই ভেবে নবাব তাকে মুক্তি দিলেন।

সনাতন আর কালবিলম্ব করলেন না। বেরিয়ে পড়লেন প্রভুর উদ্দেশ্যে। কৌপীনমাত্র অবলম্বন, ভিক্ষা করে উদর পূরণ করেন, শয়ন করেন বৃক্ষতলে। লোকে দেখে প্রভুর আশ্চর্য লীলা। গত কাল পর্যন্ত যে আরাম ও বিলাসের চরম অবস্থায় কাল কাটিয়েছে, আজ সে স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী। সনাতন এসে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর পদতলে। প্রভু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর তাকেও বৃন্দাবনে রূপের কাছে যেতে বললেন। সেখানে দু'ভাই গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। বৃন্দাবন আবার তীর্থ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠল। দু'ভাই তখন বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র-রচনায়

মনোনিবেশ করলেন। এরপর প্রভু চলে গেলেন নীলাচলে। পুরীধামের অপর নাম নীলাচল। তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর ভক্ত ও পরিকরবৃন্দ। কিন্তু রূপ-সনাতন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও গেলেন না, কারণ প্রভুর আদেশ—বৃন্দাবনে থেকেই প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা বৃন্দাবনেই রয়ে গেলেন। আজও বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও তাঁদের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়।

'ভকতি প্রণাম লহ গো আমার'

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু, নিখিল-বিশ্ব হৃদয় মাঝারে
পুণ্য লগনে এসো গো আজ,
হৃদি শতদল ফুটাও সবার,
হে রামকৃষ্ণ, রাজাধিরাজ !

তোমারি কৃপার নবারুণ আলো
ঘুচাক ধরার সব দুঃখ-কালো
তোমারি পুণ্য চরণ-পরশে
হরষে ধরণী নাচুক আজ,
প্রেম-শান্তির কুসুম-খচিত
পরুক বিশ্ব নতুন সাজ !

দক্ষিণেশ্বর থেকে শান্তিনিকেতনে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

[ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তাঁর ভাবরাশিকে কেন্দ্র করে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ঘটে নবজাগরণ। আধুনিক যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে এই নবজাগরণ শুরু হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে যুগমানসের গ্রহণোপযোগী ও যুগজীবনে প্রয়োগযোগ্য রূপে মূর্ত ভারতের সনাতন সর্বজনীন ভাবধারাকে আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রবাহিত করার উপযোগী প্রধান খাতগুলি কেটে সারা জগতে ছড়িয়ে দিয়ে যান। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর (আশ্বিন, ১৩০০ সাল) চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় এই বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু হয়। ইহার পর হইতেই ভারতের রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব ভাব অবলম্বনে বিপুল জাগরণ ঘটতে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ভাবরাশি কি রূপ নিয়েছে, প্রবন্ধটিতে তারই কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক।—সঃ]

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' কথাগুলি কাল-জয়ী। ঐ কথাগুলি এসেছে জীবনে যা-কিছু গভীরতম সেখান থেকে। জীবনের গভীরতম সত্যগুলি কত সহজ অথচ কত মৌলিক! যেমন, "সিদ্ধি সিদ্ধি বললে নেশা হয় না, সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না—খেতে হয়। 'দুধে মাখন আছে' শুধু বললে কি হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো তবে তো হবে। শাস্ত্রের কথা বললে কি হবে? শুনলেই বা কি? ধারণা করা চাই।" সাধনের প্রয়োজন বোঝাতে গিয়ে এই সব উপমা। দিব্য অনুভূতির কথা বোঝানো শক্ত। কেউ যদি বলে, ঘি কিরকম খেতে? তার উত্তর, "কেমন ঘি না যেমন ঘি।" এমনি সব সুন্দর সুন্দর সহজবোধ্য কথায় জীবনের গভীরতম সত্যগুলির প্রকাশ যেখানে, সেখানে কথাগুলি অমৃতের ঝরণা হ'য়ে মানুষের আত্মার পিপাসা মেটানোর শক্তি রাখে। 'কথামৃত' শতবার পড়েও পুরানো হয় না। খ্রীষ্ট বলেছিলেন: My words shall never pass away. কথামৃত সম্পর্কেও সমভাবে একথা প্রযোজ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণে যে সত্যের ধ্বনি, রবীন্দ্রনাথে তারই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে স্বচ্ছসলিলা অফুরান ঝরণার কলধ্বনি। মানুষের আত্মার গভীরতম আকূতি সুললিত ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে গীতাঞ্জলিতে। সেই কবিই কালজয়ী যাঁর সৃষ্টির মহিমা মানুষের প্রাণের গভীরতম দাবী মেটাবার ক্ষমতা রাখে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়ে এমন একটি দিব্যভাবের সুরধুনী-ধারা কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হ'চ্ছে যার মধ্যে আমাদের আত্মা পরম তৃপ্তি খুঁজে পায়।

"জীবন তো ক্ষণ-ভঙ্গুর। তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা খুব মন্দই হউক। হিন্দু বলেন, এ জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান —ঈশ্বরলাভ। ধর্মলাভই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সত্য হয়, তবেই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভারটা দুর্বহ হয় না, জীবনটা উপভোগ্য হয়। তাহা না হইলে জীবন একটা বৃথা ভারমাত্র।" এই

কথাগুলি স্বামী বিবেকানন্দের ; 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে আছে। কী গভীর একটা সার্বভৌম সত্য রয়েছে স্বামীজীর বাণীর মধ্যে !

এই সত্যই ছন্দোবদ্ধ রবীন্দ্র-কাব্যে। জীবন তো মুহূর্তের জন্যই ! "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান।" পরিবর্তনের খর-স্রোতে নিমেষে নিমেষে সমস্ত কিছুই যেখানে ভেসে ভেসে যাচ্ছে সেখানে চিন্তাশীল মানুষের কাছে জগৎ তো বাজীকরের ভেল্কি ব'লে মনে হবেই। এই ভেল্কি নিয়ে তার আনন্দ করবারই বা কি আছে ? আর গর্ব করবারই বা কি আছে ?

কী ল'য়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে। (গীতাঞ্জলি)

জলবুদ্বুদের মধ্যে মানুষের অনন্ত আনন্দ কোথায় ? চরম শান্তি কোথায় ? নিমেষে নিমেষে সেখানে সবই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে ক্ষণভঙ্গুরের ছায়ায় কালে কালে দেশে দেশে মানুষের আত্মা এমন কিছুকে চেয়েছে যা সমস্ত পরিবর্তনকে অতিক্রম ক'রে আছে, সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে এবং অভ্যন্তরেও রয়েছে, যাকে পেলে আমরা আমাদের পরম কল্যাণকে লাভ করি, জীবন-রহস্যের একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, যা শূন্য তা অর্থে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে এবং অস্তিত্বকে একটা দুর্বহ বোঝা ব'লে আর মনে হয় না।

'গীতাঞ্জলি'র গানে গানে এই চিরন্তন অমন-কিছুকে চাওয়ার সুরটী ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে।

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু, জানো, মন তোমারে চায় !

ধনে জনে তো আত্মার চরম শান্তি নেই। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। 'রক্তকরবী'র রাজা সোনার তাল জড়ো ক'রে ক'রে পাহাড় বানিয়েছে আর সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটা নিদারুণ শূন্যতার মধ্যে দুঃখ ক'রে বলছে : "হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে, শুধু আনন্দ বাঁধা পড়ে না।" অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী রাজা কত রিক্ত, কত তপ্ত, কত ক্লান্ত ! রাজা আনন্দকে বাঁধবে কেমন ক'রে ? ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। জীবনে যা ক্ষণ-ভঙ্গুর, যা ফুরিয়ে যায়, যা ভেল্কি, মায়া, বুদ্বুদ, 'শূন্যদিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা', তার মধ্যে মানুষের শাশ্বত সুখ থাকবার তো কথা নয়। ছায়া থেকে ছায়ার পিছু পিছু ছুটে ছুটে শুধু হয়রান হওয়ার দুর্বহ ক্লান্তিকেই রাজা মনের মধ্যে জমিয়ে তুলেছে ! রাজার সমস্ত চিত্ত জুড়ে বিত্তের কামনা। ক্ষমতার কামনা ! শূন্যের পর শূন্য যুক্ত হ'য়ে শূন্যের সংখ্যাই শুধু বেড়ে চলেছে। সেই শূন্যের প্রাচুর্যের মধ্যে রাজার মর্মের গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে হতাশায় ভরা দীর্ঘশ্বাস। শূন্যের আগে এক রাখলে তবেই তো শূন্য দশ হয়ে যায়, হাজার হয়ে যায়, লক্ষ হ'য়ে যায়। রাজার চেতনার ক্ষেত্রে এই পরম একের কোন আসন নেই। নেই সেখানে ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতা ! নেই সর্বজীবে প্রেম ! যা সীমিত, যা অল্প তার মধ্যে অনন্তকে, ধ্রুবকে, নিত্যকে চাওয়াই তো অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যাই তো দুঃখের মূলে ! অবিদ্যার অন্ধকারে শূন্য রাজা ভরা গৃহে কাঁদছে একটা দুঃসহ ক্লান্তির এবং রিক্ততার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের বাতায়নগুলিকে সবদিকেই খোলা রেখেছিলেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল দিক থেকেই আলো-হাওয়া ঢুকতো সেই বিরাট মনে। পশ্চিমের কত সেরা সেরা কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক,

দার্শনিক, চিন্তাবীর তাঁকে যুগিয়েছে নব নব ভাব-সম্পদ। তাঁদের বীণাধ্বনিতে, কণ্ঠধ্বনিতে রবীন্দ্রসাহিত্য মুখর হ'য়ে আছে! কিন্তু একথা নিশ্চয়ই আমরা বিস্মৃত হবো না যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী উপনিষদের ভাবধারায় অনুস্যূত হ'য়ে আছে। উপনিষদের ঋষিগণ সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের তপোবন হ'তে যে-প্রার্থনা ঊর্ধ্বে অবিরত উৎসারিত হয়েছে আত্মার একটি গভীরতম আকুতিকে বহন ক'রে, তা হ'চ্ছে—অসতো মা সদ্গময়। কালের দ্বারা, দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যা তাই তো অসৎ। যা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না এবং ধ্বংসের পরে থাকবে না, যা এখানে আছে—সেখানে নেই, যা এই বস্তু এবং ঐ বস্তু নয়, তাই না অসৎ! এর বিপরীত হচ্ছে সত্য অর্থাৎ যা ছিল, আছে এবং থাকবে, যা সর্বব্যাপী এবং যা জীব-জগৎ সমস্ত কিছুই হয়েছে তাকেই শুধু সত্যের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। 'গীতাঞ্জলি'তে এই সত্যের জন্য একটা নিবিড় আকুতি ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে :

আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা, পদমর্যাদা, ক্ষমতা—এদের প্রতি গভীর আসক্তিতেই তো টো-টো ক'রে দিবারাত্রি ঘুরছি ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে! এদের পিছনে কবি অমন ক'রে ঘুরে বেড়াতে চান না। কারণ এরা মিথ্যা অর্থাৎ অসত্য অর্থাৎ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, দেশের দ্বারাও। নচিকেতা কঠোপনিষদে যে-কারণে যমের প্রদত্ত রাজমুকুট, ঐশ্বর্য, নারী-মায়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছেন ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ তাদের অনিত্যত্ব চিন্তা ক'রেই কবিও সমস্ত বাসনা হ'তে মুক্ত হতে চান!

তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে,
কৃপা করিও না দুর্বল ব'লে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই—
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।

যে-হেতু ধন-জন-মান মিথ্যা, সুতরাং কবি মিথ্যার মধ্যে মিথ্যা হয়ে থাকতে রাজী নন। তাই বাসনাগুলো যাতে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় সেই জন্য কবি ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে একটিমাত্র প্রার্থনা : "ওগো, তোমায় আমি চাই।" কেন তোমায় আমি চাই? কারণ যে ধন-মানের বাসনাতে দিনে রাতে এখানে ওখানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তাদের মতো তুমি তো মিথ্যা নও, দুদিনে ফুরোবার নও। তুমি যে সত্য! সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করবার জন্য যুগে যুগে মানুষ যে অভিযানে বাহির হয়েছে, সে তো কলম্বাসের দুঃসাহসিক অভিযান। সেই অভিযানের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হয় সব-পেয়েছির আনন্দ-লোকে পৌঁছানোর সফলতায় অথবা কূলহীন সমুদ্রবক্ষের অতলে সলিল-সমাধির ট্র্যাজেডিতে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। শ্যামও রাখবো, কূলও রাখবো, হৃদয়-আসনে ঈশ্বর এবং 'ম্যামন্' দু'য়েরই জায়গা থাকবে—আধ্যাত্মিক জীবনে এই দু'নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা একেবারেই অচল। "তোমরা ঈশ্বর ও ধন-দেবতার সেবা একসঙ্গে করিতে পার না"—বাইবেল। Nature abhors a vacuum but God demands one, for He is a jealous God. প্রকৃতি পছন্দ করে না রিক্ততা; কিন্তু ভগবান দাবী করেন, আমরা নিজেদের একেবারে শূন্য ক'রে ফেলবো। কারণ আমরা শুধু তাঁকেই ভালোবাসবো,

এই তাঁর ইচ্ছা। এই জন্যই কবি প্রার্থনা করেছেন :

অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও,
আর দেরি কেন মিছে।
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে পড়ে যাক পিছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সুতোর একটী ফেঁসো যতক্ষণ বেরিয়ে আছে ততক্ষণ সুতো তো ছুঁচের ফুটোর মধ্যে যাবে না।" বাসনার অণুমাত্র হৃদয়ে থাকতে ঈশ্বর অন্তরের মধ্যে ঢুকবেন না। খ্রীষ্টের সেই কথা : Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength and all thy mind. ষোলো আনা মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতে হবে। ষোলো আনার এক কড়া-ক্রান্তিও কম নয়! সুতরাং কামনার যত বন্ধন আছে অক্টোপাসের মতো হৃদয়কে জড়িয়ে, সে সমস্তই 'ছিঁড়ে পড়ে যাক পিছে'। সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করবার সংকল্প থাকে তো মরিয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়তে হবে ত্যাগের দুর্গম রাস্তায় 'ম্যামনের' সঙ্গে সমস্ত কারবার চুকিয়ে দিয়ে। The spiritual life is a terrific and terrifying adventure. রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ যেমন বলেছে : "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার। আর কিছুতেই আমার দরকার নেই।"

মরে গিয়ে বাঁচবো আমি তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারই এক প্রেমে,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।
(গীতাঞ্জলি)

জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, সমস্ত মনটা তোমার চিন্তায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো অনুক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তার একটা প্রবাহ বইতে থাকবে অন্তরের মধ্যে—একেই গীতার ভাষায় বলা হয়েছে "মন্মনা ভব"।

কবি তাই, "চাইগো আমি তোমায় চাই,
তোমায় আমি চাই"—

এই কথাটি ব'লেই ক্ষান্ত থাকেননি। শুধু তাঁকে চাই ব'ললেই তো পাওয়া যাবে না। সাধন চাই—স্মৃতি-সাধন। কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁর কাছে যেতে হয়। তাই কবির পরের লাইনটিতে আছে :

"এই কথাটী সদাই মনে
বলতে যেন পাই।"

আমি তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে চাই, আর কিছু চাইনে—এই কথাটি সর্বদা মনে বলতে পারাটাই তো বৈরাগ্য। আর 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' বৈরাগ্যের দ্বারাই তো বায়ুর মতো চঞ্চল অবাধ্য মনকে তাঁর চরণপদ্মে নিস্পন্দিত করা সম্ভব। দিনরাত্রি চেতনায় শুধু ঈশ্বর-চাওয়াকে অনির্বাণ রাখা! মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন, The whole drama is a mental drama. সমস্ত নাট্য-লীলা তো একটা মানসিক ব্যাপার। The whole difficulty is a mental difficulty, the difficulty with an object of our thought. সমস্ত মুস্কিল তো মনের বাধা নিয়ে। আমরা যে-চিন্তাকে চেতনায় অম্লান দীপ্তিতে জ্বালিয়ে রাখতে চাই, বিপরীত চিন্তারাশি এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে মন থেকে সরিয়ে দেয়। আমাদের নৈতিক পদস্খলনের গোড়া একটা শুভ সংকল্পকে মনের মধ্যে ধরে না রাখতে পারার এই অক্ষমতায়।

ঈশ্বর-ভজনের অর্থ অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁর ভজনা। শুধু 'তোমায় চাই' বললে তো তাঁকে পাবো না। 'মামেবৈষ্যসি', আমাকে তুমি ঠিকই পাবে, to Me thou shalt come. এটা আমার একটা কথার কথা নয়। এ হচ্ছে আমার প্রতিশ্রুতি, this is My pledge and promise to thee. তবে একটা কথা। মন্মনা ভব। তোমার ষোলো আনা মন কিন্তু আমাকে দিতে হবে। তুমি যেমন আমার কাছে আসতে চাও আমিও তো তেমনি তোমার কাছে যেতে চাই। তুমি আমাকে ভালোবাসো, শুধু আমাকেই ভালোবাসো—এ যে আমি কত গভীর ক'রে চাই, তা যদি জানতে!

ঠাকুর বলতেন, "তুমি এক পা এগিয়ে গেলে ভগবান দশ পা আগিয়ে আসেন।"

যাঁর পদ-যুগ ঘিরে কোটী চন্দ্র-ভানুর নূপুর বাজছে, তিনি রাজ-রাজেশ্বর হয়েও শিশুর মতোই নম্র এবং মানুষের ভালোবাসা পেতে কতই না উৎসুক! যারা তাঁর বিদ্রোহী সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে একগুঁয়ে, তাদেরও তিনি জোর ক'রে নিজের দিকে ফেরাতে চান না। শুধু প্রেমের দ্বারাই তিনি তাদের জয় করতে চান। এই ভাবটিকে কত সুন্দর ভাষায় 'গীতাঞ্জলির' একটি গানে কবি প্রকাশ করেছেন :

তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে,—
প্রভু, নিত্য আছো জাগি।

তুমি রাজার রাজা হয়েও আমার ভালোবাসার জন্য নিত্য অপেক্ষা ক'রে আছো! বিশ্বেশ্বর হ'য়েও তুমি অবতীর্ণ হ'য়েছো ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিখারীর ভূমিকায়। সেই ভূমিকা নিয়ে তুমি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে তোমার ঐ 'তারায় খচিত' অঙ্গদ-পরা হাত দু'খানি। আমিও তো ভিখারী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে করতে চলিছি! ভিখারী হ'য়ে তোমাকে একটী মাত্র শস্যকণা দিলাম। ঘরে ফিরে পাত্র উজাড় করে দেখি, একটি সোনার চাল। হায়রে, সেই রাজভিখারীকে কেন সব দিলাম না? তবে তো সবই সোনা হ'য়ে ফিরে আসতো! এই মধুর ভাবটি কত নব নব ভঙ্গীতেই না রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

হাঁ, ভগবান ভক্তের ভালোবাসার কাঙাল! তিনি আমাদের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা বড়োজোর তাঁকে আমাদের ভালোবাসার এক আনা দিই। ষোলো আনা কেন দিতে পারিনে—এই নিয়েই তো কবির আক্ষেপ! তাই তো গীতাঞ্জলিতে কবি সমস্ত কামনার বোঝা কূলে ফেলে রেখে তাঁর সঙ্গে একতরীতে ভেসে যেতে চেয়েছেন। সেই তরীতে কোন বোঝা নেই, কেবল তুমি আর আমি!

ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তাঁর চরণমূলে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

তাঁর চরণমূলে জীবন সঁপে দেওয়া, উজাড় ক'রে দেওয়া। I-ness and My-ness বলতে চেতনায় কিছু নেই। আমি ও আমার বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে মন থেকে। আমার সমস্ত চেতনায় শুধু তুমি! আমার ভাবনার অণুপরমাণুতে অনুস্যূত হ'য়ে আছে কেবল তোমারই চিন্তা!

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা,
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে—
মনকে, আমার কায়াকে।
(গীতাঞ্জলি)

সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধির গিরিচূড়ায় আরোহণের জন্য মানুষের নিঃসঙ্গ আত্মার নিঃশঙ্ক অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী গীতাঞ্জলির গানগুলিকে একটি পরম সুষমায় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছে। 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনার মতো কবির পথিক-আত্মা একাকী চলেছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে, কঠিন পথ ভাঙতে আঁধার ঘরের রাজার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। দিব্য উপলব্ধির শিখরে পৌছানোর পথে প্রবলতম শত্রু তো অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারের সঙ্গে কবির আত্মা অনবরত লড়াই করতে চলেছে। কবি নিঃসংশয়ে জেনেছেন, সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধির পথে যত মুস্কিল ঐ অহংকে নিয়ে। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতা তাই শুরু হয়েছে যাতে অহঙ্কার চলে যায় তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

গীতাঞ্জলিকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর পটভূমির সামনে রাখলে তাই মনে হয়, দক্ষিণেশ্বরে যে সত্যের ধ্বনি, তারই প্রতিধ্বনি গীতাঞ্জলিতে।

গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাতেই কবির আকূতিতে রয়েছে, 'যাচি হে তোমার চরম শান্তি।' মানুষের চরম শান্তি সত্যের মধ্যে সত্য হওয়ায়। যেখানে দুদিনের যা অর্থাৎ যা অসত্য তাকে সত্য মনে ক'রে ধ্রুব মনে ক'রে, শাশ্বত মনে ক'রে ছায়ার মধ্যে, তৃপ্তির মধ্যে অনন্ত আনন্দ খুঁজতে যাই আমরা, সেখানে মৃত্যুর জালে আমরা জড়িয়ে যাই। কারণ কামনার আর এক নাম মার। কামনা আমাদের আত্মাকে মারে। আমাদের চেতনায় সর্বক্ষণ রয়েছে অহং। এই আমি নিজ সম্ভোগে ব্যস্ত; তার সমস্ত স্বপ্নজাল নিজেকে কেন্দ্র ক'রে। আমি আজ এতটা বিত্ত অর্জন করেছি, কাল আরও বিত্তের অধিকারী হবো। আজ এতটা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি, কাল বিপুলতর ক্ষমতাকে হস্তগত করবো। আরও বাড়ী, আরও গাড়ী, আরও যশ, আরও ক্ষমতা, মাথায় আরও মুকুটের উপরে মুকুট। আয়নার ঘরে বাস করছি—যেদিকে তাকাই আমি, আমি, আমি। এই যে আপনাকে ঘিরে ঘিরে অবিরাম কামনার জাল বুনে চলেছি—এ তো মৃত্যুজাল। এই মৃত্যুর মৃত্যু কোথায়? যিনি সত্য, যিনি অনন্ত জীবন, তাঁরই মধ্যে। তাই তো 'গীতাঞ্জলি'তে কবির বীণায় এই প্রার্থনাটি ধ্বনিত হয়েছে :

তোমায় দূরে সরিয়ে মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কাণ্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।
আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্য যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচব তবে—
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যনারায়ণের মধ্যে সত্য হবার জন্য পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে পঞ্চবটীর নির্জনে কত কান্নাই না কাঁদলেন! উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতেন :

মা, মা, তুই কি সত্যিই আছিস, তবে আমাকে কেন অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস? সত্য কি, আমাকে তা জানতে দিচ্ছিস না কেন—আমি তোকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন? লোকের কথা, শাস্ত্রের কথা, ষড়দর্শন—এসব পড়ে-শুনে কি হবে, মা? এ সবই মিছে। সত্য—যথার্থ সত্য আমি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে চাই। সত্য অনুভব করতে, স্পর্শ করতে চাই।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' আগাগোড়া 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু' গম্ভীর নির্ঘোষে ধ্বনিত হচ্ছে। সত্যকে উপলব্ধির রাস্তায় অহংকার প্রবলতম শত্রু। গীতাঞ্জলিতে এই সুরই পাই—অহংকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের সুর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতবারই কত উপমা দিয়ে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে স্মরণ-মননের কথা বলেছেন! "স্মরণ মনন থাকলেই হোলো।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন প্রিয়নাথ মুখুয্যেকে: এগিয়ে পড়; চন্দন কাঠের পর আরও আছে। প্রিয়নাথের মুখে "আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না" শুনে ঠাকুর বললেন: পায়ের বন্ধন থাকলে কি হবে?—মন নিয়ে কথা। হাঁ, মন নিয়েই তো কথা। সর্বাবস্থায় সব কাজের মধ্যে মনটা তাঁতে তুলে রাখাটাই হোলো আসল কথা। যত মুস্কিল তো ঐ অবাধ্য মনটাকে নিয়ে! রবীন্দ্রনাথে ঠাকুরেরই প্রতিধ্বনি!

> "মুখ ফিরায়ে রবো তোমার পানে
> এ ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে।
> কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
> কেবল আমার মনটা তুলে রাখা
> সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
> সকল দিনের কাজেরই মাঝখানে।"

অথবা,

> "একটী নমস্কারে প্রভু একটী নমস্কারে
> সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন-দ্বারে।"
> "যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু,
> এবার এ জীবনে
> তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
> সেকথা রয় মনে।
> যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
> শয়নে স্বপনে।"

কবির এই গানের সুরেও শ্রীরামকৃষ্ণের "স্মরণ-মননের"-ই প্রতিধ্বনি!

কিন্তু ভগবানে, কেবলমাত্র ভগবানে আমরা ষোলো আনা মন ঢেলে দিয়ে ভালোবাসবো শুধু তাঁকেই, "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে"—এই যদি ভগবান চান এবং আমাদেরও প্রার্থনা এই হয় তবে মানুষের জন্য আমাদের ভালোবাসার অবশিষ্ট রইলো কি? তবে কি আমরা মানুষকে ভালোবাসবো না? Love the Lord thy God with all thy mind, ষোলো আনা মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো—এ তো সর্বশাস্ত্রের কথা। Love thy neighbour as thyself—মানুষকে ভালোবাসার এ কথাও তো সর্বশাস্ত্রের কথা। আর ভালোবাসা মানে যাকে ভালোবাসি কর্মে তার সেবা। মিল কোথায় এই আপাতবিরোধী শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে? মিল,—ঠাকুরের শিববুদ্ধিতে জীবসেবার মধ্যে। ঠাকুর বলতেন, "মা-ই সব হয়েছেন—দুষ্টলোক পর্যন্ত, ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যন্ত।" "রামলালের মাকে বকতে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ।" বলতেন, "ভাখো দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই। তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক,—ঠাকুরসেবায় লাগবে।" এই কথার

সঙ্গে বিবেকানন্দের কথাগুলি একবার পড়া যাক্ : "জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর। ঈশ্বর তোমার নিকট অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার জন্য উপাসনার কি চমৎকার সুযোগ!"

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে সেই কথাই পাই—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "কাউকে বাদ দেবার জো নেই।" বিবেকানন্দ বলেছেন, বর্তমান জগতের সমক্ষে ঠাকুরের ঘোষণা এই, "কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত—সকল পথই ভালো।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই উদার সুরটিও ধ্বনিত হয়েছে, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে এই একটিমাত্র নমুনা রেখে দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি :

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খ্রীষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমান ভার।

মানুষকে যিনি 'নরদেবতা' বলে নমস্কার করেছেন, তাঁর কাছ থেকে সর্বজীবে এই উদার প্রীতি ও শ্রদ্ধাই আমরা আশা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণে যার ধ্বনি, রবীন্দ্রনাথে সেই সত্যেরই প্রতিধ্বনি।

অমৃতপথযাত্রী

শ্রীশুভেন্দু পালিত

যুগে যুগে, দেশে দেশে আবির্ভাব হ'য়েছে তোমার,
যখনই শোণিতসিক্ত, মসীলিপ্ত হ'য়েছে সংসার,
যতবার হিংসা দ্বেষ দিকে দিকে তুলিয়াছে মাথা—
তুমি আসিয়াছ এই ধরাধামে, ধরার বিধাতা!

বিভীষিকাময় সেই মেঘাবৃত, অন্ধকার রাতে—
একাকী ঘুরেছো তুমি দ্বারে দ্বারে দীপ ল'য়ে হাতে,
মানুষেরে ডাকিয়াছো আপনার কাছে ভালবেসে—
কভু যীশু, কভু বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ বেশে!

তোমার সে-ডাকে, জানি, দেয় নাই সাড়া সব লোকে।
তোমাকে দেখেছে কেহ সকৌতুকে সন্দেহের চোখে,
কখনো বা নিজ মুখ মুখোসের অন্তরালে ঢাকি'
তোমার কোমল দেহে ক্ষতচিহ্ন দিয়াছে যে আঁকি!

তুমি করিয়াছ ক্ষমা, ডাকিয়াছ সবারে আদরে
পৃথিবীর পথে পথে বাক্যবাণ ক্রুশ তুচ্ছ করে!
আজিও তোমার যাত্রা চলিতেছে দেখি অবিরাম
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রভু! লহ আজ মোদের প্রণাম।

স্বামীজী-মানসে স্বদেশমন্ত্র

স্বামী জীবানন্দ

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহতী ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ও উপলব্ধি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে গভীর জ্ঞান, ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞতা, সংস্কৃত সাহিত্যে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবনালোকে নিজের জীবনগঠন, ভারতের সর্বত্র আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ, জনসাধারণের ভাব-অভাব ও রীতিনীতি আলোচনা করবার বিশেষ যোগ্যতা, জগতের ধনী দরিদ্র সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তাঁর আবির্ভাব ভারত ও সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য।

সকলপ্রকার পার্থিব সুখ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি জগতের বিশেষতঃ ভারতের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করতে কুণ্ঠিত হননি। স্বামীজী ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বপ্রেম বলতে যা বোঝায় স্বামীজীর মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাভাব প্রচারের জন্য 'অখণ্ডের ঘর থেকে' যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাই সব দেশের মানুষই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত আপনার জন, সকলের মধ্যে তিনি এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতেন।

স্বামীজী বিশ্বপ্রেমিক হলেও বলেছেন আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র ভারতের সর্ববিষয়ে উন্নতি হলেই সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে; তাই তিনি আমাদের দিয়েছেন **'স্বদেশমন্ত্র'**। স্বদেশ বলতে তিনি বুঝেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ, সেখানে প্রাদেশিকতার কোন স্থান নেই।

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।' মন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি ও অমিত প্রভাব, যা মনন করলে সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত মন্ত্র জপ করলে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা সাধকের চিত্তপটে উদ্ভাসিত হন। নিরন্তর মন্ত্রজপে মন্ত্রচেতনা লাভ হয়, মন্ত্র জীবন্ত ভাস্বর হয়ে ওঠে। মন্ত্রের যিনি উদ্গাতা, তিনি ঋষি, তিনি সত্যদ্রষ্টা।

স্বদেশমন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা ভারতমাতা। ভারত বললে একটি দেশ—একটি অচেতন পদার্থ-বিশেষের কথাই সাধারণতঃ মনে আসে, যেমন ভূগোলে পড়া হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত বলতে বিরাটরূপিণী চিন্ময়ী জননীর শাশ্বত-ঐতিহ্য-সমন্বিত ভাস্বর একটি রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল বিবেকানন্দ-মানসে। ভারতমন্ত্রের ঋষি সত্যদ্রষ্টা যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ও ধ্যাননেত্রে ভারতের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র সমুদ্ভাসিত হয়েছিল। ক্রান্তদর্শী স্বামীজী তাঁর অপূর্ব মনীষা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও দার্শনিক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন—ভারতের প্রাণ কোথায়, ভারতের মহত্ত্ব কেন, অতীতে ভারতের এত গৌরব কেন হয়েছিল, কেনই বা সেই গৌরব-রবি অস্তমিত হ'ল, বর্তমানে ভারতসন্তানদের কর্তব্য কি, কিভাবে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে এবং ভবিষ্যতের রূপ কি?

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু 'স্বদেশমন্ত্র'। স্বদেশমন্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে

পাব, এর মধ্যে ভারতের সর্ববিধ উন্নতির সন্ধান রয়েছে, ভারতবাসীর চলার পথে অপূর্ব ও অভ্রান্ত পথনির্দেশ আছে। এই মন্ত্রের মননে ধ্যানে ও রূপায়ণে ভারতের লুপ্ত গরিমা ফিরে আসবে তাতে কোন সন্দেহই নেই ; শুধু তাই নয়, স্বদেশমন্ত্রের সাধন প্রতিটি ভারতবাসী ঠিকঠিক করলে অতীত ভারতের থেকেও ভবিষ্যৎ ভারতের মহিমা আরও উজ্জ্বল হবে, ভারত নিঃসন্দেহে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।

স্বদেশমন্ত্রের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে ভারতের দুরবস্থার কারণ, দ্বিতীয় অংশে কি করতে হবে, তাই বিবৃত হয়েছে।

ভারতের অবনতির কারণ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে স্বামীজী হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন অনবদ্য ভাষায়। ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দেশপ্রেম, সৃষ্ট হয়েছে অনুপম সাহিত্য।

স্বদেশমন্ত্রের প্রথমেই ভারতবাসীর প্রতি যুগাচার্য স্বামীজীর সাবধান-বাণী :

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

আমরা বড় হতে চাই, উচ্চাধিকার লাভ করতে চাই ; কিন্তু বড় হতে গেলে, উচ্চাধিকার লাভ করতে হ'লে যে ধৈর্য, শক্তি, সাহস, বীর্য, প্রেম, ত্যাগ প্রয়োজন সে-সব আমাদের নেই ; সে-সব লাভ করবার প্রচেষ্টাও আমাদের নেই। শুধু চালাকি ও ফাঁকির দ্বারা আমরা সব কিছু করায়ত্ত করতে চাই। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। 'তদ্‌ কুরু পৌরুষম্‌'।" যুগাচার্যের এই যুগবাণী আমরা স্মরণ করি না, কর্মে তার রূপায়ণ তো দূরের কথা! কারণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের অনুকরণ-স্পৃহা, স্বাবলম্বী না হয়ে অন্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে। তার উপর জাতীয় দুর্বলতা ও হিংসা-দ্বেষ! স্বামীজী বলেছেন, "যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর—দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।" 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

স্বদেশমন্ত্রে স্বামীজী ভারতবাসীকে আহ্বান ক'রে কি করতে হবে তাই বলেছেন :

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী",

স্বামীজী বুঝেছিলেন ভারতের উন্নতির মূলে রয়েছে স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়। কিভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করতে হবে সে-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি :

"মেয়েদিগকে ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর-পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্মগুলি আগে শেখাতে হবে।...আদর্শ নারীচরিত্র সব মেয়েদের সামনে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে।...যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।" 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ।'

স্বামীজী চেয়েছেন ভারতে মেয়েরাও সর্ববিষয়ে ছেলেদের মতো যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে তার সুব্যবস্থা। কিন্তু সর্বোপরি জোর দিয়েছেন পাতিব্রত্য ও সতীত্বের উপর।

তাই তিনি বলেছেন—'তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' এঁরাই সতীত্বের মহিমোজ্জল রূপ। স্বামীজী বলেছেন, "ভারতীয় রমণীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—পরমবিশুদ্ধস্বভাবা পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় হওয়া।" "মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ।"

ত্যাগদীপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেম অক্ষুণ্ন রেখে মেয়েদের আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে পাশ্চাত্য ভোগবিলাস ও আড়ম্বর তাদের যেন আদর্শচ্যুত না করে। স্বামীজীর মতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি পুরুষ অপেক্ষা নারীর উপরই বেশী নির্ভরশীল। আদর্শ-সংঘাতের যুগে তাই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর পুণ্যময় চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

"ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ;"

ভারতের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ। ত্যাগের দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়। ত্যাগই ভারতের সর্বোচ্চ আদর্শ। সেই ত্যাগের মূর্তি হলেন শঙ্কর। জগতের সমস্ত বিষ গ্রহণ ক'রে তিনি নীলকণ্ঠ! কিন্তু বিতরণ করেন অমৃত! সব অশুভ অকল্যাণ দূর ক'রে দান করেন চরম কল্যাণ। নিজস্ব বলতে তাঁর কিছু নেই, কিন্তু ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও তাঁর কাছে তুচ্ছ। ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ হলেও তাঁর এত ক্ষমতা যে ইন্দ্রত্বও তিনি দিতে পারেন। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব, স্বয়ম্ভু। সকল দেবতা তাঁর শ্রীচরণে প্রণত।

স্বামীজী বলেছেন: "জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না; ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও; একটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।"

সর্বত্যাগী শঙ্কর সব দেন, কিন্তু কারও কছে কিছুরই প্রত্যাশী নন, তাই তিনি সকলের উপাস্য ;

"ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ;"

স্বামীজী ভারতবাসীকে সচেতন হতে বলেছেন, তাদের যা কিছু ধনসম্পত্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য বল, সমগ্র জীবনটি সকলের সেবার জন্য, নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের জন্য নয়। স্বামীজীর বাণী:

"জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার; আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন, উহাই একমাত্র গতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু; আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ।"

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে
সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে,
এ সবার পায়।"

"ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।"

আমরা সকলেই বিরাটরূপিণী মহামায়ার সন্তান। তাই চিন্তা করতে হবে, যেদিন জন্ম হয়েছে সেই দিন থেকেই আমরা প্রত্যেকেই মায়ের জন্য উৎসর্গীকৃত। বিরাটরূপিণী জননীর শরীরের এক একটি পরমাণুতুল্য আমরা প্রত্যেকে। বিন্দুতে সিন্ধুর মতো অণুতেও বিরাট মহামায়ার ছায়া! মায়ের পূজায়, মায়ের

সেবায়, সমাজের আপামর সকলের কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে বলি দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা।

স্বামীজী বলেছেন: "সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেইজগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতের যত শক্তি আছে, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপিণী।...যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।"

"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!"

যারা সমাজে যুগ যুগ ধ'রে দলিত মথিত উপেক্ষিত, যাদের নীচ জাতি ব'লে ঘৃণা করা হয়, তারাও সমাজের অঙ্গ, তাদের সংখ্যাই বিপুল! তাদের ধমনীতে যে রক্তধারা প্রবাহিত, উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যেও সেই একই রক্ত, কোন পার্থক্য নেই। উচ্চশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণী, সকলেই সেই জগজ্জননীর সন্তান, অতএব পরস্পরের সম্বন্ধ ভ্রাতৃভাবের। সকলে পরস্পর ভাই—এ সম্বন্ধ ভুললেই বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা ও কলহ জাগে।

শরীরকে তখনই সুস্থ বলা যায়, যখন তার প্রত্যেকটি অঙ্গ নীরোগ থাকে। সমাজ-শরীর সম্বন্ধেও একই কথা। নীচু স্তরের জনসাধারণও সমাজ-শরীরের একটি অঙ্গ। যে-কোন অঙ্গ শক্তিহীন হলে সমস্ত দেহটাই পঙ্গু হয়ে যায়; তেমনি সমাজের নীচুস্তরের মানুষগুলির উন্নতি যদি ব্যাহত হয় তাহলে সমগ্র সমাজটিই পঙ্গুত্ব লাভ করে।

স্বামীজীর যুগোপযোগী নির্দেশ:

"উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম 'পারিয়া' (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে তাহা নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ধর্মের ইহাই লক্ষ্য, ইহাই উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ-ধার্মিক অর্থাৎ ক্ষমা-ধৃতি-শৌচ-শান্তি-উপাসনা- ও ধ্যান-পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিবে।"

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।"

তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'রে ভারতের অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে স্বজনবোধ হারিয়ে অনেকের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগে এবং নিজেদের ভারতবাসী ব'লে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা ও লজ্জাবোধ হয়। এই দুর্বলতা কাটিয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেদের ভারতবাসী ব'লে গৌরববোধ করতে বলেছেন স্বামীজী। তিনি বলেছেন: "যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞান-রাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা 'অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয় তাহা 'এই অভীঃ', এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ।"

"বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;"

শুধু উচ্চবর্ণের লোকদের নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ভ্রাতৃভাব জাগরূক হলেই হবে না, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদেরও উচ্চশ্রেণীর প্রতি যেন ভ্রাতৃভাব জাগে। অর্থাৎ সকলেই যেন জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভাবতে পারে—আমরা একই জগজ্জননীর সন্তান। অবশ্য প্রথমে

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যদি নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রেমের বিস্তার দেখাতে পারেন, তবেই তাদের দিক থেকেও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আসবে এবং সকলে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী :

"দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন হউক না কেন, কিছুতেই ফল হইবে না। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য অবশ্য করিতে হইবে।"

"তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী,"

ভারতের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, তাদের পরনের কাপড়ও তেমন জোটে না, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে হলে নিজেদের বসনভূষণের বিলাসিতা বর্জন করতে বলেছেন স্বামীজী। দেবদেবীর উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, ভারতের দেবদেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তি, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' যে সমাজে জন্ম হয়, সেই সমাজেই শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য অতিবাহিত হয়; সমাজের সঙ্গে জীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সমাজ শৈশবকালে নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যৌবনে আনন্দনিকেতন নন্দনকানন, বৃদ্ধাবস্থায় তপস্যার ক্ষেত্র। মানবজীবনের কল্যাণ সমাজের কল্যাণেই নিহিত।

"বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;"

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও বড়। দেশপ্রেমিক হতে হলে স্বদেশকে ভালবাসতে হয়, নিরন্তর স্বদেশের কল্যাণচিন্তা করতে হয়। প্রকৃত স্বদেশবৎসল মানুষের নিকট দেশের মাটি, প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। তিনি নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভুলে কিসে দেশের মঙ্গল হবে, সেই চিন্তায় সদা নিরত থেকে স্বীয় চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তাঁর কাছে দেশের কল্যাণেই তার নিজের কল্যাণ। তাই স্বামীজী দেশবাসীকে ভারতের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন।

"আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'"

প্রার্থনার শক্তি অমোঘ। তাই স্বামীজী প্রার্থনা করতে বলেছেন। বলেছেন—প্রার্থনা কর মনুষ্যত্ব, যা মানবজীবনের সর্ববিধ উন্নতির মূলে। মনুষ্যত্বের বোধ যেন লুপ্ত না হয়, মানুষ যেন পশুর মতো আচরণ না করে। আর দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করবার জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করতে হবে। দুর্বলতা কাপুরুষতা থাকলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে না, মনুষ্যত্বের বিকাশ না হলে দেবভাব জাগবে না।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—'Arise, awake and stop not till the goal is reached'. আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী এখনও

মানবহৃদয়ে স্পন্দন তুলবে, মানুষকে মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে—'যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছ থামবার অবসর কোথায়? জাগো, মহাপ্রাণ! জাগো।'

বর্তমানে নানা আদর্শের সংঘাতে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় সমগ্র ভারত জর্জরিত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, ভারতের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে 'স্বদেশমন্ত্র' আবৃত্তি করতে হবে এবং কর্মে তার রূপায়ণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যদি আমরা নিজেদের এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ চাই তবে এই-ই একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পথ—'নান্যঃ পন্থাঃ'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলার কয়েকটি আখ্যায়িকা*

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী

"বাল্যলীলা শ্রীপ্রভুর গাইলে শুনিলে।
চির-অন্ধজনে মন দিব্য আঁখি মিলে॥
... ...
বড়ই সুমিষ্ট কথা অমিয়পূরিত।
বাল্যলীলা শুনে হয় মূর্খ সুপণ্ডিত॥"

বাংলার পরম রমণীয় প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে অবস্থিত পল্লী শ্রীধাম কামারপুকুর ও তার সন্নিহিত গ্রামগুলি ছিল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাল্যলীলার পূত ক্ষেত্র। তাঁর মধুর বাল্যলীলার কয়েকটি আখ্যায়িকা এখানে উল্লেখ করা হল।

একদিন মায়ের কাছ থেকে মুড়ি-ভরা টুঁকি হাতে শিশুদের নিয়ে মাঠপথে গদাই চলেছেন খেলতে। খোলামাঠে আকাশে নবমেঘের দৃশ্য দেখে গদাধরের ভাবের আবেশ হল; তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাহ্যজ্ঞান হারালেন, হাতের টুঁকিসুদ্ধ মুড়ি মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। সাথীরা কিছুই বুঝল না, গদাইয়ের একি হল! কিছুক্ষণ বাদে গদাই সংবিৎ ফিরে পেলেন।

গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে গদাই সব সময়ে নানারকম খেলতে ভাল বাসতেন. কিন্তু তাঁর খেলা সাধারণ ছেলেদের মত মোটেই ছিল না। রাখালবালকদের সঙ্গে নির্জন প্রান্তরে বৃক্ষতলে কখনও ব্রজখেলা খেলতেন। রাখালবালকেরা কেউ হত সুবল, কেউ শ্রীদাম, আর গদাই হতেন কানাই বা রাধারাণী। একদিন মাথুর পালা তাঁরা করছেন সেই প্রান্তরের তরুতলে। গদাই রাধারাণী হয়ে আকুল চিত্তে 'কোথায় কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন, চোখের জলে তাঁর বসন ও মাটি ভিজে গেল, এই অবস্থায় তিনি বাহ্য সংজ্ঞা হারালেন। রাখালবালকেরা ব্যস্ত হয়ে, কেউ রামনাম শুনাতে লাগল, কেউ বা তাঁর মুখে চোখে জল দিতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল না। এমন সময়ে একটি বালক বুদ্ধি করে কৃষ্ণনাম শুনাতে লাগল। তাই শুনে গদাই চোখ মেলে চাইলেন, কিন্তু তখনও তাঁর মুখে কথা নেই, আকুল হয়ে কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ বলে

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' অবলম্বনে

হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন. তাঁর হাত দুটো ভাবের আবেশে কাঁপছে। রাখালবালকেরা কৃষ্ণ-নামের প্রভাব দেখে সমস্বরে কৃষ্ণনাম বলতে বলতে গরু নিয়ে তখন গদাই সহ গৃহে ফিরে এল।

এর আগে একদিন গদাই রাখালবালকদের সঙ্গে গোচারণ ভূমিতে আনন্দে নেচে নেচে মুড়ি খেতে খেতে চলেছেন, এমন সময়ে তাঁর ব্রজভাবের উদয় হল. আর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তা দেখে রাখালবালকেরা ভয়ে রামনাম করতে লাগল। সেই নাম শুনে গদাই আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। তখন রাখালবালকেরা ভয় পেয়ে তাঁকে বলল :

"গরু চরাইতে আর আনিব না তোরে।
একাকী থাকিয়ো তুমি আপনার ঘরে ॥"

শিশু গদাই যে শুধু মনুষ্যশিশুদের সঙ্গে খেলতেন তা নয়।

একবার মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী সরাইথাটায় (মায়াপুর) পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, কখনও বা মায়ের কোলে। পথে এক জায়গায় গাছের তলায় কতকগুলো বানর দেখে, আহ্লাদিত হয়ে শিশু গদাই ছড়ি হাতে বানরদের তাড়া করতে গেলেন ; বানরেরা তখন তাঁকে আক্রমণ না করে শান্তভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে এল, গাছের ডাল থেকেও কতকগুলি বানর নেমে এল, তখন শিশু গদাই বানরদের সঙ্গে একত্র নেচে নেচে খেলতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে মায়ের প্রথমে ভয় হলেও পরে বিস্ময়ের সৃষ্টি হল।

গদাই একটু বড় হয়ে সাথীদের নিয়ে যেখানেই ঈশ্বরীয় কথা, যাত্রা, ভাগবতপাঠ, কীর্তনাদি হত সেখানে যেতেন এবং নিবিষ্টমনে সে-সব আত্মস্থ শুনতেন। তাঁর সঙ্গী বালকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্দার, গদাইয়ের যা ইচ্ছা বা আদেশ হত, তারা তাই আনন্দচিত্তে পালন করত। গদাই যে যাত্রাগান বা পাঠ শুনতেন, তা এত নিবিষ্টমনে শুনতেন যে, একবার শুনেই তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতে পারতেন। তাঁর গানের গলাও ছিল খুব মধুর, আর খোল করতাল পর্যন্ত মুখে আশ্চর্য নকল করতে পারতেন। তার পরে একদিন সেই শিশু ভক্তদের নিয়ে গদাই অপূর্ব যাত্রাগান করতেন। সেই যাত্রাগানের সাজপোশাক অতি সাধারণ হত, বাইরের পোশাক অন্তরের পোশাক দিয়ে সজ্জিত হয়ে উঠত, এবং সজ্জাকারও ছিলেন স্বয়ং গদাই। গদাইয়ের সঙ্গে যাত্রাগান করে বালকেরাও মেতে উঠত। পাঠশালায় ভরতি হয়েও গদাই ছুটির পর পাঠশালার ছেলেদের নিয়ে যাত্রাভিনয় করতেন। সেই ছেলেরাও গদাইয়ের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করতে মেতে গেল। গুরুমশাই গদাইয়ের যাত্রার সুখ্যাতি শুনে পাঠশালার মধ্যেই একদিন গদাইকে যাত্রাভিনয় করে তাঁকে শোনাতে বললেন। তখন গদাই মনের আনন্দে যাত্রাগান শুরু করলেন। সেই সময়ে

"আপনি করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে ॥
গীত বাদ্য নৃত্য আদি অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ত্রুটি ॥"

এই দেব-প্রতিম শিশু গদাইয়ের যাত্রাভিনয় দেখতে ও তাঁর মুখে অমিয়-মাখা সুরের গভীর ভাবের ঈশ্বরবিষয়ক গান শুনতে গ্রামের বয়স্ক নর-নারীরাও নিজ নিজ কাজ ফেলে পাঠশালায় ছুটে আসতেন। গুরুমশাইও তাঁদের ন্যায় মনপ্রাণ দিয়ে গদাইয়ের এই বিচিত্র অভিনয় দেখে ও শুনে পুলকিত হতেন। কতক্ষণে গদাই পাঠশালায় আসবেন এই কথা ভেবে ছাত্র ও শিক্ষক সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।

পাঠশালায় গুরুমশাই গদাইকে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' পুঁথিখানা পড়াতেন। গদাই সেই বই পেয়ে সকালে বিকালে পড়ে বার কয়েক শেষ করে ফেললেন, শীঘ্রই সবটা তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। তারপর তিনি ঐ পুস্তক থেকে যে পাঠ করতেন তা এতই হৃদয়গ্রাহী হত যে, গ্রামের বয়স্ক নর-নারীগণও সে-পাঠ পরম আগ্রহভরে শুনতেন।

একদিন গদাইয়ের পাঠের সময় এক তাজ্জব দৃশ্য সবাই দেখলেন। মধু তাঁতির ঘরে গদাইয়ের প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ চলছে, তখন নিকটস্থ কোনও আমগাছ থেকে একটি হনুমান নেমে এসে পাঠকের চরণ ছুঁয়ে প্রণতি জানিয়ে পাঠ শুনবার জন্যে নিঃশব্দে সেখানে বসল। যতক্ষণ পাঠ চলল, ততক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে হনুমানটি পাঠ শুনল। পাঠ সমাপ্ত করে, পাঠক গদাধর পুঁথিখানা হনুমানের মাথায় ছোঁয়ালেন। তখন হনুমানটি পাঠকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আবার সেই আমগাছে উঠে গেল। কে এই হনুমান, কে এই বালক—এই সব চিন্তা করতে করতে বিস্মিত ও পুলকিত গ্রামবাসিগণ স্বগৃহে ফিরলেন।

গদাই যখন যে দেবতার মূর্তি দর্শন করেন বা তাঁর কথা শুনেন বা পড়েন তখনই সেই-ভাব তাঁকে অধিকার করে। গৃহে কুল-দেবতা রঘুবীরের পূজার মালা গাঁথতে গাঁথতে ভাবে বিভোর হয়ে তিনি রাম নাম গাইতেন। অতি শৈশবে তাঁর পিতা যখন রঘুবীরের মন্দিরে রঘুবীরের পূজাকালে ধ্যানস্থ হয়েছেন, তখন শিশু গদাই এসে রঘুবীরের কণ্ঠের মালা নিজ কণ্ঠে ধারণ করে, নিজ দেহ চন্দন-চর্চিত করে পিতাকে ডাক দিয়ে বললেন, "দেখ, আমি কিরূপ রঘুবীর হয়েছি!"

বড় হয়ে কোনও সময় গদাই রামের গান, কখন শ্যামাবিষয়ক গান তাঁর বীণানিন্দিত কণ্ঠে আপন মনে গেয়ে গ্রামের লোকদের প্রাণ জুড়িয়ে দিতেন। গ্রামের মহিলারা আদর করে এই বাল-গোপালসম গদাইকে নাড়ু প্রভৃতি সুখাদ্য তৈরি করে খাওয়াবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন!

গদাইয়ের অমিয়-মাখা কথাও তাঁর সুমধুর গান শুনতে এবং তাঁকে দেখতে তাঁরা সবাই আকুল হয়ে থাকতেন।

একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষে কামারপুকুরবাসী সীতানাথ পাইন মশাইয়ের বাড়ীতে সারারাত শিবের পালা যাত্রাগান হবার আয়োজন হয়েছে; অনেক লোক সমবেত হয়েছেন; গদাইকে আসরে দেখবার জন্য তাঁরা খুব উৎসুক হয়ে বসে আছেন; অনেকক্ষণ পর গদাই শিবের বেশে, ব্যাঘ্র-চর্ম পরে, গায়ে ভস্ম মেখে, ত্রিশূল হাতে যখন আসরে এসে দাঁড়ালেন তখন লোকে গদাই বলে তাঁকে চিনতে পারল না; তিনি তখন গভীর শিবভাবে বিভোর। দেখতে দেখতে মহেশ্বরের মহাভাবের আবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারালেন আর তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রুবন্যা বয়ে যেতে লাগল। এই শিবের ভাব তাঁর অনেকক্ষণ ধরে রইল। উপস্থিত লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন; শুধু বৃদ্ধ শ্রীনিবাস শাঁখারী, যিনি আগেই গদাইয়ের স্বরূপ সঠিক চিনতে পেরেছিলেন, তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র এনে, নৈবেদ্য-সংযোগে ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করে দিতেই তিনি চোখ মেললেন; তখন তাঁকে ধরে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল, যাত্রাগান সেদিন আর হল না; শোনা যায় যে ঠাকুরের ঐ মহাভাবের ঘোর তিন দিন পর্যন্ত সেবারে ছিল।

আর একবার গ্রামের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কামারপুকুরের অদূরে আনুড় গ্রামে

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে গদাই চলেছেন। পথে যেতে যেতেই দেবীর ভাবে বালক গদাধর আবিষ্ট হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যাঁরা তাঁকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাঁরা তাঁর ঐ অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন; তখন লাহাদের বাড়ীর একটি মেয়ে গদাইয়ের কানে দেবীর নাম শুনাতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

দেবপূজা বালক গদাধরের অতীব প্রিয় কাজ ছিল বলেই বোধ হয়, তিনি ছেলেবেলা থেকেই অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে মাটির প্রতিমা গড়তে পারতেন। সেই প্রতিমা এতই সুঠাম ও ভাবব্যঞ্জক হত যে মনে হত দেবতা জাগ্রত হয়েছেন। সেই অপূর্ব মূর্তি গড়ে বালক গদাই সঙ্গীদের সঙ্গে আপন মনে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পূজা করতেন।

গদাই ছবি আঁকাও শিখেছিলেন চমৎকার। তাঁর আঁকা ছবি দেখে চিত্রকরও অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর এই অদ্ভুত কুশলতার মূলে ছিল তাঁর অপার ভগবৎপ্রেম, যা ভগবৎ-বিষয়ক সব কাজে এনে দিত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্ন।

এই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই শিশু গদাই 'সুবাহুর পালা' নামে একটি যাত্রার পালাও লিখেছিলেন। তাঁর শ্রীহস্তের সুন্দর অক্ষরে লেখা এই পুঁথিখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-কার স্বচক্ষে দেখেছেন বলে পুঁথিতে উল্লেখ করেছেন।

বালক গদাই একবার আর এক আশ্চর্য কাজ করলেন। লাহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক পণ্ডিতের সমাগম হয়েছে। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রের কোনও কথা নিয়ে বিষম তর্ক উঠল, দুই দলের তর্কের মধ্যে মীমাংসা আর হয় না; এমন সময় গদাই সেখানে এসে পণ্ডিতদের তর্ক শুনে এক মুহূর্তে তার সুন্দর মীমাংসা করে দিলেন, তা শুনে পণ্ডিতেরা শিশুকে ধন্য ধন্য করে আশীর্বাদ করলেন। শুদ্ধা ভক্তি ও অগাধ ভগবৎ-বিশ্বাস-বলেই তিনি এই অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। এ-হেন বালক গদাই গ্রামের সকল লোকের সঙ্গে অতি প্রিয়জনের মত মিশতেন; তাঁর সুন্দর মূর্তি, মধুর ঈশ্বরীয় কথা, কীর্তন, গান, নাচ ও হাস্য-পরিহাসে সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে থাকতেন; তিনি যেখানে যেতেন সেখানে আনন্দের হাট বসত। অন্তঃপুরের নারীরাও এই বালক গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনিও এ-বাড়ী ও-বাড়ী দিনের পর দিন কাটিয়ে সবাইকে অপার আনন্দ দিতেন।

বালক গদাই রঙ্গরসেও ছিলেন অদ্বিতীয়। একবার নারীবেশে বালক গদাই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মহিলাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাক্যালাপ করেছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত ধরতে পারেননি। এ ঘটনা ঘটেছিল সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে। যখন ঠাকুরের মেজ ভাই তাঁর খোঁজে বেরিয়ে তাঁকে ডাকতে লাগলেন. তখন তিনি দাদার ডাকে সাড়া দেওয়াতে, সবাই জানতে পারলেন যে, ভিন্ন গ্রামের মহিলা-অতিথির বেশে স্বয়ং গদাই এতক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন বাড়ীর কর্তা সহ সকলেরই মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

দয়াল ঠাকুর গদাইয়ের নিকট গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁর পৈতার সময় তিনি ধনীমাতার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না, এই হল সপ্তমবর্ষীয় বালক গদাইয়ের জিদ। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কোন ব্রাহ্মণ-বংশীয়া রমণীর হাত থেকেই ভিক্ষা নেওয়ার নিয়ম; গ্রামের ব্রাহ্মণ রমণীরা গদাইকে ভিক্ষা দিতে সবাই ব্যগ্র হয়েছিলেন

কিন্তু গদাই কারও কথা শুনলেন না। তিনি বললেন যে, ধনী কামারনী ভিক্ষা না দিলে তিনি ভিক্ষাই গ্রহণ করবেন না। এই বলে তিনি ঘরের দরজাতে খিল দিয়ে বসে থাকলেন। সকলের প্রাণাধিক গদাই ঘরে অভুক্ত হয়ে আছেন দেখে গ্রামের কারও সেদিন আহার করতে ইচ্ছে হল না। এমন সময় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বর এসে যখন বললেন যে গদাইয়ের ইচ্ছানুযায়ী ধনী কামারনীর ভিক্ষাই সে গ্রহণ করুক, এতে বংশের অসম্মান হবে না, তখন গদাই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ধনী কামারনীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিলেন। বালকবেশী জগন্নাথের নিকট সকল মানুষই সমান, সেদিন গদাই তা নীরবে ঘোষণা করলেন।

ঠিক এই ভাবের বশবর্তী হয়ে গদাই তাঁর পরম ভক্ত বৃদ্ধ চিনু শাঁখারীকে ধন্য করেছিলেন। চিনু একদিন গদাইয়ের গলায় মালা পরাবার জন্য পরম ভক্তিভরে মালা গেঁথে, মিষ্টান্নভোগ সহ গদাইয়ের শ্রীচরণে নিবেদন করলেন, তার পর সেই মালা তাঁর গলায় পরিয়ে নিজের হাতে সেই মিষ্টান্ন গদাইকে খাওয়াতে শুরু করলেন; ভাবের আবেগে চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে এই পরমভক্ত বৃদ্ধ মিষ্টান্নসহ তাঁর হাত আবেশে গদাইয়ের মুখে গালে মাথায় ঠেকাতে লাগলেন। তখন গদাই তাঁর হাত ধরে তাঁর হাতের খাবার তাঁর মুখে দেওয়াতে লাগলেন।

এই বৃদ্ধ চিনু শাঁখারী গদাইকে প্রথম থেকেই চিনেছিলেন, তাই যখন বালকদের নিয়ে যাত্রার দল করে এ-গ্রামে সে-গ্রামে যাত্রা করতে গদাই যেতেন তখন বালকদের মধ্যে মহা উৎসাহে চিনুও যোগ দিতেন। ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গ সারাক্ষণ পাবার জন্যই বোধ হয় বৃদ্ধ এরূপ করতেন।

আর একবার খেতির মা নামে এক দরিদ্র তাঁতির ঘরের রমণীর খুব ইচ্ছা হলো নিজে হাতে এই দেব-শিশু গদাইকে খাওয়াবেন; কিন্তু নিম্নজাতীয়া বলে মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখেন। অন্তর্যামী গদাই তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে একদিন নিজেই খেতির মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে যেচে তাঁর হাতের খাবার খেয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সব মধুর, পরম মঙ্গলদায়ক কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে পড়লে পুঁথির পরম ভক্ত রচয়িতার নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে—

"ধরি নর-কলেবর মায়ায় মোহিত।
রামকৃষ্ণ শ্রীপ্রভুর বিচিত্র চরিত॥
শ্রবণ-কীর্তনে নাশে মায়ার বন্ধন।
স্মরণে মননে হয় তাপ বিমোচন॥"

সমালোচনা

Swami Premananda: Teachings and Reminiscences. প্রকাশক: বেদান্ত প্রেস, ১৯৪৬ বেদান্ত প্লেস, হলিউড, ক্যালিফর্নিয়া ৯০০২৪, আমেরিকা। স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত। পৃষ্ঠা ১৫৭; মূল্যের উল্লেখ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান ও লীলাসহচর স্বামী প্রেমানন্দের বাণীর সংকলন, পাঁচ জন সন্ন্যাসী ও দুই জন গৃহীর স্মৃতিচারণ, তাঁহার গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে যথাক্রমে ২টি, ৮টি ও ১টি এবং জনৈক গৃহী ভক্তকে লিখিত ১টি চিঠি আছে। ভূমিকাতে Clive Johnson স্বামী প্রেমানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার উদার চরিত্র, দেবদুর্লভ পবিত্রতা, নিঃসীম প্রেম, ঐকান্তিক সেবা, চরম ত্যাগ ও পরম বৈরাগ্যের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে একটি মহাজীবনের মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন ধর্মের সার্থক ও উদ্দীপ্ত অনুরণন আমরা পাই তাঁহার বাণী ও শিক্ষাতে যাহা এই গ্রন্থে সুষ্ঠুরূপে সংকলিত হইয়াছে। আর পাই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার অনন্যা ভক্তি এবং অভেদ দৃষ্টি। স্বকীয়তাবর্জন সাধনে তিনি সফলতার শীর্ষে উঠিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখি তাঁহার জীবন ছিল সম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণময়। স্বামী বিবেকানন্দপ্রবর্তিত সেবাধর্মের তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। স্মৃতিচারণে স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমঘন মূর্তিটি অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকট হইয়াছে। গুরুভাইদিগকে লিখিত পত্রগুলি হইতে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অকপট ভালবাসা প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি চিঠিতে (স্বামী অভেদানন্দকে) স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে বলিয়া উহা নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান দলিল। আর শেষ পত্রে পাই শ্রীসারদাদেবীর জীবনের একটি ভাবসমৃদ্ধ প্রোজ্জ্বল মূল্যাঙ্কন।

ইংরেজী-ভাষাভাষী পাঠকপাঠিকাদের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

স্বামী বীতশোকানন্দ

নিবেদিতা লোকমাতা (প্রথম খণ্ড) শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। পৃঃ ৭৭৬ + ২৪। মূল্য—৩০৲ টাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, জর্মান-গবেষকসুলভ অতন্দ্র অনুসন্ধিৎসা এবং ভারত-সংস্কৃতিজাত বিশাল মনঃপ্রেরণা বাংলাদেশ থেকে এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই বিশাল মহাগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অস্তিত্ব ঘোষণা করল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার যে ভাবমূর্তি নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন, সেই পরিশ্রম-সাধ্য কর্মের জন্য শুধু ধ্যাননিষ্ঠ সাধনাই নয়, তার জন্য প্রয়োজন ছিল ক্ষত্রোচিত পৌরুষ-বীর্য। এই গ্রন্থরচনায় সেই ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানলীনতা এবং

ক্ষত্রিয়ের কর্মৈষণার আশ্চর্য সংশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাবে। লোকমাতার মর্ত্য ও দিব্যজীবনের এ-হেন মহাকাব্য রচনা করে লেখক যে-সারস্বত পুণ্য অর্জন করেছেন এবং পাঠককেও তার অংশভাগী করেছেন, তার জন্য ভাবীকালের ইতিহাস-দেবতা তাঁকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

নিবেদিতার প্রবল প্রচণ্ড মাতৃস্নেহ এবং প্রচণ্ডতর বীরাঙ্গনার মূর্তি বিশ্বের এক বিচিত্র বিস্ময়। দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করা প্রবল মনুষ্যত্বের লক্ষণ, এবং বিপরীত বিষয়ের মধ্যে মাতৃস্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনরজ্জু স্থাপন নারী-চরিত্রের লক্ষণ। নিবেদিতা সেই মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের এক অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর সেই প্রবল মাতৃধর্ম, যা কোনও দিন জাতি-পংক্তি বিচার করে না, যাতে শুচি-অশুচির ভেদাভেদ নেই, সেই সর্বসহিষ্ণু দেশকালাতীত elemental মাতৃত্ব—তাকে অজস্র চরিতার্থতার মধ্যে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অধ্যাত্ম গুরু ও জনক স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ এই আইরিশ কন্যাকে কীভাবে ভারতের লোকমাতায়, সেবিকায় পরিণত করলেন, কীভাবে ভাঙলেন, গড়লেন—তার কথা নিবেদিতা নিজেই বলে গেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ দীর্ঘকালের সাধনায় সেই অপূর্ব মাতৃকামূর্তির জীবন্ত চিত্রাঙ্কন করেছেন। ইতিপূর্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গবেষণায় স্নাতকত্ব লাভ করেছেন; নিবেদিতার পুণ্যশ্লোক জীবনকথার প্রথম খণ্ড রচনা করে তিনি এবার হলেন উত্তর-স্নাতক।

'নিবেদিতা লোকমাতা'র প্রথম খণ্ডটিকে লেখক চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বে বিভক্ত করেছেন: (১) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা, (২) মৃত্যুরূপা কালী, (৩) পূর্বজীবন, (৪) ভগিনী নিবেদিতা ও ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু। শেষোক্ত পর্বে মূলতঃ জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার বিষয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেলেও প্রসঙ্গক্রমে লেখক নিবেদিতার সঙ্গে ওলি বুল, ম্যাকলাউড, অবলা বসু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্রের সম্পর্ক বিষয়েও অনেক বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই অংশে নিবেদিতা ও দীনেশচন্দ্র সেন-সংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেতে পারত। দীনেশচন্দ্রকে ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় উৎসাহিত করে, রচনাদি নিত্য সংশোধন করে দিয়ে, আলাপ-আলোচনায় দীনেশচন্দ্রের রসদৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে নিবেদিতা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও মহদুপকার করেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় খণ্ডে এই সম্পর্কে আলোচনা করলে এক নতুন দিকে নিবেদিতার প্রভাব দৃষ্টিগোচর হবে।

এই গ্রন্থের যে-দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাতে স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলন, সাহিত্য-শিল্পকলা, সমাজসেবা ও নারীশিক্ষা, দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবী এবং একালের নানা মনীষীর সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ ও সম্পর্ক বিষয়ে লেখক অনেক নতুন ব্যাপার বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। লুই বার্ক যেমন আমেরিকায় বসে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করে বিশ্বসংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন, অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসুও সেইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে সমস্ত প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। 'নিবেদিতা লোকমাতা' সেই প্রয়াসের প্রথম অর্ঘ্য। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্য পাঠকচিত্ত কতটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

একজন অপরিমিতশক্তি নারীকে (যিনি মূলতঃ কেল্টিক-শোণিতজ) কেন্দ্র করে এই শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ও বাংলার বাইরে সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সেবাধর্মের যে বিচিত্র বিকাশ দেখা গিয়েছিল, এত দিন তার অনেক কথাই মূক হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শঙ্করী-প্রসাদ সেই মৌনকে মুখর করে তুললেন।

লিজেল রেমঁ-র ফরাসী ভাষায় লেখা নিবেদিতার জীবনীটি শ্রীমতী নারায়ণী দেবী বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৯৫৫ সালে। তার কিছু পরে প্রব্রাজিকা মুক্তি-প্রাণার লেখা নিবেদিতার বাংলা জীবনী এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা ভগিনীর ইংরেজী জীবনী প্রকাশিত হলে জনসাধারণ নিবেদিতা-সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তারও অনেক আগে ১৯৪০ সালে গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী 'উদ্বোধনে' যখন শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ধারা-বাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন, তখন স্বদেশী ও গুপ্ত-আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পাঠককে চমৎকৃত করেছিল, কেউ কেউ-বা এর তথ্যপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিছু সংশয়ীও হয়েছিলেন। অতঃপর আসন্ন নিবেদিতা শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুসন্ধিৎসু ও অনুরাগীদের কৌতূহল এই সম্পর্কে নানা তথ্য-সন্ধানে ও উৎস-আবিষ্কারে সজাগ হয়ে উঠল। আমাদের লেখক, যিনি অনেক দিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তিনি নিবেদিতা-তীর্থপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছ থেকে তিনি নিবেদিতার প্রায় পাঁচশ চিঠি সংগ্রহ করলেন। তাঁরই আনুকূল্যে শঙ্করীপ্রসাদ লিজেল রেমঁ-র কাছ থেকে আরও কতকগুলি মূল্যবান চিঠি পেলেন। এই দুর্লভ দলিল তাঁকে নিবেদিতার বিষয়ে নতুন পথের সন্ধান দিল। প্রাসঙ্গিক আরও নানা তথ্য ও সূত্র থেকে তিনি প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করলেন এবং নিদারুণ পরিশ্রমকে একাজের বেতনস্বরূপ গ্রহণ করে তিনি এক মহীয়সী নারীর অপাপবিদ্ধ জীবন-কথাকে গ্রন্থাকারে গ্রন্থন করলেন।

'নিবেদিতা লোকমাতা'র প্রথম খণ্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, লেখক অজস্র উপাদান ব্যবহার করেছেন, সংবিন্যাস করেছেন, এক তথ্যের সঙ্গে অপর তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেছেন—যা একাধারে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের এক অপরূপ বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। যে গ্রন্থের শুধু চিঠি ও দিনলিপির ফটোস্টাট পৃষ্ঠাসংখ্যাই চল্লিশোর্ধ্ব, যাতে দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্র ও দুর্লভ গ্রন্থের মূল পৃষ্ঠার ফটোলিপিও প্রচুর, সে গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য ও তথ্যসমৃদ্ধির প্রাচুর্য ব্যাখ্যান করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিবেদিতার জীবনকথাকে চারিটি পর্বে বিভক্ত করে বহির্জীবন, অর্জিতজীবন, অন্তর্জীবন ও কুলধর্মকে যে-সমস্ত তথ্যস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার বিপুলতা ও পৃথুল কলেবর যে-কোন 'সহজিয়া' পাঠকের ভীতি-উৎপাদনে সক্ষম। এই বস্তু ও তথ্যপুঞ্জকে মন্থন করে নিবেদিতার চিত্তস্বরূপ আবিষ্কার করা যথার্থই ভৌগোলিক আবিষ্কারের মতোই রোমাঞ্চকর, দেশজয়ের মতো উদ্দীপনাময়, আত্মোপলব্ধির মতো শান্তরসাস্পদ।

এই খণ্ডের শেষ পর্বটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে লেখক নিবেদিতার সঙ্গে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির সম্পর্কের কথা নানা তথ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং তার যথাযথ মূল্য বিচার করেছেন। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ও সংযোগ সম্পর্কে

অসংখ্য পত্র ও দিনলিপি থেকে তিনি যেভাবে তথ্য সঙ্কলন করেছেন তাতে তাঁকে যে-কোন প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কারকের পাশে স্থান দেওয়া যেতে পারে। বড়ই পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশ এখনও সত্যদ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের একখানিও নির্ভরযোগ্য জীবনী রচনা করতে পারেনি। অসহ্য মানসিক নির্যাতন শিরোধার্য করে অদ্ভুত বীর্যের সঙ্গে এই ধ্যানমগ্ন বিজ্ঞান-সাধক সংগ্রাম করে গেছেন এবং শত বাধাকে অপসারিত করে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আশীর্বাদী মাল্য শিরে ধারণ করেছেন—তার পিছনে ছিল নিবেদিতার উৎসাহ, উপদেশ, উদ্দীপনা, সহযোগিতা। নিবেদিতা তাঁর সমস্ত স্নেহবাৎসল্য যেন এই বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রকল্প সাধকের ওপর উজাড় করে দিয়েছিলেন। সেই মানসিক সংগ্রামের ইতিহাস আজকালকার ক'জন বৈজ্ঞানিকই-বা জানতে উৎসাহী হন? বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারপ্রান্তে লগ্ন দীপধারিণী নারীমূর্তিটিই যে নিবেদিতার প্রতিরূপ, শঙ্করীপ্রসাদ অভ্রান্তভাবে তা প্রমাণিত করেছেন। 'Lady of the Lamp' জগদীশচন্দ্রকে অন্ধকারের মধ্যে অন্তরাগ্নি জ্বালিয়ে রাখতে নিত্য উৎসাহ দিয়েছেন। সেই অকথিত ইতিহাস এতদিন পরে শঙ্করীপ্রসাদের চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করল। নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র-সংক্রান্ত এই সমস্ত নতুন তথ্য ভারতের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসেও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে স্থান পাবে। অন্য তিনটি পর্বে লেখক যে সমস্ত তথ্য উদ্ধার করেছেন বিশেষজ্ঞ-মহল তার কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এই চতুর্থ পর্বটি যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি অম্লান দীপশিখা। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আমাদের ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা। লেখক এদিক থেকে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন।

অনেক সময় দেখা যায়, গবেষণাকর্মে তথ্য-ভার পাষাণভার হয়ে সহৃদয় পাঠকের সরস পাঠস্পৃহাকে বিরস করে তোলে। এ ধরনের সাহিত্যকর্মে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য ব্যাপার থাকে বটে, কিন্তু তা অনেক সময়েই হৃদয়বেদ্য সারস্বত রসবস্তু হয়ে উঠতে পারে না। শঙ্করীপ্রসাদ বসু দুরূহ তত্ত্ব ও লতাজটিল তথ্যের অজস্রতাকে সরস লেখনীর সাহায্যে মানসিক আরামে পরিণত করেছেন। এজন্য শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকেই নয়, আমাদের মতো 'দুর্মেধস্' ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তিনি অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন। এ বিশাল মহাগ্রন্থ বাঙালীর নিত্য-পঠনীয় গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমাদের সুদৃঢ়। এটি সর্বভারতীয় অনুচিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যাপক প্রচার লাভ করুক, যে-কোন সৎপাঠক এ গ্রন্থ পাঠের পর তাই কামনা করবেন। শ্রীমতী লুই বার্কের 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries' যেমন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ও গবেষণার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমন শঙ্করীপ্রসাদের 'নিবেদিতা লোকমাতা' নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নব্য-ভারতীয় সাধনা সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত বিভাসিত করেছে। চিঠিপত্র, ডায়েরি, পুরাতন গ্রন্থ, সাময়িক পত্রের দুর্দর্শন ও কৌতূহলোদ্দীপক অজস্র আলোকচিত্রসহ শোভন-আকারে গ্রন্থটিকে নৈবেদ্যস্বরূপ প্রকাশ করে প্রকাশকও একটি মূল্যবান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, এ জন্য তাঁরাও জাতির ধন্যবাদের পাত্র। শঙ্করীপ্রসাদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে নিবেদিতা-তীর্থপরিক্রমার দ্বিতীয় খণ্ডটি দ্রুত রচনা করুন, আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে এই কামনা করি।

—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৬ই ফাল্গুন ১৩৭৫ (১৮. ২. ৬৯), মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্-আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম এবং দশাবতারের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ৮,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বুধানন্দ ইংরেজীতে এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহারাজ বাংলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন অবলম্বনে সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু পথপ্রদর্শক নহেন, পথিকৃৎ; নবীনকে বরণ করিয়া লইয়া তিনি নবযুগের নবজীবনের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ভগবানলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া মানবত্বার ভিতর দিয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিবার কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। স্বামী বুধানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'যোগসহায় শ্রীরামকৃষ্ণ'। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোট-বড়-পাপী-পুণ্যবান-নির্বিশেষে ভগবানলাভের পথে সকলকেই সহায়তা করিয়া গিয়াছেন; যেখানে যে আটকাইয়া গিয়াছে, সেখানেই তিনি তাহাকে আলো দেখাইয়াছেন, তাহার পথের বাধা অপসারণ করিয়াছেন। (শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ভাষণটি এই সংখ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সারাদিন সহস্র সহস্র ভক্ত মঠে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১০ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ১৬ জনকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন।

জন্মতিথি উৎসবের পরবর্তী রবিবার ১১ই ফাল্গুন (২৩. ২. ৬৯) বেলুড় মঠে সারাদিন-ব্যাপী সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মাইকযোগে সঙ্গীত, আবৃত্তি, কথকতা, পাঠ ইত্যাদির এবং মঠ ও মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তনাদির ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যারতির পর বাজি-পোড়ানো হয়। এই দিন মঠে প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: উদ্বোধনের গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত জানুআরি, ১৯৬৯ বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ ছাড়া উক্ত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদিও বিতরণ করা হইয়াছে:

গুড়া দুধ ১,০৮৫ কেজি, বেবি-ফুড ৬ টিন,

বাসনপত্র ২,১০৯টি, কৃষি-সরঞ্জাম ৪৯৯টি, কম্বল ১০০ খানি, ধুতি ও শাড়ী ১৫ খানি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১,২৬৮ খানি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা – ১৩,৮৩৭।

মণ্ডলঘাটে পানীয় জলের জন্য ৭টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কম্যুনিটি হল এবং আরও টিউবওয়েল নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: গত ডিসেম্বর, ১৯৬৮ এবং জানুআরি, ১৯৬৯ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মেদিনীপুর জেলায় সবং ও ময়না থানার বন্যার্ত জনগণের মধ্যে ১২,১৩৭ কেজি চাল ও ১১,১১৬ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২২,৫৯৩।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: গুজরাটে বন্যার্তগণের পুনর্বাসনের জন্য মিশন কর্তৃক কুটীরনির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (আবাসিক) ছাত্রগণ অন্যান্য বছরের মতো এবারও ভারত সরকারের মেধাবৃত্তি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৩টি বৃত্তির মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১১টি বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর: রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৫ তম জন্মতিথি বিগত ১১ই জানুআরি (২৭শে পৌষ) শনিবার যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রত্যুষে আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ মোটরবাসযোগে ভজন গাহিয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। সকালে পূজা, চণ্ডীপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচশতাধিক নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৩১শে জানুআরি বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র (সভাপতি), ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (প্রধান অতিথি), এবং ডাঃ ননীগোপাল সাহা স্বামীজীর জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সভায় পাঁচশতাধিক নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, ভজন ও সভানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত আশ্রমগুলিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

মেদিনীপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৮ই ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২২শে শ্রীদুর্গাদাস তরফদার সঙ্গীতসহযোগে কথকতা করেন, পরে চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন প্রদর্শিত হয়। ২৩শে দুপুরে প্রায় সাড়ে চার হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন আয়োজিত সভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে 'প্রবীরার্জুন' অভিনীত হয়।

দেওঘর: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ১৮ই ফেব্রুআরি প্রত্যুষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি লইয়া শহরপরিক্রমা করা হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় ডাঃ বি. কে. সুর (সভাপতি), স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও বিদ্যাপীঠের কয়েকজন ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করেন। ১৯শে

নারায়ণসেবায় প্রায় ১২০০ জন নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কোয়ালপাড়া: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রমে ১৮ই হইতে ২১শে ফেব্রুআরি প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। ১৮ই অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী গদাধরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২২শে তারিখ দুপুরে ছয় সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা, শ্রীসুধীর চৌধুরীর রামায়ণগান ও রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়।

দিল্লী: গত ২৩শে ফেব্রুআরি নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মসভায় ভারত রাষ্ট্রের সহ-রাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরি সভাপতিত্ব করেন।

স্বামী জ্ঞানস্বরূপানন্দ, স্বামী প্রশান্তানন্দ ও স্বামী অঘোরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি:

স্বামী জ্ঞানস্বরূপানন্দ (মণীন্দ্র মহারাজ) গত ২রা ফেব্রুআরি ১৯৬৯ ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি ডায়েবেটিসে ভুগিতেছিলেন। গত ৩১শে জানুআরি তাঁহার 'কোমা' হওয়ায় তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি করা হয়। ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা অবনতির দিকে যাইতে থাকে এবং অবশেষে তিনি চিরশান্তি লাভ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন; ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। বেশ কিছুকাল তিনি পুরী মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী প্রশান্তানন্দ (ঋষি মহারাজ) গত ৩রা ফেব্রুআরি রাত্রি ৮-১০ মিনিটের সময় মেদিনীপুর জেলার চকজয়কৃষ্ণ নামক স্থানে জনৈক ভক্তগৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুরাতন আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

তিনি মেদিনীপুর জেলার বালিচক নামক স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন এবং সেখানেই থাকিতেন।

স্বামী অঘোরানন্দ (গণেশ মহারাজ) গত ২৩শে ফেব্রুআরি বিকাল ৫ টার সময় কলম্বো রত্নম্ প্রাইভেট হাসপাতালে ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার 'ডায়েবেটিক কোমা' হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কলম্বো ব্যতীত তিনি বোম্বাই, বেলুড় মঠ, রাজকোট, পনামপেট প্রভৃতি আশ্রমে নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিয়াছিলেন।

এই সন্ন্যাসিত্রয়ের আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বাবুগঞ্জ, হুগলী : 'বিবেকানন্দ ভারতী'র উদ্যোগে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার ৭৫তম বর্ষের স্মরণোৎসব ১৯৬৮র ১১ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর, অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই তারিখ সভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ (সভাপতি), শ্রীদিলীপকুমার সিংহ ও শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন।

শিকড়া-কুলিনগ্রাম : রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৫ই মাঘ স্বামী ব্রহ্মানন্দ জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, তীর্থপরিক্রমা, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনালোচনা করেন। পরে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হইয়াছিল।

খিদিরপুর : 'সুরবিতানে' বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

খেপুত : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ, কথকতা, কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে গত ১২. ১২. ৬৮ তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের এবং গত ১৮. ২. ৬৯ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রসুলপুর (বর্ধমান) : স্বামীজী মিলন পাঠাগারে গত ১১ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামীজীর জীবনালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী (সভাপতি), শ্রীতারাপদ মোদক ও শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেব। একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হইয়াছিল।

বড়-আন্দুলিয়া (নদীয়া) : লোক-শিক্ষা শিবিরে গত ২৬শে ফেব্রুআরি আটদিন-ব্যাপী 'গদাধরের মেলা'র উদ্বোধন দিবসে আয়োজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি) ও মৌলভী রেজাউল করিম (প্রধান অতিথি) শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আলোচনা করেন।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি হইতে ১লা মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সভা কীর্তনাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মিত্রানন্দ।

আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। দাতব্যচিকিৎসালয় হইতে গত বৎসর ৩৭,৮৭০ জন রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

দশঘরা : পূর্বপাড়া বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ২রা মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে পাঠ ও আবৃত্তি, ভজন, সভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী বীরানন্দ (সভাপতি) ও জনৈক শিক্ষক স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া যুবকগণকে স্বামীজীর আদর্শে আকৃষ্ট করেন। সভায় চারিশতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১লা হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত কল্পতরু-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, ঢাকার স্বামী দয়ানন্দ, শ্রীবিমল বোস ও ব্রহ্মচারী সুকুমার। চতুর্থ দিনে মহোৎসবে প্রায় ৭ হাজার ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নৌকায় আন্দামান অভিযান

গত ১লা ফেব্রুআরি, ১৯৬৯ লেঃ জর্জ আলবার্ট ডিউক ও শ্রীপিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার 'ম্যান-অব-ওয়ার' জেটি হইতে একখানি দাঁড়টানা নৌকাযোগে আন্দামান যাত্রা করেন। 'কনোজি আংরে' নামক নৌকাটি দৈর্ঘ্যে ২০ ফিট, চওড়ায় ৫ ফিট; কোন ইঞ্জিন বা পাল ছিল না। রাস্তায় প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয়াদি এবং একটি বেতার-প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র মাত্র সঙ্গে লইয়া দাঁড় টানিয়া সমুদ্রের বুকে প্রায় একহাজার মাইল পাড়ি দিবার জন্য অসীমসাহসী এই যুবকদ্বয় অভিযান শুরু করেন।

গত ৫ই মার্চ বিকাল ৫ টায় তাঁহারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উত্তর দিকের প্রথম দ্বীপ ল্যাণ্ড ফল-এ উপনীত হন। সেখান হইতে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌছান ৮ই মার্চ। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে ডিউক ও পিনাকী বিমানযোগে কলিকাতায় পৌছান ১১ই মার্চ পৌনে একটার সময়।

এই বীর যুবকদ্বয় যাত্রাকালে কলিকাতা, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে এবং অভিযানে সাফল্যলাভের পর ল্যাণ্ড ফল হইতে শুরু করিয়া যেখানেই গিয়াছেন সর্বত্র বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইয়াছেন। কলিকাতায় পৌছিবার দিন দমদম বিমান বন্দরে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

এই ধরনের অভিযান এশিয়ায় এই প্রথম এবং বিশ্বে দ্বিতীয়। কলিকাতা এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের সভাপতি শ্রীমিহির সেন কর্তৃক এই অভিযানটি পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়।

দিব্য বাণী

কিং জ্যোতিস্তব ভানুমানহনি মে রাত্রৌ প্রদীপাদিকং
স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধৌ কিং জ্যোতিরাখ্যাহি মে।
চক্ষুস্তস্যনিমীলনাদিসময়ে কিং ধীর্ধিয়ো দর্শনে
কিং তত্রাহমতো ভবান্ পরমকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো! ॥১

একশ্লোকী—(শঙ্করাচার্য)

'যাহা কিছু দেখিতেছ, কোন্ সে জ্যোতির বলে, কিসের বিভায়
বল দেখি, প্রকাশিত হয়ে থাকে দিনমানে অথবা নিশায়?'
"দিনমানে সূর্য আর নিশাকালে চন্দ্র-দীপ-আদি আলো দিয়া
নিখিলের বস্তুচয়ে উদ্ভাসিত করি দেয় প্রকাশ করিয়া।"
'কোন্ জ্যোতিবলে তুমি দেখ সূর্যে, দেখ দীপাদিরে জ্যোতির্ময়?'
"চক্ষুর জ্যোতিতে দেখি। (দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে প্রকাশ না পায়
কোন কিছু কারো কাছে শুধুমাত্র দীপাদির আলোর প্রভায়।)"
'চক্ষু যবে নিমীলিত (স্বপ্ন-চিন্তা-ধ্যানাদিতে) কোন্ জ্যোতিবলে
বিষয় প্রকাশ পায় (সূক্ষ্মাকারে ভেসে ওঠে তব চিত্ততলে)?'
"বুদ্ধি করে প্রকাশিত।" 'বুদ্ধি হয় প্রকাশিত কাহার বিভায়?
(প্রকাশ-শকতি তার সঞ্জীবিত হয় কোন্ জ্যোতির ধারায়?)'
"সে পরম জ্যোতি 'আমি'; আপনিও তাই, প্রভু!" ('আমি'-বোধ রূপ
চৈতন্যজ্যোতিই মাত্র প্রকাশিত করে এই বিশ্ব অপরূপ।
চৈতন্যবিহীন কোন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ কিম্বা পদার্থের কাছে
কোন বোধই জাগে নাকো কোনখানে কোন কিছু নেই কিম্বা আছে।
স্বপ্রকাশ এ চৈতন্য; ইহারই জ্যোতিতে ফোটে সর্ব ভাব রূপ;
ইহাই পরম ব্রহ্ম—তুমি আমি সবাকার ইহাই স্বরূপ।)

দিব্য বাণী

কিং জ্যোতিস্তব ভানুমানহনি মে রাত্রৌ প্রদীপাদিকং
স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধৌ কিং জ্যোতিরাখ্যাহি মে।
চক্ষুস্তস্যনিমীলনাদিসময়ে কিং ধীর্ধিয়ো দর্শনে
কিং তত্রাহমতো ভবান্ পরমকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো! ॥১

একশ্লোকী—(শঙ্করাচার্য)

'যাহা কিছু দেখিতেছ, কোন্ সে জ্যোতির বলে, কিসের বিভায়
বল দেখি, প্রকাশিত হয়ে থাকে দিনমানে অথবা নিশায় ?'
"দিনমানে সূর্য আর নিশাকালে চন্দ্র-দীপ-আদি আলো দিয়া
নিখিলের বস্তুচয়ে উদ্ভাসিত করি দেয় প্রকাশ করিয়া।"
'কোন্ জ্যোতিবলে তুমি দেখ সূর্যে, দেখ দীপাদিরে জ্যোতির্ময় ?'
"চক্ষুর জ্যোতিতে দেখি। (দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে প্রকাশ না পায়
কোন কিছু কারো কাছে শুধুমাত্র দীপাদির আলোর প্রভায়।)"
'চক্ষু যবে নিমীলিত (স্বপ্ন-চিন্তা-ধ্যানাদিতে) কোন্ জ্যোতিবলে
বিষয় প্রকাশ পায় (সূক্ষ্মাকারে ভেসে ওঠে তব চিত্ততলে) ?'
"বুদ্ধি করে প্রকাশিত।" 'বুদ্ধি হয় প্রকাশিত কাহার বিভায় ?
(প্রকাশ-শকতি তার সঞ্জীবিত হয় কোন্ জ্যোতির ধারায় ?)'
"সে পরম জ্যোতি 'আমি'; আপনিও তাই, প্রভু!" ('আমি'-বোধ রূপ
চৈতন্যজ্যোতিই মাত্র প্রকাশিত করে এই বিশ্ব অপরূপ।
চৈতন্যবিহীন কোন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ কিম্বা পদার্থের কাছে
কোন বোধই জাগে নাকো কোনখানে কোন কিছু নেই কিম্বা আছে।
স্বপ্রকাশ এ চৈতন্য ; ইহারই জ্যোতিতে ফোটে সর্ব ভাব রূপ ;
ইহাই পরম ব্রহ্ম—তুমি আমি সবাকার ইহাই স্বরূপ।)

মানুষকে এরূপ বিপুল সম্মান দিলেও, অদৃষ্টের কি পরিহাস, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই ধর্মের নামেই আমরা মহাভেদবুদ্ধি আনিয়াছি—ধর্মের নামেই একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক অধিকার দাবী করিয়াছি, এবং একজন মানুষকে অপরজন হইতে এত অধম বলিয়া ভাবিয়াছি যে তাহার স্পর্শও অধর্ম বলিয়া গণ্য!

স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, "আমাদের ধর্মে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি।" তাঁহার ব্যাথাতুর চিত্ত এই ভেদবুদ্ধিকে 'পৈশাচিক' ও 'নারকীয়' আখ্যা দিয়াছে। স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, ধর্মের সঙ্গে ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত বর্তমান জাতিপ্রথা, অধিকারবাদ ও অস্পৃশ্যতাকে আমরা মিশাইয়া ফেলিলেও এগুলির কোনটির সহিতই ধর্মের কোন সংস্রব নাই, স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমরা এগুলি ধর্মের নামে চালাইতেছি, এ সবই স্বার্থান্বেষীদের সমাজব্যবস্থার ফল—"হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্মই এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই।" "হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই, হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছে সকলেই তোমার আত্মারই রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ এই তত্ত্বকে কার্যপরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।"

স্বামীজী জাতিকে এই কলঙ্কগুলি হইতে মুক্ত করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন এগুলির জন্য ধর্মকে শুদ্ধ ত্যাগ করিয়া নহে, ধর্মকে এগুলি হইতে পৃথক করিয়া, এগুলিকে পরিহার করিয়া যথার্থ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা, এবং জাতিপ্রথার মূল ভিত্তি গুণগত বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্য সর্বজনের ঊর্ধ্বায়নের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া।

অধিকারবাদ

লণ্ডনে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছেন, "অধিকারবাদের যদি কোন দেশ থাকে, তাহা সেই দেশই, যাহা অদ্বৈত-দর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশজাত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। সেখানে অবশ্য আর্থিক অধিকারবাদ ততটা নাই (আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক), কিন্তু জন্মগত ও ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান।"

এই প্রসঙ্গে বিদ্বানের মূর্খের উপর, ধনীর নির্ধনের উপর, সবলের দুর্বলের উপর সুবিধা-ভোগের দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কারণ ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক।" আমাদের ধর্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; কোন বৈদান্তিকের পক্ষে এরূপ বিশেষ অধিকার দাবী তাঁহার আদর্শের বিপরীত— "মানুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্মক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত নারায়ণ—কীট কম অভিব্যক্ত, ব্রহ্ম অধিক অভিব্যক্ত।" "বৈদান্তিক কাহারো শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনও-রূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই না। একই শক্তি তো সকলের মধ্যে বর্তমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ। এই শক্তি সুষুপ্তাকারে সকলের মধ্যেই রহিয়াছে।

অধিকারের দাবী তবে কোথায়?" সকলেরই মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন; প্রকাশের যে তারতম্য দেখা যায়, তাহার কারণ "সে সম্ভবতঃ প্রকাশের সুযোগ পায় নাই, চতুর্দিকের পরিবেশ হয়ত তাহার প্রকাশের অনুকূল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে তখন তাহা প্রকাশ করিবে। একজন লোক অপর হইতে বড় হইয়া জন্মিয়াছে, বেদান্ত কখনই এই ধারণা পোষণ করেন না।" জন্মগত কোন অধিকারের স্থান বেদান্তের ভাবে নাই।

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতার সহিত ধর্মের কোন সংস্রব না থাকিলেও, বরং উহা ধর্মবিরোধী হইলেও ধর্মের সহিত ইহাকে আমরা নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছি। সেজন্য স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিয়াছেন, এখন "হিন্দুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যস!" "তপজপের দ্বারা সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র, আর সব অপবিত্র! পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম!"

স্বামীজী ধর্মের নামে এই পৈশাচিক ব্যবহারের আবর্তে নিমজ্জন হইতে সাবধান করিয়া দিতেছেন, "মহা দঁক সামনে—সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়।" "এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে নাকি? যারা এক টুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে?"

অস্পৃশ্যতা যে ধর্ম নয়, সামাজিক কুসংস্কার মাত্র, কতকগুলি সুবিধাবাদী লোক ইহার স্রষ্টা, স্বামীজী তাহা বহুভাবে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, "ছুঁৎমার্গ একটি মানসিক ব্যাধি।" ইহা "আমাদের জাতীয় কর্মশক্তিকে সর্বক্ষেত্রে ব্যাহত করিয়াছে।" "আমরাই 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না' ববে কোটি কোটি হিন্দুকে অধঃপাতিত করিয়া ফেলিয়াছি। আর ইহার ফলে আজ সমগ্র দেশ নীচতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত।" "এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণবদমাশ দেশটাকে উৎসন্নে দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি-বদমাশি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না!'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয় তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৮ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?"—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছেন আজ দুহাজার বছর ধরে!"

অস্পৃশ্যতা-বোধ হৃদয়ের সঙ্কোচন-সঞ্জাত। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সঙ্কোচনমাত্রই মৃত্যু, সম্প্রসারণমাত্রই জীবন।"

কাজেই জাতিকে ইহার হাত হইতে বাঁচাইবার একমাত্র পথ যথার্থ ধর্মের অনুসরণ ও হৃদয়ের প্রসারের দ্বারা—"হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলি অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি-স্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া"—বৈদান্তিকের মস্তিষ্কের সহিত বুদ্ধের হৃদয়ের সংযোগ ঘটাইয়া।

জাতি

প্রসঙ্গতঃ এখানে জাতিবিভাগের কথা আসিয়া পড়ে। অস্পৃশ্যতাকে যেমন আমরা ধর্মের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়াছি, তেমনি ফেলিয়াছি জাতির সঙ্গে। কিন্তু বাস্তবিক জাতি-বিভাগ বা বর্ণবিভাগ অন্য জিনিস। সমাজের বহুবিধ বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোক চাই-ই; সব লোক সব কাজ করিতেও পারে না। সেজন্য গুণগতভাবে চারিটি প্রধান বিভাগ করা হইয়াছিল। যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ ও পাঠন, এবং অধ্যাত্মজগতের সত্যগুলিকে উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টাতেই জীবনপাত করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদেরই একদল স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধিকারবাদ ও অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা সত্য, তবু, স্বামীজী বলিয়াছেন, আমরা যেন না ভুলি—একথাও সত্য যে তাঁহারাই যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহ দেশশাসনাদি কার্যে রত থাকেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা কৃষি-বাণিজ্যাদি করেন, তাঁহারা বৈশ্য। আর যাঁহারা অর্থের বিনিময়ে ইঁহাদের কাজে সহায়তা করেন, ইঁহাদের সেবা করেন, ইঁহাদের নিকট চাকরি করেন, তাঁহারাই শূদ্র। কর্মনির্বাচনে মানুষের বিভিন্ন স্বাভাবিক প্রবণতাই বিভিন্ন জাতিসৃষ্টির মূল। সর্বদেশের সমাজেই এই গুণগত জাতিবিভাগ কোন-না-কোন আকারে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে—"জাতিবিভাগ থাকিবেই—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।"

কিন্তু মুশকিল হইল তখন, যখনই একবর্ণের লোক অন্য বর্ণাপেক্ষা অধিকতর অধিকারের দাবী করিলেন। বৈদিক যুগ হইতেই বর্ণবিভাগের আরম্ভ দেখা যায়। কিন্তু অধিকারবাদ বা অস্পৃশ্যতা হইতে তাহা মুক্ত ছিল। ঋগ্বেদে দেখা যায়, একজন ব্রাহ্মণ ঋষি বলিতেছেন, "আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতেছি।" পৌরাণিক যুগে ইহা বংশগত হইলেও গুণানুরূপ কর্মের স্বীকৃতি লোপ পায় নাই—পরশুরাম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াও ক্ষাত্রেয়ের কর্ম করিয়াছেন; বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছেন। মহাভারতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের বংশে জন্মাইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যদি তাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকে। আর শূদ্রের মধ্যেও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখা যায় তবে সে ব্রাহ্মণই। বস্তুতঃ, স্বামীজী বলিয়াছেন, বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্যই হইল নিম্নতম অধিকারীকে উচ্চতম অধিকারীর গুণভূষিত করিয়া সেই স্তরে তাহাকে উন্নীত করা—শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করা। কিন্তু এই অধিকারের পথ পরে রুদ্ধ হয়—বর্ণবিভাগ পূর্ণরূপে জাতিগত হইয়া পড়ে, গুণের সহিত তাহার আর কোন সংস্পর্শই থাকে না। ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলেও, শাস্ত্রজ্ঞান বা অধ্যাত্মজীবন না থাকিলেও এবং রাজনীতি বা কৃষি-বাণিজ্যাদি বা চাকরি করিলেও সে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিবেচিত হইতে থাকে, সামাজিক বিধান তাহাকে বিশেষ অধিকার দিতে থাকে। অপর দিকে একজন শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণভূষিত হইলেও সে উচ্চ অধিকার হইতে চিরদিন বঞ্চিতই হয়; মানুষ হিসাবে তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধম একজন ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত ব্যক্তির নিকটও সে অস্পৃশ্যরূপেই গণ্য হয়। ধর্মের বা বর্ণবিভাগের ইহা অপেক্ষা বিকৃত রূপ আর কি হইতে পারে? স্বামীজীর

মতে—ইহার অতি-বিকৃত অবস্থার কাল সহস্রাধিক বর্ষের অধিক নহে।

স্বামীজী বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কালের সকল ধর্মাচার্যই ইহার বিলোপসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টায় স্থায়ী ফল না হওয়ার একমাত্র কারণ তাঁহারা ধর্মের সহিত ইহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন: "ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কি হইল? নিষ্ফলতা। বুদ্ধ হইতে রামমোহন পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কে একসঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা নিজের কর্ম শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।"

যথার্থ ধর্মের পুনরুজ্জীবনই পথ

ভারতে মহাত্মাজী কর্তৃক অস্পৃশ্যতাবর্জনের প্রচেষ্টা চালাইবার বহু পূর্বেই স্বামীজী ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন—প্রেমের দ্বারা, বলিয়াছেন, "ভুলিও না—··· মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।···বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই", এবং সংস্কৃতিতে অনুন্নত জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানের দ্বারা, শূদ্রকে গুণগতভাবে ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নের দ্বারা; ব্রাহ্মণকে শূদ্রত্বে টানিয়া নামাইয়া নহে। তাঁহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘের—'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের'—সন্ন্যাসিগণ শঙ্করপন্থী সন্ন্যাস-শাখার অন্যতমের অন্তর্ভুক্ত; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী শঙ্করপন্থী ছিলেন। 'ব্রাহ্মণ ছাড়া সন্ন্যাসে কাহারো অধিকার নাই'—এই মতকে শঙ্করাচার্যও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইহার গুণগত দিকটিকে বংশগত ব্রাহ্মণত্ব হইতে পৃথক করেন নাই। স্বামীজী এই ব্রাহ্মণত্বকে বংশগত না রাখিয়া গুণগতই করিয়া গিয়াছেন—যথার্থ ত্যাগ বৈরাগ্যবান যে-কেহ এই সঙ্ঘে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী; এমনকি 'হিন্দু' হইবারও প্রয়োজন নাই, যে-কোন ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন 'মানুষই' এখানে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন। হিন্দুদের সর্বজাতির তো বটেই, খৃষ্টান এবং মুসলমানও এই সন্ন্যাসিসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। যাহাদের এতদিন 'অস্পৃশ্য' বলিয়া আমরা ঘৃণা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাদের তিনি শুধু বুকে জড়াইয়াই ধরেন নাই, যোগ্য অধিকারীকে ধর্মরাজ্যে সর্বোচ্চ আসনে আসীন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিয়াছেন ও করিতে বলিয়া গিয়াছেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতে মঠ থাকাকালীন কয়েকজন শূদ্রকে একদিন তিনি উপবীত এবং গায়ত্রীমন্ত্র দান করিয়াছিলেন। যখন অস্পৃশ্যতা প্রবল প্রতাপে বিরাজ করিতেছে, সেই সময় হইতেই বেলুড় মঠে সর্বজাতির লোক একই সঙ্গে বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার উৎসবের দিনে মঠে যাইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া নিজেই সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন: যে সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত,

আপনারা তাহার সহজ সমাধান করিয়া দিয়াছেন, দেখিতেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সঙ্ঘগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সর্বজাতির কাঙালদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্বজনের ব্যবহৃত পায়খানার মেজে মুছিয়া দিয়াছিলেন নিজের কেশ দ্বারা—আমি যে কোন মানুষ হইতে বড় নই, সকলেরই ভিতর একই নারায়ণ রহিয়াছেন, এই বোধকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। সঙ্ঘজননী সারদাদেবী জয়রামবাটীতে একদিন মুসলমান আমজদের উচ্ছিষ্টস্থান স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছিলেন; সে-যুগে পল্লীগ্রামে একজন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার পক্ষে এ কাজের গুরুত্ব যে কতখানি, এখন তাহা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সহজ নহে। এই সর্বভূতে নারায়ণদর্শন, এই প্রেম, হৃদয়ের এই প্রসারই যথার্থ ধর্ম। এই ধর্মের পুনরুজ্জীবনই আমাদের করিতে হইবে। আর করিতে হইবে জাতিকে, বর্ণবিভাগকে বংশগত না রাখিয়া গুণগত, এবং বর্ণবিভাগের যাহা মূল লক্ষ্য—যাহারা অনুন্নত তাহাদের সাংস্কৃতিক উন্নতি-বিধানের জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা। আর ভোগ- ও অধিকারবৈষম্যের বিলুপ্তিসাধন। বার বার স্বামীজী আমাদের এ-বিষয়ে সজাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন যে যাহারা বড়লোক তাহারা স্বেচ্ছায় অর্থ দিয়া এবং যাহারা শিক্ষিত তাহারা শিক্ষাদান করিয়া অনুন্নত জনগণকে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া উন্নত করিতে সচেষ্ট হও। তাহা হইলে ইহারা কৃতজ্ঞ থাকিবে। আর তাহা না করিলে ইহারা যখন জাগিবে—এবং একদিন জাগিবে নিশ্চয়ই—তখন সব ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে।

আমরা ইহা করি নাই, যাহার বিষময় ফল ফলিতে শুরু হইয়াছে—ইহারা আজ জাগিয়া আমাদের সংস্কৃতিকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যতপ্রায় হইতেছে।

এখনও সময় আছে। অথচ, মানবতার এই জাগরণের দিনেও, যখন বংশগত জাতি-বিভাগ, অধিকারবাদ ও অস্পৃশ্যতা স্বাভাবিক ভাবেই দ্রুত অপস্রিয়মান, তখনও আমরা কেহ কেহ এগুলিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কোথাও কোথাও ধর্মের পতাকা হস্তে লইয়াই। ধর্মকে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিবার কুফলরূপে ধর্মের প্রতিই জগৎ জুড়িয়া মানুষের যে বিতৃষ্ণা প্রকট হইয়াছে, আমাদের এরূপ প্রচেষ্টা তাহা বাড়াইয়াই দিবে। যদি আমরা ভারতীয় জাতিকে তাহার নিজস্বতা লইয়া বাঁচাইতে চাই, তাহা হইলে ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই তাহা করিতে হইবে। (তাহা না চাহিলে ভারতকে যত সমৃদ্ধ, যত শক্তিশালী করিয়া তোলা হউক না কেন, তাহাকে পাশ্চাত্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতিগুলিরই মত 'জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখের উপরই' স্থাপিত করা হইবে)। এ কাজের সহায়ক যথার্থ ধর্মের বিকাশ—প্রেম, সহায়ক সকলকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা, এবং ধর্মের সহিত সংস্পর্শহীন, মানবতাবিরোধী, জাতির কলঙ্কস্বরূপ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কু-সংস্কারগুলিকে সযত্নে পরিহার।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ,

১৪.২.০৯

ভাই শশী,

অনেকদিন তোমায় চিঠি লিখতে পারি নাই। শরীর অসুস্থ থাকায় মহারাজের চিঠিরও উত্তর লিখিতে অশক্ত ছিলাম। প্রায় সপ্তাহকাল ভাল আছি। মহারাজের শরীর কেমন আছে লিখিবে। তিনি কি আমাদের ভুলে গেলেন? শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মমহোৎসব তো আগতপ্রায়। মহারাজ না থাকিলে যে কার্যে উৎসাহ হয় না! তাঁর শুভাগমন যে একান্ত প্রার্থনীয়! সকলেই মহারাজ কবে আসিবেন জানিতে উৎসুক। এখানকার ভক্তমহলে মহারাজের lecture পড়ে উৎসাহ ও আনন্দের কোলাহল পড়েছে।

শুনেছিলাম উমানন্দের বসন্ত হয়েছে, আবার শুনিতেছি শুকুলেরও Small-pox হয়েছে। তাহারা কেমন আছে লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

Sister দেবমাতার বই পড়ে সকলেই অতিশয় আনন্দিত। মাষ্টার মহাশয় ঐ বই রাতদিন কাছছাড়া করেন না। গিরীশ বাবু প্রত্যহ ঐ পুস্তক শুনিতেছেন। এখানে উহার খুব কাটতি হচ্ছে। কি চমৎকার কথাই বলে গেছেন! উহা এ যুগের গীতা। মঠের সকলে ভাল আছে। আমরা মহারাজের উপস্থিতি প্রতীক্ষা করিতেছি। তাঁকে বলিও ডাব্‌রি গাই সকালে /২।০ নয় পোয়া দুধ দিচ্ছে, আরও বেশী দেবে; শ্রীশ্রীপ্রভুর পায়সান্ন দেওয়া হচ্ছে। এবার গোলাপ ফুল বেশ ফুটেছিল। আর dambia খুব ফুটেছিল। মহারাজের প্রেরিত ফুলের চারা কই এখনও তো বেরোয় নাই। জল দেওয়া হচ্ছে। শ্রীশ্রীমহারাজজীকে আমার ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে ও তুমি জানিবে।

শ্রীশ্রীকামারপুকুরে ২৯শে ফাল্গুন মহোৎসব হইবে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর তত ভাল নাই শুনিলাম।

সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে।

ইতি—

দাস বাবুরাম

জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের যখন সাধন-অবস্থা তখন দক্ষিণেশ্বরে একদিন এক পূর্ণজ্ঞানী পরমহংস উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুচি অশুচি ভেদ নাই, পাগলের মতো দেখিতে। পাগল ভাবিয়া প্রসাদ পাইবার পংক্তিতে কেহ তাঁহাকে বসিতে দিল না। তিনি মন্দিরের বাহিরে এঁটো পাতার স্তূপের নিকট গিয়া কুকুরদের সহিত পাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট চাটিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভাগিনেয় হৃদয়কে জড়াইয়া ধরিয়া জগজ্জননীকে ডাকিয়া শুধাইয়াছিলেন, মা, আমারও কি তবে ঐরূপ অবস্থা হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ পরে ঐ ত্রিগুণাতীত পরমহংসের স্মৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, লোকটি পূর্ণজ্ঞানী। গঙ্গায় স্নান ক'রে মন্দিরে স্তব করতে লাগলো। সারা মন্দির কেঁপে উঠেছিল।

যদি তিনি পূর্ণজ্ঞানী তাহা হইলে তাঁহার মন্দিরে আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল আর উহার সার্থকতাই বা কি? পূর্ণজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্ম ব্যতীত ত্রি-সংসারে আর কিছু দেখেন না, কাহার উদ্দেশ্যে স্তব করিবেন? কি তাঁহার স্তবের ভাষা? আর স্তুতি গাহিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি ধরনের উল্লাস জন্মিবে? চুলচেরা বিচার করিয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া কঠিন। হয়তো বলা যাইতে পারে পূর্ণজ্ঞানীর বাস্তবিকই মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন, দেবতার পূজার্চনা, স্তুতি প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, কেননা গীতার ভাষায় (৩.১৭) তিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতে সন্তুষ্ট—তাঁহার ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদি সব ফুরাইয়াছে। তবে লোকশিক্ষার জন্য তিনি ঐ সকল করিতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ পার্থ, ত্রিসংসারে আমার অপাওয়া কিছু নাই, পাইবারও কিছু নাই, কাজেই কর্তব্য বলিয়াও কিছু নাই—তথাপি অপরের নিকট উদাহরণ হিসাবে আমি কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছি। (গীতা, ৩.২২)।

এই উত্তর কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত দক্ষিণেশ্বরের ঐ পূর্ণজ্ঞানী পরমহংসের পক্ষে খাটে না। লোকশিক্ষাদানের বালাই যে তাঁহার একেবারেই ছিল না তাহা তাঁহার হলধারীর সহিত ব্যবহারেই টের পাওয়া যায়। হলধারী কিছু উপদেশ আদায় করিবার মতলবে তাঁহার পিছু পিছু যাইতে আরম্ভ করিলে তিনি রাস্তা হইতে ইটের টুকরা কুড়াইয়া হলধারীর প্রতি ছুড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশ্য আখেরে মুখ খুলিয়া হলধারীকে একটি কথা বলিয়া গিয়াছিলেন,—"যখন এই নালার জল আর গঙ্গার জলে কোন ভেদ দেখতে পাবি না তখনই জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।"

যিনি গোঁড়া ভক্তিযোগী তিনি বলিবেন, পূর্ণজ্ঞান অধ্যাত্মজীবনের শেষ কথা নয়, বেদোপনিষদে যে অদ্বৈত সত্যের কথা আছে তাহা তো ভক্তের উপাস্য ভগবানের অঙ্গজ্যোতি মাত্র। অতএব উক্ত পূর্ণজ্ঞানী মন্দিরে গিয়া যে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন তাহা অতি প্রয়োজনীয় সাধনা হিসাবেই করিয়া থাকিবেন, নিজের তত্ত্বানুভূতিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার জ্ঞানকে ভক্তির মাধুর্যরসে সিঞ্চিত করা আবশ্যক ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময়ে ভক্তদিগের নিকট ঐ

পূর্ণজ্ঞানী পরমহংসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি নিজে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে ঘটনাটির বর্ণনা করিয়াছিলেন যাহাতে মনে হয় যে পূর্ণজ্ঞানীর মন্দিরে গিয়া স্তব করা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। যেন এই আচরণে কোনও বিতর্কই উঠিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনেও এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ আচরণ বার বার দেখা গিয়াছে। নির্বিকল্প সমাধিতে মন লীন হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে। সেব্য ও সেবক, ভগবান ও ভক্ত এই পার্থক্য তখন মুছিয়া গিয়াছে। কে চিন্তা করিবে, কে কথা কহিবে? কিন্তু সমাধি হইতে মন যখন নামিয়া আসিয়াছে তখন অন্যরূপ আচরণ। তখন ভগবানের নাম গুণগান করিতেছেন, মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করিতেছেন, ভক্তি-ভক্তের প্রসঙ্গ চলিতেছে। কে বলিবে এই ব্যক্তিই কিছুক্ষণ আগে অদ্বৈতানুভূতিতে একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির কোনও বিরোধ নাই। দর্শনের যুক্তি দিয়া জ্ঞান ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় ঘটানো কঠিন হইতে পারে, কিন্তু এই যুগের অবতারপুরুষ তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, সাধকের নিজের অনুভূতিতে এই সমন্বয় সম্পূর্ণ সম্ভবপর। পূর্ণ-জ্ঞানীর হৃদয়ে এমন প্রগাঢ় প্রেমের উদয় হইতে পারে যাহা স্তবের শব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাথরের দেউলকে কাঁপাইয়া দেয়। অবাঙ্-মনসোগোচর ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে জানিয়াও ব্রহ্মকে বাক্যমনের এলাকায় টানিয়া আনা যায় এবং তাঁহাকে পরম প্রেমাস্পদরূপে আরাধনা করা চলে। এই আরাধনা জ্ঞানের সম্পূর্তির জন্যও নয়, লোকশিক্ষার জন্যও নয়, ইহা ব্রহ্মানুভূতিরই একটি প্রকাশবিভেদমাত্র। সচ্চিদানন্দ মহা-সিন্ধুর কি পার আছে? নির্বিকল্প সমাধি ঐ সিন্ধুর একটি দৃষ্টিভঙ্গী, প্রেমে হাসা কাঁদা নাচা সেই একই মহাসিন্ধুর আর একটি প্রতিচ্ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বসূরি সাধক কবীরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, "নিরাকার আমার বাবা, সাকার আমার মা।" হয়তো দক্ষিণেশ্বরে আগত ঐ পূর্ণজ্ঞানী পরমহংস কোনও কবীর-পন্থী ছিলেন, তাই সংসারকে তত্ত্বজ্ঞানে নস্যাৎ করিয়া দিয়াও ভবতারিণী কালিকার পাষাণ-মূর্তির সামনে দাঁড়াইয়া স্তোত্র গাহিয়াছিলেন এবং মন্দির কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

বলিও না নির্গুণ-সগুণকে সমন্বিত করিবার জন্য একটি নূতন দর্শনের প্রয়োজন। নির্গুণ একদেশী, সগুণও একদেশী—এই দুই একদেশী দাঁড়াইয়া আছে একটি পূর্ণতর সমন্বিত সত্যের উপর। একটি গালভরা নাম দিয়া এই নূতন সত্যকে প্রচার করিতে হইবে। না, কোনও নূতন সত্য আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই। শব্দবিলাসীদের নিকট ঐ অবতরণ প্রয়োজন হইতে পারে, পুস্তকরচনার জন্য—কিন্তু সত্যান্বেষী সাধকের প্রয়োজন মতবাদ বা দার্শনিক বিচার নয়, নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বিত উপলব্ধির শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন আত্মবিদ্যা, সেই সন্তকুলসেবিত বহু-প্রচলিত প্রেমভক্তির পথ। আন্তরিকতা লইয়া, গোঁড়ামি বর্জন করিয়া যে-কোনও পথে চলিতে থাক, দেখিবে অপরটিতেও পৌছিয়া গিয়াছ। জ্ঞান এবং প্রেম একই অনুভূতির দুইটি রূপ মাত্র।

* * *

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ধ্যানমন্ত্র লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঠাকুরের দিব্য-

জীবনের কোনও কোনও ঘটনা এবং তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য এই সকল গ্রন্থের উপজীব্য। প্রেমাস্পদের গুণগান দ্বারা তাঁহার প্রতি ভালবাসা যে বর্ধিত হয়, ইহা তো ভক্তিশাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত ধ্যানমালা ও স্তবস্তোত্রাদি পাঠ ও মনন করিলে ভক্তের ভাবভক্তি যে পুষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি-শ্রীরামকৃষ্ণের পশ্চাতে একটি নৈর্ব্যক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি কাহারও কাহারও কাছে এই নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে। স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ ইহার পথপ্রদর্শক। ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণও কথাপ্রসঙ্গে ইহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমা সারদাদেবীকে জনৈক ভক্ত 'ঠাকুর আপনার কে?' এই প্রশ্ন করিলে মা বলিয়াছিলেন, তিনি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, সব। পিতা-মাতা, স্বামীর বর্ণনা চলে, কিন্তু 'সব'-এর আর বর্ণনা চলে না। 'সব' হইল ইষ্টের নৈর্ব্যক্তিক লক্ষণা। সীমা যখন অসীমে হারাইয়া যায় তখনই 'সব'-এর উপলব্ধি। তাই গীতা বলিয়াছেন, বাসুদেবঃ সর্বমিতি। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আরতি-স্তোত্রে ঠাকুরকে বলিতেছেন নিগুর্ণ-গুণময়। যে-সব অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক সম্পদ তাঁহার চরিত্রকে বিভূষিত করিয়াছিল উহাদের কথা যখন চিন্তা করি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নিকট 'গুণময়'। কিন্তু ঐ সকল চিন্তাকে ছাড়াইয়া মন যখন একটি অব্যক্ত অসীম সত্তায় স্থিতি লাভ করিতে উন্মুখ তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ রহিয়াছেন—'নির্গুণ' স্বরূপে রহিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ একদিন ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া একটি ভক্তকে বলিয়াছিলেন, এই যে ছবি দেখছ, এ আসল ঠাকুর নয়। আসল ঠাকুর অন্তরের অন্তরে ধ্যানে উপলব্ধি করতে হয়।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'বেদমূর্তি'। বেদের কোন্ মন্ত্রগুলি তাঁহার দিব্য অঙ্গকে গঠিত করিয়াছে? জননী সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চিতই বলিবেন, 'সব'। বেদ যে মন্ত্র দিয়া আরম্ভ সেই মন্ত্রে স্তুত অগ্নি ভাবুকের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণেরই রূপ—সর্বকালিমাহর বিশ্বপ্রসারী চৈতন্যজ্যোতি শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভবতারিণী কালিকার পূজা করিতে বসিয়া মন্দিরের সকল দিক হইতে নির্গত এই জ্যোতিঃপুঞ্জকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নিত্যপরিবর্তনশীল জগৎপ্রপঞ্চকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়া যদি আচ্ছাদন করিতে চাও তাহা হইলে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের ধ্যান কর। ঐ মন্ত্রের 'ঈশ' শ্রীরামকৃষ্ণের নৈর্ব্যক্তিক রূপ। কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্র দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা আরম্ভ কর। কে তোমার মনের পিছনে বসিয়া মনের আলোড়ন-বিলোড়ন সম্পাদন করিতেছেন? কে তোমার চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দিতেছেন? কে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পিছনে বসিয়া? কে তোমার প্রাণের প্রাণ, বাক্যের অভিব্যঞ্জক? কেনোপনিষদের সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে প্রয়োগ কর। প্রতি-বোধবিদিতম্—শ্রীরামকৃষ্ণই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ-রূপে তোমার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়বোধকে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

কঠোপনিষদের মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অন্ন করিয়া উহাদের সহিত মৃত্যু অর্থাৎ তমোগুণকে ব্যঞ্জনরূপে মিশাইয়া বিরাট ভোজন-পর্বে বসিয়া গিয়াছেন। উঁহাই তো পরমহংসের

ঠিক ঠিক বর্ণনা। তিন গুণই উদরস্থ। ত্রিগুণাতীত বালক—কোন গুণের বশ নন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ কি আমার হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত স্থানে অন্তরাত্মারূপে বসিয়া আছেন—কঠোপনিষদের শেষে যম যাহা নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'রসো বৈ সঃ' (তিনি রসস্বরূপ) মুণ্ডক উপনিষদের 'আবিঃ সন্নিহিতং' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' 'অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রঃ' ইত্যাদি বাক্য শ্রীরামকৃষ্ণের নৈর্ব্যক্তিক ধ্যানে ব্যবহার করিতে পারা যায়। মুণ্ডক উপনিষদের শেষ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে সকল খণ্ড কি করিয়া অখণ্ডে লীন হয়, সকল অংশ কি করিয়া পূর্ণে প্রবেশ করে, সকল কর্ম, সকল দেবতা কি করিয়া পরম অব্যয় তত্ত্বে একীভূত হয় তাহার বর্ণনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানী ভক্ত ঐ মন্ত্র অবলম্বনে জননী যশোদা যেমন গোপালের মুখবিবরে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তিতে সকল সসীম অনুভূতিকে মিলাইয়া এক করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ ছান্দোগ্য উপনিষদের 'যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু (৩।১৩।৭)—স্বর্গ-মর্ত্যের পারে দেদীপ্যমান সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ যাহা সর্বতোব্যাপ্ত, যাহা ভাল মন্দ সব কিছুকে প্রকাশ করিতেছে।

জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ ছান্দোগ্যের ৭ম প্রপাঠকে নারদকে সনৎকুমার কর্তৃক উপদিষ্ট 'ভূমা'—যাহা পরমসুখস্বরূপ, যাহা আপন মহিমায় সর্বদা প্রতিষ্ঠিত। ঐ ভূমাকে অনুভব করিলে 'সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ'—সকল অজ্ঞান-বন্ধনের মুক্তি হয়।

জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-উপদিষ্ট 'অক্ষর' পুরুষ—অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা—বাক্য সে সত্যে পৌঁছায় না, মনও নয়—নেতি নেতি বলিয়া নিষেধ-মুখে ঋষিরা ইঙ্গিতে সে সত্যের নিরূপণ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, "প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে। সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।" হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—'ঠারে ঠোরে' উহার ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-উপাসকও একদিন দেখিতে পান, তাঁহার ঠাকুরের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া নিঃশেষ করা যায় না। পুরুষ-সূক্তের পুরুষ যেমন অব্যক্ত তিন ভাগ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে রাখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপও সেইরূপ আমাদের সসীম অভিজ্ঞতার বাহিরে। নৈর্ব্যক্তিক সত্যের জ্ঞাপক বেদমন্ত্র তাঁহার ধ্যানে প্রয়োগ করিলে আমাদের ভক্তি ভালবাসা সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার 'বেদমূর্তি'কে কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুগসমস্যা*

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আপনাদের আজিকার এই মহদনুষ্ঠানে এই স্থবির সন্ন্যাসীকে পুরোভাগে পতাকাহস্তে দাঁড় করাইয়া বিশ্বকল্যাণকাম অভিযানটি শুরু করিতে চাহিয়াছেন, সে নিমিত্ত আমি কৃতজ্ঞ। তাহার হেতু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—এই যুগ্ম যুগাবতার-প্রভাবমহিমা আমার তরুণ জীবনে ঐ ঊর্ধ্বধামের সত্য শিব সুন্দরের সমাচার এবং তাহার অনুপ্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। সে অহেতুক কৃপার ঋণ যে কিভাবে শোধ হইবে তাহা জানি না! বহুদূরের স্বল্পতোয়া কৃচ্ছ্রগমনা সরিৎ যেমন জানে না কবে কিভাবে সজল জলদবরিষণে সরিন্নাথের যে ঋণ, সে ঋণ সে পরিশোধ করিবে! 'যাবন্নস্থা নদীনাথে নৈকান্তিক-সমর্পণম্'—তাবৎ স্বপ্নেও সেটি তো হইবার নয়!

সে অনেকদিনের কথা—পূর্বশতকের শেষ আর বর্তমান শতকের প্রথমভাগের কথা। তারপর বহু বহু সহস্রবার আমাদের এই বসুন্ধরা আপন অক্ষদণ্ডে আবর্তন করিয়াছে। ফলে, মানব-মানসে, মানবের সাধনায় এবং ব্যবহারে অনেক বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এই তো সেদিন মর্ত্যের তিনটি প্রাণী চন্দ্রমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বমহাকাশে উড্ডীন করিয়া আসিলেন। ইহার প্রসাদে পৃথ্বী বিপুলতরা, এবং কাল আরও নিরবধি হইল সন্দেহ নাই। ইহার ফলে, আমাদের এই সীমিত বাস্তভূমিটির শুধু পরিধি এবং আয়তন বাড়িল না; ইহার কাম্য ভাবী সম্পদের সম্ভাবনাটিও বহুগুণে বাড়িয়া গেল। ভৌম অভ্যুদয়ের পন্থা বিশালতর হইল। তথাপি মনে প্রশ্ন জাগে—ততঃ কিম্?

বিজ্ঞানের যে মন্ত্র, যে যন্ত্র, যে তন্ত্র, সে সবে কুশলিনী এই মানব-মনীষা যে আশার বাণীটি আজ শোনাইল, যে অমরার সম্পদের ছবিটি আঁকিয়া ধরিল, সে আশা কি কুহকিনী, সে ছবি কি মায়া, মতি-বিভ্রম? এ প্রশ্ন আসে এইজন্য যে—যে মহীয়সী শক্তি-সাধনায় তুমি আজ এই অঘটন ঘটাইলে, এবং ভাবিকালে আরও বিস্ময়কর অনেককিছু করিবে ভাবিতেছ, সে শক্তি কি দৈত্য-দানব-শক্তির মত তোমাকে ভূরি ভূরি ঐশ্বর্য সম্পদের মাঝেই সেই 'মহতী-বিনষ্টির' পানেই টানিয়া লইবে না—যাহার সম্বন্ধে পুরাণী প্রজ্ঞানবাণী তোমায় সচেতন সাবধান করিয়াছেন? তুমি এই পৃথিবীকে অমরাপুরী করিয়া রচিবে ভাবিতেছ, কিন্তু তোমার সর্বনাশা ভ্রাতৃবিদ্বেষের ফলে, এই সমগ্র ভূমণ্ডলটাই যদি কোন ভাবী সংঘর্ষের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভস্ম হইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া যায়, তবে ওগো মহাকাশবিজয়ী! তুমি সেদিন ঐ দূরের চন্দ্র বা শুক্রগ্রহ হইতে ধরার পানে তোমার যন্ত্রদৃষ্টি ফিরাইয়া কি দেখিবে বলত? আজিকের এই নীলসিন্ধুহকুলা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী জননী ধরণীটিকে, না, মহাজাগতিক ধূলিরাশি (cosmic dust) মাত্র? সমগ্র ভূমণ্ডলটাই যদি অতি বিস্ফোরক-গর্ভ এক আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইতে চলে, তবে তাহার উপরে, নববিজ্ঞানের ইন্দ্রজাল

* স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে নিউ এসিয়াটিক সোসাইটি হলে প্রদত্ত ভাষণ।

তাহার স্বপ্নকে মর্মরে রূপায়িত শতকোটি তাজমহলে সুষমাশ্রী অথবা এক অপরূপকল্প চন্দ্রমল্লিকা-বিশ্বপ্রদর্শনী সাজাইয়া কি সার্থকতা আনিয়া দিবে বল? হয়তো বা এ বিভীষিকা অনেক পরিমাণে অতিসন্ত্রস্ত-গণমানসের অবাস্তব-প্রতিক্রিয়া। বিজ্ঞানবিদ্যার বর্তমান প্রগতির ফলে আমাদের ঐ 'মহতী বিনষ্টি' নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবিনী নহে। এ বিদ্যা দ্বারা অর্জিত যে সম্পদ, সে সম্পদও 'মহতী', যে ভদ্র বা কল্যাণ, সেটিও বরেণ্য, যদি যে ভাবী বা বর্তমান মানবতার অধিকারী সে তার আপন বরণীয় মহত্ত্বে শ্রদ্ধা না হারায়, আপন লোভ-মোহ-দৃষ্টিতে ভদ্রকে ভয়াল, কুশলকে কশ্মল না করিয়া ফেলে।

সম্পদের অভাবনীয় প্রাচুর্যের সঙ্গে, যদি এমন সুসমঞ্জস সমাজব্যবস্থা এবং সর্বমঙ্গলা যৌথজীবন সে গড়িয়া লইতে পারে, যাহার ফলে মর্ত্যের মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন সেই 'সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী'-কে সে বাস্তবে জীবন্ত রূপ দিতে পারে, তবে বিজ্ঞানের ব্যবহারক্ষেত্রে এই জয়যাত্রা বিশ্বকল্যাণের লক্ষ্যেই হইতেছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু 'যদি' বলিয়া ঐ যে সর্তটি করা হইল, সেটি বড়ই বড় সর্ত, এবং সে-পরিমাণে দুষ্প্রতি-পাল্যও বটে। মানবের ইতিহাস নানা যুগে নানান বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে ঐ একই সর্তের পূরণে, ঐ একই সমস্যার সমাধানে। এখনও তাই। সমাধানের প্রকৃতি- ও পদ্ধতিভেদে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষও হইয়াছে বহুবার, এখনও হইতেছে। নববিজ্ঞান সত্য-সমাধানের এক মহাশক্তিসমৃদ্ধ সাধনপদ্ধতি আমাদের বাতলাইলেন। প্রাচীন প্রজ্ঞানও তাহা করিয়াছেন। প্রাচীন, বিশেষ করিয়া বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ (correct mode, correct mood and correct under-standing)—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের বার্তা শুনাইয়াছেন, আমাদের সাধনকে বীর্যবত্তর এবং কুশলতর করিবার নিমিত্ত। নবীনের আজ্ঞায় সে প্রাচীন আপনাকে সরাসরি 'বাতিল বকেয়ায়' উপেক্ষিত প্রত্নস্তূপে ফেলিতে এখনও নারাজ। যেটি সত্য, শিব, সুন্দর, তাহার সম্বন্ধে 'সনাতন' বলিয়া তাহার বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে একটা কিছু আছেই। আছে বলিয়া, সে যেমন ঐ সেদিন-কার চন্দ্রমণ্ডল-পরিক্রমাকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করিল, তেমনি আবার বেশী করিয়া, সমগ্র আকৃতি দিয়া অভিনন্দন করিল—মহাকাশযাত্রী ব্যোমযানের ঐ ঈশ্বরোদ্দেশে যুক্ত-করপুট প্রার্থনাটিকে—

"Give us, O God, the vision which can see Thy love in the world inspite of human failure.

Give us the faith to trust Thy good-ness inspite of our ignorance and weakness. Give us the knowledge that we may continue to pray with understanding hearts, and show us what each one of us can do to set forward the coming of the day of universal peace. Amen."

হে ঈশ্বর! সেই অভ্রান্ত দৃষ্টিদীপ জ্বালাও যাহাতে এত হিংসোন্মাদনার মধ্যেও তোমার এই সৃষ্টি-রচনাকে তোমার প্রেমেরই প্রতিস্ফুরণ ও অভিব্যক্তিরূপে দেখিতে পারি; সেই আত্মবিশ্বাস ও নির্ভর দাও, যাহাতে মানুষের সকল অপূর্ণতা ও দুর্বলতার মাঝে তাহার ভাগবতী সত্তায় ও মহত্ত্বে শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি; দাও সেই বোধি বা সংবিৎ, যেটি আমাদের প্রত্যেককে এবং বিশ্বমানবকে যথার্থ কল্যাণের পন্থা দেখাইবে এবং বিশ্বশান্তির সাধনে উদ্বুদ্ধ করিবে!

এ প্রার্থনায় ধ্বনিত হইতেছে সেই শাশ্বত অমৃত অভয়ের বাণী, যে বাণী শোনাইবার জন্য এ দেশের ঋষি একদিন গাহিয়াছিলেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এই বাণী শোনার পর, এ বাণীর যেটি 'উপনিষৎ', কিনা, মর্ম, তাহাতে ধীর সমাহিত হইতেও বলিয়াছেন। কেন না, সত্যের সাক্ষাৎ প্রত্যয়ের ক্রমই তাই। তাই না ভাগবতের আদিতে এবং অন্তে—'ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি', 'তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি!' হ্যাঁ—শ্রবণের পর স্থিতধী হইতে হইবে, তবে না স্থিতপ্রজ্ঞ!

এ বাণী বেদান্তের বাণী। সকল কুণ্ঠাকার্পণ্য-দোষ বিদূরিত করিবার নিমিত্তই এ উদাত্ত পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি শ্রীভগবানের মুখে। স্বামীজীর মুখে এই ধীরোদাত্ত বিশ্বজনীন অভয় অমৃত বাণীই আমরা শুনিয়াছি। সেই অমোঘ শাশ্বত বাণীর আজ জয় দিতেছি—বিজ্ঞানের অন্ধকার বিজয়গৌরবের যে কর্ণভেদী তূর্যনাদ, তাহার মাঝেই। সে তূর্যনাদে আজ মনে হয় বিশ্বকর্ণ বধির! বোরমানের ঐ প্রার্থনা কেই বা কান পাতিয়া শুনিল জানি না। হয়তো বা কোথাও অবিশ্বাস এবং বিদ্রূপের চটুল হাস্যরোল শোনা যাইতেছে, মানবাত্মার বহিঃপ্রকোষ্ঠে, বেপরওয়া আলাপ-অপলাপের বৈঠকে। কিন্তু তথাপি বিরূপ বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না তো আজ! সর্ববিধ ব্যবহার-জীবনের আস্তরণতলে যে মহাবিস্ফোরকরাশি পুঞ্জীভূত, তাহাদের গোপন 'ফিউজে' আগুন লাগিতে কি বড় বেশী বিলম্ব আছে?

মহাকাশবিজয়িনী বিজ্ঞানবিদ্যা এবং তৎ-প্রসাদে লব্ধ বা লব্ধব্য মহীয়সী ঋদ্ধির জয় গাহিয়া, আর সেই সঙ্গে তাহার আত্মঘ্ন হইবার যে আসন্ন অথবা দূর সম্ভাবনাটিও রহিয়াছে, এবং সে সম্ভাবনা যে কোথায়, কেনই বা রহিয়াছে, সেটি তাহাকে, চিরন্তনী যে প্রজ্ঞানোজ্জ্বল সত্যদৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে একটিবার দেখিতে বলিয়া, আমরা আজিকার প্রথম কথাটি শেষ করিয়াছি। আমরা বলি—বিজ্ঞান এবং তাহার অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যত না মত-ও পথবিরোধ, আর তাহার অন্তরে যত না ভয়-ভরসার পাল্লাপাল্লি চলিতে থাকুক, তাহার অন্তরতম অথচ নেপথ্য আকূতি ঐ প্রার্থনায়, যেটি উদ্ধৃত করিয়াছি। মানবসত্তা ভাগবতী সত্তা, তাহার আকূতি অন্যরূপ হইবার তো কথা নয়! বেদের ভাষায় ঐ আকূতি 'সমানী' হউক! সে অমানী বা বিমানী হইয়া আজও গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিবে?

তাই চাই—কেবল মহাকাশবিজয়ী নয়, মহাকালবিজয়ী। এরূপ মহাকালবিজয়ী মহা-মানব (যাঁহাদের যুগাবতার বলি) আসিয়া থাকেন জীবের সঙ্কট-মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে। উনবিংশের শেষার্ধ আর এই বিংশ শতাব্দীর সবটাই সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণে আসিলেন মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোয় সর্বধর্ম-সম্মেলনে যাইয়া তিনিই মঙ্গলভৈরব নাদে জগৎকে শুনাইলেন—ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার সারাৎসার সাম্য, শান্তি, ঋদ্ধি ও মুক্তির বাণী। শোনাইলেন—যাহার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বতোভদ্র অভ্যুদয়, আর তাহার ফলে সর্ববিধ অনাত্মবন্ধন হইতে মুক্তি হয়, অর্থাৎ যাহার পর শ্রেয়ঃ নাই সেটি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম। 'সর্বং ব্রহ্মোপ-নিষদম্', 'আত্মৈবেদং সর্বম্'—এই পরম প্রত্যয়। এ ধর্মে মানবসত্তার অবদমন ও অবমাননার এতটুকুও স্থান নাই। যে সর্বহারা তাহাকে শোষণ করা দূরে থাকুক, তাহাকে আপন আত্মা অথবা নারায়ণ-বুদ্ধিতে সেবা করাই ধর্ম। এ-হেন যে ধর্ম তাহাতে কদাপি দুর্গতি হয় না,

ধর্মের গ্লানিতেই সেটি ঘটিয়া থাকে। ইহাই মানবাত্মার প্রকৃত স্বধর্ম, এ ধর্মের গ্লানি হইল পরধর্ম বা অনাত্মধর্ম, যেটির সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—এ সৃষ্টিমহীরুহ 'ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ' (কিনা, ভাগবতী শক্তিই এর মূলে) বটে, তবে ঐহিক বাস্তব যে 'মাটি' সেটিকে উপেক্ষা করিয়া নয়। সে মাটি-কেও সে দেখে 'মা-টি'! ব্রাহ্মী দৃষ্টিতে জড়ে জাড্য বা জড়িমা নাই। অসীম স্বলসিত বস্তুর সীমিত অলসিত রূপ! যেন—শ্রীরামের পদপঙ্কজ-পরাগপরশ-বিধুরা অভিশপ্তা পাষাণী অহল্যা! তাই জড়ে ডর কি, চিতে চিদৈকস্বরূপে ভূতের ভয়ই বা কেন? তার জীবনবেদের মন্ত্র—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥' এরূপ সর্ব-সমন্বয় এবং সর্বথা সামঞ্জস্যের বাণী স্বামীজী আমাদের শুনাইতেছেন। তাঁহার শিক্ষায় ভোগ শুধুই মর্ত্যের ধূলিতে লুটাইয়া থাকে না, সে হয় ব্রজের রজঃ অথবা মহাযোগীশ্বর শিবশঙ্করের অঙ্গের ভস্ম-বিভূতি।

এতো গেল ভক্তরসিক আর প্রজ্ঞানদৃষ্টির সমাচার। শুধু কি প্রজ্ঞান? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ মরতের ধূলি ধূলিই—ইতর, অপাংক্তেয়—যতক্ষণ সে এই মাটিতে লুটাইয়া থাকে। ঊর্ধ্ব-সমীরণে যখন সে ধূলি ঐ অভ্রলোকে উঠিয়া যায়, তখন সে শুধু অপরূপ-রঞ্জনশিল্পকুহকী যাদুকরীটি নয়, সে তখন আপন ধূসর ক্ষুদ্র অঙ্গে তড়িৎকণার ওড়না জড়াইয়া হয় জ্যোতির্ময়ী—মরতের নিখিল প্রাণের পালয়িত্রী। বিজ্ঞান বলে—ব্যোমের ঐ বিপুল প্রশান্ত নীলিমা, উদয়াস্ত-গগনের ঐ হিরণ্য লাবণ্য, এ সবই ঐ অভ্রলোকচারিণী ধূলিটির মহিমায়; আবার, সিন্ধুর বাষ্পও তড়িৎকণাসমৃদ্ধা ঐ ধূলিটি না পাইলে মেঘের জলবিন্দুরূপে ঘনীভূত হয় না। তাই প্রকৃতি ধরার ধূলিকে ধরাতেই লুটাইয়া রাখে নাই। বৈরাজবিশ্বে ধূলির যে মাহাত্ম্য সে তো কোটিকণ্ঠে কীর্তন করিয়াও শেষ করা যায় না। ঊর্ধ্বে তাহার অভিযান এই ধরণীকে সব রকমেই সুন্দর, সফল ও সার্থক করিয়াছে। তাই বেদান্ত ধূলিকে অবজ্ঞা করিতে বলে না। ধূলিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতেই শেখায়। শুধু তাই নয়—ধূলিতেও 'মধুব্রহ্ম'—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'। চিরন্তনী যে মানবীয় প্রজ্ঞা, তাহার এই দুটি পক্ষপুট—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। এ দুয়ের কোনটিকে পঙ্গু দুর্বল করিতে নাই। তাহারা দুটিতেও সেই—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—স্বামীজী এটি ভালমতেই মনে রাখিতে বলিয়াছেন।

ভূতে জাড্যং কিমাস্থাং চিতি পরিলসনং
নৈশখদ্যোতলাস্য
সাম্যং সখ্যঞ্চ সৌখ্যং হৃদি নিষ্ক্রমণং
হার্দহীনেঽপি বিশ্বে।
আত্মৈবেয়ং ত্রিলোকী চিরমভয়পদং চামৃতং
প্রত্যগাত্মা
ভূতে মূর্তশ্চ সোঽয়ং জহিহি শুচমিতি
স্বামিসূরীন্দ্রবাণী॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবিবেকানন্দৌ বিজয়েতাম্॥

ওঁ শান্তিঃ॥

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

এই চিঠি থেকেই দেখা যায়, স্বামীজী মাদ্রাজী ভক্তদের মধ্যে আলাসিঙ্গার কর্মদক্ষতায় সর্বাধিক আস্থাবান ছিলেন, এবং তাঁরই নির্দেশে আলাসিঙ্গা পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনের থিয়জফি-প্রীতির বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে আলাসিঙ্গা অতঃপর ১৫ ফেব্রুআরী সংখ্যায় আমেরিকা থেকে প্রেরিত কৃপানন্দের এক চিঠি ছাপলেন, যার মধ্যে আমেরিকায় থিয়জফি-রহস্যবাদের অতি শোচনীয় রূপ চিত্রিত।[৮] এবং তারপরে ১৪ মার্চ ম্যাক্সমুলারের যে-পত্রটি ছাপলেন, তাতে পুনশ্চ পণ্ডিতপ্রবরের থিয়জফির বিরুদ্ধে আপত্তির চেহারা দেখা গেল। ম্যাক্সমুলার লিখেছিলেন—"I have read with great pleasure the numbers of the *Brahmavadin* which you have kindly sent me. What I like is the spirit of pure Hinduism, more particularly Vedantism, unadulterated by so called Theosophy."

এই পত্রের তলায় সম্পাদকের পক্ষ থেকে ব্রহ্মবাদিনের নীতির পুনর্ঘোষণা ছিল, যা ম্যাক্সমুলারকে জানাবার জন্য প্রধানতঃ লেখা হয়নি, হয়েছিল স্বামীজীকে আশ্বস্ত করবার জন্যই।—

"We heartily thank the Professor (Max Muller) for the advice he has given us and wish to assure him that, although we have no kind of quarrel with the 'so-called Theosophy' and the Theosophists, we find both it and them to be too occult for our understanding. It is our declared policy to propagate 'the spirit of pure Hinduism' in open day-light without any resort to the more or less dark shadows of occultism and mystic magnetism ; and in the editorial columns of the very first number of the *Brahmavadin* may be found the following statement of our view in regard to the matter,—"The sublime rationality of the Vedanta can allow the roughest handling of it, without the slightest injury to itself, and although it is sometimes spoken as *Rahasya*, *Guhya*, as something secret and hidden, it stands in no need of mystic justification."

স্বামীজী আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবাদিনের আর্থিক দিকটায় তিনি আবার মনোযোগ দিলেন। টাকা পাঠালেন[৯], সকলকে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, এবং তাতেও যখন ব্রহ্মবাদিনের অর্থকষ্ট দূর হল না, তখন ৬ অগস্ট, ১৮৯৬ তারিখে সুইজারল্যাণ্ড থেকে পুনশ্চ লিখে পাঠালেন—

"ব্রহ্মবাদিন্ কতটা আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। লণ্ডনে যখন ফিরে যাব, তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা ক'রব।

৮ চিঠিটি অন্যত্র থিয়জফি-প্রসঙ্গে দিয়েছি।

৯ "এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম। আমি আমার শিষ্যদের বলেছি, যাতে তারা তোমার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে।" (মার্চ, ১৮৯৬)

তুমি স্বর নামিও না যেন—কাগজখানি চালিয়ে যাও; অতি শীঘ্রই এমন সাহায্য করতে পারব যে, বাজে শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও না; বড় বড় সব কাজ হবে, বৎস! সাহস অবলম্বন কর। 'ব্রহ্মবাদিন্' একটি রত্নবিশেষ, একে নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না। অবশ্য এ-জাতীয় পত্রিকাকে সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা তাই ক'রব। আরও মাস-কয়েক আঁকড়ে পড়ে থাকো।··· ভয় পেও না; টাকা ও আর সব শীঘ্রই আসবে।"

এর দুদিন পরেই ৮ আগস্ট আলাসিঙ্গাকে আবার লিখলেন—"কয়েকদিন পূর্বে তোমায় একখানি পত্র লিখেছি। সম্প্রতি আমার পক্ষে তোমায় জানান সম্ভবপর হয়েছে, ব্রহ্মবাদিন্-এর জন্য আমি এইটুকু করতে পারব: তোমায় দু-এক বছরের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে অর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউণ্ড হিসাবে, যাতে মাসে ১০০৲ পুরা হয়, এমন সাহায্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে ব্রহ্মবাদিন্-এর কাজ করতে পারবে ও সেটিকে ভাল ক'রে দাঁড় করাতে পারবে। মণি আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলে পত্রিকার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা খরচ ক'রে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? ব্রহ্মবাদিনে যা কিছু বেরুবে, তার সবটাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোন মানে নাই; কিন্তু দেশপ্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের এ-পত্রিকার গ্রাহক হওয়া উচিত —অবশ্য আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।···ব্রহ্মবাদিন্‌টিকে ভালভাবে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা প্রয়োজন। এই পত্রিকাই তোমার ইষ্টদেবতা-স্বরূপ হোক; তাহলেই দেখবে সাফল্য কেমন ক'রে আসে।···এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব পাঠিও—যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো—অখণ্ড পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থশূন্য একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল।

"দু-বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিন্-কে এরূপ দাঁড় করাব যে পত্রিকার আয় থেকে শুধু যে খরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি এখনও কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে তবে এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।"

শুধু টাকাকড়ি নয়, ব্রহ্মবাদিনের সব কিছুতে স্বামীজীর মনোযোগ। থিয়জফিষ্টদের সঙ্গে আপস যেমন চাইতেন না, তেমনি অযথা কলহেও তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং থিয়জফিষ্টদের নিন্দাপূর্ণ কৃপানন্দের রচনাটির প্রকাশ তিনি সমর্থন করলেন না।[১০] পত্রিকার প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয়তে দুর্বোধ্য তাত্ত্বিকতা বা পারিভাষিক শব্দব্যবহারে বারবার আপত্তি জানালেন, কারণ তাঁর মতে, ব্রহ্মবাদিনের

---

১০ "তোমরা ব্রহ্মবাদিনে কৃপানন্দের একখানা পত্র ছেপেছ, কাজটা ভাল হয়নি।···ব্রহ্মবাদিনের সুরের সঙ্গে ওটি খাপ খায় না।···কোনো সম্প্রদায়—ভালই হোক আর মন্দই হোক, তাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মবাদিনে কিছু ছাপানো যেন না হয়। অবশ্য বুজরুকদের প্রতি গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাবারও কোনো আবশ্যক নেই। (১৮৯৬-এর চিঠি)

দায়িত্ব হল 'সারা পৃথিবীকে সম্বোধন করে কথা বলা।'[১১]

পাক্ষিক ব্রহ্মবাদিন্‌কে[১২] কিছুদিনের মধ্যে মাসিকপত্রে পরিবর্তিত করতে চান আলাসিঙ্গা। ১৮৯৬, ২২শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে ব্রহ্মবাদিন্‌ সম্বন্ধে আবার বিস্তারিত আলোচনা করেন যার শেষাংশে পূর্বোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মবাদিনের আদর্শরূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য আছে--

"যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড় করতে পারবে—এমন ভরসা যদি না থাকে, তবে এখনই ওটিকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্যন্ত তো পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমরা প্রবেশও করিনি; যথা —তুলসীদাস, কবীর, নানক ও দক্ষিণভারতীয় সাধুদের জীবন ও বাণী। এসব অসাবধানে ও যা-তা ভাবে না লিখে সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এ পত্রিকার আদর্শ বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, তা ছাড়া এটি ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মুখপত্র হবে—অবশ্য ঐ গবেষণাদি হবে ধর্ম সম্বন্ধে। তোমার উচিত কলকাতা ও বোম্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আসা ও তাঁদের কাছ থেকে সযত্নে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা।"

এর কয়েকমাস পরে ১৮৯৬, ২০ নভেম্বর স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের ক্রমোন্নতিতে আনন্দিত হয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে লিখলেন—"এখন তো আমাদের ইংরাজী পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কয়েকখানা আরম্ভ করতে পারি।"

বৎসরাধিক পরিশ্রমের ও উদ্বেগের অন্তে স্বামীজী যে লিখতে পারলেন, পত্রিকাটি দাঁড়িয়ে গেছে—তা কিন্তু সত্য সত্যই কোনদিন দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। স্বামীজীর প্রেরণা ও সাহায্য, এবং আলাসিঙ্গার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে পত্রিকাটি আলাসিঙ্গার মৃত্যুকাল অবধি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তারপরে আলাসিঙ্গার উত্তরাধিকারীদের

---

১১ "ব্রহ্মবাদিনে লম্বা লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা চলার সম্ভাবনা অল্প। তুমি ওটাকে তাহলে তো গোটা সংস্কৃতে ছাপলেই পারো। সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং অফুরন্ত সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়তো বেশ সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসী তো আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধার ধারে না। একান্ত যদি রাখতে চাও তো না হয় একটা প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর—বাকিগুলিতে সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উচিত এবং লেখা হাল্কা হওয়া উচিত। আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ আমার সহজ ভাষা। আচার্যের মহত্ত্ব হচ্ছে—তাঁর ভাষার সরলতা। তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত ক'রে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পারো, তবে 'ব্রহ্মবাদিন্‌' এখানে জনপ্রিয় হবে—নতুবা নয়। যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তারা শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে।" (২৩ মার্চ, ১৮৯৬)

"আবার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাগজটা এতই পারিভাষিক হয়ে পড়েছে যে, এখানে এর গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্যদেশবাসী ঐ সব দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত কথা বা পরিভাষা জানেও না, জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে। কোন একটা মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে। আর সর্বদা মনে রেখো যে তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন ক'রে কথা ব'লছ; আর তোমরা যা বলতে চাইছ, জগৎ তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক অনূদিত সংস্কৃত শব্দ সাবধানে ব্যবহার ক'রো; আর ভাষা যতটা সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করো।" (১৮৯৬)

১২ ব্রহ্মবাদিনের Prospectus-এ সাপ্তাহিক পত্ররূপে ব্রহ্মবাদিন্‌কে আরম্ভ করার ইচ্ছার কথা বলা হয়েছিল।

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও আর কয়েক বৎসর মাত্র চলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আলাসিঙ্গার দেহত্যাগের পরের বৎসর নভেম্বর মাসে এই পত্রিকার ব্যাপারে স্বামীজী ও আলাসিঙ্গার ভূমিকা সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিনে লেখা হয়—

"The Brahmavadin completes its fifteenth year of existence with the coming December issue. Next January, 1911, it will come of age according to the Hindu law. It sprang into being under the breath of the late lamented Swami Vivekananda. For five years it derived sustenance and nourishment from his loving hands, and fared like a *Raja*. During the next period of its apprenticeship and service as *Dasa* —a period of ten long eventful years—it has had much ado in trying to save itself from extinction. Only two events need here be mentioned. ··· One is the passing away of the Swami, the author and inspirer of this journal, the other, the passing away of Mr. M. C. Alasinga Perumal, our amiable and talented editor, to whose virtues we wish it were in our power to bear adequate testimony. That after the passing away of the revered Swami who inspired it, and after the death of Mr. Alasinga Perumal who nurtured it, the journal still lives is due to the power and glory of the hands that blessed it at its birth.··· Although the journal is not a success from a financial point of view, it has spared no pains in ministering to the higher needs of the public in its own humble way. The journal has all along endeavoured to be faithful to the high ideal with which the late Master inspired it, and has not willingly done aught that is in any way calculated to lower that ideal."

(*Brahmavadin*, November, 1910)

॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবাদিনের ভিতরের ইতিহাস দেখলাম। সেই কঠোর সংগ্রাম, নৈরাশ্যের অন্ধকার, এবং তাকে অতিক্রম করার প্রাণপণ প্রয়াস। বাইরের ইতিহাসে কিন্তু অপরদিকে সমাদরের উজ্জ্বল আলোক। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পত্রিকাটি অজস্রভাবে পেয়েছিল। প্রকাশের পূর্বে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রচারিত প্রস্পেকটাস্টি[১৩] ভারতের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত ও সংবর্ধিত হয়।[১৪] ব্রহ্মবাদিন্ প্রকাশিত হবার পরেও প্রশংসিত হয় নানা মহলে। ইণ্ডিয়ান মিরার ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ তারিখের সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর এই কাজকে ভারতের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মহাবোধি জার্নালও এই বিষয়ে ১৮৯৬, জানুয়ারীতে মন্তব্য করেছিল। ভারতের বাইরেও কয়েকটি কাগজে প্রশংসা বেরিয়েছিল।[১৫]

---

১৩ বিবৃতির তলায় স্বাক্ষর ছিল: "জি ভেঙ্কটারঙ্গ রাও এম. এ; এম. সি. নানজুনডা রাও, বি. এ, এম. বি., ও. সি. এম; এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল, বি. এ."—এই তিনজনের।

১৪ যথা ইণ্ডিয়ান মিরার, ২৭ জুলাই, ১৮৯৫।

১৫ যেমন *'The world's advance thought of Portland Orcon.'* লেখে—"We gladly welcome to the journalistic brotherhood of those engaged in disseminating the Light of the New, the True and the Good, the *Brahmavadin*. He who reads this new, enlightened Hindu Publication will see that all truth is One and that the true religion of the soul is not bounded by geographical lines, nor restricted to certain creedal systems. Its editor is a ripe scholar and spiritual man. The *Brahmavadin* will be successful beyond the expectations of its projectors."

ইণ্ডিয়ান মিরার মন্তব্য করে—

"A new era of religious thought and aspiration is dawning everywhere, and it is hoped that *Brahmavadin* in its catholicity and unsectarian spirit will be in accord with the spirit of the age."

মিরারের এই আশা ব্রহ্মবাদিন্ কতখানি পূরণ করতে পেরেছিল, তার উত্তর পাই আলাসিঙ্গার মৃত্যুর পরে মাদ্রাজের বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সান্ধ্য দৈনিক 'মাদ্রাজ মেল'-এর মন্তব্যের মধ্যে—

"He (Alasinga Perumal) was also instrumental, with the literary help of the Swamis of the Ramakrishna Mission in establishing the *Brahmavadin, the first and foremost Indian journal conducted in English, devoted to the exposition of Vedanta philosophy and to recording the progress of the Ramakrishna Movement, in various parts of the world.*"[১৬]

(বক্রলিপি লেখককৃত)

মিরার ও মাদ্রাজ মেলের উদ্ধৃত দুই মন্তব্যের মধ্যবর্তীকালে যে-ব্রহ্মবাদিন্ প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা এসেছে ম্যাক্সমুলারের মত শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিতের কাছ থেকেও। ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত প্রবন্ধের এক নির্বাচিত সংকলন বার করার কথা হয়।[১৭] তার ভূমিকা লিখে দিতে স্বীকৃত হন ম্যাক্সমুলার। সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ম্যাক্সমুলার-লিখিত ভূমিকাটি পরে ব্রহ্মবাদিনে মুদ্রিত হয়েছিল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে। রচনাটি উদ্ধৃতির পক্ষে দীর্ঘ হলেও গুরুত্ব বিবেচনা করে মূলেই উপস্থিত করছি—

"Dear sir, I was very glad to hear that you intend to publish a selection of the articles bearing on the Vedanta philosophy which have appeared from time to time in your interesting journal, the *Brahmavadin*. I read most of the articles, when they appeared, but articles published in a journal whether weekly, monthly, or quarterly, are so soon forgotten and so difficult to find again that it would indeed seem to be a very good plan if the editors of every serious and scientific paper were to follow your example. ···This is particularly the case when a number of articles has come out during the year which have all a common subject, such as numerous articles which are contained in the twenty-four numbers of the *Brahmavadin* all treating of different aspects of the ancient and modern Vedanta philosophy and all intended to excite a more general interest in that marvellous system of philosophical and religious thought. I mean more particularly the papers contributed by Professor M. Rangacharyar of the Presidency College, Madras, Professor Vythinatham, formerly Professor of Philosophy at the same college, Mr. N. Ramanujam, of the Pschaippa's College, Madras, Mr. G. Venkata Rangam, of the same College, Professor Sundara

---

১৬ আলাসিঙ্গার দেহান্তের পরে 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকা ব্রহ্মবাদিন্ সম্বন্ধে লেখে—

"He (Alasinga) was also instrumental, with the literary help of the Swamis of the Ramakrishna Mission, in establishing the *Brahmavadin*, the first and foremost Indian journal conducted in English, devoted to the exposition of the Vedanta philosophy and to recording the progress of the Ramakrishna Movement in various parts of the world."

১৭ বইটির প্রস্তাবিত নাম—*Select Essays from Brahmavadin*.

Rama Iyer and several others. They treat of the religion, the ethics, the social ideals of the Vedanta, and though they do not pretend to give a complete and systematic representation of that philosophy, they touch on many points which are of great interest at the present moment when the philosophy elaborated by Badarayana in his Sutras, and fully explained by Sankaracharya and Ramanuja in their great commentaries, is beginning to claim its rightful place among the classical systems of philosophy, which have ruled the minds of men for more than the last two thousand years. It may seem indeed to superficial observers as if the very age of the Vedanta proved it to be an antiquated system of thought, not likely to help us at the present day or influence in any way our own philosophical speculations. This would be very true with regard to scientific observations, but the great problems of philosophy are the same to-day as they were thousands of years ago, and neither the careful observations on the developments of cells, or the watching of the operations of our physical organs concomitant with our perceptions, or what has truly been called Physical Psychology, is likely to bring us one step nearer to that borderland where the objective world ends and that of the subject begins.

It is right therefore that we should turn our eyes to every quarter from which new light may reasonably be expected on the ancient problems of the world, the same to-day as they were thousands of years ago. And here I know of no philosophy that has a better right to be heard and to be studied by our own philosophers than the ancient philosophy of India, and more particularly the Vedanta philosophy. Of course the principal documents in which that philosophy would be studied are the Upanishads, the Sutras and their commentaries. These we possess now in good editions and in good translations also. But what is peculiar to the Vedanta is its longevity. If it is the oldest philosophy in india, it is also the newest, for it sways the thoughts of your countrymen as much as ever. Of late years its rejuvenescence has been most surprising, and while in Europe we hardly find a single man excepting, it may be, a special scholar, who would still call himself a Platonist, or even a Cartesian or Spinozist without very considerable reservations, there are in India ever so many journals, ever so many societies which proclaim doctrines of the Vedanta, and see in them their only guide towards the truth. With many of the religious reformers of India, when the Veda had failed them the Vedanta stepped in, and if you asked those who formerly would have called themselves worshippers of Siva or Vishnu, or even simply Vaidiks, most of them would probably now prefer to be called Vedantists, whether following the interpretation of Sankarachariya or Ramanuja."

॥ ৬ ॥

ব্রহ্মবাদিন্‌-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আবার এই পত্রিকার স্থপতি আলাসিঙ্গা পেরুমলের

ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করব। নিষ্কাম কর্মের যদি কোনো প্রতীক থাকে—সে এই আলাসিঙ্গা পেরুমল। তাঁর দেহত্যাগের পরে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার মন্তব্যে ভারতের ধর্মজাগরণের ইতিহাসে আলাসিঙ্গার ভূমিকার চমৎকার উপস্থাপনা আছে :

"স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি (আলাসিঙ্গা পেরুমল) এদেশের সাম্প্রতিক ধর্মজাগরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে **অপরিচিত সন্ন্যাসিরূপে** মাদ্রাজে উপস্থিত হন, তখন এঁর অন্তর্দৃষ্টিতেই তাঁর মহিমা ধরা পড়ে, এবং ইনিই দেশবাসীর কাছে তাঁকে উপস্থিত করেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগোর সু-মহান ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থনের জন্য স্বামীজী এঁরই চেষ্টার ফলে যেতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পরে কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভূখণ্ডে ক্রমান্বয়ে যেসব সংবর্ধনা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তার মূলেও প্রধানতঃ ছিল স্বামীজী ও তাঁর কাজের জন্য এঁর ভালবাসা ও উদ্দীপনা। স্বতঃই ইনি অতীব অমায়িক ও সহৃদয় মানুষ, বন্ধুগোষ্ঠী সেজন্য খুবই বৃহৎ ছিল। বিবেকানন্দ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলে বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতের, এবং ইওরোপ-আমেরিকার বহু কর্মীর সঙ্গে এঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এবং তাঁদের উচ্চ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ইনি লাভ করেছিলেন। বেদান্তের আধুনিক প্রবক্তারূপে সুবিখ্যাত ভূমিকা গ্রহণ করার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজিতে একটি ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন, যে পত্রিকার দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মকে তার সর্বাধিক বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সার্বভৌমিক রূপে উপস্থিত করা যাবে। এ ব্যাপারে তাঁর কর্মধারার একান্ত সমর্থক ও সবিশেষ অনুগত আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছেই কথাটি পাড়েন। আলাসিঙ্গা তৎক্ষণাৎ কাজটি গ্রহণ করলেন। বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ভারতীয় বন্ধুর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পত্রিকা বার করলেন, স্বামীজীর নির্দেশে পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম হল 'ব্রহ্মবাদিন্'। পনের বছর ধরে পত্রিকাটি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে যে পত্রিকাটি তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তার পত্রে পত্রে আলাসিঙ্গার অদম্য উৎসাহ ও উচ্চ আদর্শের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। ব্রহ্মবাদিন্‌কে কেন্দ্র করে আলাসিঙ্গার কার্যকলাপকে তাঁর জীবনের মূল কীর্তি বলা চলে। পত্রিকাটির উচ্চ মান তিনি কখনই নামাননি, তার জন্য বহু দুর্ভোগ ঘটেছে, প্রভূত আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। এই ধরনের আরও কত কাজই না তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল! তাঁর অকালমৃত্যু তাই দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। সেবাই ছিল তাঁর ব্রত; বিপদে বা প্রয়োজনে মানুষ যখন তাঁর সাহায্য চেয়েছে সানন্দে তিনি তা দিয়েছেন। বিধবা মা, চার পুত্র ও এক কন্যার একটি পরিবার তিনি রেখে গেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর সংবাদ সারা দেশ জুড়ে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, ও ভক্ত ছাত্রদের হৃদয়ে গভীর শোকচ্ছায়া বিস্তার করবে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁর স্নেহময় অঙ্কে এই পবিত্র মহান আত্মাটিকে গ্রহণ করুন; প্রার্থনা করি, উচ্চ কর্তব্যবোধ নিয়ে একাগ্রচিত্তে যেবজীবনে যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্রতী ছিলেন, তা যেন সত্যই সফল হয়।" (অনূদিত)

আলাসিঙ্গার কর্মপ্রচেষ্টার মূল অংশ ব্রহ্ম-বাদিন্ গ্রাস করে থাকলেও উদ্বৃত্ত প্রবাহে আরও বহু ভূমি সিঞ্চিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাই 'দিনমণি' পত্রিকার পূর্বোক্ত রচনায় :

"১৯০৭ সালে থিরুমলাচার্য আলাসিঙ্গার সঙ্গে যোগ দেন ব্রহ্মবাদিন্‌কে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু থিরুমলাচার্য রাজনীতিতে চরমপন্থী। ব্রহ্মবাদিনে রাজনৈতিক বিষয় আমদানি করলে সরকার পত্রিকাটির ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা করে থিরুমলাচার্য ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস থেকে আর একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা আরম্ভ করলেন, তার নাম 'ইণ্ডিয়া'। কিছু-দিন পরে 'ইণ্ডিয়া' তার নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। আলাসিঙ্গা লেখায় তেজ-বীর্য চাইতেন, তাই 'ইণ্ডিয়া'-তে তিনি কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আনালেন। ভারতী তখন 'স্বদেশমিত্রম্'-এ কাজ করছিলেন।" (বেদান্তকেশরী দ্রষ্টব্য, ডিসেম্বর, ১৯৪১)[১৮]

এ বিষয়ে সুবিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী 'ইণ্ডিয়া' কাগজে যা লিখেছিলেন, তার অংশ—

"দু-ধরনের দেশপ্রেমিক আছেন ; এক ধরনের যাঁরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, অন্য ধরনের যাঁরা যবনিকার অন্তরালে থাকেন, নামযশের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন না।

...আলাসিঙ্গা শেষোক্ত ধরনের। পচি-আপ্পা কলেজে তিনি দীর্ঘদিন প্রধানশিক্ষক ছিলেন। অন্য অনেকগুলি কাজও তাঁর ছিল। এই সকল কাজের মধ্যে থেকেও তাঁর হৃদয়ে অনির্বাণ ছিল দেশপ্রেমের অগ্নি। বর্তমান লেখককে আলাসিঙ্গা প্রভূত সাহায্য করেছেন, তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের সহায়তা আমি পেয়েছি। এই 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা যাঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। ভগিনী নিবেদিতাকে যখন আমি কলকাতায় বলেছিলাম, 'মাদ্রাজে আপনার মত বয়সের কোনো দেশপ্রেমিক নেতা নেই যিনি আমাদের মত তরুণদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে পারেন, এক্ষেত্রে আমরা কী করব বলুন ?' ভগিনী উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, আলাসিঙ্গা রয়েছেন! জনজীবনের ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে, তাঁর কাছ থেকে তা তোমরা পরিষ্কার বুঝে নিতে পারো।"

আলাসিঙ্গার ত্যাগ ও স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে পাই—

"অভাব যদিও লেগেই থাকত, তাহলেও নিজের সামান্য আয়েই আলাসিঙ্গা সন্তুষ্ট থাকতেন। অর্থ বা ক্ষমতার লোভ তাঁর কখনই ছিল না। একবার স্বামী বিবেকানন্দের এক ধনী আমেরিকান শিষ্য আলাসিঙ্গার অর্থকষ্টে সহানুভূতি বোধ করে ভগিনী নিবেদিতার কাছে বলেন, তিনি আলাসিঙ্গাকে এক লক্ষ টাকা দেবেন, যাতে তিনি অর্থকষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন।[১৯] ভগিনী নিবেদিতা যখন আলাসিঙ্গাকে একথা জানালেন, তখন তিনি কিছুসময় ভাবলেন তারপর ভগিনীকে বললেন, আমেরিকান ভদ্রমহোদয়কে তাঁর উদার প্রস্তাবের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমার পক্ষে ও-টাকা

---

১৮ শ্রীনিবাসনের প্রবন্ধে পাই, 'ইণ্ডিয়া' কাগজ ছাড়াও 'উইকলি রিভিউ' এবং 'নেটিভ স্টেট' কাগজের সঙ্গে আলাসিঙ্গার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল।

১৯ এক লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব চমকপ্রদ। এই তথ্যের উৎস লেখক জানাননি।

নেওয়া সম্ভব নয়। পরে তিনি বন্ধুদের জানান, কিছু ব্যক্তিগত লাভের জন্য তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্জন করতে পারেন না।"

এ সকলের উপরে আছে গুরু ও শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কী, তা আলাসিঙ্গা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। দাক্ষিণাত্যের সুপণ্ডিত লেখক সুন্দররাম আয়ার এই বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন--

"প্রথমেই আমি আলাসিঙ্গা পেরুমলের নাম করব।... ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কন্যাকুমারিকা ও রামেশ্বর ঘুরে স্বামীজী প্রথম মাদ্রাজে এসেছিলেন—সেই সময় থেকে আলাসিঙ্গা যে প্রেমে ও পূজায় ব্যক্তি-বিবেকানন্দ এবং তাঁর জীবনকর্মকে গ্রহণ করেছিলেন,—স্বামীজীর কাজের সর্ববিধ পর্যায়ে প্রতিটি ব্যাপারে যে অবিচলিত উৎসাহে তিনি যুক্ত ছিলেন--আচার্যশ্রেষ্ঠের জন্যে তাঁর সেই অখণ্ড সেবার দৃষ্টান্ত আমার কাছে এক অপরূপ সৌন্দর্যময় বস্তু; জীবনের নৈরাশ্যময়, অন্ধকার প্রহরে কত সান্ত্বনা ও আনন্দই না তা আমাকে দান করেছে! স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য দ্রষ্টাপুরুষের প্রতি পূর্ণ প্রকৃষ্ট পবিত্র শ্রদ্ধার আকৃতি এবং সুমধুর সুকোমল ভালবাসার ব্যাকুলতা বোধ করার মত মানুষ আমাদের অধঃপতিত হিন্দুসমাজ এখনো সৃষ্টি করতে পারে—এটাই ছিল আমার কাছে মহা বিস্ময়ের আবিষ্কার।"
(অনূদিত— 'Reminiscences' গ্রন্থ থেকে)

স্বামীজী স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যের কথা-চিত্র একবার এঁকেছিলেন, তাঁর আপাত-কৌতুকময় রচনাভঙ্গির মধ্য থেকে কী গভীর শ্রদ্ধাই না ফুটেছিল!:

"আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু-পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন-কখন জুতো পায়ে দেয়।...আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার 'ব্রহ্মবাদিন্', মাইসোরী রামানুজী 'রসম্'-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 'তেংকেলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটুলি! একটায় চিড়ে ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি-লোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া, বেরাদারি যদি কিছু না বলল তো কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবসুদ্ধ পাঁচ-শ, কোনটায় সাত-শ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগনিকে বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়। যাই-হোক, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া!"

(পরিব্রাজক)

আর তাঁর কী স্নেহ!

"বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়া 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত না হয়। তাহার কথা আমাদের সর্বদাই মনে আছে। তাহার

ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব না।······ আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবিয়া গিয়া নিজের শরীরপাত করিতেছে। তাহাকে বলিও, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এইভাবেই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হইতে পারে। তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইও।' (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পত্র, ১৮৯৮, মার্চ)

না, এও যথেষ্ট নয়—স্বামীজীর হৃদয়ের কোন্ গভীরে আলাসিঙ্গার স্থান ছিল, তা একটি স্মরণীয় ঘটনায় অব্যর্থ ফুটেছে। মিস্ ম্যাকলাউড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"স্বামীজী ভারতে ফিরে যাবার পরে আমি তাঁকে কোনো চিঠিই লিখিনি, অপেক্ষা করছিলাম তাঁর বার্তার জন্য। অবশেষে চিঠি পেলাম—'তুমি চিঠি লিখছ না কেন?' তখন উত্তরে লিখলাম, 'আমি কি ভারতে যেতে পারি?' উত্তর এল, 'হাঁ, আসতে পারো, যদি ক্লেদ, পতন ও দারিদ্র্য দেখতে চাও, সেই সঙ্গে কটিমাত্রবস্ত্র-পরা মানুষ ধর্মকথা বলছে—এই দৃশ্য। যদি অন্য কিছু আশা করো, কদাপি এসো না। একটি বাড়তি সমালোচনাও সহ্য হবে না।' স্বভাবতই আমি প্রথম জাহাজ ধরলাম।··· বোম্বায়ে পৌছলাম ১২ ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮), মিঃ আলাসিঙ্গা সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কপালে বৈষ্ণবের রক্ততিলক ধারণ করেছিলেন। পরে কাশ্মীর যাত্রাপথে একদিন যখন স্বামীজীর সঙ্গে বসে আছি, আমি মন্তব্য করলাম, 'কী অদ্ভুত! মিঃ আলাসিঙ্গাও কপালে ঐসব বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করেন! তৎক্ষণাৎ স্বামীজী ঘুরে অতি কঠিন স্বরে বললেন, 'থামো! এ পর্যন্ত তুমি কী করেছ?' আমি কি দোষ করেছিলাম তখন জানিনি। অবশ্য উত্তরে কিছু বলিনি। আমার দুচোখ জলে ভরে গেল, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। পরে আমি জেনেছিলাম, মিঃ আলাসিঙ্গা পেরুমল তরুণ ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজে একটি কলেজে দর্শন পড়ান, মাইনে পান মাসে ১০০৲ টাকা, তাতে পালন করেন পিতা, মাতা, স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তানকে। ইনিই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছেন বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যে পাঠাবার জন্য। তিনি না থাকলে হয়ত আমরা কোন দিন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেতাম না। এই শোনার পরে বুঝলাম, মিঃ আলাসিঙ্গা সম্বন্ধে সামান্যতম কটাক্ষেও স্বামীজী কেন অত রুষ্ট।" (Reminiscences)

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় নারীর আদর্শ ও শিক্ষার ধারা

স্বামী তেজসানন্দ

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুদূর-প্রসারী দিব্যদৃষ্টিসহায়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষার উপরই ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করে। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা বাধা, বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ কালের অবিশ্রান্ত ধারা বাহিয়া ধীর ও অবিচলিত ভাবে তাহার ঐতিহ্যবহুল ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। যুগে যুগে ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে যে, পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত অবদানেই জাতি তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে,—নারীজাতিকে দূরে রাখিয়া, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিয়া নহে। তাই মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড হইয়াছে। যে-দেশে, যে-জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে-দেশ, সে-জাতি কথনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্-কালে পারিবেও না। তোমাদের যে এত অধঃ-পতন ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কারণ--এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা'—এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।" "শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ-শিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তি-সকলকে এমন ভাবে গঠিত করা যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে। তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা স্বার্থগন্ধশূন্যা বীর রমণী হইবে; ভগবানের পাদস্পর্শে যে বীর্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্যশালিনী হইবে; সুতরাং তাহারা বীর-প্রসবিণী হইবার যোগ্য হইবে।"

ভূয়োদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্ত্রী-শিক্ষার এই উচ্চ আদর্শ সর্বতোভাবে রূপায়িত করা ভারত-কল্যাণ-চিকীর্ষু দেশ-নায়কগণের যে একটি অপরিহার্য কর্তব্য, তাহা কোন চিন্তাশীল বিদগ্ধ মনীষীই আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতীয় সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যাবগাহী নারী-শিক্ষা স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত না হইলে এবং উহা সত্বর বাস্তবে রূপায়িত করিতে না পারিলে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ-সাধন যে সুদূরপরাহত, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ সুশিক্ষার মাধ্যমেই নারী-জাতির অন্ত-র্নিহিত শক্তি ও সদ্বৃত্তিনিচয়ের প্রস্ফুরণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সকলের অন্তরে গভীর আত্মপ্রত্যয়, শ্রদ্ধা, বিচারশীলতা, দায়িত্ববোধ, কর্মকুশলতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী প্রকটিত হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে, এতদ্দ্বারা প্রত্যেক পারিবারিক জীবনও সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির পবিত্র আবাস-ভূমি হইয়া উঠে। ইহাদের কল্যাণেই যে সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের

কল্যাণ—ভারতেতিহাস যুগে যুগে তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া আসিয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে পুণ্যভূমি ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষি-মুনিবৃন্দ নারীজাতিকে অনন্তশক্তি-স্বরূপিণী জগজ্জননীরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। দেখিতে পাই বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রে সেই একই মহান সঙ্গীতের স্বর ধ্বনিত হইয়াছে। আজও ভারতবাসী শ্রদ্ধাবনতশিরে মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া থাকে —

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৬

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র এতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

—মনুসংহিতা, ৩৫৬।

—'হে দেবি, বেদাদি সমস্ত বিদ্যা আপনারই প্রকাশ। জগতের সমগ্র নারীমূর্তি আপনারই স্বরূপ।'

—'যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, দেবতারাও সেখানে আনন্দ করেন। যেখানে তাঁহারা পূজিতা হন না, সেখানে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া থাকে।'

এই সমুন্নত পবিত্র আদর্শ ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন ও নারী-সমাজের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ভারতবাসী প্রাচীনকাল হইতে বিশ্বের স্ত্রী-জাতিকে দেবী-স্বরূপিণী জ্ঞান করিয়া তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে ইসলামীয় সভ্যতার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারতের বিভিন্নস্তরের জনগণ নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার চাপে দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এক বিরাট বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল সনাতনপন্থী গোঁড়া নেতৃবর্গ এই সঙ্কটকালে নারীজাতির তথা সমাজজীবনের পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে স্ত্রী-জাতিকে বিধি-নিষেধের অষ্টপাশে আবদ্ধ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই কঠোর অবরোধ-প্রথার কতকটা প্রয়োজন থাকিলেও, ইহার প্রবর্তনের ফলে স্ত্রী-জাতির পূর্বতন সাবলীল স্বচ্ছন্দ জীবন-ধারা, শিক্ষা-দীক্ষা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল এবং সমাজের অবাধ অগ্রগতির পথও বিশেষভাবে রুদ্ধ হইল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাষ্ট্রগগনে আবার এক বিপদ-মেঘ সহসা আবির্ভূত হইল। প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে প্রবেশপূর্বক অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গকে ছলে বলে কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিদেশীশক্তির নিকট এই পরাভব ভারতের কৃষ্টিজগতেও এক যুগান্তরকারী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যের আপাতরমণীয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও শিক্ষায় বিভ্রান্ত হইয় অনেকেই আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাল-চলনে প্রতীচ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং অনেকে ধর্মান্তরও গ্রহণ করিল। এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারত-রঙ্গমঞ্চে এমন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক আন্দোলনের প্রয়োজন হইল যাহা সনাতনপন্থীর রক্ষণশীলতা ও উগ্রসংস্কারবাদীর প্রগতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভারতীয় কৃষ্টি ও ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে। এই সমূহ বিপদকালে যুগপ্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারত তথা

মানবেতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহায্যে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে দেখাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি একটা অলীক বা পরস্পরবিরোধী কুসংস্কারপূর্ণ কল্পনা নহে। অনন্ত শক্তি ও অফুরন্ত সম্ভাবনা উহাতে নিহিত রহিয়াছে, যাহা ভারতের পুনরুত্থান ও মুক্তির কারণ হইবে এবং বিশ্ববাসীকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিবে।

ভারতবর্ষের নারীজাতির পবিত্র আদর্শ ভারতের নর-নারী ও বিশ্বজগতের সম্মুখে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বিশাল কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে আনিলেন তাঁহারই শক্তিস্বরূপিণী সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে, যাঁহার সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন, "ও সারদা, সাক্ষাৎ সরস্বতী,—জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞান দিতে এসেছে। ও কি যে সে? ও আমার শক্তি। ইচ্ছামাত্র দিব্যজ্ঞান দিতে পারে।" নারীজাতির হৃত গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যই এবার বস্তুতান্ত্রিক জড়সভ্যতার তাণ্ডবলীলার মধ্যে পুণ্যসলিলা সুরধুনীতটে তীর্থপীঠ দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবে শক্তি-সাধনা, সিদ্ধসাধিকা যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে তন্ত্রসাধনায় গুরুরূপে বরণ এবং সাধনান্তে স্বীয় অষ্টাদশবর্ষীয়া সহধর্মিণী সারদা-দেবীকে ৺ষোড়শীদেবী জ্ঞানে আরাধনা। ভারতের নর-নারী তথা বিশ্ববাসী নির্বাকবিস্ময়ে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই লোকোত্তর সাধনা ও সিদ্ধি দর্শনে বিপুল আনন্দে উল্লসিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল,—মাতৃজাতির সনাতন আদর্শ ও গৌরবান্বিত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল,—নবযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর বিবাহিত জীবন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। ইঁহাদের শুচিশুভ্র যুগ্মজীবন মোহান্ধ মানবকে শিক্ষা দিয়াছে যে, বিবাহিত জীবন ইন্দ্রিয়সুখের বা ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে; কেমন করিয়া এই মায়াময় ভোগ-বিলাসপূর্ণ সংসারে বৈবাহিক সম্বন্ধকে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে পরিণত করিয়া সাধন-ভজনসহায়ে ক্রমে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায়, তাহাই তাঁহাদের এই পবিত্র জীবন দ্বারা প্রকটিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা একাধারে গৃহিণী, জননী ও সন্ন্যাসিনী এবং জ্ঞান-ভক্তির উজ্জ্বল প্রতিমা। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে এক পত্রে শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেইখানে বলিয়া। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মিবে। শক্তির কৃপা না হইলে কি ছাই হইবে?"

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-দুহিতা ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার বিখ্যাত 'The Master as I saw Him' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি) গ্রন্থে শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটা পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না,—নূতন কোনো আদর্শের অগ্রদূত? তাঁর ভেতরে আমরা খুঁজে পাই সেই জ্ঞান ও মাধুর্য যা সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য। কিন্তু তবুও আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার অপরূপত্ব ও তাঁর বিরাট খোলা হৃদয় তাঁর দেবীত্বের মতই বিস্ময়কর মনে

হয়েছে। যত নূতন বা জটিলই কোনো প্রশ্ন হোক না কেন, আমি তাঁকে উদার এবং সহৃদয় মীমাংসা দিতে ইতস্ততঃ করতে দেখিনি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা একটানা নীরব প্রার্থনার মত। তাঁর জীবনের সব অভিজ্ঞতাই হচ্ছে ঐশ্বরিক রাজ্য নিয়ে, দিব্য সমাজ নিয়ে। তবুও তিনি প্রত্যেক লৌকিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সমর্থ।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবদ্দশাতেই দেখিতে পাই, তাঁহাদের মহিমা-মণ্ডিত আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শুদ্ধচরিত্রা ভক্তিমতী অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস (যোগীন-মা), গোলাপসুন্দরী দেবী (গোলাপ-মা), গৌরী-মা, লক্ষ্মীমণি দেবী (লক্ষ্মী-দিদি), যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও রাণী রাসমণি প্রভৃতি রমণীগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর চারিপাশে ভীড় জমাইয়াছিলেন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ-জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া আদর্শভ্রষ্ট বিভ্রান্ত নর-নারীকে প্রকৃত শান্তির পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সমুজ্জ্বল সার্থক জীবন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কোন দেশ, জাতি বা ধর্মবিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সকলেরই আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিবার সমান অধিকার রহিয়াছে।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিচিত্রঘটনাসমন্বিত ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যুগে যুগে নানা ক্ষেত্রে নানা আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু মহীয়সী নারী মাতৃভূমির সেবা ও উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদ্, তন্ত্র ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ, তামিল-নাড়ুর তেভারম্, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের শৌর্য-বীর্যগাথা ও অন্যান্য কাহিনী সাক্ষ্যপ্রদান করে,—এই ভারতমাতার ক্রোড়েই বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের স্বনামধন্যা ব্রহ্মবাদিনী মমতা ও অপালা, বাক্ ও বিশ্ববরা, গোধা ও ও রোমশা, ঘোষা ও শাশ্বতী, গার্গী ও মৈত্রেয়ী, জৈন ও বৌদ্ধযুগের শ্রাবিকা ও থেরীবৃন্দ ও দক্ষিণ ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা আন্দাম্মারগণ এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় মহাকাব্যযুগে সীতা ও শর্বরী, অহল্যা ও সরমা, তারা ও মন্দোদরী, কৌশল্যা ও অনুসূয়া, গান্ধারী ও কুন্তী, দ্রৌপদী ও লোপমুদ্রা, সুলভা ও সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া নারীগণের আবির্ভাবে ভারতের জাতীয় জীবন অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন এই ভারতভূমিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—পদ্মিনী ও দুর্গাবতী, কর্ণাবতী ও মহামায়া, জিজাবাঈ ও মুক্তাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ ও অহল্যাবাঈ, রাজিয়া ও চাঁদবিবি, নুরজাহান ও জাহানারা, রাণী ভবানী ও রাসমণি প্রভৃতি মহীয়সী নারীবৃন্দ, যাঁহাদের নাম তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপূর্ব শৌর্য-বীর্য, অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও অমূল্য অবদানের জন্য আজও ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সহিত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই সকল নারীগণের অবিস্মরণীয় কীর্তি-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই নবযুগের প্রারম্ভে বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য— কি প্রকারে নব্যভারত-গঠনকল্পে ভারতের সেই সনাতন মহান আদর্শে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করিয়া বিভ্রান্ত ম্রিয়মাণ জাতীয় জীবনকে পুনঃ সুস্থ, সবল ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের নারীজাতিকে ধর্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শানুযায়ী শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষায়তন-সমূহ নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, বস্তুতান্ত্রিক জড়সভ্যতার প্রভাব হইতে আমাদের সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। পারিবারিক জীবন, সমাজ ও দেশমাতৃকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য তাহাদের যে গভীর দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে এবং তাহাদের অবদানের উপর ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ যে বহুলপরিমাণে নির্ভর করে, যে-সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তোলা এই স্ত্রী-শিক্ষার মহতী পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষি-স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্ম-জ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকিবে না কেন? একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার অবশ্য ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহা স্মরণ আছে তো? তাহার প্রধান প্রশ্নকর্তা ছিলেন বাকপটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার দিনে মহিলাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় ধানুকের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের ন্যায়।' এইস্থলে তাঁহার নারীত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য-শিক্ষাপরিষদসমূহে বালক-বালিকার সমানাধিকার ছিল। তদপেক্ষা অধিক সাম্যভাব আর কি হইতে পারে?"

"কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।…জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতালাভে সমর্থা।"

"বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রাণী কেমন ছিলেন! যে-জন্য আমার ইচ্ছা আছে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরি করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। **কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে।** পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকর্ম, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণা ও নীতিপরায়ণা করতে হবে। কালে যাতে

তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে সকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হয়, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়।"

"আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা সহজেই দেওয়া যাইতে পারে—হিন্দুর মেয়ে সতীত্ব কি জিনিস, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত কিনা! প্রথমে সেই ভাবটাই তাহাদের মধ্যে উস্‌কাইয়া দিয়া তাহাদের চরিত্রগঠন করিতে হইবে—যাহাতে তাহারা বিবাহিতা হউক বা কুমারী থাকুক, সব অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। ভারতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভব নয়। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।...যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের,—সে-দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এইজন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।"

"আমি পুরুষদের যাহা বলিয়া থাকি, রমণীদিগকেও ঠিক তাহাই বলিব। ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ; ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিতা না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর; আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এই মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোন নারীর সাহস হইবে না?"

দূরদর্শী বীরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের এই অগ্নিগর্ভ উপদেশ ও প্রাণস্পর্শী আহ্বানে কি আমাদের নারীসমাজ ভারতের ভাগ্যগঠনে আজ নবযুগ-প্রভাতে সাড়া দিবে না? কিভাবে ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে, কি আদর্শে নারীদিগকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে পারিলে ভারতমাতার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ বাণীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পৃথকভাবে নারীশিক্ষার জন্য আদর্শ বিদ্যালয়সমূহ গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার পরিচালনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আদর্শে শিক্ষিতা মহিলাদিগকেই শিক্ষিকা-রূপে নিযুক্ত করিয়া বালিকা ও যুবতীগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য, যাহাতে তাহাদের জীবন প্রাচীন ও নবীন ভাবের সমন্বয়ভূমি হইয়া দাঁড়ায় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-দুহিতা ভগিনী নিবেদিতার সুচিন্তিত উক্তির মধ্যে তাঁহার গুরুদেবের বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন—বৃত্তিকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার বহুল প্রচার ও পরিবর্তনের দিনে বালক-বালিকার দেহ ও মনের যুগপৎ উৎকর্ষ-বিধান-কল্পে জাতীয় শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। মনুষ্যশরীরের স্নায়বিক গঠনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি তদভাবে স্বতঃই উপেক্ষিত হইবে। তাই পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে

কারিগরি শিক্ষাকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—যতদিন আমরা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নারীজাতিকে সাদরে গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন ভারতমাতার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে না এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ভারতমাতার প্রাণ তখনই আনন্দ ও গর্বে উল্লসিত হইয়া উঠিবে, যখন তাহারই সুশিক্ষিতা ও আদর্শচরিত্রা দুহিতৃবৃন্দ তাহার চারিপাশে সমবেত হইবে এবং তাহারই সেবা-বেদীমূলে শ্রদ্ধাবনতশিরে সামগ্রিক কল্যাণকল্পে ব্রত গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, তখনই ভারতমাতা উন্নতশিরে জগতের সম্মুখে সগৌরবে দাঁড়াইবার বিপুলশক্তি অর্জন করিবে এবং তাহার শূন্য মন্দিরে জাতীয় আরাধনার শুভ শঙ্খনাদ বাজিয়া উঠিবে—উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক পুনঃ উদ্ভাসিত হইবে।

নিবেদিতা তাঁহার দিব্যদৃষ্টিসহায়ে জাতীয় জীবনের এই শুভ সুপ্রভাত আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আজ ভারত-ভারতীর শিক্ষার গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা প্রয়াসী, আশা করি তাঁহারা বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গীকৃত ভগিনী নিবেদিতার সুগভীর চিন্তাপ্রসূত শিক্ষা-পরিকল্পনা সর্বতোভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টিত হইবেন।

আমরাও আজ অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সহিত লক্ষ্য করিতেছি—ভারতের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ভারতীয় নারী বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতীব প্রশংসা ও দক্ষতার সঙ্গে স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতেছেন। বর্তমানে উচ্চশিক্ষিতা নারীগণের মধ্য হইতেই কেহ বা শিক্ষক, অধ্যাপক, বক্তা, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক; কেহ বা রাজনীতিবিশারদ,—বিধানসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছেন; কেহ বা উত্তুঙ্গ দুর্গম গিরিশৃঙ্গাভিযাত্রী, আবার কেহ মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদের সম্মিলিত অকুণ্ঠ সেবার মাধ্যমে মাতৃভূমির অশেষ গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের তথা বহির্জগতের সর্বত্র আজ যে নারীজাগরণের এক বিরাট সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে, এই নারীজাগরণের দিনে যদি স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিক আদর্শ ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা জীবনগঠনপূর্বক নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থা হন, তবেই এই নারী-জাগরণ সার্থক হইয়া উঠিবে এবং নারীজাতির তথা সমগ্র মানবজাতির সমুন্নত আদর্শ ও শিক্ষার ধারাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে; নতুবা ভারতের যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে জগৎ-সভায় উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে এবং যে আদর্শের জন্য বিশ্ববাসী অদ্যাবধি ভারতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই আদর্শ অটুট ও অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে না।

ভারতের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। যুগে যুগে ভারতের নর-নারীর অক্লান্ত নীরব সাধনা ভারতের এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, নবভারত-গঠনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় নর-নারীর শিক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় সনাতন সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন করিতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল ও মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিবে এবং জগতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববাসীকেও শাশ্বত-কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিতে সমর্থ হইবে।

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

স্বামী চেতনানন্দ

আপনাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—এই কথা যদি কালিদাস ও ভবভূতিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই নীলাকাশের দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত মিটমিট করিয়া হাসিয়া পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেন। ইহা সত্ত্বেও যদি তাঁহাদের বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইত, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তাকুল হইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিতেন: "দেখ ভাই, ইহা সাব্যস্ত করা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। উপরন্তু ইহা নির্ধারণ করিতে যে নৈপুণ্যের দরকার তাহা আমাদের নাই।" এই উত্তরে জিজ্ঞাসুরা কখনই খুশী হইবে না। কারণ প্রতিভার মূল্যায়ন হয় অপরের কাছে। কস্তুরীমৃগ কখনও নিজের নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধ পায় না। মানুষের রূপ নিজের চোখে ধরা পড়ে না—পড়ে অপরের চোখে। সেইহেতু আমরা এই কবিকুল-শিরোমণিদ্বয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়া তাঁহাদের অমরকীর্তি রামচরিতে প্রবেশ করিব।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃতসাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহাদের মধ্যে কে বেশী উজ্জ্বল বলা কঠিন। উভয়েরই নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। উভয়েরই কবিত্বশক্তি অসাধারণ। রসব্যাপারে পণ্ডিতেরা বলেন—শৃঙ্গারে কালিদাস শ্রেষ্ঠ; কিন্তু হৃদয়ের প্রবল আবেগ-প্রকাশে ও করুণ রসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রসবৈচিত্র্য দেখা যায়। "সংক্ষেপে বলিতে গেলে কালিদাসের রচনা—পরিপাটি, পরিচ্ছিন্ন, সুন্দর, সুমার্জিত, সুবিন্যস্ত, সুরম্য উদ্যান; এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর, ভীষণ, বীভৎস, নিবিড়, জটিল, বিপুল মহারণ্য।" জনৈক পণ্ডিতপ্রবরের মতে—কবিত্বে কালিদাস শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞতায়, সদাচারে, ধার্মিকতায় ভবভূতি বড়।

উভয়ের নাটকেই গাম্ভীর্য বিদ্যমান। তথাপি কালিদাসের নাটকগুলি ব্যঞ্জনাপ্রধান এবং ভবভূতির নাটকগুলি অভিধা-শক্তির দ্বারা সুন্দরভাবে চিহ্নিত। উভয়ের উপরে কালের প্রভাব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। কালিদাসের কালে ভারতবর্ষে আনন্দ ও শান্তি বিরাজিত ছিল; সেইহেতু তাঁহার রচনা আমোদপ্রমোদে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও সাময়িক দুঃখ প্রকাশ পাইলেও উহা চিরস্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই। কালিদাসের সমস্ত নাটকেই বিদূষক বিদ্যমান। তিনি হাস্য-পরিহাসের দ্বারা নায়ক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

অপরদিকে ভবভূতির জীবন দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন উহা ভারতের ঘোর অবনতির যুগ। বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর অধঃপতন, নানাবিধ উদ্ভট ক্রিয়াকলাপে সমাজ জর্জরিত। ইহার প্রমাণ ভবভূতির মালতীমাধবে রহিয়াছে। সেখানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীর আশ্রম-বিগর্হিত কার্যকলাপ ও তান্ত্রিক অভিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভবভূতি আপন জীবনকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে দেরী হইতেছে দেখিয়া দুঃখপূর্ণ করুণরসের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

নাট্যসমালোচকদের দৃষ্টিতে কালিদাসের নাটক বৈদর্ভী রীতিতে এবং ভবভূতির নাটক গৌড়ীয় রীতিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কালিদাসের রচনায় বহির্জগতের পরিপাটি এবং ভবভূতির রচনায় অন্তর্জগতের খুঁটিনাটি।

বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পণ্ডিতেরা লড়াই করে নিয়ে তারিখ সাল॥" ইহা খুব সত্য কথা। কালিদাস ও ভবভূতির আবির্ভাব-কাল লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। তথাপি বিভিন্ন গ্রন্থ-দৃষ্টে মনে হয় কালিদাস ৬ষ্ঠ এবং ভবভূতি ৮ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কবিদের ছায়া পরবর্তীদের উপর পতিত হওয়াই স্বাভাবিক; সেইহেতু ভবভূতির উপর কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইতিহাসপাঠে জানিতে পারা যায় কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন এবং ভবভূতি ছিলেন কনৌজের রাজা যশোবর্মার সভাপণ্ডিত। পরবর্তীকালে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কনৌজরাজকে পরাভূত করিয়া ভবভূতিকে মহাসমাদরে কাশ্মীরে লইয়া যান। ভবভূতির পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকর্ণী এবং জন্মস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ-প্রদেশের পদ্মপুর নগরে। তিনি সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া শ্রীকণ্ঠ উপাধি পান। কালিদাসের সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন যে, তিনি পশ্চিম মালবের বাসিন্দা ছিলেন। কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া আমাদের দেশে একটি প্রাচীন শ্লোক আছে: পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ। নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ॥"

রামচরিত্র বিশাল ও সুগভীর। কাহারও চক্ষে রাম অবতার, কাহারও কাছে আদর্শ মানব, আদর্শ রাজা। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সমগ্ররূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্। অর্থাৎ কোন্ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপগ্রহণ করিয়াছেন? রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।" এই আদর্শচরিত্র রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে কত মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, গল্প, কবিতা, কথকতা, ব্রতকথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আদি কবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধককবি তুলসীদাস, ভক্তকবি কৃত্তিবাস, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মনীষীরা রামগাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যকেই সাধারণতঃ Epic বলে; কিন্তু রামায়ণ বেদনার কাব্য। বীরত্বের অন্তরালে রহিয়াছে ব্যথা। এই ব্যথা রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা করিয়াছে, সীতাকে অতুলনীয় সতীত্বে দাঁড় করাইয়াছে, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, হনুমানকে আদর্শ কর্মবীরে পরিণত করিয়াছে। এই অশ্রুসিক্ত কাব্য আমাদের দুঃখভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি। রামায়ণ আমাদের ঘরের কথায় ভরা; সেইহেতু আমাদের বড় আদরের।

কেহ কেহ মনে করেন—দুঃখে কি আনন্দ আছে? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' (সাহিত্য-দর্পণ)। অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যে যদি শুধু সুখজনক স্বীকৃত হয় তাহা হইলে করুণ প্রভৃতি রস দুঃখজনকত্ব বলিয়া তাহাদের রসত্ব নাই। ইহার উত্তর সাহিত্য-দর্পণে দেওয়া হইয়াছে: "করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্। সচেতসামনুভবঃ

প্রমাণং তত্র কেবলম্॥ কিন্তু তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ। তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা॥" অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রসে যে অত্যন্ত সুখ জাত হয়, সহৃদয়ের অনুভবই তাহার একমাত্র প্রমাণ। বাস্তবিক যদি তাহাতে দুঃখই থাকিত তবে সে বিষয়ে কেহ উন্মুখ হইত না এবং রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য কেবল দুঃখেরই হেতু হইত। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে। সন্ন্যাসীদের তপস্যারূপ কৃচ্ছ্রতা, সতীনারীদের ব্রত-উপবাসরূপ কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও আনন্দ আছে।

মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে এবং ভবভূতি 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত' এই দুইখানি অমর নাটকে রামচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। যাহা দেখা যায় বা অভিনয় করিয়া দেখানো যায় তাহা দৃশ্য কাব্য। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তররামচরিত। যাহা শুনা যায় তাহা শ্রব্য কাব্য; যেমন রঘুবংশ, মেঘদূত, কাদম্বরী প্রভৃতি। সুতরাং রামচরিতে কালিদাস শ্রব্য কাব্যের এবং ভবভূতি দৃশ্য কাব্যের আশ্রয় লইয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতির রামচরিত্র পড়িলে একটি জিনিস স্বতঃই মনে হইবে যে কালিদাস রামচন্দ্রকে দেবতারূপে এবং ভবভূতি মহাবীররূপে আর কোথাও বা লোকোত্তর পুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশের প্রারম্ভে দেবগণ অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর কাছে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া রাবণবধের প্রার্থনা জানান। ইহার উত্তরে বিষ্ণু বলেন, "আমি দশরথের পুত্ররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া শাণিত শরাঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসাধিপের শিরঃপরম্পরারূপ কমলমালা সংগ্রামভূমির বলিরূপে প্রদান করিব।" ভবভূতির রামচন্দ্র মহাবীর। অলৌকিক তাঁহার পরাক্রম। কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নাই।

পণ্ডিতেরা চরিত্রচিত্রণ, রসপুষ্টি, বর্ণনাচাতুর্য, রচনাশৈলী ও ভাষার সৌকর্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বলেন যে, রঘুবংশ কালিদাসের শেষের জীবনে লেখা এবং ঐকালে তাঁহার ধর্মবুদ্ধি প্রবল ও গভীর হইয়াছিল। অন্যান্য কাব্যের (কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার) প্রারম্ভে কালিদাস মঙ্গলাচরণ করেন নাই; কিন্তু রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥" অর্থাৎ আমি প্রচুর পরিমাণে শব্দ ও অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, জগতের জনক-জননীস্বরূপ শিব ও শিবানী এই উভয়কে ভক্তিসহকারে নমস্কার করি। রঘুবংশে মহাকবির বিনয় আমাদের মুগ্ধ করে—"ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।" অর্থাৎ কোথায় সেই মহান সূর্যবংশ আর কোথায় আমার মত অল্পবুদ্ধি মানুষ। অজ্ঞানবশতঃ মহৎ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই হেতু ভেলা লইয়া দুস্তর সাগর পার হইতে চলিয়াছি। বৃহৎ তরুশাখায় ঝুলন্ত ফল উন্নত পুরুষ ধরিতে পারেন, কিন্তু বামন ঐরূপ করিতে গেলে উপহাস্যাস্পদ হয়। "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" অর্থাৎ মূঢ়মতি হইয়া কবিদের যশঃপ্রার্থী হইয়াছি, সুতরাং আমি যে উপহাস্যাস্পদ হইব—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভবভূতির তিনখানি নাটক প্রসিদ্ধ আছে—বীররসসমন্বিত 'মহাবীরচরিত', শৃঙ্গারসমন্বিত 'মালতী-মাধব' এবং করুণরসসমন্বিত 'উত্তররামচরিত'। রচনাদৃষ্টে পণ্ডিতেরা বলেন

যে, ভবভূতি মহাবীরচরিত প্রথমদিকে এবং উত্তররামচরিত শেষ জীবনে রচনা করেন। সংস্কৃতনাটকে নান্দীপাঠই মঙ্গলাচরণ। উহা নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির জন্য পঠিত হয়। ভবভূতি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মার অংশরূপ ও অমৃতের ন্যায় সুরসা বাগ্‌দেবীকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থদ্বয় আরম্ভ করিয়াছেন। কালিদাসের মত অত বিনয় প্রকাশ করিয়া ভবভূতি রামচরিতে প্রবেশ করেন নাই। রামচরিতের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া গম্ভীরভাবে লোকোত্তর পুরুষের জীবন-সলিলে অবগাহন করিয়াছেন। নাটকের নৈপুণ্য নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নাটকের গুণ বাড়াইতে পারে না। বাক্য যদি গম্ভীর ও প্রাঞ্জল হয়, তাহা হইলেই অর্থের গৌরব অক্ষুন্ন থাকে এবং উহাতেই নাটকের নৈপুণ্য বিকশিত হয়।" মালতী-মাধব পড়িলে বোঝা যায় যে, ভবভূতির নিজের প্রতিভার প্রতি একটি দৃঢ় আস্থা ছিল। একটি সুন্দর শ্লোকে তিনি উহা বর্ণনা করিয়াছেন: "তে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং, জানন্তি যে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ। উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমান-ধর্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥" অর্থাৎ আমার প্রতি যাহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহারা অল্পই বোঝে; তাহাদের জন্য আমার এই রচনার প্রয়াস নহে। এ পৃথিবী বিশাল এবং কালেরও কোন সীমা নাই; যেহেতু আমার সমানধর্মা কেহ আছে বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে। ভবভূতির 'সমানধর্মা' এবং Greyর 'Kindred Soul' একার্থক। লেখক ও পাঠকের যোগসূত্র কাব্যই স্থাপন করে এবং পরস্পরং ভাবয়ন্তং না হইলে উহা রসোত্তীর্ণ হয় না। Leo Tolstoy তাঁহার What is Art গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Every art causes those to whom the artist's feeling is translated to unite in soul with the artist and also with all who receive the samo impression."

রঘুবংশ কালিদাসের ১৯ সর্গ ব্যাপী একখানি উৎকৃষ্ট বিরাট কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্য কাব্যের মত ইহার সমস্ত অঙ্গই বিদ্যমান। দৈর্ঘ্যে একটু বেশী হইলেও উহার গাঁথুনি মজবুত। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯০ সালে বঙ্গদর্শনে লেখনীমুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি: "কাব্য বা মহাকাব্য হয় একটি নায়ক, একটি নায়িকা, একটি দেশ, একটি নগর বা একটি নগরী লইয়া। সমস্তটাই বহিজগতেরই হউক বা অন্তর্জগতেরই হউক, একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। অন্তর্জগতের গণ্ডীও ছোট—হয় প্রেম, নয় করুণ, নয় বীররস। রঘুবংশ গণ্ডী মানে না। যদি ইহার কোন গণ্ডী থাকে তবে উহা প্রকাণ্ড দিগ্‌দেশকাল ব্যাপিয়া। রস-ভাব বল, প্রায় সব ক'টিই উহাতে আছে। সুতরাং কি বাহিরে কি ভিতরে রঘুবংশ একখানি প্রকাণ্ড কাব্য। দেশ যদি বল, উহা সমস্ত ভারত জুড়িয়া আছে; এমন কি ভারতের বাহিরেও পারস্য দেশ, আরব-দেশ, যবন দেশ, হূন দেশ, লঙ্কা, উচাং, বোস্তাং, খোটান প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন ভারতবর্ষেরও একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া মধ্যস্থলের দেশগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বর্গ আছে, মর্ত্য আছে নাগলোক আছে, সমুদ্র আছে, পর্বত আছে

বন আছে, নদনদী আছে। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশে যাহা কিছু আছে, ইহাতে সবই আছে। দেশও যেমন প্রকাণ্ড, কালও তেমন প্রকাণ্ড। ২৯ পুরুষ এই কাব্যের বিষয়।··· মোটকথা, সমস্ত পৃথিবীর কবিরা যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ভালগুলি রঘুবংশে লইয়াছেন।"

রামায়ণে আদিকবি বাল্মীকি রামকে নানাভাবে রূপ দিয়াছেন; গাহিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব কীর্তিকথা। তাহা হইলে কবি কালিদাসের আবার নূতন প্রয়াস কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন: "কালিদাসের চেষ্টাটা যেন বাল্মীকির উপর টেক্কা দেওয়া। তিনি রামসীতার ছবি আঁকিতে গিয়া দেখিলেন, জমিতেছে না, বাল্মীকির উপর জমিতেছে না। তখন তিনি রামসীতার আশেপাশে আরও অনেকগুলি ছবি দিয়া জিনিসটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তুলিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির ছবিখানি বজায় রাখিলেন। যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা খুব উজ্জ্বল, কালিদাস সেখানে খুব সংক্ষেপে সারিলেন।···কিন্তু যেখানে বাল্মীকির ফাঁক পাইলেন, সেইখানেই আপনার কবিত্ব-কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। এ ত গেল খাস রামায়ণে—যাহা লইয়া রঘুবংশের ১০-১৫ সর্গ। কিন্তু খাস রামায়ণের বাহিরে যে-সব ছবি, বাল্মীকিতে ত সেগুলি নাই। সেগুলি কালিদাসের নিজস্ব। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে বাল্মীকি যেন রাম ও সীতার দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া গিয়াছেন; আর কালিদাস তাহাতে background দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছেন।"

কাব্যে যাহা দেখানো সম্ভব, নাটকে তাহা সম্ভব নহে; আবার নাটকে যাহা সম্ভব কাব্যে তাহা দেখানো যায় না। দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য উভয়েই যদিও কাব্যধর্মী তবুও উভয়েরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে এবং বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কালিদাস ৬টি সর্গে (৫১২টি শ্লোকে) আর ভবভূতি ২ খানি নাটকে (১৪টি অঙ্কে) রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় ভবভূতিও বাল্মীকিকৃত রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া আপন আদর্শ ও ভাবানুযায়ী রামচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির কল্পনা সুদূরপ্রসারী। অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উহার প্রমাণ দিব। ভবভূতির মালতীমাধব একটি কাল্পনিক সৃষ্টি। রঘুবংশে কালিদাসের যেমন নিজস্বতা আছে তেমনি ভবভূতির রামচরিতদ্বয় নিজস্বতায় পরিপূর্ণ। শ্রব্য কাব্য বলিয়া কালিদাস background সাজাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু ভবভূতি বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের মুখে কথা সাজাইয়া দিয়া উহাদের জীবন্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। নাট্যকারেরা চরিত্র-সৃষ্টি-ব্যাপারে licence লইয়া থাকেন, ইহা সর্বজন-বিদিত। ভবভূতি ঐ সুযোগ ছাড়েন নাই। কালিদাস বাল্মীকিকে টেক্কা মারিয়াছেন; ভবভূতি কিন্তু কেবল টেক্কা মারিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনভাবে বিস্তার করিয়াছেন।

ভবভূতি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। কথিত আছে, তিনি কুমারিল ভট্টের নিকট পূর্বমীমাংসা এবং জ্ঞাননিধির নিকট উত্তরমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ' ভবভূতি ধুরন্ধর তার্কিকদের ন্যায় নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে বৈদিক ধর্মের উৎকর্ষ এবং ন্যায়সঙ্গতা দেখাইয়াছেন। হাস্যরস নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ, নতুবা দর্শকের একঘেয়ে লাগিবার আশঙ্কা থাকে। কালিদাসের নাটকে

বিদূষক আছে, কিন্তু ভবভূতির তিনখানি নাটকে কোথাও বিদূষক নাই। করুণরসের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন করা কঠিন হইলেও ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৪র্থ অঙ্কে মুনিবালকদের দ্বারা অশ্বমেধের অশ্বকে লইয়া কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি বলিয়াছেন: "ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা। ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাটকে যন্ন দৃশ্যতে॥" অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ ও কর্ম নাই যাহা নাটকে দেখানো যায় না। শ্রব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য মনের উপর অধিক রেখাপাত করে।

রঘুবংশের উপর দৃষ্টিপাত করিলে একটি জিনিস স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে; উহা হইতেছে একটি মহান বংশের উত্থান ও পতন অর্থাৎ উঠতি বেলা ও পড়তি বেলা। সূর্য-বংশের সূর্য দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘু, অজ ও দশরথের উপর দিয়া উদিত হইয়া যখন রামচন্দ্রের উপর পড়িল তখন বেলা বারোটা। রঘুবংশ তখন গৌরবের শীর্ষে। ঐ সূর্য তারপর যখন ২৩ পুরুষ পার হইয়া ২৪ পুরুষ বা শেষ পুরুষ অগ্নিবর্ণে পৌঁছাইল তখন সূর্য অস্তোন্মুখ। অগ্নিবর্ণ নামেই অগ্নিবর্ণ ছিলেন; অত্যধিক ভোগোন্মত্ততার জন্য তাঁহার রাজযক্ষ্মা হয়। ইহার ফলে বিবর্ণ হইয়া কোন বংশধর না রাখিয়া মারা যান। প্রজারা অগ্নিবর্ণের এক গর্ভবতী মহিষীকে রাজপদে ন্যস্ত করেন। কালিদাস বড় নির্দয়ভাবে রঘুবংশের উপর যবনিকা টানিয়াছেন।

কালিদাস রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ১০ম সর্গে দেখাইয়া একটু মন্তব্য করিয়াছেন: "দশানন-কিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ। মণিব্যাজেন পর্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ॥" অর্থাৎ রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রত্নচ্ছলে রাক্ষসলক্ষ্মীর অশ্রুবিন্দুসকল অবনীতলে পতিত হইল। যজ্ঞ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে সর্বগুণের আকর রামচন্দ্রকে চাহিলেন। রামচন্দ্রের বয়স তখন ১৫ বৎসর। কালিদাস লিখিয়াছিলেন, "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে" অর্থাৎ তেজস্বীদের বয়স-পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। রামলক্ষ্মণ কৌশিক মুনির সঙ্গে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিলেন। এইকালে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে তাঁহারা বহু দিব্য অস্ত্র লাভ করেন এবং সিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করেন। রামচন্দ্র পরে অহল্যা-উদ্ধার এবং মিথিলায় গমন করিয়া হরধনু ভঙ্গ করেন এবং জনকের অযোনিজা কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। ইহা সত্যই আশ্চর্যের যে, ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত—উভয়েরই নায়িকাদ্বয় অযোনিজা।

নিমিকুলের সঙ্গে রঘুকুলের সম্বন্ধ বৈবাহিক সূত্রে দৃঢ় হইল। রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইল। রাজা দশরথ সকলকে লইয়া অযোধ্যার পথে অগ্রসর হইলেন। তিন দিন চলিবার পর কৃতান্তসম পরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। পরশুরাম নিজগুরু শিবের ধনুর্ভঙ্গকারী রামকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিলেন, "নিহত দৃপ্ত রাজন্যবর্গের গলদেশ হইতে নির্গত রুধিরপায়ী আমার এই ভয়ঙ্কর পরশু নির্দয়ভাবে পতিত হউক তাহার উপর, নিঃশঙ্কচিত্তে যে আমার গুরুর ধনু ভঙ্গ করিয়াছে এবং উচ্ছ্বলিত নবীন যৌবনের দ্বারা যাহার অথর্ব গর্বতাপ স্ফুরিত হইয়াছে।" রসগঙ্গাধর গ্রন্থে এই উক্তিটিকে রৌদ্ররসের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা

হইয়াছে। এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে, একমাত্র রামায়ণে দেখা যায় দুই জন অবতারের পরস্পর সাক্ষাৎ। জয়দেবকৃত দশাবতার-স্তোত্রে প্রথমে 'কেশবধৃতভৃগুপতিরূপ' এবং ঠিক তাহার পরেই 'কেশবধৃতরঘুপতিরূপ' উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়কারী মাতৃহন্তা পরশুরামকে দেখিয়া বৃদ্ধ দশরথ ভীত হইয়া 'অর্ঘ্য অর্ঘ্য' বলিয়া জামদগ্ন্যকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ জগতে পুত্রবাৎসল্য মানুষকে এইরূপই উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে। কালিদাস পরশুরামের বীরত্ব অত্যন্ত সাধারণভাবেই দেখাইয়াছেন। "পূর্বে 'রামনাম' উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এখন সেই নাম অভ্যুদয়োন্মুখ তোমাতে বিভক্ত হওয়াতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে। তুমি আমার এই শরাসনে গুণারোপণ করিয়া শরসংযুক্ত ধনুক আকর্ষণ কর, যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। ইহাতে সমর্থ হইলে তোমাকে সমবাহুবলশালী বিবেচনা করিয়া পরাভব স্বীকার করিব অথবা আমার প্রদীপ্ত কুঠারের ভয়ে ভীত হইয়া অভয় প্রার্থনা কর।" পরশুরামের উপর্যুক্ত উক্তিতে রামচন্দ্র মৃদুহাস্য করিয়া ধনুক গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বলুন, এই অব্যর্থ শর দ্বারা আপনার স্বৈরগতি অথবা যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোক অবরোধ করিব?" হতদর্প পরশুরাম নতি স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া জানিতাম না এমন নহে; আপনি মর্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনার দিব্যতেজ দর্শন করিবার জন্য আপনাকে কুপিত করিয়াছি। যাহা হউক, আপনি আমার গতি রুদ্ধ করিবেন না, আমার পুণ্যার্জিত স্বর্গলোক অবরুদ্ধ করুন।" রামচন্দ্র তাহাই করিলেন।

ভবভূতি কালিদাসের মত রামচরিতে প্রবেশ করেন নাই। রামচন্দ্রের উপর তাঁহার প্রথম নাটক মহাবীরচরিত। বীররূপেই তিনি রামচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চে উঠাইয়াছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে ধনুর্বাণহস্তে যজ্ঞরক্ষাকারিরূপে দেখি। ঐ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মিথিলার রাজর্ষি জনককে বলিয়া পাঠান, "তুমি এই যজ্ঞে যজমানরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছ জানিবে এবং সীতা ও উর্মিলার সঙ্গে কুশধ্বজকে এখানে পাঠাইয়া দিবে।" এই সংবাদ পাইবামাত্র জনক নিজভ্রাতা কুশধ্বজকে কন্যাদ্বয়সহ সিদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। যাহা হউক, নাটকের প্রারম্ভে ইহাদের পূর্বকল্পিত মিলন খুবই সুন্দর।

এ জগতে গুণানুরাগ রূপানুরাগকে দৃঢ় করে। রামচন্দ্রের তেজঃপ্রভাবে অহল্যার উদ্ধার হইলে পর সীতা চুপি চুপি সানুরাগে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "ইহার যেরূপ শরীরের গঠন, ইহার প্রভাবও তাহারই অনুরূপ।" মহাবীরচরিতে এই বালকাণ্ডের যথেষ্ট নূতনত্ব রহিয়াছে; যাহা অন্য কোন রামায়ণে নাই। সিদ্ধাশ্রমেই রাবণ পুরোহিত 'সর্বময়' নামক জনৈক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের দূতরূপে আসিয়া জানাইলেন যে, রাবণ সীতাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এমন সময় তাড়কা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিতে আসিলে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে রাক্ষসীকে বধ করিতে নির্দেশ দেন। রাম বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্ স্ত্রী খলু ইয়ম্।" অর্থাৎ ইনি যে স্ত্রীলোক! এই কথা শুনিয়া সীতার পূর্বরাগ আরও বর্ধিত হইয়াছে। সীতা বলিয়া উঠিয়াছেন, "আহা! স্ত্রীলোক বলিয়া ইঁহার মনের ভাবটা কেমন বদলাইয়া গেল!" যাহা হউক, রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আদেশে তাড়কাবধ করিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট অলৌকিক সব দিব্যাস্ত্র লাভ করেন এবং হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিলেন। ভবভূতির হরধনুর বর্ণনা বাল্মীকি বা কালিদাসের সঙ্গে মিলে না। তাঁহার মতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবতাদের পরাক্রমের সার দিয়া ত্রিপুরাসুরবধের জন্য এই হরধনু তৈরি করেন। অপরদের মতে বিশ্বকর্মা ঐ ধনুর নির্মাতা। (ক্রমশঃ)

হাস্যরসিক বিবেকানন্দ

শ্রীরাধাশ্যাম দাস

ধ্যানগম্ভীর বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনের বহুল ঘটনার মধ্যে কৌতুক ও রঙ্গরসপ্রিয় বিবেকানন্দের সন্ধান সহজেই পাওয়া যায়। হাস্য-কৌতুকে তাঁর এত নিপুণতা ছিল যে, যে-কোন বিষয়ে অতি সহজে রঙ্গরস পরিবেশন করতে যেতে যেতে পারতেন আর হাস্যরোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত। আবার যাকে নিয়ে রঙ্গ করতেন তিনিও ক্ষেত্রবিশেষে এতে যোগদান না করে চুপ করে থাকতে পারতেন না। তা ছাড়া একসঙ্গে রাগাতে, হাসাতে আবার ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে খুব কম লোকই পারে। স্বামীজীর জীবনে ঘটেছিল এরই মণি-কাঞ্চনযোগ।

তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের এত ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে, যা সংগ্রহ করলে এক বিরাট পুঁথি হতে পারে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত এরূপ ঘটনার সামান্য কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া গেল :

একসময় স্বামীজী আমেরিকায় অবস্থানকালে এক সভায় বক্তৃতা করতে যান। স্বামীজী বিদেশী, ভারত থেকে এসেছেন, তাই শ্রোতারা প্রথমদিকে অনেকেই এলোমেলো ভাবে স্বামীজীকে নানারূপ প্রশ্ন করতে থাকেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা কুমারী পাদরীদের লেখা বই পড়ে এসে স্বামীজীকে প্রশ্ন করে—"স্বামীজী! আপনাদের দেশে ছোট শিশুদের গঙ্গাতে কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করে কেন?" স্বামীজীও গম্ভীরমুখে ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর করলেন—"ছোট মেয়েদের মাংস বেশ নরম কিনা, তাই তাদের কুমীরকে খেতে দেয়।" উত্তর শুনে শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর সকলেই হাসতে লাগলেন আর কুমারীটিও অপ্রতিভ হয়ে গেল।[১]

আমেরিকা ধনীর দেশ। তথায় সাত'শ ধনাঢ্য ঘর আছে। তাঁরা নিজদিগকে সবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। তাই সাধারণের সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত হতেন। একদিন স্বামীজী একস্থানে বক্তৃতা করতে যান। তথায় একটি ধনাঢ্য মহিলা এসে স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন—"এখানে কি সাত'শ লোকের সভা?" স্বামীজী ক্ষণবিলম্ব না করে উত্তর দেন—"না, এটা চোদ্দ'শ লোকের সভা।" মহিলাটি উত্তর শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। চারদিকে হাসির ঢেউ খেলে যায়।[১]

স্বামীজী নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তথাকার চীনা অধিবাসীর ইংরেজী শুনে খুব আনন্দ পেতেন। চীনাদের অনুকরণ করে তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে ইংরেজী বলতেন আর হাসির রোল উঠত। তিনি চীনাদের মত করে বলতেন—"O me Melican Chinaman. Me eat polk, me eat blandy, me eat evely thing." চীনারা 'র' স্থলে 'ল' প্রয়োগ করতো, তাই pork-এর স্থলে polk, brandy-এর স্থলে blandy প্রভৃতি।[২]

স্বামীজীর লণ্ডনে অবস্থানকালের একটি কাহিনী বিশেষ কৌতুককর। স্বামীজী একবার ট্রেনে করে যাচ্ছেন, সঙ্গে এক কপর্দকও নেই। তাছাড়া আগের দিন খাবারও জোটেনি। ট্রেনে কতকগুলি বোম্বাই অঞ্চলের

লোক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সবাই থিওসফিষ্ট। স্বামীজীকে দেখে তাঁরা বললেন, ইনি হিমালয়ের অনেক স্থানে ঘুরে বেড়ান। নিশ্চয়ই হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে মহাত্মা কুত্‌মিলারের দেখা পেয়ে থাকবেন। তাঁরা সবাই হিমালয়ের অলৌকিক ঘটনা ও মহাত্মাদিগের অনেক আজগুবি গল্প করতে থাকেন। স্বামীজী আজগুবি গল্প শুনে হাস্য সংবরণ করে গম্ভীর মুখে তাঁদের সঙ্গে আজগুবি গল্পে মিশে যান। তারপর হঠাৎ বলেন—"কুত্‌মিলারের কথা বলছেন কি, এই কদিন আগে কুত্‌মিলারের ভাণ্ডারাতে গেছলুম। সে কি ব্যাপার! এই এত বড় বড় লাড্ডু (নিজের হাত দেখাইয়া), আর কত যে সাধু ভোজন করেছে তার ইয়ত্তা নেই! সে যে কি ব্যাপার তা আর আপনাদের কি বলবো!" এই বলে স্বামীজী আরও অধিক আজগুবি কাহিনী বলতে লাগলেন। স্বামীজী যে তাঁদের বিদ্রূপ করছেন তা তাঁরা বুঝতে না পেরে স্বামীজীর সঙ্গে মহোল্লাসে মেতে গিয়ে স্বামীজীকে বেশ ভাল করে ভোজন করালেন। ভোজনান্তে একটু সুস্থ হয়ে ভাব পরিবর্তন করে স্বামীজী নিজ মূর্তি ধারণ করে তাঁদের খুব ভর্ৎসনা করলেন।[৩]

যখন যে অবস্থা ও পরিবেশে স্বামীজী থাকতেন নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতেন। তাই সহজেই তিনি ভাব-পরিবর্তনে সক্ষম হতেন। একবার স্বামীজী গাজীপুরে মুন্সেফ শিরিশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে আছেন। তখন গাজীপুরে এক সরকারী ঠাকুর্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ আর গাঁজা, গুলি ও চরসে সিদ্ধপুরুষ। ঠাকুর্দার আর একটা দোষ ছিল—সবজান্তা ভাব। কোন কথা বা প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর্দা "ও বিষয়ে আমি জানি"—বলতেন। একদিন ঠাকুর্দা শিরিশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত আছেন। স্বামীজীও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর্দাকে নিয়ে সবাই খুব স্ফূর্তি করতে লাগলেন। স্বামীজীও তখন ঠাকুর্দাকে নিয়ে রঙ্গ আরম্ভ করলেন। স্বামীজী প্রথমেই ঠাকুর্দাকে বেদ পড়ে শুনাতে লাগলেন—"কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাস্বরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম"—এ হোল বেদের প্রথম স্তোত্র। স্বামীজীর মুখে বেদের নাম শুনেই ঠাকুর্দা আগে থেকে কান্না জুড়ে দেন। স্বামীজী তারপর বেদের ব্যাখ্যা শুরু করেন। কী শব্দবিন্যাস ও ভাবপূর্ণ শ্লোক! এদিকে ঠাকুর্দা হাপুস নয়নে কাঁদছেন আর রুদ্ধকণ্ঠে শোকব্যঞ্জক উঁহু উঁহু করছেন। এমন সময় শিরিশবাবু এসে পড়লেন। তিনি স্বামীজীর ব্যঙ্গ দেখে হেসে ফেললেন। স্বামীজী শিরিশবাবুকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন, কারণ তিনি তখন ঠাকুর্দাকে বেদ শুনাচ্ছেন। শিরিশচন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়ে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। এদিকে গেঁজেল ঠাকুর্দা বেদপাঠ শুনে কেঁদে ভাসাতে লাগলেন।[৪]

আবার একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে গিরিশবাবু ও স্বামীজী খেতে বসেছেন পাশাপাশি। সে সময়টা গরমের সময় বলে বলরামবাবু প্রচুর পাকা আমের ব্যবস্থা করেছিলেন। আম এলো; যত আম গিরিশবাবুর পাতে দিচ্ছে সবগুলি বেশ মিষ্টি আর স্বামীজীর পাতে যত দিচ্ছে সবই টক। এতে স্বামীজী চটে গিয়ে গিরিশবাবুকে বললেন—"জি. সি., আপনার পাতে যত মিষ্টি আম আর আমার পাতে যত টক; আপনি নিশ্চয়ই বাড়ীর ভেতর গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছেন।" গিরিশবাবুও বাইরে গাম্ভীর্য রক্ষা করে উত্তর দেন "আমরা গৃহী, সংসারী—আমরাই তো মজা মারবো।

তুমি সন্ন্যাসী, ফকির—পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তোমাদের কপালে তো খুঁটকো, টোকো আম জুটবেই।"

গিরিশবাবু বলতেন—ঝগড়া করে এমন সুখ কারও সঙ্গে হয় না। সে ঝগড়া যে কত আনন্দের, কত মিষ্টি![৫]

এমনি কত ঘটনা জানত অজানত ঘটে গেছে, যার সঠিক বিবরণ-সংগ্রহ হয়নি। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাস্যরস-পরিবেশনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

সাধনভজন করার জন্যে স্বামীজী কাকেও উপবাস করতে দেখলে কৌতুক করে বলতেন—"কিরে! ডালকুত্তা (hound) করছিস্ নাকি?" তিনি ডালকুত্তার গল্প খুব বলতেন। বাল্যকালে তিনি পাড়ার একজনার বাড়ীতে বেড়াতে যান। গিয়ে দেখেন একটা ছেলে একটা নেড়িকুত্তাকে ধরে নারকেল দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে কষে পেটে বেঁধেছে আর দিনান্তে মাত্র একমুঠো ভাত বরাদ্দ করে রেখেছে। কুকুরটার হাড়-পাঁজড়া সব বের হয়ে গেছে। দাঁড়াতে পারছে না, পাগুলো থরথর করে কাঁপছে, গলায় আওয়াজ বেরুচ্ছে না। এই দেখে স্বামীজী কুকুরটাকে এমন করে বেঁধে মারার কারণ জানতে চাইলেন। ছেলেটি গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "একে ডালকুত্তা বানাচ্ছি।" সেই থেকেই স্বামীজী উপবাসী দেখলেই ঐ কৌতুককর কাহিনীর কথা উল্লেখ করে হাসিঠাট্টা করতেন।[৬]

স্বামীজী কৌতুক করে কত লোকের নতুন নতুন নামকরণ করেছেন। যাঁদের তিনি নতুন নাম দিয়ে ভূষিত করেছেন, সে নাম যত বিদ্রূপাত্মক বা হাস্যকরই হোক না কেন, তাঁরা বিদ্রূপ বা ঠাট্টাকে স্বামীজীর আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে সারা জীবন আনন্দের সঙ্গে সে নাম বহন করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছেন। এখানে এরূপ কয়েকটা ঘটনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

যখন স্বামীজী রাজা অজিত সিং-এর রাজ্যে অবস্থান করেন, দেওয়ান সাহেব মুন্সি জগমোহনলাল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একদিন স্বামীজী সকলের সামনে রাজস্থানের বিভিন্ন কাহিনী বলছিলেন টডের 'রাজস্থান' থেকে। স্বামীজী প্রায় মুখস্থ বলে যাচ্ছিলেন সমস্ত ঘটনা। কোন্ রাজা কোন্ বংশীয় এসব শুনতে শুনতে শ্রোতারা বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কোন্ রাজা সূর্যবংশীয়, কোন্ রাজা চন্দ্রবংশীয়, কোন্ রাজা হরিকুলবংশীয় ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। তথায় স্থানীয় একটি মুসলমান গায়ক উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজসভার ধ্রুপদী। খাঁ সাহেব স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। খাঁ সাহেব সহসা স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন—"স্বামীজী, কেউ চন্দ্রবংশীয়, কেউ সূর্যবংশীয়। আমিও তো রাজপুত। তবে আমি কোন্ বংশীয়?" স্বামীজী গাম্ভীর্য- ও হাস্যপূর্ণ মুখে উত্তর করলেন—"খাঁ সাহেব। চন্দ্রবংশীয়, সূর্যবংশীয় এ সব তো পুরানো হয়ে গেছে, তুমি হচ্ছ গিয়ে তারাবংশী।" খাঁ সাহেব ও অন্যান্য সকলে এ তাজা কথা শুনে ঠাট্টা বুঝেও মহানন্দ করতে লাগলেন। খাঁ সাহেব তদবধি নিজেকে তারাবংশী বলেই পরিচয় দিতেন। খাঁ সাহেব গৌরব করে বলতেন—"স্বামীজী আমাকে এ নাম দিয়েছেন, এ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাধি।"[৭]

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে অক্ষয়কুমার সেনের কথা, যাঁকে স্বামীজী আদর করে 'শাঁকচুন্নী' বলে ডাকতেন। পুঁথিকার নিজেকে ধন্যজ্ঞানে 'শাঁকচুন্নী' নামেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আমরা শাঁকচুন্নীর প্রথম পরিচয় পাই—

"নামটী আমার 'শাঁকচুন্নী' কল্পগাছে বাসা
লীলাপুঁথি উক্তি লিখে মিটে যেন আশা॥"[৮]

স্বামীজী পুঁথি পড়ে বলেছেন—"শাঁকচুন্নী is the future apostle for the masses of Bengal. শাঁকচুন্নীর পুঁথি and শাঁকচুন্নী himself must electrify the masses. ধন্য শাঁকচুন্নী, সাবাস্ শাঁকচুন্নী !"

তারপর আমরা স্বামীজীর দক্ষিণ-ভারতীয় শিষ্য আলাসিঙ্গার কথা মনে করতে পারি। অধ্যাপক শ্রীনন্দম্ চক্রবর্তী আলাসিঙ্গা পেরুমল ছিলেন স্বামীজীর বিশিষ্ট শিষ্য ও সহায়ক। এত বড় নামে ডাকা অসুবিধা তাই স্বামীজী অধ্যাপকের একটি সংক্ষিপ্ত ও কৌতুককর নাম দেন—'আচিঙ্গা'। অধ্যাপকের এক কনিষ্ঠ সহোদরও স্বামীজীর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। স্বামীজী আদর করে তাঁকে ডাকতেন আচিঙ্গার ভাই 'চিচিঙ্গা' বলে। চিচিঙ্গা নামে অভিহিত হয়ে তিনি সারা জীবন নিজের পরিচয় 'চিচিঙ্গা' বলেই দিয়ে গেছেন সগর্বে। এতে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।[৯]

শ্রীহরমোহন মিত্র স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির। কোন ঘোর-প্যাঁচ তাঁর হৃদয়ে ছিল না। তাঁকে স্বামীজী আদর করে ডাকতেন 'হারমোনিয়ম' বলে।[১০]

এমনিভাবে তাঁর গুরুভাই ও ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের নিয়েও স্বামীজীর কৌতুককর কাহিনীর অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন শ্রীযুত গিরিশ ঘোষকে স্বামীজী আদর ও কৌতুক করে ডাকতেন জি. সি. বলে। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র হাজরাকে ডাকতেন Thousanda বলে। গঙ্গাধর মহারাজকে Ganges বলে। তাছাড়া রাখাল মহারাজ, যোগেন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ কেউই স্বামীজীর কাছে রেহাই পাননি। ব্যঙ্গকৌতুক ও হাস্যরসের খোরাক যেন প্রতি পদেই স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়াতো আর তিনিও তা নিপুণভাবে প্রকাশ করে রঙ্গরসের হুল্লোড় তুলতে ছাড়তেন না।[১১]

সাধারণলোকদের নিয়েও ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্ত ছিল না। স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী কৌতুকের মাত্রারও তারতম্য হোত। একদিন একজন লোক জাত-বিচারের কথা নিয়ে খুব লম্বা লম্বা কথা বলছিলেন। স্বামীজী অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে শুনছিলেন। শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে না পেরে স্বামীজীও ঠাট্টা শুরু করলেন—"ওহে, তোমাদের তো কাঁচা জাত, একটু ছুঁয়ে দিলেই জাত যায়। আমাদের কি জান—পাকা জাত, উনসত্তিক লোক ছুঁলেও জাত যায় না। আর তোমাদের ছোঁয়ার আগেই জাত গিয়েছে। আমাদের সাধুদের পাকা জাত, ছুঁলে কিছু হয় না, বরং তাকে সে-জাতে করে নেওয়া যায়।" তখন সে লোকটা একেবারে চুপ মেরে যায়।[১২]

মাদ্রাজের ব্রাহ্মণগণ মেননদের জাতিতে শূদ্র বলে মনে করতেন। তাঁদের জাতিবিচার খুব বেশী ছিল। তাঁরা একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা স্বামীজী, আপনি কি জাত? স্বামীজী গম্ভীর হয়ে উত্তর দেন—I belong to king-maker caste. অর্থাৎ যে জাত রাজা সৃষ্টি করে আমি সেই জাতের লোক। স্বামীজীর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা একেবারে নির্বাক্। স্বামীজীকে আর জাতের প্রশ্ন করতে সাহস পাননি তাঁরা। এ ঘটনাটি নিয়ে স্বামীজী খুব কৌতুক করতেন। এমনি আরও কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে স্বামীজীর স্বল্পস্থায়ী অলৌকিক জীবনে।[১৩]

হাল্কা ধরনের হাস্যরস থেকে আরম্ভ করে গম্ভীর ভাবের ব্যঙ্গ কৌতুক বিভিন্ন পরিবেশে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেই তিনি সুনিপুণ কৌতুককারের মতই পরিবেশন করেছেন। যাঁরা স্বামীজীর কৌতুক উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা জীবনভোর সে আনন্দরসে বিভোর হয়ে থেকেছেন। আর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তার কিছুটা পরিবেশন করে হাসির ঢেউ তুলেছেন।

১, ২, ৫, ১২ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : ৩য় খণ্ড : মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৩, ৭, ৯, ১৩ ঐ ২য় খণ্ড ঐ
৪, ৬, ১০, ১১ ঐ ১ম খণ্ড ঐ
৮ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতে প্রিয়জন একদিন হঠাৎ অন্তর্হিত হয় এই ধরার ধূলি থেকে রেখে যায় শুধু স্মৃতি। কত স্নেহ, কত প্রেম, কত প্রীতি, কত কলহাস্যের গুঞ্জরণ—জীবনকে একদিন যা ভরে রেখে দিত! আর একদিন দেখা গেল 'নাই নাই সে পথিক নাই।' সঙ্গে সঙ্গে সে নিয়ে গেছে জীবনের যত সুখ, আনন্দ, বেঁচে থাকবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। বিরাট শূন্যতাবোধ জাগে অন্তরে, নিজেকে মনে হয় অন্তহীন ধূ ধূ মরুভূমিতে একলা পথিক—আশা নেই, ভাষা নেই, নেই জীবনের সেই রঙীন আলোর ইশারা—যে আলো তাকে আকর্ষণ করতো নিত্যনতুন কর্মের পথে। জীবন যেন যন্ত্রচালিত, শুধুমাত্র কর্তব্যের বোঝা বহন করে চলতে থাকে পথিক জীবনের এ-ঘাট থেকে ও ঘাটে।

মনে হয় জীবন অর্থহীন। কাজ কি আর নিরর্থক এ জীবনের বোঝা বয়ে? জীবনের ভার ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রিয়জন যে পথে চলে গেছে সে অসীম রহস্যলোকে ছুটে চলাই তো ভালো!

তমসাচ্ছন্ন মনের ওপর এক সময় এসে পড়ে অপার রহস্যলোকের ওপার থেকে প্রত্যাশার স্বর্ণরশ্মি। ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে একখানি মুখ সে শোকাহত বোবা মনের আকাশে। ডেকে বলে, আমার মৃত্যু নেই; অজর, অমর আমার আত্মা। যাকে তুমি পুড়ে যেতে দেখেছ সে তো রক্তমাংসে গড়া ভঙ্গুর দেহখানি। আমার নিত্যসত্তা ছড়িয়ে আছে ওই অন্তহীন আকাশের নীলিমায়, অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে, সূর্যের আলোকে, চাঁদের হাসিতে। নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে আমার হাসি উচ্ছলিত; ভোরের আলোতে সর্ববিশ্বে আমার প্রকাশ, ফুলের পাপড়িতে আমার আধো ঘুম, আধো জাগরণ, বাতাসে বাতাসে আমার স্বর মর্মরিত, বর্ষার ধারাবর্ষণে আমার বেদনার দীর্ঘশ্বাস!

প্রকৃতিজগতে সে চিরন্তন আত্মার সজীব স্পর্শে রোমাঞ্চ অনুভব করি। প্রীতিবিগলিত-চিত্তে সে নিত্যসত্তাকে জড়াতে চাই নিজ প্রাণের আলিঙ্গনে। কিন্তু কোথায় সেই নিবিড় স্পর্শ? দূরের থেকে দূরে অপসৃত হয়ে যায় সে সত্তা। মর্মবেদনার গভীর গহনে আবার শুরু হয় লক্ষ্যহীন জীবনের অন্তহীন পথ-পরিক্রমা।

এবার আর ভয় নয়। টুকরো টুকরো স্মৃতির মণিকা এসে দগ্ধ মনের ওপর বুলিয়ে দেয় শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। ওই হাসি, ওই গান, ওই স্নেহ, ওই প্রীতি, ফেলে-যাওয়া কত টুকিটাকি সঞ্চয়ের মধ্যে তোমাকে নিত্য আবিষ্কার করি। স্মৃতির ভাণ্ডার নিয়ে বসে যায় বেচাকেনার হাট। স্মৃতির বোঝা দিয়ে ঘর সাজাই, স্মৃতিকে চিরন্তন করে তুলতে চাই কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে।

কিন্তু স্মৃতিরক্ষার সাহায্যেই কী মানবাত্মাকে বন্দী রাখা যায়? আত্মা যে সর্বভারমুক্ত,—নিত্যনতুন জীবনের পথে তার অবিরাম অবিশ্রাম চলাকে রোধ করবে কে?

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

আসলে চলাটাই হল জীবনের একমাত্র ধর্ম, প্রত্যক্ষ সত্য। এই চলার বেগে স্মৃতিও একদিন বিবর্ণ হয়ে ওঠে, কোনও সময় বা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির ঘনান্ধকারে। জীবনের রথচক্র চলে ঘর্ঘর রবে, পুরাতনের সঞ্চয় মাড়িয়ে, নতুনের অভিযানে। আসে জীবনে ব্যর্থতার বেদনা, সার্থকতার আনন্দ। আবর্তিত সে জীবনে মনে হয় পুরাতনের স্মৃতি বুঝি হয়েছে চিরতরে অবলুপ্ত, বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে নবীন জীবনের জয়ধ্বনি।

জীবন স্পর্শকাতর। নবীনের আহ্বান সুরার মত উত্তেজক। সফলতার আনন্দ জীবনকে ঠেলে নিয়ে চলে নিত্য নতুন কর্মের পথে। সাময়িক ভাবে বিস্মৃতি কালো আস্তরণখানি দিয়ে ঢেকে দেয় স্মৃতির মণিমঞ্জুষাকে। তাই বলে বিস্মৃতি কী একেবারে লোপ করে দিতে পারে স্মৃতির স্বর্ণময় ঐশ্বর্যকে?

পারে না। যেহেতু বিস্মৃতি ক্ষণিকের জন্য ভুলে থাকা। স্মৃতি আত্মার সঞ্জীবনীমন্ত্র:

'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে
যে দোলা।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'···

জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার নিত্য দ্বন্দ্বে বিগত প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি মনের পর্দা থেকে কখন সরে যায়—মানুষ হয়ত তা ভালো করে বুঝতে পারে না। কিন্তু জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে মানুষ আবিষ্কার করে বিস্মৃতির রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে বসে স্মৃতি আপন মনে কাজ করে চলেছে, আকর্ষণ করছে মানুষকে এক অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে নবতর চেতনার জগতে। এ ভাবে ফুটে উঠছে পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির ফুল—বেদনার গভীরতর অনুভূতিতে স্পন্দমান, প্রসারিত চেতনায় সমৃদ্ধ।

বর্তমান—কঠিন, কঠোর, কঙ্করময়, বিসর্পিত। শক্তি অপচিত হচ্ছে প্রতিক্ষণে। এই ক্ষয় ও ক্ষতি জীবনকে হয়ত একদিন অচল করে তুলত। কিন্তু পারে না। পারে না, যেহেতু স্মৃতির রসসুধা জীবনের মর্মকোষে বর্তমান থেকে জীবনকে করে রেখেছে সচল। স্মৃতিময় অতীত ছাড়া রুক্ষ বর্তমানের মধ্য দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দেওয়া মানুষের পক্ষে হত অসম্ভব।

স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্বে মানবজীবন ক্ষত-বিক্ষত। সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায়, আনন্দ-বেদনায় নিত্য আবর্তিত মানবজীবনে যদি কোন প্রত্যক্ষ পরম সত্য থাকে সে সত্য—এই দ্বন্দ্ব। যে প্রিয় স্মৃতিকে সমস্ত মন প্রাণ চেতনা দিয়ে সবলে আঁকড়ে ধরতে চাই বহির্জীবনের অন্তহীন জীবনসংগ্রামে, সে স্মৃতিকেই সাময়িকভাবে ভুলে যাই—এর চাইতে জটিল রহস্য জীবনে আর কী আছে? এ রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলেছে মানবসমাজে যুগ থেকে যুগান্তরে। ভোগী নিত্য নতুন ভোগের আয়োজন করে জীবনের চরম উত্তেজনার মধ্যে এ রহস্যকে ভুলতে চেয়েছে, তত্ত্বজ্ঞানী যোগী বৃহত্তর ভাবনা ও চেতনার জগতে খুঁজে পেয়েছে এ জটিল জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর, শিল্পী নিজ সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখে ভুলতে চেয়েছে এ জটিল প্রশ্ন, কর্মী সদা-প্রবহমান কর্মচাঞ্চল্যের স্রোতে ভাসমান হয়ে এড়িয়ে যেতে চায় এ জীবন-সমস্যা। উদ্‌ভ্রান্ত মিষ্টিক কবি এ জটিল প্রশ্নের রহস্যভেদ করতে না পেরে গভীর অন্তর্বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠেন:

'এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী।'

বেদনার্ত মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগে—জীবনের এ গভীরতম রহস্যের সমাধান কোথায়?

মহাপ্লাবন

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

বসেছিনু অন্ধকারে বর্ষানদীতীরে
সমর্পিয়া মনপ্রাণ তটিনীর নীরে ;
ভৈরব ছুটিয়া চলে ডম্বরু বাজায়ে
দুই কূল সঁপি' দেয় ধূর্জটির পায়ে
সকল ঐশ্বর্য তার বছর-সঞ্চিত
দুর্বোধ্য কী এক মন্ত্রে করিয়া মন্ত্রিত
বুঝি তার ভয়ংকর ক্রোধ থামাবারে।
সহসা চঞ্চল মন সেই স্রোতধারে
ছুটে যায় বহে যাহা নীরব কল্লোলে
ফল্গুসম ত্রিসংসারে ; সুমহান রোলে
প্লাবন আসিলে তাহে কারা ভাগ্যবান
তার দুই কূল হয়ে করে অর্ঘ্য দান।
সেদিন আসিলে মোরে সেথায় আনিও
পূজার সে মন্ত্র প্রভু শিখাইয়া দিও।

প্রভুর জন্মদিনে

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

তব, মন্দির-দ্বারে পঁহুছিতে যেই
পারেনি হে মোর প্রভু,
অন্তর মাঝে দেখেছে তোমারি রূপ,
আকুলিতমন-পুষ্পাঞ্জলি
দিয়েছে চরণে তবু,
জ্বালায়ে দিয়েছে বেদনার দীপ ধূপ !
উৎসব-বাঁশী শুনেছে নিভৃত প্রাণে,
ভরেছে হৃদয় তব দক্ষিণ দানে।
অমল আলোকে দূরে সরে গেছে
ভ্রান্তি-আঁধার যবে
রাজাধিরাজের জন্মোৎসবে
মিলেছে সে অনুভবে।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ-প্রণীত, শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৬।৪, গ্রে স্ট্রীট (অরবিন্দ সরণি), কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত: পৃষ্ঠা ৮৭৬+৬২; মূল্য ২৫'০ টাকা।

প্রথম সমুদ্রদর্শনের বিস্ময় অন্তরে বহন করিয়াই এই পঞ্চসহস্রাধিকশ্লোকযুক্ত মহাগ্রন্থখানি পাঠ করিলাম—আদিতে বিস্ময়, মধ্যে বিস্ময়, অন্তে বিস্ময়। পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী-বিষয়ক স্তবাবলী সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের প্রধানতম বাহক সংস্কৃত ভাষার পোষকতায় স্বামীজী ছিলেন সকলের অগ্রণী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইতেছে; আশা করা যায়, ইহার আকর-গ্রন্থগুলি অচিরকাল মধ্যে সংস্কৃত ভাষায়ও অনূদিত হইবে। স্বাধীনচিন্তাধারা-সংবলিত মৌলিক সংস্কৃত রচনাও যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে এই মহাগ্রন্থখানি।

গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী এবং শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষীর শুভেচ্ছা-ভূষিত।

শ্রীমদ্ভাগবত কেবল শ্রীভগবানের লীলা-বিবৃতি নহে; নানাকল্মষোপহত জীবোদ্ধারেই ইহার তাৎপর্য। বর্তমান গ্রন্থকারও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবর্ণনার মধ্য দিয়া এই মহাজীবনের কলিকলুষনাশনরূপ গূঢ় তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কি কামারপুকুর-লীলা, কি দক্ষিণেশ্বর-লীলা, কি কাশীপুর-লীলা—সর্বলীলারই একমাত্র জীবের চৈতন্যবিধানে পর্যবসান। সুতরাং ভক্ত পাঠকগোষ্ঠীর নিকট এই গ্রন্থের আকর্ষণ সহজেই অনুমেয়। ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তসমুজ্জ্বল এই নব-ভাগবতখানি শ্রীমদ্ভাগবতের মতই নিত্য পঠিত, পাঠিত ও প্রচলিত ধারায় অনুশীলিত হইবার যোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে প্রয়োজন আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দেশ প্রভৃতি—ইহা চিরাচরিত রীতি। প্রারিপ্সিত গ্রন্থের নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তিকাম গ্রন্থকার তাঁহার অন্তর্যামী পরমেষ্ট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইতেছেন:

> শ্রীরামকৃষ্ণবচসাং ন হি তুলাস্তি
> শ্রীরামকৃষ্ণমনসাম ভয়ং সদৈব।
> শ্রীরামকৃষ্ণ-ভগবানখিলার্থদাতা
> শ্রীরামকৃষ্ণপদমেব গতির্মমাস্তু॥

ভক্তের আকুতি এত মর্মস্পর্শী যে বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন হয় না, আবার বলিতেছেন:

> শ্রীরামকৃষ্ণস্য কথাপ্রসক্তিনঃ
> স্বামিপ্রধানা জনদুঃখমোচকাঃ।
> তদীয়পাদাম্বুজধূলিধূসরং
> কদা ভবেদস্য শিরোহধমস্য মে॥

—'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই যাঁহাদের নিত্য আলোচ্য বিষয়, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ রহিয়াছেন; জনগণের আর্তিহরণই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কত-দিনে আমার মস্তক ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইবে!' গ্রন্থকার আট বৎসর বয়সে আপন পিতার সহিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি আপনার কে—আপনার পিতা, জ্যেষ্ঠতাত অথবা খুল্লতাত?' তখন তাঁহার পিতৃদেব বলিয়াছিলেন:

* * * * * * সর্বেষাং নঃ পিতা হ্যয়ম্।
যথাকাশস্থিতশ্চন্দ্রঃ সর্বেষাং মাতুলো ভবেৎ॥
তথা শ্রীরামকৃষ্ণোঽয়ং ভগবান্ জগতঃ পিতা।
বৈকুণ্ঠাদবতীর্ণোঽত্র জনমঙ্গলহেতবে॥

—'ইনি আমাদের সকলের পিতা। আকাশে যখন চন্দ্র উদিত হন তখন তিনি সকলেরই মাতুল হন—সকলেই বলে চাঁদা মামা; সেইরূপ ইনিও আমাদের সকলের পরমাত্মীয়। জগতের মঙ্গলের জন্য জগৎপিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠ হইতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' সেই স্মৃতিচারণের ফলস্বরূপ দীর্ঘানুধ্যানসঞ্জাত এই কবিকৃতি!

লেখক কবিযশঃপ্রার্থী নন; অর্থাগমেও তাঁহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। আপন অন্তঃকরণের বিশুদ্ধিসম্পাদনের জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘুণ নামক কীট কাষ্ঠ-দংশন করিতে করিতে আকস্মিকভাবে যেমন দুই-একটি বর্ণ সৃষ্টি করে, সেইরূপ তাঁহার রচনায়ও অজ্ঞাতসারে কিছু ভাল কথা থাকিতে পারে। তাহাতে ভক্তজনের আনন্দ হইলেই লেখকের পরম সৌভাগ্য:

নাহং কবিযশঃপ্রার্থী ন মে চার্থাগমে স্পৃহা।
আত্মসংশোধনার্থায় মমায়ং পরমোত্তমঃ॥
ঘুণাক্ষরমিব তেন যদি কস্যাপি বা ভবেৎ।
স্বল্পানন্দো মমৈবাসৌ সৌভাগ্যোদয় উত্তমঃ॥

দক্ষিণেশ্বর-লীলায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজক। অত্যাশ্চর্য অভূতপূর্ব এই পূজা! দিব্যভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার বর্ণনব্যপদেশে লেখক বলিতেছেন:

আত্মবিস্মৃতভাবোঽয়ং ন কুত্রাপ্যক্ষিগোচরঃ।
নেয়ং পূজা পূজকস্য স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

—পূজকের এই পূজা সাধারণ পূজামাত্র নয়, ইহা তাঁহার আত্মস্বরূপে অবস্থান! এই লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সাধনমার্গে অবস্থিতিও অসাধারণ নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সাধকপ্রবর অদ্বৈতবেদান্তী সন্ন্যাসী তোতাপুরী শক্তিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবশ্য বর্তমান গ্রন্থকার এই ঘটনাটিকে অনবদ্য কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন।

লেখক স্থানে স্থানে সংস্কৃত গদ্যেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের একটি অনুপম সুবিদিত ঘটনা নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিধৃত: —আদৌ শ্রীবৈদ্যনাথধাম গত্বা তত্রস্থক্ষুধাতুর-ধৃতকঙ্কালমাত্রদেহ-দরিদ্রদর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয়ো দরিদ্রদেবতা দরিদ্রসেবার্থং ··· মথুরানাথমুক্তবান্—ভো মথুর! কেবলমেকদিনমেতেষাং ভক্ষ্যদানেনোদরং পরিপূরয়। দদস্ব প্রচুরতরং তৈলং মস্তকেষু। তথা ··· পরিধেয়বস্ত্রমপি প্রযচ্ছ। এবং ভগবতোঽমৃতায়মানবচাংসি শ্রুত্বাপি বারাণসীযাত্রাসমুৎসুকো মথুরো বারাণস্যামেব দরিদ্রভোজনাদিব্যবস্থা বিধেয়েতি সাগ্রহমুক্তবান্। শ্রুত্বৈবং দরিদ্রপরমদেবতা সরোষমবদৎ। নাহং যাস্যামি বারাণস্যাম্, এভিরেবাত্র বসামি। দরিদ্রাণামেষাং নাস্তি কিং কোঽপি দাতা? ততো মথুরেণ দরিদ্রান্তর্গতং ভগবন্তমবলোক্য সদ্যস্তদাজ্ঞাপূরণে কৃতে ঠাকুর ঈশদ্ধাস্যপুরঃসরং পরমানন্দমবাপ।—অনুবাদের সাহায্য ছাড়াও করুণাবিগলিতমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে পাঠক সহজেই এখানে চিনিয়া লইতে পারিবেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীমা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-পুষ্টির সহায়িকারূপে, নিখিলমাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি-রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন; অবশ্য এই বৃহদায়তন গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার বিস্তৃততর রূপায়ণ ভক্তগণ স্বতই

আকাঙ্ক্ষা করেন। কাব্যখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'অখণ্ডের ঘর' শ্রীনরেন্দ্রনাথসান্নিধ্যে আমরা পরিতৃপ্ত; তবে 'রাখাল', 'বাবুরাম', 'শরৎ', 'শশী,' 'লাটু'—ইঁহাদের এবং আরও অনেকের সঙ্গে কেবল প্রাসঙ্গিক পরিচয়ে ভক্তচিত্ত উৎসাহিত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণের পূর্বে শ্রীনরেন্দ্রনাথের নিকট আপন দিব্যস্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনের ছায়া সুস্পষ্ট। ইহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে ইহা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য কয়েক স্থলেও এই ধরনের পুরাণানুরূপ বর্ণনা আছে, যাহা প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে নাই। তবুও রসবিচারে এগুলির মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। যেমন, শ্রীনরেন্দ্রনাথ পরম আকুতি সহকারে তাঁহার আরাধ্যদেবকে স্তবভঙ্গীতে বলিতেছেন :

> ক্বাহং মহামূর্খতমো দুরাত্মা
> শিক্ষাপি দীক্ষা ন চ মে কথঞ্চিৎ।
> সৎকর্ম-সদ্ভাব-পুপুণ্যলভ্যো
> ত্বৎপাদপদ্মে ন রতির্মমাস্তি ॥
> ইত্থং সুদুষ্টাশয়দুষ্টজীবে
> তবানুকম্পা বিমলা বিশিষ্টা।
> ন শোভতে দেব যথা ভুজঙ্গে
> দত্তং পয়স্তৎ গরলং বহু স্যাৎ ॥
> জ্ঞাত্বা ন তে রূপমরূপমাদ্যং
> সদা সদানন্দময়ং বরেণ্যং
> অনন্তকল্যাণগুণাত্মকস্য
> মন্যে পুরা প্রাকৃতবিগ্রহং ত্বম্ ॥

গ্রন্থখানির প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোক বঙ্গভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। উভয় অনুবাদই সুপাঠ্য হইয়াছে মনে করি। সর্ব-শ্রেণীর পাঠকের নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। তবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সুপণ্ডিত গ্রন্থ-কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতম্ কথাটির 'ব' অন্তঃস্থ; অথচ ইংরেজীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam-রূপে—'b'-এর পরিবর্তে 'v' হওয়া উচিত ছিল। আগন্ত সংস্কৃত শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, অথচ কোথাও বর্গীয় ব (ৰ) এবং অন্তঃস্থ ব (ব)-এর পার্থক্য দর্শিত হয় নাই। ইহা অনেকের নিকট ত্রুটি বলিয়াই বিবেচিত হইবে। সাধারণ বর্ণাশুদ্ধিও একেবারে অপ্রচুর নহে। অশেষগুণসন্নিপাতে এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্য হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না, তবুও আগামী সংস্করণে ইহারা পরিহৃত হইলে ভক্ত পাঠকদের যেমন উপকার হইবে তেমনি সপ্তাশীতি-বর্ষবয়স্ক গ্রন্থকারের সাধনাও সর্বাংশে সফল হইবে মনে করি। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

উপনিষৎপ্রদীপম্ (ঈশোপনিষদ্ভাষ্যম্) —ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪১+৪; মূল্য ২·৫০।

উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যালাভে অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। ভারতের অধ্যাত্ম-জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদ্গুলির মধ্যে ঈশোপনিষদের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আচার্যগণ তাঁহাদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ উপনিষদ্গুলির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদী শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্যই সর্বাধিক প্রচলিত।

'উপনিষৎপ্রদীপম্' গ্রন্থখানি ঈশোপনিষদের শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য-মতানুসারী ভাষ্য। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতে স্বাভাবিক ভেদাভেদ বা স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয়—জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ এবং তাহাদের স্থিতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি ব্রহ্মের অধীন। এই মতে জীবজগৎকে সত্য বলিয়া ধরা হয় এবং মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্ব থাকে।

আলোচ্য গ্রন্থে ঈশোপনিষদের মূল মন্ত্রগুলি, তাহাদের শব্দার্থ সহিত অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'উপনিষৎপ্রদীপম্'-ভাষ্য ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং পাদটীকায় বিভিন্ন দার্শনিক পরিভাষার তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের সংস্কৃতভাষ্য-রচনায় পাণ্ডিত্য ও পরমতখণ্ডনের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের নামকরণটিও তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক। সুধীসমাজে পুস্তকখানির যোগ্য সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: রামকৃষ্ণ মিশনের মেদিনীপুর ও কাঁথি আশ্রমের তত্ত্বাবধানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি প্রাথমিক এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ জানুআরি মাসের মধ্যে মেরামত করা হইয়াছে। শিশুদের ২৮৩টি পোশাক এবং ২,৩৬০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত ফেব্রুআরি, ১৯৬৯, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যসমূহ:

গুঁড়া দুধ ১,৭৩৭ কেজি, বেবি-ফুড ৫৫ টিন, সুপ-মিক্সচার ৪৪ টিন, বাসনপত্র ২৭৭টি, কৃষি-সরঞ্জাম ৪১১টি, কম্বল ১১৮ খানি, ধুতি ও শাড়ী ৩৪ খানি, জামা ইত্যাদি ২৭৬টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৭৫০। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৩,২৩৪। ৩০০ জনের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হয়।

১১টি স্কুলে এবং ২টি কলেজে 'বুক-ব্যাঙ্ক' খুলিবার জন্য যথাক্রমে ৪,৪৮১ খানি পাঠ্যপুস্তক এবং ৭২টি তথ্য-পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

দুঃস্থদের জন্য ৯০টি কুটির নির্মিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—(পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া): এই কেন্দ্রের ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সারদাপীঠ এবং ইহার প্রথম ইউনিট বিদ্যামন্দিরের ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সারদাপীঠের বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলির ছাত্রগণ সম্মিলিতভাবে তত্ত্বমন্দিরে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা করিয়াছিল।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবাকার্যে সারদাপীঠ অংশ গ্রহণ করে এবং সেবাকার্যের জন্য কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে এবার সারদাপীঠে প্রথম সমাবর্তন-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সারদাপীঠের কৃতকার্য ছাত্রগণকে বি.এ, বি.এসসি, বি.টি ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

বিদ্যামন্দির: এই আবাসিক ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২১ ও ৩৬৫। ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছিল। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যচর্চা এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

শিক্ষণমন্দির: ইহা আবাসিক মহাবিদ্যালয়। এখানে বি.টি. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২১ ও ১৩২। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ১২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১৮ জন ডিগ্রী লাভ করেন, তন্মধ্যে ৫ জন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিলেন।

শিল্পমন্দির: সরকার অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিকাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমা-কোর্সে শিক্ষাদানকার্য পরিচালিত হয়। বিভিন্ন বিভাগে বর্ষদ্বয়ে ৬৩৮ ও ৫১৬ জন শিক্ষা লাভ করে। শিল্পমন্দির-ছাত্রাবাসে দুই বৎসরে ১২১ ও ৯০ জন ছাত্র ছিল। শিল্পমন্দিরের ডিপ্লোমা-পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

শিল্পায়তন: ১৪ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক

বালকদের জন্য জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮ জন ছাত্র লইয়া ইহা খোলা হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২৪ ও ১১৪। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৪৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ জন প্রথম বিভাগে এবং একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

শিল্পবিদ্যালয়: এখানে বৈদ্যুতিক কাজ, টার্নিং, ফিটিং, কার্পেনট্রি, টেলারিং, তাঁতের কাজ প্রভৃতি শিখানো হয়। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৮০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৫৫ জনের মধ্যে ৫৩ জন উত্তীর্ণ হয়।

জনশিক্ষামন্দির: ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ইহার লক্ষ্য। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯টি নৈশ বিদ্যালয়ে ৩৩০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়; ১০২টি শিক্ষা- ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়, মোট ৪৩,৩৭০ জন যোগদান করে। প্রধান গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ইউনিটের মাধ্যমে ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে বিনা-চাঁদায় জনসাধারণকে ২৫,১৯৯ খানি বই পড়িতে দেওয়া হয়; ২০০ জন শিশুকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হইয়াছিল। জনশিক্ষা-মন্দিরের আরও অনেক কাজ আছে, তন্মধ্যে যুবকগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্বমন্দির: এখানে সাধুব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়মিত শাস্ত্রক্লাস ও জনসাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব ও অন্যান্য সংবাদ

রাঁচি: মোরাবাদী রাঁচি মিশন আশ্রমে গত ১৬ই মার্চ, ১৯৬৯, স্বামী আদিনাথানন্দজী সমাজসেবায় যুব-সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করিবার জন্য পরিকল্পিত 'দিব্যায়ন' শিক্ষায়তনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

চণ্ডীগড়: গত ১লা মার্চ, ১৯৬৯ চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের উদ্বোধনী সভায় হরিয়ানার গভর্নর শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন।

চেরাপুঞ্জী: গত ২২শে মার্চ চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক উৎসবসভায় আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের গভর্নর শ্রী বি. কে. নেহরু পৌরোহিত্য করেন।

বেলঘরিয়া: গত ২৬শে মার্চ বেলঘরিয়াস্থিত কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমে প্রতিমায় শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা মহানন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিন আশ্রমে দেড় শতাধিক সাধুসমাগম হইয়াছিল। আড়াই হাজারেরও অধিক নরনারী বসিয়া অন্ন-প্রসাদ পাইয়াছেন। স্থানীয় দুঃস্থগণের মধ্যে ১০৮ খানি শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গত ৯ই হইতে ১২ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়।

৯ই মার্চ ধর্মসভায় টাটা কারখানার জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী পি. অনন্ত (সভাপতি) ইংরেজীতে, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ডঃ সত্যদেব ওঝা হিন্দীতে এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ প্রত্যহ সকাল ৯টায় আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত ১১টি (৫টি উচ্চ মাধ্যমিক, ৪টি মাধ্যমিক ও ২টি উচ্চ প্রাথমিক)

বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়; প্রথম দিন ৩টির, দ্বিতীয় দিন ৪টির ও তৃতীয় দিন ৪টির। প্রতিদিনই বিদ্যালয়গুলির ব্যাণ্ডপার্টি সমাগতদের সংবর্ধিত করে। ১০ই মার্চ সভাপতিত্ব করেন টাটা কোম্পানীর ডাইরেক্টর শ্রী আর. এস. পাণ্ডে, পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী এস. এন. মাথুর। ১১ই মার্চ সভাপতিত্ব করেন ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানীর ডাইরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জে. জি. কেসোয়ানি, পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী সীতা কেসোয়ানি এবং ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। ১২ই মার্চ টাটা কোম্পানীর শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা শ্রী বি. এন. সাক্সেনা সভাপতিত্ব করেন, সিংভূম জেলা বিদ্যালয়-নিরীক্ষিকা কুমারী ই. সিতমে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

কামারপুকুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়-গুলিতে গত ২৮শে ফেব্রুআরি ও ১লা মার্চ দুইদিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বীতশোকানন্দজী; এইদিন তিনি বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দজী। এই দিনের সভায় প্রধানশিক্ষক ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য, বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী অদ্বয়ানন্দজী ও বিশিষ্ট অতিথিদ্বয় স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানশেষে রাত্রে ছাত্রবৃন্দের দ্বারা 'রাণাপ্রতাপ' অভিনীত হয়।

কাঁথি: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মোৎসব গত ১৮ই ফেব্রুআরি এবং ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিন পূজা-পাঠাদি, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুআরি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। অপরাহ্নে কইপুর শ্রীগুরু আশ্রম কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি সঙ্গীতে পরিবেশিত হয়। পরে ধর্মসভায় শ্রীঅশোকমোহন রায় (সভাপতি), স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

১লা মার্চ সকালে রহড়া বালকাশ্রমের বিদ্যার্থিগণ রামনামকীর্তন করেন। এই সভায় অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্য (সভাপতি), স্বামী মুমুক্ষানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

২রা মার্চ দ্বিপ্রহরে প্রায় সাতহাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীসরোজ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করিবার পর আয়োজিত সভায় স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন স্বামী বিশ্ব-দেবানন্দ, শ্রীবিমলচন্দ্র মৈত্র এবং স্বামী মুমুক্ষানন্দ। সভান্তে সভাপতি মহারাজ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির পুরস্কার বিতরণ করেন।

আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী আপ্তকামানন্দ প্রতিদিনই সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৮শে ফেব্রুআরি ও ১লা মার্চ আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক দুটি নাটক অভিনীত হয়। ২রা মার্চ সন্ধ্যায় 'স্বামীজী' সবাকচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

৩রা ও ৪ঠা মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীবঙ্কিম দাস শ্রীচৈতন্যলীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

স্বামী যোগীন্দ্রানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৯ বেলা সাড়ে বারোটার সময় করোনারী থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হইয়া স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (শিবতোষ মহারাজ) বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বোম্বাই ও সোনার গাঁ আশ্রমে, দেওঘর বিদ্যাপীঠে এবং বারাণসী সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিয়াছেন। তিনি কর্মঠ এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। মধুর ও ত্যাগপূত স্বভাবের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

কুচবিহার: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭শে মার্চ বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা এবং ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ; তিনি ২৫শে মার্চ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিন আশ্রমে ছিলেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীমূর্তির অধিবাস এবং পরদিন মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি করেন স্বামী শর্মানন্দ। ২৭শে সকালে হরিনাম-সঙ্কীর্তন সহ মন্দির-প্রদক্ষিণের পর মূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়; তিনদিনই স্বামী সৌম্যানন্দ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী বীতশোকানন্দ ভাষণ দেন। ইঁহারা দুইজন ছাড়া ভাষণ দেন প্রথম দিন স্বামী ইজ্যানন্দ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মসচিব ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ অসুস্থতা-নিবন্ধন কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে থাকায় উৎসবে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হন; সভার উদ্বোধনী ভাষণে আশ্রমের সভাপতি শ্রীঅংশুমান দাশগুপ্ত দুঃখের সহিত সেকথা জানান।

উৎসবের কয়দিন বহু সন্ন্যাসীর, বিশেষ করিয়া স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের উপস্থিতি আশ্রমকে আনন্দমুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লালমণিরহাটে এই আশ্রমটির প্রথম পত্তন হয়। দেশ-বিভাগের পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে আশ্রমটিকে উঠাইয়া ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনে কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের জন্মতিথিতে বর্তমান মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন এবং ঐ বৎসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিনে

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর পটে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

নিম্নলিখিত আশ্রমগুলিতে পূজা, পাঠ, ভজন ও সভাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে:

ফুলেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাতীর্থে গত ১৮ই ফেব্রুআরি পূজাদি ও দুই হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২২শে ফেব্রুআরি বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), মহকুমাশাসক শ্রীনিখিলরঞ্জন দাস (প্রধান অতিথ), অধ্যক্ষ শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীশ্যামল বিশ্বাস। সভার প্রারম্ভে সারদাতীর্থের কর্মসচিব আশ্রমের গত বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় সাতহাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে শিবপুর রামকৃষ্ণ-মন্দির কর্তৃক 'সাধক রামপ্রসাদ' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলী: হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘে গত ১৮ হইতে ২৩শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৮ই তারিখ দুপুরে প্রসাদবিতরণ এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ-গান ও শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকথা পরিবেশিত হয়। ১৯, ২০, ও ২১শে তারিখ ভজন ও লীলাকীর্তন হয়। ২২শে ও ২৩শে সভা হইয়াছিল। ২২ তারিখ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী ভাস্করানন্দ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি, বসু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা করেন। সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় ছায়াচিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন প্রদর্শিত হয়। ২৩শে তারিখ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা-জজ শ্রীনির্মলচন্দ্র দত্ত এবং পারিতোষিক বিতরণ করেন ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী। বিচিত্রানুষ্ঠান ও শ্রীমদ্ভাগবতপাঠান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

নাটশাল: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ২রা মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রথম দিন পাঁচশতাধিক ও দ্বিতীয় দিন তেরো হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় যাত্রাভিনয় হয়।

২রা মার্চ সন্ধ্যায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রাত্রে গেঁয়খালি তরুণ সংঘ কর্তৃক 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' থিয়েটার অভিনীত হয়।

বেলাড়া: বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকালে প্রভাতফেরী, এবং মধ্যাহ্নে প্রায় বারো হাজার নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্থানীয় মহকুমাশাসক শ্রীনিখিলরঞ্জন দাস (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাশঘোষ। সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও 'ভক্ত প্রহ্লাদ' ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হয়।

দিল্লী: সরোজিনী নগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে ২৩শে ফেব্রুআরি ও ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৩শে ফেব্রুআরি রবিবার ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ও ইংরেজীতে রচনা-প্রতিযোগিতা

হয়। বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন, ৬৮ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৮ই মার্চ সন্ধ্যায় ভারত-সেবক সমাজপ্রাঙ্গণে স্বামী ব্যোমানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। ভারত সরকারের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা শ্রীসুধাংশুকুমার সাহা বাংলায় বলেন। সভাপতি মহারাজ ভাষণান্তে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চাকদহ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব চারিপ্রহর-ব্যাপী রামকৃষ্ণনামকীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই মার্চ বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী বীতশোকানন্দ (সভাপতি) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন।

১৬ই মার্চ দুপুরে চারি হাজারের বেশী ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় শ্রীগুরু সংঘ কর্তৃক 'নিমাইসন্ন্যাস' পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

রূপনারায়ণপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে গত ১৬ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজান্তে জাতিধর্মনির্বিশেষে তিন সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে পূজা করেন স্বামী নিষ্ঠানন্দ। জনসভায় বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। আলোচনা করেন হিন্দুস্থান কেবলস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীআই. কে. গুপ্ত (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (প্রধান অতিথি), কেবলস্-এর ওয়ার্কস ম্যানেজার, পরিষদের সভাপতি শ্রীএস্. পি. ব্যানার্জি প্রভৃতি।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ): শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২ ও ২৩ তারিখ ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রী বি. আর. বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী সুখদানন্দ; বক্তৃতা করেন, সেখ আনেশ আলী, -শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ২৪ তারিখ কীর্তন, নরনারায়ণ-সেবা ও 'হরিশ্চন্দ্র' যাত্রাভিনয় হয়।

চণ্ডীবালা সেনের পরলোকপ্রাপ্তি

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-প্রণেতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ও গৃহী ভক্ত ৺অক্ষয়কুমার সেনের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ চণ্ডীবালা সেন ছিলেন শ্রীশ্রীসারদামাতার মন্ত্র-শিষ্যা। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি দীক্ষালাভ করেন। ৮১ বৎসর বয়সে তিনি নিজ শ্বশুরালয় ময়নাপুরে ১৩ই পৌষ রবিবার, ১৩৭৫ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। প্রার্থনা করি শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত ফাল্গুন, ১৩৭৫ সংখ্যায় ৭৫ পৃষ্ঠা, ২য় কলমের ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ৩০ লাইনে, এবং ৭৬ পৃষ্ঠা, ১ম কলমের ২ ও ১০ লাইনে 'দ্রৌপদী' স্থলে 'সুভদ্রা' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২

(সকামকর্মের পথে, প্রবৃত্তিমার্গেতে শুধু
ইহ-পর-লোকে হয় ভোগেরই উপায় ;
সে-পথ বন্ধন আনে জন্ম-মৃত্যু-আবর্তনে,
আকীর্ণ তা মরণের ভীতির ছায়ায়।
নিবৃত্তির পথে, ত্যাগ-পথে হয় মুক্তিলাভ,
অমৃত-আনন্দ-লাভ,—সে পথ অভয়।)
যে-বুদ্ধিতে স্পষ্ট হয় ত্যাগ ও ভোগের মর্ম,
কর্তব্য ও অকর্তব্যে থাকে না সংশয়,
বোঝা যায় কোন্ পথ ভয় ও বন্ধন আনে,
অভয় ও মুক্তি লাভ কোন্ পথে থাকি,—
(চলার পথের 'পরে বিমল আলোকবর্ষী
সুবিপুল প্রভাময়) সে বুদ্ধি 'সাত্ত্বিকী' ॥
যে-বুদ্ধিতে ধর্মাধর্ম, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মর্ম,
কর্তব্য ও অকর্তব্য সব পরিজ্ঞাত
অস্পষ্টভাবেতে হয়, যথাযথভাবে নয়,—
'রাজসী' বলিয়া, পার্থ, সেই বুদ্ধি খ্যাত ॥
তমসার আবরণে অনুজ্জ্বল যেই বুদ্ধি,
অধর্মেরে ধর্ম বলি' বোঝাতে যা চায়,—
'তামসী' তাহার নাম—সর্ববিষয়েই তাহা
সর্বদাই বিপরীত জ্ঞানে নিয়ে যায় ॥

যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮শ অধ্যায়

(সংযম ও একাগ্রতা প্রথম সাধনকালে
মনে হয় যেন দুঃখদায়ী বিষসম !
সেই প্রচেষ্টারই ফলে পরিণামে আসে কিন্তু
উচ্চতর জীবনের সুখ অনুপম।
ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে অসংযত ভোগসুখ
প্রথমেতে অতিশয় প্রিয় বোধ হয়,
সে-ভোগের পরিণাম সর্বদাই হয় কিন্তু
দুবিষহ অশান্তি ও দুঃখের নিলয়।)
অগ্রে যাহা বিষবৎ, তবু পরিণাম যার
মধুবর্ষী, শান্তিময়, অমৃত-উপম,—
আপন স্বরূপবোধ-, সত্যজ্ঞান সমুদ্ভূত
সে-সুখ 'সাত্ত্বিক' সুখ, সে-সুখই উত্তম ॥
ইন্দ্রিয়ের সনে যুক্ত বিষয় সম্ভোগ কালে
যে সুখ-পরশ লাগে অমৃত-সরস,
যে-সুখের পরিণাম অসীম বেদনাময়,
হলাহল-দাহ সম,—সে সুখ 'রাজস' ॥
নিদ্রায় আলস্যে আর প্রমাদেতে যেই সুখ,
সেই সুখ আগে পরে সকল সময়
মোহাচ্ছন্ন করে প্রাণে, বিপুল জড়তা আনে
দেহ-মনে,—'তামস' সে-সুখেরেই কয় ॥

পরলোকে ডক্টর জাকির হোসেন

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ৩রা মে, ১৯৬৯, বেলা ১১টা ২০ মিনিটের সময় ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

জীবনাবসানের কয়েক মিনিট পূর্ব পর্যন্তও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, যথানিয়মে কাজ করিতেছিলেন। নিয়মমাফিক তাঁহার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ১১টার পর ডাক্তারগণ আসেন। তাঁহাদের বসিতে বলিয়া ১১-১৫ মিনিটের সময় তিনি বাথরুমে যান; সেখানেই সহসা হৃদ্‌রোগের আক্রমণে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান এবং উহাতেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। কুড়িমিনিট পরেও তিনি যখন বাথরুম হইতে বাহির হইলেন না, তখন ডাক্তারগণ উদ্বিগ্ন হইয়া সেখানে যাইয়া তাঁহাকে মৃত অবস্থায় শায়িত দেখিতে পান। তখনই বাহিরে আনিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রকে পুনরায় সচল করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন। অন্যান্য ডাক্তারকেও খবর দিয়া আনা হয়। বহু চেষ্টাতেও কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না। ১১-৫৫ মিনিটের সময় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে মৃত বলিয়া বিবৃতি দেন।

গত ৫ই মে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার কর্মজীবনের প্রথম ক্ষেত্র, তাঁহার প্রিয় 'জামিয়া মিলিয়া'তে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়; 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'-বিদ্যায়তন-সংলগ্ন চারি একর পরিমিত এই সমাধিস্থানটি চারিজন হিন্দু সানন্দে দান করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে জাতি একজন সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত, মানবতাবাদী, উদারহৃদয় দেশসেবককে হারাইল।

ডক্টর জাকির হোসেন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে খুব বেশীদিন জড়িত ছিলেন না; তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়াছে শিক্ষাব্রতে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুআরি হায়দ্রাবাদে এক মধ্যবিত্ত পাঠান পরিবারে জাকির হোসেন জন্মগ্রহণ করেন; এই পরিবারের পৈতৃক ভিটা উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার কইমগঞ্জে। তাঁহার পিতা আইনজীবী ছিলেন। তাঁহার আট বৎসর বয়সের সময় পিতা সপরিবারে মধ্যপ্রদেশের এটোয়া শহরে চলিয়া আসেন। এখানে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া জাকির হোসেন আলিগড়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। আদর্শচরিত্র ছাত্রহিসাবে এখানে অল্প-দিনেই তিনি ছাত্রমহলে সুপরিচিত হন।

অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করিবার পর আইন পড়িবার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়া তিনি কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সমন্বিত করিয়া 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' নামে একটি নূতন ধরনের বিদ্যায়তন স্থাপনে সহায়তা করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে যাইয়া তিনি আবার পড়াশুনা শুরু করেন এবং চার বৎসর পরে অর্থনীতিতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

বার্লিন হইতে ফিরিবার পর ১৯২৬ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'র উপাচার্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে ২২ বছরের সাধনায় তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হইয়া উঠেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে ইহার নবরূপায়ণ-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৬ হইতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইউনেসকো-র কার্যনির্বাহক বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তিনি প্রথম প্রবেশ করেন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে; জহরলাল নেহেরু তাঁহাকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করিয়া আনেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহারের রাজ্য-পালের এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে এই আসন অলঙ্কৃত করেন। রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার প্রথম বাণী, 'ভারতই আমার স্বদেশ। জনগণই আমার পরিবার।'

রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি ১৯৬৭-র জুন মাসে কানাডা, ১৯৬৮-র জুনে হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়া এবং ১৯৬৮-র জুলাই-এ সোভিয়েট রাশিয়া ও আফগানিস্তান সফর করিয়া আসিয়াছিলেন।

ডক্টর হোসেন ইংরেজী ছাড়াও জার্মান, পস্তু প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় দক্ষ ছিলেন; জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। ইংরেজী ও উর্দুতে অনেকগুলি পুস্তকও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বার্লিনে থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধীর জীবনী এবং 'দেওয়ান-ই-গালিব' প্রকাশ করেন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বিদেশী পুস্তকের উর্দু অনুবাদ তিনি করিয়াছেন; তাঁহার ইংরেজী রচনার অন্যতম 'ক্যাপিট্যালিজম্।'

অত্যন্ত রুচিশীল ছিলেন তিনি। তাঁহার অতি মার্জিত ব্যবহার সর্বজনবিদিত। গোলাপ বাগানের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। জীবাশ্ম-সংগ্রহেও তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রচুর।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, 'যৌবনে স্বামীজীর লেখা পড়িয়াই তো আমি স্বদেশপ্রেমের মধ্যে নূতন আলোক পাইয়াছি। স্বামীজীর ভাবে যদি যুবকগণ অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা খুবই দুঃখজনক হইবে।' পাটনায় রাজ্যপালরূপে থাকাকালীন ফ্রেমে বাঁধানো স্বামীজীর এই বাণীটি তাঁহার টেবিলের উপর থাকিত—"মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির, তাই মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ভগবদারাধনা।"

উদারহৃদয় এই স্বদেশসেবীর অভাব আজ দেশবাসীর অন্তরে গভীরভাবে অনুভূত হইতেছে।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

নীতির মূল্যায়ন ও উচ্ছৃঙ্খলতা

জাতীয় চিন্তা পরিবেশনের অভাব

প্রত্যেক মানুষই সমাজের অঙ্গ; ব্যক্তির চিন্তা ও মানসিক প্রবণতাই সমাজের মান নির্ণয় করে। ব্যক্তিজীবনের নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধি অপেক্ষা মনের সবলতা বা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সমধিক প্রবল, একথা সত্য। কিন্তু মনকে সবল হইবার পথ দেখাইবার কাজে বুদ্ধির অবদান অনস্বীকার্য। বুদ্ধি কেবল আলোকবর্ষণ করিয়া পথ দেখাইয়া দিলেও এবং জীবনকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহা মন স্থির করিলেও ভাল পথ যদি তাহাকে দেখানোই না হয়, সেপথে চলিবার প্রশ্ন স্বভাবতই আর উঠে না। বিশেষ করিয়া বুদ্ধিকে যদি আপাতমনোরম অথচ পরিণামে বিষময় পথকেই কল্যাণকর পথ বলিয়া শেখানো হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিরও সমর্থন পাইয়া সেই আপাতমনোরম পথেই যে মন নিঃসঙ্কোচে চলিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। ইহার বিষময় ফল যখন ফলিতে শুরু করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল বুঝিতে পারিলেও আর ফিরিবার উপায় থাকে না।

বর্তমানে আমাদের সমাজে তাহাই ঘটিতে শুরু করিয়াছে। যে সব নীতির অনুসরণ জীবনকে উন্নততর, সবলতর, অধিকতর স্বার্থ-হীন করিয়া তোলে—এক কথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়—সে নীতিগুলিকে মূল্যহীন বলিয়া যুবকগণের বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার, দেহসীমিত মানুষই যে মানুষের একমাত্র অস্তিত্ব—এই ধারণার শিখাতেই যুববুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করাইবার এবং তাহারই আলোক নীতি ও সমাজের উপর ফেলিয়া সেগুলিকে দেখিবার ও সেগুলির মূল্যায়ন করিবার আয়োজন আজ প্রচুর। সেই আলোকে উদ্ভাসিত একটিমাত্র জীবনপথই আজ যুবমনের সম্মুখে উদ্ভাসিত। বলা বাহুল্য এই আলোকে উদ্ভাসিত পথ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুগ এবং তজ্জন্য আপাতমনোরমও। এপথে জীবন-সংগ্রাম বলিতে দৈহিক প্রয়োজনমাত্র মিটাইবার সংগ্রামই বুঝায়। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বলিতে এখানে মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষে যাহা প্রযোজ্য মূলতঃ তাহাই—যোগ্যতম বলিতে এখানে দৈহিক বলে যোগ্যতমকেই বুঝায়। এপথে সংযম, সত্য, এমনকি দয়া-স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল শুভবৃত্তিগুলিরও কোন স্থান নাই। এখানে মানুষকে, রাষ্ট্রকে, সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একমাত্র তরবারির—দৈহিক বলের—প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন বলই পরিণামে কার্যকর হয় না।

জীবনের অন্যান্য যে-সব আদর্শ আছে, যুগ যুগ ধরিয়া খুঁজিয়া মানুষ অন্যান্য যে-সব পথ আবিষ্কার করিয়াছে, সে পথগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখিবার সুযোগও আজকাল যুব-বুদ্ধিকে দিবার ব্যবস্থা নাই, সে পথে অন্ততঃ পরীক্ষামূলক ভাবে অল্প কিছুদূর যাইয়া যাচাইয়া লইবার ব্যবস্থা থাকা তো দূরের কথা।

ইহার ফল

ইহারই ফলে, ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি-রূপে বহু তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে আজ আমাদের মধ্যে জীবনবোধ সম্বন্ধে নিম্নদৃষ্টি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ও বিকৃতদৃষ্টি ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিক্ষকদের অবমাননা বা তাঁহাদের সহিত অশালীন আচরণে বিদ্যায়তনের পবিত্রতা নষ্ট হয় বলিয়া

আজ আমরা মনে করি না; বরং মনে করি উহার প্রতিকারের প্রচেষ্টাই হয়তো বিদ্যায়তনকে অপবিত্র করিবে। বিদ্বান, হৃদয়বান, চরিত্রবান মানুষকে সব সময় আমরা পূজা পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি না, আজ সে-পূজার আসনে বসাইয়াছি চিত্র-তারকাদের; ধর্ম-বা দর্শন-বিষয়ক আলোচনাসভা তো দূরের কথা, কোন প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তির বৌদ্ধিক আলোচনা-সভাতেও যুবসমাগম হয় নগণ্য; কিন্তু কোন সভায় যদি কোন চিত্র-তারকার আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষের কী বিপুল সমাগম! যে পুস্তক যত বেশী নীতিহীনতার ও নিম্নদৃষ্টির কাল্পত বর্ণনায় পূর্ণ, নীতির তথাকথিত নবমূল্যায়নে তৎপর, বাজারে তাহারই চাহিদা তত বেশী। সর্বোপরি একদল লোকের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সমাজ-হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোন কোন ক্ষেত্রে আজ শুধু স্তম্ভিতই নয়, আতঙ্কিতও করিয়া তুলিতেছে, নিরাপত্তাবোধকে শিথিল করিতেছে। চারিদিকে আজ যাহা ঘটিতেছে, বিশেষ করিয়া ৬ই এপ্রিল তারিখের রবীন্দ্র ষ্টেডিয়ামের ঘটনা এরূপ ধারণাই মনে আনিয়া দেয়। দেশবাসীকে অধিকতর চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল—যাঁহাদের উপর এইজাতীয় ঘটনার প্রতিবাদের ও প্রতিকারের দায়িত্ব ন্যস্ত, প্রথম-দিকে তাঁহাদের শ্লথ-গামিত্ব। আশ্বাসের কথা, আজ আমরা সকলেই ইহার কারণানুসন্ধানে ও এই-জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে বদ্ধপরিকর।

স্থায়ী প্রতিকারের জন্য মূলে, শিক্ষায় সংস্কারের প্রয়োজন

এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার পুনরাবৃত্তি রোধ করিতে হইলে কেবল সাময়িকভাবে অন্যায়-কারীদের নিরস্ত করিতে পারিলেই হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহা তো করিতেই হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া উহার মূলোৎপাটনও প্রয়োজন। মূল অনেক গভীরে এবং ইতোমধ্যেই বহুদূর বিস্তৃত। বিদ্যায়তনে এবং গণশিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্রেই ইহার মূল নিহিত। শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারাই সাধারণ মানুষের চিন্তাকে, গণশিক্ষাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীদের নিকট আমাদের জাতীয় উচ্চ-চিন্তার, উচ্চাদর্শের সুষ্ঠু পরিবেশনের ব্যবস্থার একান্ত অভাব। এদিকে নানাভাবে সেখানে জড়বাদী চিন্তা আসিয়া শিক্ষার্থীদের চিন্তারাজ্যে ধীরে ধীরে একটি প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছে, যাহা ভারতীয় চিন্তার দিকে তাহাদের দৃষ্টিপথ ক্রমশঃ রুদ্ধ করিতেছে। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে অবসরবিনোদনের সঙ্গেই পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে সরল সাবলীল-ভাবে সর্বজনের নিকট উচ্চভাব প্রচারের যে ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, তাহাও আজ নাই। এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে সিনেমা ও গল্প-সাহিত্য। কিন্তু সেগুলির মধ্য দিয়া কী ভাব প্রচারিত হয় তাহা আমরা সকলেই জানি; আর এই চিন্তারাশি এভাবে পরিবেশিত হইতেছে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই কাছে। কাজেই জীবনাদর্শ ও নীতির মূল্যায়ন যে পাল্টাইবে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহার আরো বহু কারণ অবশ্যই আছে; কিন্তু মনে হয় মূল কারণ এখানেই। যে বুদ্ধি আলো দেখায়, যে মন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই সব কিছুর মূলে। বুদ্ধির নিকট সর্ববিধ আদর্শকে যাচাইয়া লইবার পথ যদি সমভাবে উন্মুক্ত রাখা না হয়, মন উচ্চতর জীবনানুভূতির

আস্বাদ হইতে যদি বঞ্চিত থাকে, তাহার পরিণাম উচ্ছৃঙ্খল হইবেই।

মানুষ দুর্বল মুহূর্তে অন্যায় কাজ করিতে পারে ; সেখানে বিবেক উহাকে সীমিত রাখে, প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা দেয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি 'সব কিছুর অর্থকে বিপরীত করিয়া দেখিতে' শেখে, অন্যায়কেই যদি ন্যায় ভাবিতে শুরু করে, তখন অন্যায় আচরণের মূর্তি হয় অন্যরূপ। তখন উহা না করিতে পারাকেই অনেক ক্ষেত্রে মনের দুর্বলতা ও বুদ্ধির দৈন্য বলিয়াই ধরা হয়, যে উহা করিতে পারে না তাহাকে মাদকতাচ্ছন্ন, কুসংস্কারগ্রস্ত বলিয়াই মনে করা হয়। ইহা ভয়াবহ ; জীবনবোধকে উন্নত না করিতে পারিলে অন্য কোনও উপায়ে ইহার প্রতিকার করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

আর তাহা করার প্রকৃষ্ট মাধ্যম শিক্ষা। ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তার একটা বিশেষ স্থান থাকিবে না কেন ? সর্বসাধারণকে সেই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে না কেন ? ইহার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক যুগের অন্য দেশের চিন্তাগুলিকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। তাহাও দূষণীয় এবং উন্নতির পরিপন্থী। জ্ঞানের সব দুয়ারই খোলা থাকিবে। কিন্তু আধুনিক জগতের বহুবিধ জীবন-চিন্তার অরণ্যের মধ্যে যাহা জীবনের যথার্থ কল্যাণময় পথকে চিনিয়া লইতে সহায়তা করে, যাহা আধুনিককালের সর্ববিধ বিপরীত চিন্তারই সম্মুখীন হইয়া তাহার শুভ ও অশুভ উভয়বিধ দিককেই যথাযথভাবে চিনিয়া লইতে সক্ষম, যাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জীবনের কষ্টিপাথরে সুপরীক্ষিত, যাহা আজিও মানবজাতির সর্বোচ্চ চিন্তা—ভারতের সেই সুপ্রাচীন চিন্তাকে আধুনিক মননের পাত্রে ধরিয়া সর্বাগ্রে শিক্ষার সর্বস্তরেই পরিবেশন করা হইবে না কেন ? আধুনিককালের বহির্বিশ্বের চিন্তার সহিত সংযোগ না রাখিয়া কেবল আমাদের জাতীয় চিন্তায় বুদ্ধিকে আবদ্ধ রাখা যতখানি দূষণীয়, জাতীয় চিন্তাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল বহির্বিশ্বের চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক দূষণীয়।

অথচ তাহাই আমরা এখনো, স্বাধীনতা-লাভের পর শিক্ষাকে নিজেদের মতো করিয়া পুনর্বিন্যস্ত করিবার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিবার সুদীর্ঘকাল পর পর্যন্তও করিয়া চলিয়াছি। এভাবে গণশিক্ষারও কোন ব্যবস্থা করি নাই। আজ যুবমন যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, বিদ্রোহী হইয়া থাকে, আজ সমাজে সমাজবিরোধী লোকের সংখ্যা যদি অত্যধিক সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষ কাহাকে দিব ? বুদ্ধিকে উজ্জ্বলতরভাবে প্রদীপ্ত করিয়া আজিকার অসংখ্য যুক্তি ও যুক্ত্যাভাসের মধ্য হইতে সত্যকে চিনিয়া লইবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ভাস্বর করিতে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাকে সর্ববিধ বিপরীত অবস্থায় আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো প্রসন্ন সবলতা মনকে দিতে যাহা প্রয়োজন, তাহার পরিবেশনের কী ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি ? মনে হয় যেন তাহাদের কল্যাণপথের সন্ধান দিবার বা সে-পথে চালিত করার মতো কেহই নাই।

শুধু ভারতে নয়, সারা জগতেই আজ মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র তামসিকতা ও ভয় কাটিয়া গিয়া রাজসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের বিপুল মহান জাগরণ ঘটিতেছে ; কিন্তু এই সদ্যোমুক্ত শক্তি সর্বক্ষেত্রে সর্বমানবের যথার্থ কল্যাণের পথে পরিচালিত না হইয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া অপচিত হইতেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহা সমাজের প্রভূত ক্ষতিও

করিতেছে। বর্তমান জগতে শুধু যুবমনে নয়, সর্বত্রই শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের এই জাগরণ একটি মহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োগের দিঙ্‌নির্ণয় যথাযথ ভাবে না হইলে ইহা অশুভকারী অসুরের জাগরণে পর্যবসিত হইবে। সেজন্য জাগরণও যেমন প্রয়োজন, ততোধিক প্রয়োজন মন ও বুদ্ধির শুভভাবপ্রবাহে অবগাহন।

শক্তির, আত্মবিশ্বাসের, মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছার জাগরণ যদি না চাওয়া হয় বা উহার প্রকাশের পথরোধ করিতে চাওয়া হয়, তবে তাহা মনুষ্যত্বহীনতার লক্ষণ। কোন 'মানুষই' ইহা চাহিতে পারে না, বরং ইহাতে সহায়তা করাই সর্বজনকাম্য। কাম্য নয় শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শক্তির, এই বিশ্বাসের, এই ইচ্ছার দিগ্‌ভ্রান্তি বা বিপরীতগামিত্ব যাহা ব্যক্তিকে, সমাজকে, জাতিকে উন্নত না করিয়া অবনতই করিবে, পরিণামে সুসভ্য মানবসমাজকে পাশববলপ্রধান বুদ্ধিমান-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমিতুল্য করিয়া তুলিবে—যেখানে মানবতা হইবে নিত্যকার বলি।

বুদ্ধিকে সত্যের, উচ্চতর বাস্তবতার সন্ধান দেওয়া এবং মনকে উহার অমৃতময় আস্বাদে ও উহাতে স্থিত থাকিবার মতো শক্তিধারায় সিঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা, এককথায় জীবনকে আপাত-মনোরমতায় নয়, সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা করাই একমাত্র পন্থা। স্বামী বিবেকানন্দ একবার সমাজের অকল্যাণ নিবারণের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, কয়েক সহস্র যুবক যদি আদর্শ জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহারই প্রভাবে আপনা-আপনি সব বিদূরিত হইবে—কাহাকেও কোন কথা বলিবারও প্রয়োজন হইবে না ; আর জীবন যদি না থাকে, কেবল বক্তৃতায় কোনদিন কোন ফলই ফলিবে না।

'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' বলিতে মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে যেমন দেহের যোগ্যতাকেই বোঝায়, মানুষের বেলা তাহা কেবল বহিঃ-প্রকৃতির সহিত সংগ্রামের জন্য দৈহিক যোগ্যতাকেই বোঝায় না ; ক্রমবিবর্তনের পথে বহু-উন্নত মানুষের ক্ষেত্রে উহা অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার যোগ্যতাকেও, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতাকেও বোঝায়—ইহা ধারণা করা সহজ হইবে এই জীবনসাধনা দ্বারা ; উচ্ছৃঙ্খলতা যে জীবনকে অন্তঃসারশূন্য করে, সংযম যে জীবনকে শক্তি, সত্যালোক ও আনন্দে পূর্ণ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করাইবে এই জীবনসাধনা ; ধর্মের মূল কথাগুলি যে সমকালীন মানুষের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ- ও আবিষ্কার-ভিত্তিক অনুমান মাত্র নহে, সেগুলি সর্বকালীন সত্য, এবং যুগপ্রয়োজনে যুগে যুগে যাহা পরিবর্তিত হয় তাহা তৎকালীন পারবেশে সে-সত্যের প্রয়োগ মাত্র—তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার মতো বিপুল ভাস্বরতা বুদ্ধিকে দিবে এই জীবনসাধনা।

তাই মনে হয়, বুদ্ধি ও মনকে জাতীয় সুপ্রাচীন চিরন্তন ভাবধারার সংস্পর্শে আনার ব্যবস্থা আর বিলম্ব না করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে করা একান্ত প্রয়োজন, বিদেশী সর্ববিধ ভাবধারার সহিত পরিচয় তো সেখানে থাকিবেই।

ভারতের নিজস্ব ভাবের ভিত্তির উপর বহিরাগত ভাবের সমন্বয় এবং নীতির যথার্থ মূল্যায়ন তখনই হইবে (এখন নিজস্ব ভাব ত্যাগ করিয়া অপরের ভাবগ্রহণই হইতেছে, সমন্বয় নহে)। আর তখনই সকল শিক্ষিত দেশবাসিগণ এবং তাঁহাদের দ্বারা স্বতঃপ্রভাবিত সর্বসাধারণও আধুনিকতাকে সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণমূর্তিতে বরণ করিয়া লইতে পারিবে—যাহা সমাজে আনন্দোজ্জ্বল কল্যাণ আনিবে, আতঙ্ক নহে।

রাহুল-মাতা

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদ্দার

কপিলবাস্তুর শাক্যনায়ক শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবী পিত্রালয় দেবদহে যাবার পথে লুম্বিনী উদ্যানে অশোকতরু বা শালতরুর শাখা ধরে দাঁড়ালেন প্রসব-বেদনায় কাতর হয়ে। ক্ষণকাল পরে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সদ্যোজাতককে পরমাদরে প্রাসাদে আনা হল। সেই পুণ্যতিথিতে আরও সাতজন পুণ্যাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন নারী। তিনিই রাহুল-মাতা।

বুদ্ধচরিতে রাহুল-মাতার নাম যশোধরা। কার তনয়া সে বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ললিতবিস্তর'-এর মতে তিনি দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা; নাম গোপা। ডুলব্ (তিব্বতীয় বিনয়-পিটক)-এর মতেও দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যার নাম যশোধরা। পালি সাহিত্যের সাক্ষ্যানুসারে রাহুল-মাতা দণ্ডপাণির ভ্রাতা সুপ্পবুদ্ধের (সুপ্রবুদ্ধ) ভার্যা অমিতার (অমৃতা) তনয়া। সুপ্পবুদ্ধও শাক্যবংশীয় নেতা ছিলেন। তিনি মায়াদেবীর সহোদর ভ্রাতা হতেন আর গৌতম বুদ্ধের মামা। অনেকের মতে অমৃতা—গৌতমের পিসী ছিলেন।

যাই হোক রাহুল-মাতার ইতিহাসসম্মত নাম কোন্‌টি, বলা কঠিন। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে শুধু রাহুল-মাতা বলেই উল্লেখ আছে। সঙ্ঘের প্রাচীনগণ যে তাঁর নাম জানতেন না তাও নয়—অথচ জেনেও নামোল্লেখের কোন প্রয়োজন কেন যে উপলব্ধি করেননি, তা বোঝা যায় না। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যেই তাঁর কত নাম পাওয়া যায়। গোপা, যশোধরা, সুভদ্দকা [সুভদ্রকা], ভদ্দকচ্চা, ভদ্দকচ্চানা [ভদ্রকাঞ্চনা], বিম্বা সুন্দরী, বিম্বা প্রভৃতি। এর মধ্যে কোন্‌টি যে তাঁর আসল নাম নির্ণয় করা কঠিন।

কাহিনীগুলিরও রচনা কোন দেশ-বিশেষের বৌদ্ধগণের নয়, একরকমও নয়। ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকায় স্থানবিশেষে অদ্ভুত রূপকথার রূপান্তরও দেখা যায়। স্থবিরগণের দ্বারা পালিভাষায় লিখিত কাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃতে রচিত কাহিনীর সঙ্গতি নেই। তাছাড়া উত্তরভারতীয় কাহিনীর সাথে দক্ষিণভারতীয় কাহিনীর সাদৃশ্যের একান্ত অভাব।

পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের শেষ বুদ্ধকে প্রসবের সাতদিন পরে জননী মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। মায়াদেবীর ভগ্নী এবং সপত্নী মাতৃহারা শিশুকে মায়ের মতই যত্নে আদরে লালন-পালন করেন। শিশুর নাম হল গৌতম।

গৌতমের ষোল বছর বয়সের সময় নানা-স্থানে ঘটক গেল একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে মনোনীত করে আনতে। জাতি হিসেবে শাক্যেরা অহংকারী। শাক্যেরা গৌতমকে কন্যাদান করতে অস্বীকার করল। শুদ্ধোদনের ছেলে গৌতমের বিদ্যা আছে, রূপ আছে ঠিকই। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা? ধনুর্বিদ্যা কেন, কোন পুরুষোচিত ক্রীড়ায়ও কোন নৈপুণ্য তার নেই। ক্ষত্রিয়ের ছেলে বিবাহ করে স্ত্রীকে রক্ষা করবে কি করে? এরূপ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলতেই পারে না। সমস্ত শাক্য-নায়কেরা অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

গৌতমও শুনলেন একথা। ধনুর্বিদ্যা কি তিনি জানেন না?

রাজোদ্যানের এক প্রশস্ত স্থানে নিমন্ত্রিত শাক্যকুলের সম্মুখে কুমার নানা শস্ত্রবিদ্যার বিচিত্র এবং নবতম কৌশল প্রদর্শন করলেন।

শাক্যগণ দেখে অবাক, বিস্ময়হতবাক! স্তম্ভিত সমস্ত দর্শক! প্রত্যেক শাক্যনেতা আপন আপন তনয়া পাঠিয়ে দিলেন কপিলবাস্তুতে। তাঁদের ভেতর গৌতম পছন্দ করলেন যশোধরাকে। যশোধরার সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হল। তেরো বৎসর যশোধরা বা গোপা স্বামীর ঘর করলেন।

আটজন ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ বাণী শুনে বরাবর শঙ্কিত ছিলেন শুদ্ধোদন—কখন তাঁর নয়নপুত্তলি গৃহত্যাগী হয়! সব রকমের সাবধানতার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন তিনি।

চিত্তে বৈরাগ্য যাতে না আসে, তার জন্য তিনি পুত্রের বাসের জন্য সুরম্য সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সে সৌধ লোভনীয় দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ, সতর্ক প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত, কোনই আগন্তুক সহসা যেন তথায় প্রবেশ না করতে পারে।

পিতার স্নেহবন্ধন সতর্কতা সবই নিয়তির বিধানে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একদিন রাজপথে ভ্রমণকালে একজন করে রোগী, বৃদ্ধ, ও মৃত ব্যক্তিকে দেখার পর মানুষের দুঃখের চিরতরে মূলোচ্ছেদ করার চিন্তায় আকুল হলেন কুমার। দেখলেন একজন শান্ত যতিকেও। সন্ধান পেলেন পথের।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। রাজ-উদ্যানের বাপীতীরে বসে বসে গৌতম অনেকক্ষণ ধরে ভাবছেন। কোনদিকে খেয়াল নেই। এমন সময় দূতীমুখে সংবাদ পেলেন তাঁর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রাসাদাভ্যন্তরে চিন্তিত কুমার প্রবেশ করলেন অতি সন্তর্পণে। বীণার ঝংকারে, নূপুরের নিক্কণে আর গানের মূর্ছনায় সমগ্র প্রাসাদ মুখরিত। মুহুর্মুহুঃ মঙ্গল শঙ্খধ্বনি।

আমোদ-প্রমোদ তিক্ততায় পর্যবসিত হল কুমারের অন্তরে। মন হল চিন্তায় ভারাক্রান্ত। এ কী আবার নতুন বাঁধন। আর না, এবার বেরুতেই হবে প্রকৃত আনন্দের সন্ধানে। ছিন্ন করতে হবে বন্ধনডোর। সমস্ত বিশ্ব তখন ঘুমে অচেতন।

বাইরে রথ প্রস্তুত ছিল, পূর্বাদেশ অনুযায়ী। গৌতম সূতিকাগারে গেলেন। দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে মাতৃত্বের অপূর্ব ছবিও অবলোকন করলেন—শয্যায় শুয়ে যশোধরা বাহুলতায় পুত্রের মস্তক ন্যস্ত করে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রামগ্ন।

দু'পা এগুলেন ঘরের দিকে। আবার কি ভেবে থামলেন। কি জানি, যদি জেগে ওঠে! কিছুক্ষণ কি ভেবে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

রাজগৃহের (রাজগীরের) বেণুবন থেকে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের পরে বুদ্ধ বহু শিষ্যসহ প্রথমবার এলেন কপিলবাস্তুতে, পিতার বিশেষ আমন্ত্রণে। নগরীর প্রান্তদেশে ন্যগ্রোধারামে রইলেন তিনি। পরের দিন ভিক্ষার জন্য বের হলেন। কথাটা চতুর্দিকে বিদ্যুতের মতন ছড়িয়ে পড়লো। আবালবৃদ্ধবনিতা বিস্মিত। যশোধরাও শুনলেন।

আনন্দে পুলকে কম্পিতদেহে উন্মাদিনীর মতন দাঁড়ালেন প্রাসাদের গবাক্ষে। একটি বারের জন্যও যদি দেখতে পান তাঁর প্রাণের আরাধ্য দেবকে। আবার ভাবেন, যদি এ পথে না যান তিনি! না, ওই তো দেখা যায়,

ঐ তো সেই মানুষ। সেই অঙ্গকান্তি, সেই চলনভঙ্গিমা, দেহকান্তি পূর্বাপেক্ষা সুন্দর। পিছনে লোকে লোকারণ্য। দেবতা আজ শুধু তাঁর একলার নন, বিশ্বজনের আরাধ্য-দেবতা! অশ্রুভারাক্রান্ত যশোধরা গবাক্ষ হতে নিঃশব্দে সরে এলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল, দেহ শীতল পাষাণের ওপর পতিত হল। দাসীরা ক্রমে তাঁকে তুলে পালঙ্কে স্থাপিত করে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগল। অনেক পরে যশোধরা চোখ খুললেন। উন্মাদিনীর মতন চারদিকে কাকে যেন খুঁজলেন।

পিতৃভবনে গৌতম এলেন রাজা শুদ্ধোদনের নিমন্ত্রণে অনেক শিষ্য সঙ্গে নিয়ে। আহারান্তে পুররমণীগণ এলেন প্রত্যেকেই তাঁকে দর্শন করতে। এলেন না রাহুল-জননী। অভি-মানিনী ভাবলেন—কেন যাবো আমি দেখা করতে? তিনি নিজে কেন দেখা করবেন না? রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত যিনি আসতে পারলেন, তিনি এখানে এসে যশোধরার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না? তেরো বছর যাঁর সাথে আনন্দে চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত করেছেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেই কি তাঁকে একেবারে ভুলতে পারেন? তিনি যদি না আসেন, যশো-ধরাই বা উপযাচিকা হয়ে দেখা করতে যাবেন কেন? সেই মহানিশা থেকে প্রাসাদে বাস করেও এত দিন তিনি একান্ত চিত্তে তপস্বিনীর জীবনই তো যাপন করে এসেছেন!

অকস্মাৎ গৌতমের আগমনবার্তা ঘোষিত হল। তাঁর আগমনে যশোধরা বিভ্রান্ত হলেন, হলেন দিশেহারা। কি করে প্রাণদেবতাকে অভ্যর্থনা করবেন ভেবে আকুল! তাড়াতাড়ি ক্ষমাসুন্দরের জন্য বসবার আসনসজ্জা করলেন ক্ষিপ্রহস্তে।

দুজন অগ্রশ্রাবক (ভিক্ষু) সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারপথে তথাগত। বিমর্ষ শুদ্ধোদন সঙ্গে আছেন। যশোধরা স্থাণুর মত দণ্ডায়মান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পাষাণ-প্রতিমার দেহে যেন প্রাণ পর্যন্ত নেই!

'তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি করেই তুমি আমায় অভ্যর্থনা করতে পারো. যশোধরা,' বললেন প্রেমময় মূর্তি ভগবান তথাগত স্মিত অধরে।

দিশেহারা যশোধরা স্বামীর পাদমূলে আছাড় খেয়ে পড়লেন, তাঁর পাদপঙ্কজদ্বয় নিজ শিরোপরি স্থাপন করলেন।

'ভদন্ত! আমার স্নেহশীলা পুত্রবধূ যখন শুনলেন যে তুমি কাষায়বসন ধারণ করেছো, ইনিও বহুমূল্য সাজসজ্জা ত্যাগ করে কাষায়বস্ত্র ধারণ করে—সমস্ত বিলাসসামগ্রী পরিত্যাগ করে—সন্ন্যাসিনীর মতন দিন যাপন করতে লাগলেন। ভূমিশয্যায় শয়ন, দিনান্তে ভোজন করে পরম নিষ্ঠায় রইলেন। ইনি তোমার প্রতি এমনই নিবদ্ধচিত্তা'—গুরুগম্ভীর স্বরে পুত্রকে বললেন পিতা শুদ্ধোদন।

মধুর হাসি হেসে ভগবান মধুর স্বরে বললেন—'তা আমি জ্ঞাত আছি, পিতঃ। আমার এই শেষ জন্মেই নয়—ইতঃপূর্বে চতুর্বিংশতি জন্মেও আমার প্রতি ইনি এরূপই নিবদ্ধচিত্তা ছিলেন।' তারপর তিনি পূর্বজন্মকাহিনী শুদ্ধোদনকে শোনাতে লাগলেন।

ক্রমে পাঁচদিন কেটে গেলো। যশোধরা পুত্রকে বললেন—'রাহুল! উনিই তোমার পিতা।'

রাহুল বিস্মিত! 'ইনিই আমার পিতা?'

'হ্যাঁ পুত্র, তোমার ইহকাল পরকাল, তোমার স্বর্গ, তোমার ধর্ম, তোমার পরম আরাধ্যের উনি। তুমি ওঁর কাছে গেলে না!'

সাত বৎসরের কুমারের বক্ষে যে কি যাতনা,

মা জানতেন সবই। বললেন—'যা বাবা, ওঁর কাছে যা। গিয়ে বল যে, আমার দায়জ্জ (উত্তরাধিকার) দিন।'

পুত্র গেল। ভোজনান্তে তথাগত পিতৃভবন ত্যাগ করে চলেছেন, পুত্র চাইল উত্তরাধিকার। বুদ্ধ সারিপুত্রকে আদেশ করলেন—'রাহুলকে দীক্ষা দাও'।

স্বামী গেছে, পুত্রও চিরদিনের মতন পর হল। পিতার পশ্চাদনুসরণ করল রাহুল। নারীর স্বামী পুত্র ছাড়া সংসার আর কিসের?

নারীজাতির প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি হল। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভিক্ষুসঙ্ঘের নেত্রী হয়েছেন। যশোধরা আরও শুনলেন যে, ভগবান তথাগত শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন—নয়নপুতলি রাহুলও শ্রমণ-বেশে সেখানে। কপিলবাস্তুর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে শ্রাবস্তীতে চলে গেলেন যশোধরা। ভিক্ষুণীদের এক উপাশ্রমে যশোধরা আশ্রয় গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন।

মাঝে মাঝে রাহুল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। ভিক্ষুণীসঙ্ঘের অভ্যন্তরে যাওয়া নিষেধ। দ্বারপ্রান্তে মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়।

মায়ের খুব অসুখ। পেটের পীড়া। পুত্র ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, 'তোমার কি খেলে রোগ উপশম হবে, মা?'

ব্যথিত স্বরে রোগক্লিষ্টা যশোধরা বলেন—'যা খেলে ভাল হবে তা এখানে কোথায় পাবো, বাবা? যখন কপিলবাস্তুতে ছিলাম তখন প্রায়ই এ অসুখ আমার হতো। তখন পাকা আমের রসের সঙ্গে শর্করা মিশিয়ে খেতাম, তাতেই নিরাময় হতো। কিন্তু ভিক্ষে করে খাই, এখানে তা কোথায় পাবো, বৎস?'

চিন্তান্বিত রাহুল উপাধ্যায় সারিপুত্রের কাছে সব নিবেদন করল। সারিপুত্র মহারাজ প্রসেনজিতের নিকট হতে রাজোদ্যানের সুপক্ব আমের রস সংগ্রহ করে মাতাকে দিল।

জাতকে অন্যরকম কাহিনী আছে। মায়ের আন্ত্রিক যন্ত্রণা-উপশমের জন্য সারিপুত্র প্রসেন-জিতের কাছ থেকে লাল মাছ দিয়ে (কি মাছ তার নাম নেই) সুগন্ধ চাউলের পোলাও সংগ্রহ করেছিলেন।

থেরী অপদানের একস্থানে থেরী যশোধরার উল্লেখ আছে। সঙ্ঘে তিনি ভদ্দকচ্চানা থেরী বলেই প্রসিদ্ধা ছিলেন। সাধনমার্গেও তিনি ভিক্ষুণীশ্রেষ্ঠায় পরিগণিত ছিলেন। প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে সারিপুত্ত, মোগল্লান বক্কুল ছাড়া বোধ হয় অন্যেরা যশোধরার মতন আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না।

যশোধরার জীবনের আর বেশী কথা জানা যায় না। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পূর্বেই বোধ হয় আটাত্তর বৎসর বয়সে যশোধরার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি ভগবান বুদ্ধের চরণধুলি গ্রহণ করে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলেন।

স্বামীজীর স্বরূপ

স্বামী ধ্যানানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে-সব উক্তি রয়েছে, মুখ্যতঃ শ্রীমা সারদাদেবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের উক্তি-সহায়ে আমরা তা আলোচনা করছি। যদিও শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের উক্তি-নিচয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিগুলির ব্যাখ্যা নয়—অনেকাংশে প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তিবিশেষ—তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিসমূহের মর্মগ্রহণে সহায়তা করে বলেই তাদের অবতারণা করা হচ্ছে। এই উক্তিসমূহকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে: (১) সপ্তর্ষির একজন, (২) অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন, (৩) 'নর'-ঋষি ও (৪) শিবাবতার।

(১) সপ্তর্ষির একজন

স্বামীজীর স্বরূপের পরিচায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তিটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের' পঞ্চম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে (১০ম সং পৃঃ ১২৪)। ঐ খণ্ডেরই চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর এই উক্তি রয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের রাজ্যে সমাধিস্থ সাতজন প্রবীণ ঋষির অন্যতম (ঐ পৃঃ ১০৫-২০৭)। এই বিষয়ে তাঁর দিব্য দর্শন যা 'লীলাপ্রসঙ্গে' প্রসন্নগম্ভীর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তা' অতি প্রসিদ্ধ, এইজন্য প্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

এই সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় ভাগে শ্রীমা সারদাদেবীর এই উক্তিগুলি পাওয়া যায়:

'আর কিছু বুঝি না, সপ্তর্ষির মধ্য থেকে একটি ঋষি এসেছিলেন—এইটি জানি।' (৪র্থ সং পৃঃ ১৬৩)। 'ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ত শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন; তা না বলে সেই বড় সাত জনের মধ্যে একজন বললেন।' (ঐ পৃঃ ১৭৯)।

'বিভিন্ন দেবলোক সব আছে কিনা—জনলোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক। স্বামীজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন। তাঁর কথা বেদবাক্য ত, মিথ্যা হবার জো নেই।' (ঐ পৃঃ ৭৭)।

'নরেনকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন—তাও সবটা আসেনি।' (ঐ পৃঃ ৯৭)।

'সবটা আসেনি' শ্রীশ্রীমায়ের এই কথা ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' (৫.৪) উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—'তাঁহারই (সেই ঋষির) শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে'—একার্থক। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'প্রধান ঋষি' কথাটি লক্ষ্য করবার।

'স্বামিশিষ্যসংবাদে' আছে, স্বামী যোগানন্দজী গ্রন্থকার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতেন: 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবী-সকলও ব্রহ্ম হ'তে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক্ রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন—

সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক্ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।' (বাণী ও রচনা, ২য় সং, পৃঃ ৫৯)। 'অংশাবতার' কথাটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও এটি 'অপূর্ব' নয়—প্রাপ্তেরই 'অনুবাদ' মাত্র, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বকথিত সপ্তর্ষিবিষয়ক দিব্যদর্শনের লীলাপ্রসঙ্গোক্ত বর্ণনায় 'শরীর-মনের একাংশ', এবং শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি—'সবটা আসেনি'—এই দুটি উক্তিতেই ঐ কথা প্রকারান্তরে বলা হয়েছে।

এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত, 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়:

'বিজ্ঞান মহারাজ রাখাল মহারাজের আহ্বানে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির নির্মাণ করাইতে যান। ইহার কয়েক মাস পূর্ব হইতেই তিনি স্বামীজীর ভাবে খুব মগ্ন ছিলেন। তখন তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোন্ ঋষি কোন্ কল্পে ছিলেন এবং বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের কি কাজ প্রভৃতির খুব চর্চা করিতেন। সেই সময়ে নরসিংহ দাস নামক জয়পুরের এক ভদ্রলোককে দিয়া সপ্তর্ষির তৈলচিত্র তৈয়ার করান। ইহার নমুনা দেখিবার জন্য তাঁহাকে এলাহাবাদের ভরদ্বাজ 'আশ্রমস্থ সপ্তর্ষির মূর্তি দেখিতে পাঠান। ঐ লোকটি উক্ত মূর্তি অবলম্বনে যে ছবি তৈয়ার করেন তাহা এখনও এলাহাবাদ মঠে আছে।...বিজ্ঞান মহারাজ বলিতেন, "স্বামীজী বিশ্বব্যাপী হইলেও তাঁহার স্থান ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলে। তিনি সেখানে থাকিয়াই জগৎ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ও আমাদের দেখিতেছেন।" '...

'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর এই উক্তিটি রয়েছে:

'ঠাকুর দেখেছিলেন—স্বামীজী সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এ পৃথিবীতে এসেছেন।'

এই বিষয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'র বিবরণ (পৃঃ ৪১৪):

'বিশ্বজন-পূজনীয় প্রভু-ভক্তগণ।
পদরজ তাঁহাদের করিয়া ধারণ॥
গাইতে যখন লীলা হইয়াছি ব্রতী।
শুন কই নরেন্দ্রের স্বরূপ-ভারতী॥
এক দিন বলিছেন প্রভু বাঁকা আঁখি।
নরেন্দ্রে লীলায় আনা প্রয়োজন দেখি॥
হৃষ্ট মনে অন্বেষণে নিজে আমি যাই।
সপ্তর্ষিমণ্ডলে (?) তার যোগাসনে ঠাঁই॥'

এই উদ্ধৃতিতে 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে' শব্দটির পরে বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্নটি লক্ষণীয়। এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য, গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার সেনের প্রদত্ত কিনা তা অনু-সন্ধানের বিষয়।

যাইহোক, অন্ততঃ শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর উক্তিসমূহ থেকে মনে হয়, উত্তরাকাশে আমরা যে উজ্জ্বল সাতটি নক্ষত্র দেখি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলেই স্বামীজীর স্থান। স্বামী তেজসানন্দ-রচিত 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' গ্রন্থেও এই মতেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর দেহত্যাগের দু'-তিন ঘণ্টা পূর্বের একটি দৃশ্যের বর্ণনা:

'মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভাগীরথী-বক্ষে যেন তরঙ্গমালার কানাকানি চলিতেছে; ঊর্ধ্বে অসীম আকাশে অগণিত নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আত্মসমাহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কে বলিবে সেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাকাইয়া আজ

তাঁহার দৃষ্টি উর্ধ্বে সুদূর সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত প্রসারিত হইল কিনা!'

উত্তর আকাশে যে উজ্জ্বল সাতটি নক্ষত্র 'সপ্তর্ষি' নামে প্রসিদ্ধ, বৈদিক যুগ থেকেই সেগুলি ঐ 'সপ্তর্ষি' নামেই অভিহিত হয়ে আসছে। শুক্ল যজুর্বেদে আছে: 'সপ্তর্ষীন্‌হ স্ম বৈ পুরর্ক্ষা ইত্যাচক্ষতে, অমী হ্যুত্তরা হি সপ্তর্ষয় উদ্যন্তি' (শতপথ ব্রাহ্মণ ২. ১. ২. ৪)। 'অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা' ঋগ্বেদের (১. ২৪. ১০) এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় যাস্ক 'ঋক্ষ'-শব্দটিকে সাধারণভাবে সমস্ত নক্ষত্রের অর্থেই নিয়েছেন; পরবর্তী কালে সায়ণাচার্য দু'রকম অর্থই করেছেন: (১) সপ্তর্ষি (ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ—সায়ণভাষ্য) (২) সমস্ত নক্ষত্র।

বৈদিক সাহিত্যে একদিকে যেমন ঐ সাতটি নক্ষত্রকে সপ্তর্ষি বলা হয়েছে, অন্যদিকে এই নক্ষত্রগুলির সঙ্গে স্পষ্টতঃ কোনও সম্পর্ক উল্লেখ না করে সপ্তর্ষি শব্দটির বহুল প্রয়োগ করা হয়েছে—ঋগ্বেদ ১০. ১০৯. ৪, ৪. ৪২. ৮, অথর্ব বেদ ১১. ১. ১, ১১. ১. ৩, ১১. ১. ২৪, শুক্ল-যজুর্বেদ ১৪. ২৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হ'ল না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তের দেবতা হিসাবে 'বিশ্বে দেবা'-র সঙ্গে কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষিরও নাম উল্লিখিত হয়েছে (রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। শুক্ল যজুর্বেদেও এই সপ্ত ঋষিরই নাম হুবহু পাওয়া যায় (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২. ২. ৪)।

আকাশে পরিদৃশ্যমান 'সপ্তর্ষি'-নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে এই সপ্ত ঋষিদের সংযোগের কথা বর্তমানে উপলব্ধ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া না গেলেও, পরবর্তী কালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে যে এই সংযোগ সুপরিস্ফুট হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। তবে পৌরাণিক বলেই সব কথা নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুরাণের মধ্যেও কাহিনী-ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব রয়েছে, যা বিজ্ঞান-দৃষ্টি, সত্যান্বেষী সাধকের গবেষণার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রমথনাথ বসু-রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম ভাগের ২য় সংস্করণের ১২৮ পৃষ্ঠায় 'সপ্তর্ষির একজন' এই কথার পাদটীকায় বলা হয়েছে—'এই সপ্তর্ষি পুরাণোক্ত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি নহেন।' এই গ্রন্থটি স্বামী শুদ্ধানন্দজী আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছিলেন এবং প্রথম সংস্করণেই (১ম খণ্ডের 'শ্রীরামকৃষ্ণচরণে' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। প্রথম সংস্করণ ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।) এই পাদটীকা থাকায় এই মতটি যে তাঁরও অনুমোদিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মরীচি ঋষির নাম থাকায় বোঝা যায় যে পাদটীকায় উল্লিখিত ঋষি-সপ্তক প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ঋষি। তাঁদের নাম: মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ (হরিবংশ ৭. ৮)। পুরাণমতে প্রতি মন্বন্তরে নূতন সপ্তর্ষিদের আবির্ভাব হয়ে থাকে। এক কল্পে ১৪টি মনু। হরিবংশ, ভাগবত আদি পুরাণে প্রত্যেক মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম দেওয়া হয়েছে। হরিবংশ, সূর্যসিদ্ধান্ত আদি গ্রন্থ অনুসারে বর্তমানে আমরা সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর অধিকারে বাস করছি। এই মন্বধিকারের সপ্তর্ষিরা হচ্ছেন তাঁরাই, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২. ২. ৪) ও ঋগ্বেদের ১০. ১৩৭ সূক্তের দেবতা হিসাবে যাঁদের নামোল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। গোত্র-প্রবর্তক, প্রবৃত্তিধর্মপরায়ণ এই সাত জন ঋষিরই শিলামূর্তি এলাহাবাদের ভরদ্বাজ আশ্রমে রয়েছে।

পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একদিকে যেমন ভরদ্বাজ আশ্রমস্থ সপ্তর্ষির মূর্তি থেকে এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জন্য সপ্তর্ষির তৈলচিত্র তৈরি করিয়ে রেখে গেছেন, অন্যদিকে নিবৃত্তিধর্মপরায়ণ স্বামীজীরও স্থান যে সপ্তর্ষি-মণ্ডলেই তা'ও বলেছেন। কী ভাবে তিনি এই দু'টি দিকের সামঞ্জস্যবিধান করেছিলেন তা' বর্তমানে জানা যায় না। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রক্ষিত ঐ তৈলচিত্রে সাধ্বী অরুন্ধতীও স্থান পেয়েছেন, কারণ ভরদ্বাজ আশ্রমেও অরুন্ধতীর শিলামূর্তি বিরাজমান। সেখানকার পাণ্ডারা জিজ্ঞাসু যাত্রীকে আজও 'ঋষিপঞ্চমী-ব্রতকথা' নামে একটি পুস্তিকা থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিয়ে থাকেন :

কশ্যপোঽত্রির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্বশিষ্ঠশ্চ সাধ্বী চৈবাপ্যরুন্ধতী ॥

আর একটি কথা। বিষ্ণুপুরাণে (১. ১২. ৯১-৯২, ২. ৭. ১০-১৫) বলা হয়েছে যে, সূর্যচন্দ্রাদি এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবলোকের অনেক নীচে; মহঃ, জন, তপঃ বা সত্যলোক যা ধ্রুবলোকের উত্তরোত্তর অনেক ঊর্ধ্বে, সপ্তর্ষি-মণ্ডল তাদের যে কত নীচে তার গাণিতিক হিসাবও সেখানে দেওয়া হয়েছে। এদিকে আবার তপোলোক সম্বন্ধে Wilson নোট দিয়েছেন—'Tapoloka, the world of the seven sages'. (Vishnu Puran—Wilson, p. 42, Note 10)। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ও বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ কথাই লিখেছেন—'সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে স্থান (তপোলোক) তাহাই বনৌকস (বানপ্রস্থ)-দিগের স্থান।'

আমাদের বক্তব্য এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবলোকের অনেক নীচেই হোক বা অনেক ঊর্ধ্বে তপোলোকেই হোক, আধিকারিক পুরুষ স্বামীজীর সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকতে কোন বাধাই নেই। কারণ যে-সূর্যের অবস্থান ধ্রুব-লোকেরও বহু নীচে বলা হয়েছে, তদভিমানিনী দেবতাও একজন আধিকারিক পুরুষ। 'যাবদ্ অধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্'—বেদান্তদর্শনের এই সূত্রের (৩. ৩. ৩২) ভাষ্যে আচার্য শংকর লিখেছেন :

'ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্যন্তং জগতোঽধিকারং চরিত্বা তদবসানে উদয়াস্তময়বর্জিতং কৈবল্যম্ অনুভবতি।'

অর্থাৎ ভগবান আদিত্য এক কল্পকাল পর্যন্ত জগতের (উপর তাঁর পরমেশ্বর-প্রদত্ত) অধিকার পালন ক'রে, কল্পান্তে উদয়াস্তময়-বর্জিত কৈবল্য লাভ করেন।

স্বামীজীর স্বরূপের পরিচায়ক 'সপ্তর্ষির একজন' এই প্রথম পর্বটি আমরা এইখানেই শেষ করছি।

(২) অখণ্ডের ঘরের চার জনের একজন :

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' আছে যে, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ১৮৮৩ সালের কোন এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে সম্বোধন ক'রে বলেন যে, তিনি দেখেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন' (৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ১২৩-১২৪)। সান্ন্যাল মহাশয় এই কথা স্বামী সারদানন্দজীকে বলেন এবং সেই বিবৃতি 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিপিবদ্ধ করা হয়।

'অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন' এই উক্তিটি আমাদের চতুঃসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এঁরা চিরকুমার, নিবৃত্তিধর্মের প্রচারক, পরম প্রেমিক ও 'বিজ্ঞানী'। এখানে 'বিজ্ঞানী'-শব্দটির সংজ্ঞা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আমরা

া পাই, তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।' (৪. ১৯. ১)

'সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার—এঁরাও ব্রহ্মজ্ঞানের পর দাস-আমি, ভক্তের-আমি রেখেছিলেন। এঁরা জাহাজের মত, নিজেও পারে যান আবার অনেক লোককে পারে নিয়ে যান।' (৪, ১৬. ১)

মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই চতুঃসনের জ্ঞান ও ভক্তির অমূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট রয়েছে। গীতাভাষ্যের ভূমিকায় শংকর জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃত্তিধর্মের প্রবর্তক এই সনকাদির উল্লেখ করেছেন এবং 'অপরোক্ষানুভূতি' নামক প্রকরণগ্রন্থে বলেছেন যে, এঁরা 'নিমেষার্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।'

বাস্তবিক চতুঃসনের সঙ্গে স্বামীজীর প্রচুর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীমা সারদাদেবীর বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের কোনও উক্তি পাওয়া যায় না ব'লে, কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তা'ছাড়া স্বামীজী চতুঃসনের একজন এবং সপ্তর্ষিরও একজন—এই দু'টি সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করা সম্ভব কি? অবশ্য সান্ন্যাল মহাশয়ের পূর্বোক্ত বিবৃতিতে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতে একই বাক্যে রয়েছে যে, স্বামীজী অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন ও সপ্তর্ষিরও একজন। সম্পূর্ণ উক্তিটি এই: 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ-সত্ত্বগুণী; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না!' এই উক্তিটি আমাদের গীতার (১০. ৬) 'মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা' ইত্যাদি জটিল শ্লোকটি স্মরণ করিয়ে দেয়—অবশ্য ভাষ্যকার শংকর ভিন্ন অন্যান্য অধিকাংশ টীকাকাররা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে। তবে এ নিয়ে কোনও বিচারের অবকাশ নেই, কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আলোক-সম্পাতী আপ্ত-বাক্যের এক্ষেত্রে একান্ত অভাব।

স্বামীজীর স্বরূপের পরিচায়ক এই দ্বিতীয় পর্বটি আমরা এখানেই শেষ করছি। (ক্রমশঃ)

মায়ের পূজা

শ্রীতুলসী চক্রবর্তী

মাগো তোমায় ডাকতে হলে
চাইনে জবা-বিল্বদল,
মা তোর চরণ পূজতে হলে
দিতেই হবে অশ্রুজল।
দুঃখ-সুখে, ব্যথায়, ভয়ে,
শিশু যে তার মাকে স্মরে,
মায়ের পরশ শান্ত করে
অশান্ত তার চিত্তদল।

বিশ্বজগৎ জুড়ে মাগো
তোর-ই রূপের মেলা,
সকল মনের সকল স্তরে
তোর-ই লীলা-খেলা।
তুই হলি মা লীলাময়ী,
ভক্ত-মনের কুসুমচয়ী,
চরণদুটির পরশ দিয়ে
ফোটাস মানস-কুসুমদল।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

মহাপুরুষদিগকে প্রথম দর্শনেই ধরা-ছোঁয়া যায় না। যত বেশী মেলামেশা করা যায় ততই ক্রমে তাঁহাদের উচ্চভাব কথঞ্চিৎ বোঝা যায়।

আমি মঠে সাধুদিগের নিকট হইতে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সামান্য কিছু সংবাদ প্রথমে পাই; তাঁহার বাল্যজীবন, তাঁহার হিমালয়, কেদারবদরী, কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণ ও রাজপুতানায় তাঁহার সেবাকার্য, মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ, সারগাছিতে অনাথ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবগত হই। তখন হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ঠিক কখন তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলাম মনে নাই: সম্ভবতঃ ১৯২১ বা ১৯২২ সালে—সেদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

তিনি যখন মহারাজদের সহিত কথা বলিতেন তখন তাঁহার প্রাণখোলা হাসি, মিষ্ট বাক্য, সরলতা ও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। কথা বলিবার সময় তাঁহার চক্ষু ও সর্বাঙ্গ দিয়া আনন্দের স্ফুরণ হইত। এমন মহাপুরুষকে দেখিয়া কার না আনন্দ হয়?

যখনই সময় হইত তখনই তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মের সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব ভ্রমন-কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইতাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদসেবাদি করিয়া ধন্য হইয়াছি। ভ্রমণকালে তাঁহার রোগীর সেবা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদির কথা শুনিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।

রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষজী তাঁহাকে পাইলে তাঁহার সহিত খুব আনন্দ করিতেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত রঙ্গরসাদি করিয়া আমাদিগকেও আনন্দ দিতেন; তিনি যথার্থই একজন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন।

তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে অনেক কিছু লেখা হইয়াছে। এখানে তাঁহার সহিত আমার যে-সকল ঘটনা অল্পবিস্তর ঘটিয়াছে সেগুলি লিখিবার চেষ্টা করিব।

আমি ১৯২৫ সালে মালদহ আশ্রমের কাজে যাই। তখনকার সে আশ্রমটি ছিল অতি ক্ষুদ্রাকার, ১০্ টাকা তাহার ভাড়া; তাহাতে একটিমাত্র পাকাঘর ও দুইটি কুঁড়েঘর; একান্ত স্থানাভাব। সামান্য কিছু চাঁদা পাওয়া যাইত; তাহাই আর মুষ্টিভিক্ষার চাউলই ছিল আমাদের সম্বল। উহারই একটি ঘরে রাত্রে গরীব ছেলেদের নৈশ পাঠশালা বসিত, আর একটিতে ছিল আমাদের রান্নাঘর। আশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল ২।৩টি স্কুল পাড়ায় পাড়ায়, একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ছোট একটি লাইব্রেরী এবং সামান্যভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা।

একবার এক সন্ধ্যায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক একটি শিশুকে, বয়স ২।৩ বৎসর হইবে, আশ্রমে লইয়া উপস্থিত। ২।১টি কথাবার্তার পর তিনি অকস্মাৎ উহাকে আশ্রমে রাখিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আশ্রমের অন্যতম কর্মী ব্রহ্মচারী গঙ্গাচৈতন্য (বর্তমানে স্বামী বগলানন্দ) উহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ছেলেটিকে এখানে রেখে যাচ্ছেন যে?"

তিনি বলিলেন, "এটি মুচির ছেলে, ইহার পিতামাতা মারা যাওয়ার পর আমি বাড়ি নিয়ে যাই এবং লালন-পালন করি, এখন এ খুবই অসুস্থ। তাই আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি এবং রেখে যাচ্ছি। আপনারা সকলের সেবা করেন, এরও করুন।" ইহা বলিয়া উক্ত ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমরা মহাবিপদে পড়িলাম। নিজেরা কোনমতে রান্না করিয়া দুটি খাই। ইহাকে লইয়া কি করা যাইবে? কোন উপায় তো দেখিতেছি না। তখন মনে হইল পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের কথা। ২।৩ দিন পর তাঁহাকে একখানি পত্রে ছেলেটির বিষয় সব লিখিলাম। তিনি চিঠি পাওয়ামাত্রই উহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন; ২।৪ দিন পর ছেলেটিকে সারগাছি পাঠানো হইল। তিনি কিন্তু ছেলেটিকে পাইয়া মহা খুশী হইলেন। আমি ৫।৬ মাস পরে মঠে যাইবার পথে পূজনীয় মহারাজজীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই সেই ছেলেটিকে কোলে করিয়া আনন্দ করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'দেখ দেখ, তোমার সেই ছেলেটি।' দেখিলাম সেই ছেলেটির চেহারা ভদ্রবংশের ছেলের মত হইয়াছে। সুস্থ ও সবল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির কি ভাগ্য! কোথায় সে ছিল একটি মুচির ছেলে, আর আজ সে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের কোলে উঠিয়াছে, এবং কি আদর-যত্ন পাইতেছে! পূর্বজন্মে না জানি তাহার কি সুকৃতিই ছিল!

আমি তিন দিন সেখানে ছিলাম, সেই আশ্রমের অবস্থাও ভাল নহে। সকাল ৯টার পর আমাদের এক ঠোঙা মুড়ি ও সামান্য একটু গুড় দেওয়া হইত। ইহাই ছিল সেখানের জলখাবার। বেলা ১২টায় আশ্রমের ক্ষেতের মোটা চালের ভাত ও একটু ডাল। খাইতে বসিয়া দেখিলাম ডালও জলের মত পাতলা এবং শক্ত। তরকারী মাত্র বাগানের ডাঁটা ও বেগুন। রাত্রে ও দিনে ১২টার পর আহার এবং একইরূপ খাদ্য। তিন দিনই এই ছিল আমাদের আহার। বলা বাহুল্য, মহারাজজীও তাহাই খাইতেন, বেশীর মধ্যে তাঁহার ছিল একটু চা ও একটু দুধ। এত কষ্ট করিয়াও তিনি সেখানে এমন আনন্দে কাটাইতেন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম!

এক বৎসর পরে আবার সারগাছি যাই বেলুড় মঠ যাইবার পথে। আমি যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন দেখি মহারাজজী আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিতেছেন। আমি নিকটে আসিলে তিনি মৃত সন্তানের মাতারা যেমন আপন আত্মীয় দেখিয়া কান্নাকাটি করে, সেই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, "দেখ, জ্বরে ভুগে তোমার ছেলেটি ৫।৬ দিন শয্যাগত ছিল। তারপর হঠাৎ মারা গেল। অনেক যত্ন করেছিলাম, কিছুতেই বাঁচানো গেল না।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া সব শুনিলাম, পরে বলিলাম, "মহারাজজী, ছেলেটির বড় ভাগ্য। আপনি তাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, এবং কত না ভালবাসিতেন! শরীর যাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরই তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়াছেন নিশ্চয়ই।" এই কথা শুনিয়া তিনি শান্ত হইলেন। মহারাজজীর এই অহেতুক ভালবাসা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

মহাপুরুষজী প্রথম যখন অসুস্থ হইয়া পড়েন, গঙ্গাধর মহারাজজী আসিয়া মহাপুরুষজীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, ভাল হয়ে উঠুন। আপনি চলে গেলে কি

হবে ?" তাঁহার কান্না দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গুরুভাইয়ের প্রতি গুরুভাইয়ের এত স্নেহ ও ভালবাসা! সে দৃশ্য দেখিবার মত। তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসা কত গভীর ছিল তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না!

গঙ্গাধর মহারাজজী সেই সময় সোনার-বাগানের বাড়ীর দক্ষিণদিকের ছোট ঘরটিতে থাকিতেন। আমি হলঘরটিতে শুইতাম। একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমাইতেছি, তখন রাত্রি বারটা হইবে। তিনি সহসা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন. "নীলকণ্ঠ, ঘুমোচ্ছ ? ওঠো, রাত্রে ঘুমুবে কি ? হাতমুখ ধুয়ে জপধ্যান কর।" আমিও বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া জপধ্যান করিতে বসিয়া ভাবিলাম, মহারাজজী আমাকে কত ভালবাসেন, তাই আমাকে এমনভাবে ডাকিলেন। আমি জপাদি করিবার পর ৩½ টায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শয্যা হইতে উঠাইয়া আবার জপাদি করিতে বসিতাম। তিনি ৫।৬দিন আমাকে এইরূপে উঠাইতেন ও জপাদি করিতে বলিতেন। এইভাবে এত রাত্রি জাগা ও দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাসেবাদি করা আমার পক্ষে ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিল। শরীর দুর্বল বোধ করিতে লাগিলাম, পূজার কাজ করিতে অসমর্থ হইলাম। তখন তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, রাত্রি জাগায় ও দিনের বেলা পূজার খাটুনিতে আমার শরীর খারাপ হইতেছে; আমি রাত্রি জাগিয়া আর জপধ্যানাদি করিতে পারিতেছি না, আমাকে আর রাত্রে দয়া করিয়া ডাকিবেন না, এতে ঠাকুরসেবার ত্রুটি হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "কেন ? আমরা তো শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় দিনরাত তাঁর সেবা করেছি। তোমরা পারবে না কেন ?"

ঐ দিন রাত্রে তিনি আবার ডাকিলেন, তার পরদিন ভোরে ঐ ঘর হইতে বিছানা লইয়া অন্যত্র যাইব ঠিক করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় তিনি উহা দেখিতে পাইয়া আমার বিছানা ধরিয়া আমাকে আটকাইলেন, বলিলেন, "কোথায় যাও ?" আমি বলিলাম, "রাত্রি জাগিয়া দিনে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি আর এখানে থাকিব না।" তিনি বলিলেন, "আমরা সারা রাত সারা দিন কাজ করেছি; আমাদের তো কষ্ট হয় নাই। তোমরা পারবে না কেন ?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের শরীর ও মন ঐ ভাবে গঠন করে দিয়েছিলেন, তাই আপনারা এমনভাবে সেবা করতে সমর্থ হয়েছিলেন; আমাদের শরীর ও মন এতটা করতে পারছে না। আপনি দয়া করে আমাদেরও সেইরূপ করে দিন।" তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ, তা সত্য বটে। আচ্ছা, আর তোমাকে ডাকব না।" ভাবিলাম আমার মঙ্গলের জন্য তিনি কত না ভাবিতেছেন! অথচ দেখিতাম সারা রাত তাঁহার চোখে ঘুম নাই। সর্বদাই ঠাকুর-দেবতাদের নাম করিতেছেন।

এইভাবে তাঁহার কত ভালবাসাই না পাইয়াছি! আজ শেষ বয়সে এইসব কথা মনে হইলে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া যাই।

আর একবার—তিনি তখন মঠের অধ্যক্ষ। একটি বড় পানতুয়া লইয়া সারগাছি হইতে মঠে আসিয়াছেন, ঐ পানতুয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিবার পর তাঁহাকে উহার কিছুটা প্রসাদ দিয়া আসিলাম। রোজই সময় পাইলে তাঁহার কাছে যাইতাম এবং সেবাদি করিতাম। ঐদিন যখন তাঁহার কাছে গিয়াছি তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'এই যে নীলকণ্ঠ, এই পানতুয়া আছে। খাও।" আমি বলিলাম,

"আমার খিদে নেই, শরীর খারাপ।" কিন্তু তিনি বলিলেন, "না, এইটুকু খাইতে পারিবে।" আমি বারংবার না না করিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমার হাতে ওটা দিয়া বলিলেন "খাও, কিছু হবে না।" অগত্যা তাহা খাইতে হইল। কিন্তু আমার কোন অসুখ হয় নাই। এইরূপে কত স্নেহ ভালবাসাদি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি আজ তাহা স্মরণ করিয়া 'স্বধ্যামি' পুনঃ পুনঃ! কত ভাগ্য ছিল তাই এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানদের করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পাইয়াছি।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীজাবের আলি

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এ যুগের অবতার!
শুধু শাক্তের, হিন্দুর নহ—প্রিয় তুমি সবাকার:
বিভেদ-ব্যথায় ব্যথিত বিশ্ব গেলে তুমি এক করে
লভিলে দীক্ষা সকল ধর্মে বিশ্বমানব তরে।
মুসলমানের বেশভূষা পরি করেছ নামাজ, রোজা,
খৃষ্টসাধক, শ্রীশ্যামা-সেবক, বুঝেছিলে পথ সোজা!
তোমারই এ বাণী: 'যত নদনদী ছুটে চলে কলতানে
লক্ষ্য তাদের সকলেরই এক—একই সাগরের পানে!
কেহ বলে জল, কেহ ওয়াটার, কেহ কহে তারে পানি—
বহু নাম তবু জল সে একই, একথা সবাই জানি;
তেমনি তাঁহারে কেহ গড্ বলে, কেহ খোদা, ভগবান,
হিন্দুর রাম—তাঁরেই রহিম ডাকিছে মুসলমান।'
দেখাইলে তুমি তাঁর কাছে যেতে যত মত তত পথ
পথ যা-ই হোক, একই লক্ষ্যেই চলে সব মনোরথ।
সহজ ভাষায় সার কথাগুলি বোঝালে সকল জনে
বিবেকানন্দ সেই বারতাই ছড়ালো বিশ্বমনে।
কি যে যাদু জান, কি মন্ত্র দিয়ে করে গেলে আপনার
সাধকশ্রেষ্ঠ, ভক্তপ্রবর, এ যুগের অবতার!

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

যাহাহউক সেই 'সর্বময়' রাক্ষস সব কিছুর সাক্ষী হইয়া লঙ্কায় রাবণ-অমাত্য মাল্যবানকে সংবাদ দিতে গেল। মন্ত্রী মাল্যবান মহেন্দ্রদ্বীপে পরশুরামের কাছে রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের সংবাদ দিয়া দূত পাঠাইলেন। মাল্যবান প্রকৃত রাজনীতিবিদদের মত 'সাম-দান-ভেদ ও দণ্ড' নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে শম্ভু-শিষ্য উগ্রতেজা পরশুরামকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন। পরশুরামের চরিত্র ভবভূতির একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতে রহিয়াছে ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, অপূর্ব গুরুভক্তি। ভবভূতি রামচন্দ্রের বীরত্ব-খ্যাপনে পরশুরামের চিত্র যত উজ্জ্বল করিয়াছেন, রাবণের চিত্র তত উজ্জ্বল হয় নাই। প্রবাদ আছে, 'জটীলে কুটীলে না হইলে লীলা পোষ্টাই হয় না' অর্থাৎ বিঘ্নকারীরা না থাকিলে প্রেম বা বীরত্ব কোনটিই বিশেষভাবে প্রকটিত হয় না। তাই মনে হয় ভবভূতি কিশোর বালক রামের প্রতি পরশুরামের ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার, সর্বগ্রাসী মনোভাব একটু বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন। রামকে দেখিয়া পরশুরামের অশ্রুও বিগলিত হইয়াছে। মানুষের চোখের জল ফেলাইতে ভবভূতি সিদ্ধহস্ত। একই চরিত্রে যুগপৎ বিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ। পরশুরামের হিংস্রতার মধ্যে দেখা দিয়াছে মানবিক স্নেহ কোমলতা। তিনি রামচন্দ্রকে 'ক্ষত্রিয়ডিম্ব' বলিয়া গালাগালি করিয়া পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "তুমি নয়নাভিরাম, আমার প্রিয়; কিন্তু গুরুর অপমান-হেতু তুমি বধ্য। আবার তুমি নূতন বিবাহ করিয়াছ। সেই নববধূর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া তোমাকে বধ করিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এইরূপ কষ্ট আমার পূর্বে কখনও হয় নাই; অথচ পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার কালে আমি ক্ষত্রিয়নারীর গর্ভ হইতে ক্ষত্র-পুত্র বাহির করিয়া কাটিয়াছি।"

শত বিপদেও মহাবীর রাম নির্বিকার। ভবভূতি রামকে কোথাও উদ্বিগ্ন হইতে দেন নাই। পরশুরামের গালিগালাজ-বর্ষণ, ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও রাম তাঁহার শ্রদ্ধা বা বিনয়-প্রকাশে কার্পণ্য করেন নাই। ভবভূতি শত্রু পরশুরামের মুখ হইতে রামের মহিমা প্রকাশ করাইয়াছেন: "আশ্চর্য, আশ্চর্য! কি অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য ও সৌজন্য! ক্রোধে গম্ভীর, পৌরুষে ধীর।" যখন অন্তঃপুর হইতে বধূদের কঙ্কণ-মোচনের জন্য জামাতা রামচন্দ্রের ডাক পড়িল, তখনও মানবিকতাবোধে পরশুরাম বলিতেছেন, "যাও, লোকধর্ম পালন করিয়া আইস।" তারপর রাম কর্তৃক পরাজিত হইয়া পরশুরাম তাঁহাকে নিজ ধনু দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভবভূতি সীতাকে নারীসুলভ মৃদুতা, কোমলতা দিয়া গড়িয়াছেন। পরশুরামের ভয়ে সীতা জড়সড় ছিলেন। ইতিহাস-বিশ্রুতা ক্ষত্রিয়রমণী সংযুক্তা স্বামী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধের সাজ পরাইয়া দিবার কালে বলিয়াছিলেন, "তুমি চৌহান-সূর্য। তুমি এই জীবনে যশ ও সুখ দুই-ই যেমনভাবে পাত্রপূর্ণ করিয়া পান করিয়াছ, তেমন আর কেহ করে নাই। জীবন হইতেছে একটা পুরানো কাপড়; যদি ইহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়, দুঃখ নাই। কারণ ভাল

করিয়া মৃত্যুবরণ করাই হইতেছে অমরতা।” সীতা সংযুক্তার মত না হইলেও তাঁহার মৃদুতা নিছক দুর্বলতা নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন, “মৃদুতার দ্বারা কঠোর জিত, অকঠোরও জিত হয়। মৃদুতার দ্বারা অভিভূত হয় না, এমন কিছুই নাই। মৃদুতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র।”

রঘুবংশে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড মাত্র ১০৪টি শ্লোকে সমাপ্ত (দ্বাদশ সর্গ)। কালিদাস কেবল বাল্মীকির চিন্তাধারার সংগতি রক্ষা করিয়া দুই-চারিটি কথা বলিয়া কাব্যিক প্রবাহ রক্ষা করিয়াছেন। কালিদাসের উপমা তুলনাহীন। দ্বাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকে তিনি পরবর্তী ঘটনায় ভূমিকাস্বরূপ বলিয়াছেন: ঊষাকালে বর্তিকার অন্তর্বর্তিনী দীপশিখা যেমন পাত্রস্থিত সমস্ত তৈল সম্ভোগ করিয়া নির্বাণোন্মুখ হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ অন্তিম দশায় উপস্থিত ও বিষয় সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণের সমীপবর্তী হইলেন। জরা দশরথের কর্ণে রামচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোপনা কৈকেয়ী ঈর্ষাবিষ উদ্‌গীরণ করিলেন। বাল্মীকি বনগমন-ব্যাপারে কৈকেয়ীর নিকট রামচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন: “আমি রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে পারি, বিষ খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি।” রামচন্দ্রের বনগমনে কালিদাসের অনুভব: “সীতাকে রামের পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী রামগুণে পক্ষপাতিনী হইয়া, কৈকেয়ীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন।” অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র নির্বিকার, অপূর্ব সংযমী, সত্যে অটুট। কেহ তখন বিষাদমগ্ন, কেহ প্রতিশোধপরায়ণ, কেহ বা রাজ্যকামী—কিন্তু ঐ সব সাংসারিক বিপর্যয়ের ভিতর জ্ঞানী রামচন্দ্র কর্তব্যের বিগ্রহরূপে অবস্থিত। বৈষয়িক সংঘর্ষ সাধারণ মানুষের মত তাঁহার হৃদয়কে দোলায়িত করিতে পারে নাই। কালিদাস একটু সহানুভূতির সুরে বলিয়াছেন, “প্রশান্তচিত্ত সানুজ রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে যৌবনকালেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদের ব্রত আচরণ করিতে চলিলেন।”

ভবভূতির মহাবীরচরিতে অযোধ্যাকাণ্ডের বিবরণ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই রামচন্দ্রকে দমনের জন্য রাবণের ষড়যন্ত্র দেখা যায়। রাবণের মাতামহ ও মন্ত্রী মাল্যবান এইসব ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা। প্রথমে পরশুরামকে দিয়া রামকে জব্দ করিবার চেষ্টা, পরে শূর্পণখাকে মায়াবিনী হইয়া মন্থরার উপর ভর করিতে নির্দেশ এবং অবশেষে বালীকে দিয়া রামচন্দ্রের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা। মাল্যবানের সঙ্গে শূর্পণখার কথাবার্তা ভবভূতির কল্পিত। নাট্যে ও কাব্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্য কল্পনা দূষণীয় নহে।

মন্থরা-শরীর-প্রবিষ্ট শূর্পণখা রামলক্ষ্মণকে পাইয়া কৈকেয়ীর পত্র দেখাইতেছেন: “দেখ বৎস, পূর্বে মহারাজ আমাকে দুইটি বর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তোমার পিতার এই পত্রখানিই এই বিষয়ের বার্তাবাহক-স্বরূপ। একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্যশ্রী ভোগ করুক; অন্য বরের দ্বারা রাম কালহরণ না করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করুক।” অযোধ্যায় তখন রামের অভিষেকের মহোৎসব ও জামদগ্ন্য-বিজয়োৎসব চলিতেছে। এমন সময় রামচন্দ্র রাজা দশরথের কাছে বনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। ঐ কথা শুনিয়া দশরথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে চলিলেন।

দর্শক ও শ্রোতা যখন করুণরসের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন অন্য রস পরিবেশন করিয়া ঐ বিষাদের লাঘব কবি-কুশলতার পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই সমান দক্ষ। কালিদাস শূর্পণখাকে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে ফষ্টিনষ্টি করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। হাস্যরতা সীতাকে ক্রোধোন্মত্তা শূর্পণখা বলিয়াছে: "তুই শীঘ্রই এই পরিহাসের সমুচিত ফল পাইবি; আমার দিকে দেখ্, মৃগী যেমন ব্যাঘ্রীকে উপহাস করে তুই আমাকে সেইরূপ পরিহাস করলি, ইহা মনে রাখিস্।" তারপর লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কাটিয়া দিলেন। ফল হইল সীতাহরণ। বাল্মীকি সীতাহারা রামকে দিয়া হাহুতাশ ও বিলাপ করাইয়াছেন; কালিদাস ও ভবভূতি ওদিকে বেশী যান নাই। মানুষ আপন মন দিয়াই জগৎ গড়ে। ভক্তকবি তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের নবদূর্বাদলশ্যাম কোমল দেহশ্রী অঙ্কন করিয়া তাঁহার বীরত্বের ও বৈরাগ্যের দিকটা তত দেখান নাই। মহর্ষি বাল্মীকি বনবাসোপলক্ষে বিলাপরতা কৌশল্যাকে দিয়া বলাইয়াছেন, "মহেন্দ্রধ্বজ-সঙ্কাশ উন্নতদেহ রামচন্দ্র স্বীয় পরিঘ-তুল্য-কঠিন বাহু উপাধান করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন?" শৃঙ্গবেরপুরে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইঙ্গুদীমূলে কঠিন স্থণ্ডিলভূমি রামের বাহু-নিষ্পীড়নে মর্দিত হইয়া আছে, আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।" সুতরাং ভক্তকবিদের রামবর্ণনা 'নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল' বা 'ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে'— বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতির সঙ্গে মিলে না।

পূর্বে আমরা সীতাকে কোমলস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঐ কোমলতার সঙ্গে ছিল বুদ্ধির প্রখরতা আর ছিল পতিগতপ্রাণা সতীর পতিমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। ইহার একটু নমুনা উল্লেখ করিয়া আমরা বালীবধের বর্ণনায় প্রবেশ করিব। বনবাসকালে ঋষি-গণের অনুরোধে রাম রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্য-নিবারণের ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সীতা রামকে বলেন, "তিনটি কার্য পুরুষের বর্জনীয়—মিথ্যাকথা, পরদার ও অকারণ শত্রুতা। তোমার সম্বন্ধে প্রথম দুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না; কিন্তু তুমি রাক্ষস-গণের সঙ্গে অকারণ শত্রুতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" রাম প্রত্যুত্তরে বলেন, "ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়। আমি শরণাগত ঋষিগণকে কথা দিয়াছি। আমার যে-কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজ্য এমন কি তোমাকেও পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

কালিদাস একটি শ্লোকে বালীর উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন। বাল্মীকি বালীকে সাহস, তেজ ও উদারতার পরাকাষ্ঠারূপে দেখাইয়াছেন। বাণবিদ্ধ বালী রামচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় যেসব যুক্তিমণ্ডিত নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তিনি তাহার একটিরও যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নাই। কয়েকটি যুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: ১। আমি আপনার রাজ্যে যাইয়া কোন অন্যায় করি নাই, অথচ আপনি আমাকে বধ করিলেন। ২। আমার মাংস আহার করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। ৩। এখানে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা উৎকৃষ্ট শস্য জন্মায় না, যেহেতু আপনি এ স্থান অধিকার করিবেন। ৪। আপনি লুকাইয়া তস্করের ন্যায় আমাকে বধ করিলেন; লুকাইয়া বাণনিক্ষেপ যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। ৫। যে আপনার কোন অন্যায় করে নাই, তাহাকে অন্যায়পূর্বক হত্যা করিলেন—ইহা

সাহসী যোদ্ধার কাজ নহে। ৬। সুপ্ত ব্যক্তিকে যেরূপ সর্প দংশন করে, আপনি আমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সম্মুখ যুদ্ধে আপনার সঙ্গে দেখা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিহত হইতেন। ৭। রাজহত্যার ফল অনন্ত নরক ; আপনি তজ্জন্য প্রস্তুত হউন। আপনার ভিতরে হিংসা অথচ তপস্বীর মত জটাজুট চীরবাস ধারণ করিয়াছেন। আমাকে বধ করিয়া আপনি অক্ষয় অযশ অর্জন করিলেন।

বালীর এইসব উক্তির উত্তরে রামচন্দ্রের যুক্তিগুলি দৈন্যে ভরা। ভবভূতি কিন্তু ঐদিক দিয়া যান নাই। তিনি রামচন্দ্র ও বালীকে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছেন এবং পরে বাণ-বিদ্ধ বালীকে দিয়া নাটকীয় ভাবে যুগপৎ একটি বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন। মতঙ্গমুনির আশ্রমে মৃত্যুপথগামী বালীই রাম ও সুগ্রীবের এবং রাম ও বিভীষণের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করাইয়া দেন।

রামচন্দ্র কপিকুল দ্বারা অপার সমুদ্র-সলিলোপরি এক দৃঢ় সেতু বন্ধন করাইলেন ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত রসাতল হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সেই সেতুপথে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ বানরসৈন্যসহ লঙ্কা অবরোধ করিলেন। আরম্ভ হইল তুমুল যুদ্ধ। স্ববশে আনিবার জন্য রাবণ মায়াবলে জানকীকে রামের ছিন্ন মস্তক দেখাইলেন ; পরে ত্রিজটা সীতাকে সান্ত্বনা দিল। গরুড় রামলক্ষ্মণকে মেঘনাদের নাগপাশবাণ হইতে মুক্ত করিল। রাবণের শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষ বিদীর্ণ করিল ; পরে হনুমান কর্তৃক আনীত মহোষধি লক্ষ্মণকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করিল। 'তুমি অতিশয় নিদ্রাপ্রিয় ; দশানন অকালে তোমাকে বৃথা জাগরিত করিয়াছেন'—কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র তাহাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করাইলেন। "অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ" অর্থাৎ আজ ব্রহ্মাণ্ড হয় রাবণশূন্য অথবা রামশূন্য হইবে—এই নিশ্চয় করিয়া রাবণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে পাদচারী রামচন্দ্র ও রথারূঢ় রাবণের যুদ্ধ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র রামের নিকট স্বীয় সারথি মাতলিসহ নিজ জৈত্ররথ পাঠাইয়া দিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর 'দেবতাদের অবধ্য' এই বরপ্রাপ্ত রাবণ মানুষ রামের হস্তে নিহত হইলেন। রঘুবংশে কালিদাস-বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসে সিক্ত হইতে পারে নাই। কারণ কালিদাস ভবভূতির ন্যায় রামচন্দ্রকে লইয়া বীররসের অবতারণা করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "We have no martial music, no martial poetry either. Bhavabhuti is a little martial." প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে পরে বর্ণিত উক্তি কালিদাসকে নরম থাকের মানুষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। "দশানন অতিশয় ক্রোধভরে জানকীর সঙ্গমসূচক রামচন্দ্রের স্পন্দমান দক্ষিণ-ভুজে শর নিক্ষেপ করিলেন।" কালিদাসের আর একটি উক্তি ধরা যাক : "অদ্বিতীয় ধনুর্ধর রামের সেই দীপ্ত অস্ত্র আকাশপথে শতধা প্রদীপ্ত হইয়া করালফণামণ্ডলধারী শেষভুজঙ্গমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।" আবার ঠিক তাহার পরেই রহিয়াছে, "সেই অস্ত্রাঘাতে মস্তকচ্ছেদনকালে লঙ্কেশ্বর কিছু মাত্রই কষ্ট অনুভব করিলেন না।" অবশ্য এইরূপ পাশাপাশি ভাবের বৈচিত্র্য কাব্যকে সুন্দর করিয়া তোলে—এই কথা সত্য। যুদ্ধের বর্ণনায় কালিদাস যে কম নিপুণ ছিলেন, একথা বলিলে ভুল হইবে। কারণ রঘুবংশে রঘুপুত্র

অজের সঙ্গে অন্য রাজাদের যুদ্ধ বা কুমারসম্ভবে ৪টি সর্গে (১৪, ১৫, ১৬, ১৭) ২০৯টি শ্লোকে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সঙ্গে তারকাসুরের যুদ্ধবর্ণনা সত্যই অদ্ভুত ভীতিপ্রদ।

ভবভূতি রাবণকে বীররূপে আঁকিয়াছেন, রাবণ প্রিয়তমা ভার্যা মন্দোদরীর সাবধানোক্তি উপেক্ষা করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের পৌরুষে সদা আস্থাবান ছিলেন। যিনি লোকপাল ঈশ্বরদের জয় করিয়া নিজের বশে রাখিয়াছিলেন, তিনি কি আর মানুষ-বানরকে গণ্য করিবেন! মন্দোদরী চাহেন স্বামীর মঙ্গল। সেইহেতু তিনি অত্যাশ্চর্যভাবে রামের সেতুবন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছু বর্ণনা করিলেন, যাহাতে রাবণ যুদ্ধ হইতে বিরত হন। বালীপুত্র অঙ্গদ রামের দূতরূপে আসিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বলিল। 'বানরও বক্তা হইল'—রাবণের উপহাসোক্তি অঙ্গদকে ক্রোধোন্মত্ত করিয়া তুলিল। সে হুংকার দিয়া রামের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। শুরু হইল যুদ্ধ।

রাম-রাবণের যুদ্ধের তুলনা রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই তুলনাহীন যুদ্ধের কাহিনী উপস্থাপনে ভবভূতির রচনাশৈলী অপূর্ব ও মৌলিক। তিনি নিজের মুখে কিছু না বলিয়া আকাশমার্গে একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়া গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন সংযোজনা করিয়াছেন। ঠিক যেন ফুটবলখেলার ধারাবিবরণী। দেবরাজ ও গন্ধর্বরাজের কথোপকথনে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের একখানি নিখুঁত ছবি। ভবভূতির মনের ইচ্ছা—আমি কিছু জানি না; মানুষরাজ ও রাক্ষসরাজের যুদ্ধের সাক্ষী দেবরাজ ও গন্ধর্ব-রাজ। ঐ প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও ভবভূতি রাম-রাবণের মনে বাৎসল্যরস সিঞ্চিত করিয়াছেন। একদিকে রাম ও রাবণ সংগ্রামে মত্ত, অপরদিকে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ। একদিকে চলিয়াছে ঘোর বাণবৃষ্টি, কিন্তু তাহার ভিতরেও দুই স্নেহাস্পদের প্রতি রাম ও রাবণের ছুটিয়াছে স্নেহদৃষ্টি। ভবভূতি বেশ মজা করিয়া বলিয়াছেন, "মানুষে লোকে বাৎসল্যং নাম কেবলমখিলেন্দ্রিয়বশীকরণ-চূর্ণমুষ্টিঃ" অর্থাৎ মনুষ্যলোকে বাৎসল্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীকরণের চূর্ণমুষ্টিস্বরূপ। শক্তিশেলে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামের চিত্ত যুগপৎ করুণ- ও বীররসে পূর্ণ হইয়াছিল। চিত্ররথ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আহা, রঘুপুঙ্গবের কি বাৎসল্য-মহিমা! উনি অনুজের অবস্থা নিজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতেছেন।" তারপর হনুমান মহৌষধি আনিয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইলেন।

Suspense বা সন্দেহজনিত উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিতে ভবভূতি অদ্বিতীয়। নাটককে মনোরম করিতে উহার ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইন্দ্র ও চিত্ররথের একটির পর একটি উদ্বেগ-সৃষ্টি ও উহার নিরসন সত্যই মনোজ্ঞ। রাবণ-নিধনের পর কালিদাস সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখান নাই, ভবভূতি দেখাইয়াছেন। লঙ্কার ভয়াবহ ধ্বংসের বিবরণ কালিদাস দেন নাই, ভবভূতি দিয়াছেন।

এবার অযোধ্যায় ফিরিবার পালা। পুষ্পক বিমানে উঠিবার পূর্বে রঘুবংশের ভাষার ও নৈসর্গিক বর্ণনার একটু মূল্যায়ন করা দরকার। সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গে (৭১টি শ্লোক) কালিদাস তাঁহার কবিত্বশক্তির চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৩টি সর্গে (২৮, ২৯, ৩০) বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা আছে। কালিদাস রঘুবংশে সংক্ষেপে ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। 'ঋতুসংহার' নামক ক্ষুদ্র

কাব্যগ্রন্থে তিনি ঋতুবর্ণনায় বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখেন নাই। কালিদাসের নামে একটি অপবাদ আছে যে, তিনি সম্ভোগের কবি। এই কথা কিন্তু নিছক অপবাদ। পাঠক-সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্য, তাহার উপর কালিদাসের রচনা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। মল্লিনাথ কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত—এই কাব্যত্রয়ের উপর সঞ্জীবনী ব্যাখ্যার প্রারম্ভে অবতরণিকা-শ্লোকে লিখিয়াছেন: "ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা। এষা সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥" অর্থাৎ কালিদাসের বাণী আজ দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষক্রিয়ায় মূর্ছাগ্রস্ত; আমার এই সঞ্জীবনী ব্যাখ্যাই তাহাকে উজ্জীবিত করিবে।

রঘুবংশের ভাষা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন: "কালিদাসের অন্য সকল কাব্যে ও নাটকে ভাষার যে-সকল দোষ দেখা যায়, রঘুবংশে সে-সকল দোষ দেখা যায় না। 'ঋতুসংহার' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' অনেক সময় দূরান্বয় দেখা যায়। 'রঘুবংশে' সে দোষ একেবারে নাই। কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ রঘুবংশে নাই বলিলেও হয়। যে ভাষায় কথাবার্তা চলে না তাহার একটা দোষ—উহাতে লম্বা লম্বা সমাস আসিয়া জুটিয়া যায়। কালিদাসে কিন্তু সে দোষ বড় বেশী নাই। বাণভট্টে, ভবভূতিতে ও শঙ্করাচার্যে যেরূপ দেড়গজী ও দুগজী সমাস দেখা যায়, কালিদাসে সেরূপ একেবারেই নাই। সংস্কৃত ভাষা শিখিতে হইলে, আমার বোধহয়, কালিদাসই মডেল, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রঘুবংশ'ই মডেল।"

কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের আরম্ভে লিখিয়াছেন; অনন্তর সর্বগুণসম্পন্ন নারায়ণের অংশসম্ভূত রঘুতিলক রামনামধারী হরি পুষ্পক-রথে আরোহণপূর্বক শব্দগুণশালী আকাশপথে যাত্রাকালে সাগর ও দূর হইতে ভারতভূমি দর্শন করিয়া সুমধুর বাক্যে প্রিয়তমা জানকীকে বলিতে লাগিলেন: "মৈথিলি, দেখ—'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥'" অর্থাৎ দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান তমালবন ও তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ বেলাভূমি লৌহচক্রতুল্য লবণাম্বুরাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।" আলোচ্যমান শ্লোকগুলি কাব্য-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মহাকবি অপূর্ব কৌশলে রামসীতার অপূর্ব প্রেমচিত্র ফুটাইয়াছেন; দুঃখময়, বিরহপূর্ণ অরণ্যবাসের স্মৃতিগুলিও আজ তাঁহাদের কাছে মনোরম। বেদনা ভালবাসাকে গাঢ় করিয়া তোলে। রামচন্দ্র কখনও রাক্ষসসঙ্কুল জনস্থান, কখনও সেই বনস্থলী যেখানে তিনি সীতার নূপুর পান, কখনও পম্পা সরোবর, গোদাবরীর তীর, বিভিন্ন তপস্বীদের আশ্রম ইত্যাদি প্রিয়তমা মহিষীকে দেখাইতে দেখাইতে সুখ-দুঃখের দিনগুলির উপর দিয়া ঝটিতি উড়িয়া গেলেন। পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "লঙ্কাদ্বীপ হইতে সারা ভারতবর্ষের—দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত সারা দেশের—এমন বর্ণনা আর নাই। যত বড় বড় জিনিস, সব দেখান হইল। পুরাণ কথা সব বলা হইল। পুরাণ প্রেমের কাহিনী সব মনে করিয়া দেওয়া হইল। রাম দেখাইলেন, সীতা দেখিলেন; মাঝে মাঝে সীতার উপর রামের প্রেম উথলিয়া পড়িল। এই মিলনই মিলন, চরম মিলন, পরম মিলন।"

কাব্যে যাহা সম্ভব নাটকে তাহা সম্ভব নহে। কালিদাস রঘুবংশে রামকে দিয়া এক তরফা বলাইয়াছেন; কিন্তু মহাবীর-চরিতে ভবভূতি স্বতন্ত্র। নৈসর্গিক বর্ণনা যৎসামান্য। আকাশপথে যাত্রাকালে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি সকলেরই কথাবার্তা আছে। প্রথমে প্রশ্নকারী সীতা "অস্মাভিঃ সাম্প্রতং ক্ব প্রস্থীয়তে?" অর্থাৎ আমাদের এখন কোথায় যাইতে হইবে? লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন: "দেবি, রঘুকুলরাজধানীমযোধ্যাং প্রতি।" অর্থাৎ রঘুকুলের রাজধানী অযোধ্যায়। ভবভূতিতেও পুরাণ কথা, আশ্রমবর্ণনা, রামচন্দ্রের বিগত দিনের বীরত্বগাথা প্রভৃতি সব কিছুই আছে। কল্পনার অশ্ব ভবভূতিও ছুটাইয়াছেন। তিনি সেই আকাশ-বিমানকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া অন্তরীক্ষলোক দেখাইয়াছেন, সেখানে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখা যায়। অশ্বমুখী কিন্নর-মিথুন নামে অদ্ভুত জীবও দেখাইয়াছেন। তারপর মধুময় পূর্ব স্মৃতিগুলি রোমন্থন করিতে করিতে তাঁহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, উহা বাল্মীকির রচনা নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বহু প্রমাণ আছে। শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকায় উহা সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধকাণ্ডের পর রামায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় সেখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। তাহা ছাড়া বাল্মীকি সীতার উপর দুইবার নিষ্ঠুরতা করেন নাই। বসু মহাশয় বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড-রচয়িতাকে পূর্বকবি ও উত্তরকাণ্ডের রচয়িতাকে উত্তরকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা করেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন; কিন্তু উত্তরকবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। এ কি নিষ্ঠুরতা, না উৎকট আদর্শপ্রীতি? আমার মনে হয় উত্তরকবির আদর্শ মহৎ। তিনি আপাত-নিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উত্তরকবির মনঃপূত হয়নি, তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত করেছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্ত বোধ হয় কালিদাসেরও ভাল লাগেনি, তিনি রঘুবংশে এক লাইনে একটু উল্লেখ করেছেন; কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিস্তার দিয়েছেন। বিধবা রাক্ষসীদের শাপের ফলে রাম সীতাকে অশুভ নয়নে দেখেছিলেন, এ কথা লিখে কৃত্তিবাস রামের দোষ খণ্ডন করেছেন। তুলসীদাস অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সীতার নির্বাসন ও পাতালপ্রবেশ একেবারে বাদ দিয়েছেন।" ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' মিলনান্ত। তিনি নির্বাসন দিয়া মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু সীতাকে পাতালপ্রবেশ করান নাই।

সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রাম-চরিতে কোথাও ঔচিত্য আর কোথায় অনৌচিত্য, উহা বিবৃত করাও অপ্রাসঙ্গিক। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধককবিরা সুধামাখা রামকথা জনমানসে যুগ যুগ ধরিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন; আর ভারতের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে উহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

আমরা আবার রঘুবংশে ফিরিয়া যাই। জন্মদুঃখিনী সীতার কথা বিবৃত করিতে গিয়া মনে হয় কালিদাস নিজেই কষ্ট পাইতেছেন।

লঙ্কা হইতে প্রত্যাগতা সীতা কৌশল্যা ও সুমিত্রার কাছে আত্মপরিচয় দিতেছেন, "ক্লেশাবহা ভর্তুরলক্ষণাহং সীতা।" অর্থাৎ পতির ক্লেশপ্রদা আমি সেই অলক্ষণা সীতা। প্রত্যুত্তরে শ্বশ্রূমাতাগণ বলিতেছেন: "উত্তিষ্ঠ বৎসে নমু সানুজোঽসৌ বৃত্তেন ভর্ত্তা শুচিনা তবৈব। কৃচ্ছ্রং মহৎ তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হাং তামূচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা॥" অর্থাৎ বৎসে, উঠ, উঠ। তোমারই চরিত্রের পবিত্রতা হেতুই রামলক্ষ্মণ মহৎ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন; এইরূপ প্রিয় অথচ সত্যবাক্যে পরম প্রেমাস্পদ বধূকে সান্ত্বনা করিলেন। সীতার কপালে কোন সুখই স্থায়ী হইল না। প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র ভদ্র নামক এক গুপ্তচর দ্বারা নগরীর খবর লইয়া জানিলেন যে, রাক্ষসগৃহে অবস্থিতির পর সীতাগ্রহণের জন্য তাঁহার নিন্দা হইতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, "যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ।" আপন কীর্তি বাঁচাইতে গিয়া রামচন্দ্র গর্ভবতী কান্তাকে হারাইলেন। সমষ্টি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতির ডোর কাটিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন সীতাকে বনবাসে রাখিয়া আসিবার জন্য। অনুজ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশ মন হইতে অনুমোদন করেন নাই; কিন্তু লোকশ্রুতি "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" অর্থাৎ গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয়—অনুসারে স্বীকৃত হইলেন। বাল্মীকির তপোবনে মূর্ছিতা সীতার নিকট হইতে লক্ষ্মণের বিদায় সত্যই মর্মন্তুদ। পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর একটিও দেখা যাইবে না, যে রাজমহিষী উপরন্তু গর্ভবতী সীতার দুঃখে অশ্রু ফেলিবে না বা রামচন্দ্রের অন্যায় একবাক্যে স্বীকার করিবে না। কালিদাস এমন মর্মী ভাষায় এই চিত্রটি আঁকিয়াছেন যে, স্থাবর জঙ্গম সর্বত্রই শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে: "নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ। তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥" অর্থাৎ সীতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ময়ূরগুলি পেখম গুটাইয়া নাচ থামাইল; কুসুমাকীর্ণ বৃক্ষগুলি হইতে কুসুম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণগুলি মুখে কচি ঘাস ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল; আহা! সীতার দুঃখে বনভূমিও কাঁদিতে লাগিল! সে ক্রন্দন পৌঁছাইল দয়াশীল মুনি বাল্মীকির কর্ণে। তিনি সীতাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। কালিদাস রামের অবস্থা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কৌলীন্যভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বিদেহসুতা মনস্তঃ।" অর্থাৎ লোকাপবাদভয়ে রাম মৈথিলীকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করেন, কিন্তু হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ঃ ধর্মদাস লাহা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লীলাবার্তা

[গদাধরের উপনয়নে ধর্মদাস]

গদাধরের উপনয়ন লীলায়ও শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ধনী কামারনীর নিকট হতে গদাধরের ভিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীরামকুমার ছিলেন ঘোর বিরোধী।

'ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিক্ষা অন্য কোন জাতি।
না দেওয়ার সেই বংশে কুলোচিত রীতি॥'

—পুঁথি

সুতরাং ঐ বিষয়ে তিনি প্রবল আপত্তি জানালে এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এদিকে গদাধরও তার প্রতিশ্রুতি-পালনে বদ্ধপরিকর। ফলে, উভয় পক্ষের সমান জেদে উপনয়ন-অনুষ্ঠানের সমুদয় ব্যবস্থা ও আয়োজন প্রায় পণ্ড হতে বসে।

শ্রীমতী ধনী কামারনীর আকুল প্রার্থনায় একদা গদাধর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, উপনয়নকালে সে তাঁর নিকট হতে ভিক্ষাগ্রহণ করে তাঁকেই 'ভিক্ষামাতা' করবে। কিন্তু এরূপ আচরণ তাদের বংশপরম্পরাগত কুলরীতির পরিপন্থী। তাই রামকুমার তাঁদের বংশের চিরাগত কুলাচার ও নিষ্ঠা ভঙ্গ করতে কোনক্রমেই সম্মত নন। অথচ গদাধরও তার সত্যরক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প।

'হেথায় গদাই কন, ধনী কামারিনী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি॥
কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥'

—পুঁথি

অবশেষে, সে ঘরে খিল দিয়ে অনাহারে সারাদিন আবদ্ধ থাকে। এদিকে তার উপনয়নের নির্ধারিত দিন সমুপস্থিতপ্রায়। অনুষ্ঠানের সমুদয় আয়োজনও প্রস্তুত। অথচ কোন পক্ষই নিজ মত-পরিবর্তনে সম্মত নন। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই স্বজনবর্গ এবং প্রতিবেশিগণ বিশেষ চিন্তান্বিত ও বিচলিত হন।

যাহোক, ঐ সংবাদ ক্রমশঃ ধর্মদাস লাহার কর্ণগোচর হয়। ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য তখন তিনি স্বয়ং অগ্রসর হন। তিনি বালক গদাধরকে বুঝানোর জন্য কোনরূপ চেষ্টা করতে ভরসা পান না। কারণ তিনি জানতেন যে, সে আশৈশব সত্যাশ্রয়ী। সুতরাং তার সঙ্কল্প হতে তাকে কোনক্রমেই বিচ্যুত করা সম্ভবপর হবে না। তাই তিনি রামকুমার ও রামেশ্বরকে ঐ বিষয়ে নানাভাবে বুঝান। প্রসঙ্গতঃ তিনি তাঁদের বলেন যে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট হতে ভিক্ষাগ্রহণ তাঁদের চিরাচরিত কুলরীতির বিরোধী, সন্দেহ নাই। তবে অন্যত্র বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ-পরিবারে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং গদাধর ধনী কামারনীর নিকট হতে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রলে, তাঁদের নিন্দাভাজন হবার কোনও আশঙ্কা নাই। অতএব এক্ষেত্রে বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য, সর্বোপরি তার সত্যরক্ষার জন্য, ঐরূপ করা মনে হয় কখনই দূষণীয় হবে না।

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহাকে রামকুমার ও রামেশ্বর সর্বদাই মান্য করতেন। যাহোক, পিতৃসুহৃদের ঐরূপ পরামর্শে ও উপদেশে

অবশেষে তাঁরা নিজেদের জেদ পরিবর্তন করেন এবং গদাধরকে ঐ বিষয়ে সম্মতি দেন। তাঁদের এই ব্যবস্থায় লাহাবাবু পরম সন্তুষ্ট হন। অতঃপর নির্ধারিত দিনে গদাধরের শুভ উপনয়ন-অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় এবং যথাসময়ে গদাধর ধাত্রীমাতা ধনী কামারনীর নিকট হতে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করে।

[লাহাভবনে পণ্ডিতসভায় গদাধর]

লাহাপরিবারের কারও শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে একবার লাহাভবনে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাগম হয়। একত্র সম্মিলিত হয়ে পরস্পর তাঁরা শাস্ত্রীয় বিচার ও বিতর্কাদি আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা কোন এক দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করে তার বিচার ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পরস্পর বহু আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পরও তাঁরা ঐ বিষয়ের স্থির মীমাংসায় উপনীত হতে পারেন না। অবশেষে সভায় তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা ও হইচই শুরু হয়। হট্টগোল শুনে আশে-পাশে যে যেখানে ছিল, কৌতূহলবশে সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়।

'সঙ্গী সনে রঙ্গ করি শিশু গদাধর।
উপনীত হইলেন সভার ভিতর॥'—পুঁথি

গদাধর সহচরদের সঙ্গে খেলা-ধুলায় অন্যত্র মত্ত ছিল। পণ্ডিতদের হইচই শুনে বন্ধুদের সঙ্গে সেও সেখানে ছুটে আসে এবং তাড়াতাড়ি তাঁদের সভার মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁদের বিতর্ক শুনে, উপস্থিত বুদ্ধিবলে সে সহজেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার সূত্র খুঁজে পায়। তখন সে অতি চমৎকার উপমা সহায়ে অকাট্য যুক্তি দ্বারা অনায়াসেই ঐ বিষয়টির মীমাংসা ক'রে দেয়। তার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। ঐ বয়সে তার অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও অত্যাশ্চর্য প্রতিভা দেখে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি থাকে না।

'যেসব পণ্ডিত শাস্ত্রে আগুয়ান দূর।
কহে আছে দৈবশক্তি নিশ্চয় শিশুর॥'
—পুঁথি

সমবেত সকলকেই সে পরম চমৎকৃত করে। তার সিদ্ধান্তে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ সকলেই একমত হন এবং তার উচ্চ প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। অদ্ভুত প্রতিভাধর এই বালক মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র—তার এই পরিচয় জেনে তাঁরা পরম আহ্লাদিত হন এবং হৃষ্টচিত্তে তাকে অজস্র আশীর্বাদ করেন।

'গ্রামবাসিমধ্যে কথা রাষ্ট্র হয় পরে।
পণ্ডিতমণ্ডলী আজি পরাস্ত বিচারে॥
গদাইর কাছে হৈল সবে পরাজয়।
কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য সকলেতে কয়॥'
—পুঁথি

[গদাধরের বিবাহে ধর্মদাস]

গদাধরের বিবাহকালে ধর্মদাস লাহা জীবিত ছিলেন। সে সময় তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। বিবাহের পর বালিকাবধূ সারদা কামারপুকুরে শ্বশুরালয়ে আগমন করে। ঐসময় একদিন সকালে লাহাবাবু তাকে বাড়ির পিছনে খেজুর কুড়াতে দেখেন। তিনি অনুমানে বুঝতে পারলেও ঐ বালিকাই নববধূ কি না, তা সঠিকভাবে জানার জন্য আগ্রহভরে শ্রীমতী চন্দ্রাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। চন্দ্রমণির উত্তরে তিনি স্বীয় অনুমানের যথার্থ সমর্থন লাভ করে পরম আহ্লাদিত হন। অতঃপর একান্ত হৃষ্টচিত্তে তিনি সারদার উদ্দেশে স্বীয় অন্তরের অশেষ শুভ কামনা জ্ঞাপন করেন।

লাহাগিন্নীর ভূমিকা

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-বৃত্তান্তে 'লাহাগিন্নী' নামে পরিচিতা। এই পুণ্যশীলা রমণীর নাম জানা যায় না। তিনি অতিশয় সরলা, দয়াবতী, ধর্মশীলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। তাঁর সুমধুর প্রকৃতি ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য প্রতিবেশিনীরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তিনি ছিলেন চন্দ্রমণি দেবীর অন্তরঙ্গ বয়স্যা এবং তাঁরই প্রায় সমবয়স্কা। চাটুয্যে পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও মধুর প্রেম-সম্বন্ধ দেখা যায়। তাঁর পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে কেবল প্রসন্নময়ী ও গয়াবিষ্ণুর নাম উল্লেখিত রয়েছে। আর অপর কারও নাম বা বৃত্তান্ত জানা যায় না। প্রসন্নময়ী ছিলেন সম্ভবতঃ কাত্যায়নী দেবীর সমবয়স্কা আর গয়াবিষ্ণু ছিল গদাধরের সমবয়সী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শৈশব- ও বাল্যলীলাকাণ্ডে লাহাগিন্নীর ভূমিকা স্মরণীয়। গদাধরের শুভ আবির্ভাব-লগ্নে চাটুয্যে কুটীরে এই পূতস্বভাবা রমণীকে উপস্থিত দেখা যায়। সুতরাং ঐ দেবশিশু ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পরে যে দু-চার জন প্রতিবেশিনী তাকে সূতিকাগারে প্রথম দর্শন করেছিলেন, তিনি সেই মহাভাগ্যবতী-গণেরও অন্যতমা।

গদাধরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ অপত্য-স্নেহ ও প্রগাঢ় বাৎসল্যপ্রীতি। তিনি তাকে পুত্রাধিক স্নেহযত্ন ও আদর-আপ্যায়ন করতেন। গদাধর ছিল তাঁর পুত্র গয়াবিষ্ণুর একান্ত অন্তরঙ্গ সহচর ও স্যাঙাত। এই সূত্রে সে ছিল তাঁর 'ধর্মপুত্র'। এজন্যেও তিনি তাকে সবদাই গভীর মমতা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তার শৈশবে ও বাল্যে তিনি তাকে বহু কোলে পিঠেও ধারণ করেছিলেন এবং তার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে চন্দ্রাদেবীকেও তিনি সক্রিয়ভাবে বহু সাহায্য করেছিলেন।

'পুত্রনির্বিশেষে বাসে লাহার গৃহিণী।
কতই গদাই কন না যায় বাখানি॥
যত্নে পোষা কত গাই দুধ দেয় কত।
নানাবিধ দুগ্ধদ্রব্য ঘরে জনমিত॥
খাওয়াতেন গদাধরে পরম যতনে।
গদাই কতই কন শুনিতেন কানে॥'—পুঁথি

সখা গয়াবিষ্ণুর টানে গদাধর অতি শৈশব-কাল হতেই লাহাভবনের অন্তঃপুরে ঘনঘন গতায়াত শুরু করে। তার আগমনে লাহাগিন্নীর অন্তরে স্বভাবতই গভীর প্রীতির সঞ্চার হত। তিনি তার জন্যে প্রত্যহ ক্ষীর-সর, নাড়ু-ননী প্রভৃতি সযত্নে তুলে রাখতেন। সে উপস্থিত হলে তিনি বিশেষ আদর সহকারে ঐগুলি তাকে উপহার দিতেন। তাকে কোলে নিয়ে তিনি কত আদর স্নেহ করতেন এবং নিজ হাতে তাকে ঐ সকল মিষ্টান্ন খাইয়েও দিতেন। তার মধুর ভোজনে রঙ্গ দেখে তিনি অপার আনন্দ লাভ করতেন। কখন কখন তিনি মনোহর বেশ-ভূষা করে তাকে সাজিয়েও দিতেন। সে তাঁদের অন্তঃপুরে সখা গয়াবিষ্ণুর সঙ্গে কত মধুর খেলা-ধূলা ও আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াত।—'সসঙ্গী কানাই যেন নন্দের অঙ্গনে।' তিনি নির্নিমেষ নয়নে ঐ মনোহর দৃশ্য দেখতেন এবং অপার সুখোল্লাসে আত্মহারা হয়ে পড়তেন।

কোন কোন দিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গদাধর লাহাভবনে উপস্থিত না হলে তিনি তার জন্যে অতিশয় উৎকণ্ঠিতা ও ব্যাকুলা হয়ে পড়তেন। অবশেষে তিনি ঐ সকল মিষ্টান্ন সামগ্রী নিয়ে তার সন্ধানে নিজেই চাটুয্যে কুটীরে উপনীতা হতেন, তথায় গদাধরের

সাক্ষাৎ পেলে ঐগুলি পরম সমাদরে তিনি তাকে উপহার দিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার সাক্ষাৎ না পেলে তিনি ঐগুলি তাকে দেওয়ার জন্য বয়স্যা চন্দ্রার নিকট রেখে আসতেন। আবার কোন কোন দিন বিশেষ অসুবিধা-বশতঃ নিজে অসমর্থা হলে তিনি ঐগুলি গদাধরকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রসন্নময়ী প্রভৃতির হাত দিয়েও চাটুয্যে কুটীরে পাঠিয়ে দিতেন।

গদাধরের শুভ বিবাহ-উৎসবে নববধূ সারদাকে সাজানোর জন্য চন্দ্রাদেবী লাহাগিন্নীর নিকট হতে কতকগুলি অলঙ্কার চেয়ে আনেন। বালিকা-বধূকে ঐসকল অলঙ্কার পরিয়ে সাজানো হয়। গহনাগুলি তার অঙ্গে বেশ মানায় এবং তার সুকোমল অঙ্গের শোভাও বৃদ্ধি করে অনেকখানি। যা হোক, গা-ভরতি সুন্দর সুন্দর গহনা পরে সারদা পরম আহ্লাদিতা হয় এবং মনের আনন্দে কদিন বেশ সেজে থাকে। অতঃপর তার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের দিন আসন্নপ্রায় হলে চন্দ্রাদেবী কিছুটা দুর্ভাবনায় পড়েন। কারণ গহনাগুলি তার পূর্বেই লাহাগিন্নীকে ফেরত দেওয়া দরকার। কিন্তু বালিকা-বধূর অঙ্গ হতে ঐগুলি কোন্ প্রাণে তিনি খুলবেন! যা হোক, জননীর মনোভাব বুঝতে পেরে গদাধর রাত্রিকালে নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হতে অতি সন্তর্পণে ঐ গহনাগুলি খুলে নেন এবং লাহাগিন্নীকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি জননীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন। যাহোক বালিকা-বধূর মনে কষ্ট হবে ভেবে লাহাগিন্নী ঐগুলি ফেরত নিতে সম্মতা হন না। কিন্তু চন্দ্রাদেবী তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করে ঐগুলি তাঁকে ফেরত দিয়ে আসেন।

গয়াবিষ্ণুর ভূমিকা

'অখিলের নাথ যিনি জগতের পিতা।
সঙ্গে তাঁর গয়াবিষ্ণু করিল মিত্রতা॥'

—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যলীলা-কাণ্ডে ধর্মদাস-পুত্র গয়াবিষ্ণুর ভূমিকাও বিশেষ স্মরণীয়। নবযুগাবতারের বাল্যলীলা-বৃত্তান্তে কামার-পুকুরের যে-সকল শিশু ও বালককে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচররূপে চিহ্নিত দেখা যায়, গয়াবিষ্ণু লাহা তাদেরই বিশিষ্টতম। সে ছিল গদাধরের সমবয়সী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতি শৈশবকাল হ'তেই তাদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় সৌহার্দ্য ও মধুর সখ্য-সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তারা উভয়েই উভয়কে গভীরভাবে ভালবাসত এবং সর্বদাই একসঙ্গে থাকত ও একত্র খেলা-ধুলা ক'রত। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উভয়ের হৃদ্যতা এবং সম্প্রীতিও নিবিড়তর হয়ে ওঠে। অতঃপর তারা উভয়ে পাঠাভ্যাস এবং আহার-বিহারাদিও একত্র করতে থাকে। বস্তুতঃ তারা উভয়েই উভয়ের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হয়ে ওঠে যে, স্বল্পকালও পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে পারত না। কদাচিৎ ঐরূপ ঘটলে উভয়েই বিষম বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে পড়ত।

গদাধর ও গয়াবিষ্ণুর আশৈশব ঐরূপ অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা প্রতিবেশিগণের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং ধর্মদাস লাহাও বালকদ্বয়ের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও অপূর্ব সম্প্রীতি লক্ষ্য ক'রে পরম আহ্লাদিত হয়েছিলেন। অবশেষে ধর্মদাস লাহা শুভদিনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ক'রে তাদের উভয়ের 'স্যাঙাত'-সম্বন্ধ পাতিয়ে দেন। ঐবিষয়ে সুহৃদ ধর্মদাসকে ক্ষুদিরামও আন্তরিক উৎসাহ দান করেন। যাহোক, ঐ মধুর সম্বন্ধ-

স্থাপনের পর গদাধর ও গয়াবিষ্ণু উভয়েই উভয়কে স্যাঙাত সম্ভাষণ করত।

'কর্তৃপক্ষ উভয়ের পিরীতি দেখিয়ে।
দিয়াছিলা পরস্পরে সেঙ্গাত পাতায়ে॥
সেঙ্গাতের নামান্তর সখা কই যারে।
কি সৌভাগ্য গয়াবিষ্ণু সখা পায় কারে॥'
—পুঁথি

গয়াবিষ্ণুকে ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি পুত্রবৎ স্নেহ-আদর ক'রতেন। গয়াবিষ্ণু গদাধরের সহপাঠীও ছিল। লাহাবাবুর পাঠশালায় তারা উভয়ে একই শ্রেণীতে পড়ত। তাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা দেখে শিক্ষক মহাশয়ও চমৎকৃত হন। পাঠাভ্যাসের পর তারা উভয়ে পাঠশালার সন্নিকটে শ্রীরাম মল্লিক, গঙ্গাবিষ্ণু লাহা প্রভৃতি সমবয়সী ও সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে বিচিত্র খেলাধূলা, হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ-অভিনয়ে মত্ত হত। গ্রামে অথবা নিকটের কোন পল্লীতে যেখানে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, পুরাণপাঠ, সংকীর্তন ও পার্বণ-উৎসবাদি হত, সেখানে গদাধর ও গয়াবিষ্ণু একত্র গমন করত। পথে-ঘাটে-মাঠে, মাণিকরাজার আমবাগানে, লাহাবাবুর অতিথিশালায়, রাখাল বালকদের সঙ্গে গোচারণে, প্রতিবেশিগণের গৃহে—সর্বত্র তাদের উভয়কে একসঙ্গে উপস্থিত দেখা যায়। বৃন্দার মা, ধনী কামারনী, শঙ্করী প্রমুখ প্রতিবেশিনীরা গদাধরকে মিষ্টান্ন নাড়ু প্রভৃতি উপহার দিলে অথবা অতিথিশালায় সাধু-বৈষ্ণবেরা তাকে ঠাকুর-প্রসাদ প্রদান করলে, সে গয়াবিষ্ণুকে ভাগ দিয়ে তবে ভোজন করত।

বিভিন্ন স্থানে যাত্রা-অভিনয় প্রভৃতি শুনে গদাধর বড় বড় পালা কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে এবং অভিনেতাদের ভঙ্গিমাগুলিও হুবহু আয়ত্ত ক'রে নেয়। অতঃপর সে বিভিন্ন পালার গানগুলি অবিকল গেয়ে এবং দৃশ্যগুলির নিখুঁত অভিনয় দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত ক'রে দেয়। যাহোক, সঙ্গীতে ও অভিনয়ে তার অসাধারণ দক্ষতা দেখে গয়াবিষ্ণু, গঙ্গাবিষ্ণু, শ্রীরাম মল্লিক প্রমুখ বয়স্যগণ তাকে 'অধিকারী' ক'রে একটি সৌখীন যাত্রার দল গড়ে তোলে। বৃদ্ধ চিনু শাঁখারীও তাদের ঐ দলভুক্ত হন।

'চিনিবাস বড় চিনে গদাই শিশুকে।
না রহে গদাই যেথা চিনু নাহি থাকে॥'
—পুঁথি

তাদের অভিনয়-শিক্ষার স্থান নির্ধারিত হয় মাণিক রাজার আমবাগান। দলের সকলের আগ্রহে গদাধরকেই অভিনয়-শিক্ষা-দানের ভার গ্রহণ করতে হয়। পাঠশালে বিদ্যাভ্যাসের পর প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তারা সেখানে মিলিত হয়ে অভিনয়-শিক্ষা আরম্ভ করে। গদাধরের অভিনব শিক্ষায় তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ নিজ ভূমিকার সমস্ত পাঠ ও গান মুখস্থ ক'রে ফেলে এবং অভিনয়ের ভাব-ভঙ্গিমাগুলিও সুন্দরভাবে আয়ত্ত ক'রে নেয়। পালাগুলির প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল গদাধরকেই গ্রহণ ক'রতে হয়।

অতঃপর প্রতিদিন শ্রীরামচন্দ্র- ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাভিনয়ে তারা ঐ আম্রকানন মুখরিত ক'রে তোলে। তাদের যাত্রাভিনয়ের সংবাদ অচিরে শিক্ষক মহাশয়ের কর্ণগোচর হয় এবং গ্রামবাসিগণও তা শুনতে পান। অবশেষে শিক্ষক মহাশয়ের আগ্রহে পাঠশালেও তাদের দলের অভিনয় আরম্ভ হয়। তারা পাঠশালাও মাতিয়ে তোলে! গ্রামবাসীরাও অনেকে ছুটে আসেন। তাদের অভিনয় শিক্ষক মহাশয় এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকেই

পরম চমৎকৃত করে। সকলেই গদাধরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যাহোক, ঐ যাত্রার দলগঠনে গয়াবিষ্ণু এবং গঙ্গাবিষ্ণুরই উৎসাহ অধিকতর দেখা যায়।

জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীরামকুমারের সঙ্গে কলকাতা যাত্রার সময় গদাধর গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে আসতে বিশেষ ব্যথিত হন। তাঁর উক্ত বয়স্যগণও তাঁর জন্য বিষম বেদনা অনুভব করেন। কলকাতায় এসেও তাকে তাঁদের জন্য ব্যাকুল দেখা যায়। অতঃপর তিনি যখনই কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছেন, তখনই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম প্রীতি লাভ করেছেন। গয়াবিষ্ণু প্রভৃতিও তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় সখাকে পেয়ে যারপরনাই উল্লসিত হয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সেই মধুর সখ্য-সম্বন্ধ তখনও অক্ষুণ্ণ দেখা যায়।

সাধকোত্তর জীবনেও শ্রীরামকৃষ্ণ গয়াবিষ্ণু, শ্রীরাম মল্লিক প্রমুখ বাল্য সহচরদের কথা ভোলেননি। তিনি যখনই কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছেন, তখনই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা তখনও শৈশবের সেই সারল্য ও প্রাণখোলা অমায়িক ভাবটি লক্ষ্য ক'রে বিমুগ্ধ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু তাঁদের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন তথা ঘোর সংসার-আসক্তির নগ্ন প্রকাশ দেখে বিশেষ ব্যথিত হতে দেখা যায়।

যাহোক, গয়াবিষ্ণু ও শ্রীরাম মল্লিক দক্ষিণেশ্বরেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একাধিক বার মিলিত হয়েছেন। তাঁদের আগমনে তিনিও পরম আহ্লাদিত হয়েছেন এবং তাঁদের যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন-আপ্যায়ন করেছেন। তাঁর টানে দক্ষিণেশ্বরে তাঁরা কয়েকবার কদিন বাসও করেছেন।

গয়াবিষ্ণু লাহার কথা

'নাম গয়াবিষ্ণু লাহা তামলির জাত।
যেই বংশে গয়াবিষ্ণু প্রভুর সেঙ্গাত॥
বড় মানে গঙ্গাবিষ্ণু প্রভু গদাধরে।
শ্রীপদে বিশ্বাস তাঁর অটল অন্তরে॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলামঞ্চে গঙ্গাবিষ্ণু লাহা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে ছিল গদাধরের প্রায় সমবয়সী এবং তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্যতম। পাঠশালে সে গদাধরের সহপাঠীও ছিল। প্রধানতঃ তারই উৎসাহে গদাধর গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ বন্ধুদের নিয়ে যাত্রার দল গড়েছিল। ঐ দলে গঙ্গাবিষ্ণু কেবল অভিনয়ই নয়, প্রধান বেশকারেরও কাজ করত।

গঙ্গাবিষ্ণু ছিল কামারপুকুরের লাহাবাবুদেরই বংশের সন্তান। সে সম্ভবতঃ ধর্মদাস লাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। যাহোক, গদাধরের সহিত সম্পর্কিত তার কিছু কিছু বৃত্তান্ত প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিষয়ে অতিরিক্ত আর একটিমাত্র বিবরণী পাওয়া যায়।

সাধনপর্ব সমাপন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ যেবার ভাগিনেয় হৃদয়রামসহ কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন, সেবার গঙ্গাবিষ্ণুর পুত্রের প্রাণসংশয়-পীড়া হয়। ঐ বালককে মরণাপন্ন দেখে গঙ্গাবিষ্ণু ও তার পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে স্বভাবতই নিদারুণ বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশেষজ্ঞ বৈদ্যগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বালকের আরোগ্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। বরং তার অবস্থার দিন দিন শোচনীয় অবনতিই ঘটতে থাকে। অবশেষে চিকিৎসকগণও তার আরোগ্যবিষয়ে নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েন এবং জবাব দেন।

'সকলেই বিজ্ঞতম কেহ নহে কম।
কেহ না করিতে পারে কিছু উপশম॥

বিফল কৌশল যত সময় নিদান।
পুত্র হেতু গঙ্গাবিষ্ণু আকুল পরাণ॥
পরাণ সমান পুত্র প্রায় যায় ছেড়ে।
কভু ভূমে গড়াগড়ি কভু মাথা খুঁড়ে॥'-পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শৈশবে ও বাল্যে গঙ্গাবিষ্ণুর নিবিড় সখ্যভাব থাকলেও তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যময় দেবভাবের পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। এ-জন্য তার প্রতি গঙ্গাবিষ্ণুর অগাধ বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখা যায়। কিছুতেই বালকের প্রাণরক্ষার কোন কূল-কিনারা না পেয়ে তিনি অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর নিকট তার প্রাণভিক্ষা করেন। তাঁর তীব্র কাতরতা ও ব্যাকুলতা দেখে পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ভাবের প্রচণ্ড আবেশে তাঁর সর্বাঙ্গ টলতে থাকে। ঐ আবেশের ভরে তিনি বারংবার ঢলে ঢলে পড়তে থাকেন এবং পরিশেষে আর্তনাদপূর্বক ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে করুণাভরে গঙ্গাবিষ্ণুকে অশেষ আশীর্বাদ করেন।

'বলিলেন, নাহি দিবে বালকে ঔষধি।
মায়ের কৃপায় হবে উপশম ব্যাধি॥'—পুঁথি

অতঃপর গঙ্গাবিষ্ণু তাঁর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভর করে সমস্ত ঔষধ ও বড়ি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করেন এবং বালকের চিকিৎসাদি একেবারে বন্ধ ক'রে দেন। কি আশ্চর্য, তারপর মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তাঁর সেই মরণাপন্ন পুত্র আরোগ্য লাভ করে।

উপসংহার—

অবতারপুরুষগণের দিব্য লীলাবিলাসে অংশগ্রহণকারিগণ সকলেই পরম ভাগ্যবান। এঁরা মহিমময় পুরুষগণের ভাগবতী লীলার মহিমা-বিকাশের আধার ও সহায়ক। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদ্যলীলা-মাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহা এবং তাঁর পরিবারবর্গ-সম্পর্কিত যেসকল খণ্ড খণ্ড বিবরণী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ রয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে মাত্র সেইগুলিই সংগ্রথিত হয়েছে।

"তাঁর (স্বামীজীর) মতে ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে কদাপি নয়।···ভারতের যৌবনকামনা আধুনিক সভ্যতার বিলাসদ্রব্য নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয় তার আছে—কিন্তু প্রত্যাবর্তন সে কি করবে না? করবেই, কারণ তার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা আর আধ্যাত্মিকতা।"

—ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

দুই

প্রবুদ্ধ ভারতের দুই পর্ব

॥ ১ ॥

স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে আলাসিঙ্গা ছাড়া আর দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একজন হলেন সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার, অন্যজন ডাঃ ননজুণ্ডা রাও। বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাস্তিক সিঙ্গারাভেলু স্বামীজীর স্পর্শে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ননজুণ্ডা রাও—

"শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি; অপরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রি; স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত—সুস্মিত সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগেই গান গাইছিলেন যা প্রাণের ভিতরকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে।··· মহামায়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সুমহান সঙ্গীত। ভাববিহ্বল কণ্ঠে গানটি একটু একটু করে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত সকলে নিঃশ্বাস রোধ করে সেই গান শুনছিল। গান শেষ হলে অসীম স্তব্ধতা, যা সভয় সম্ভ্রমে অভিভূত করে দিয়েছিল। স্বামীজী আবার যখন কথা আরম্ভ করলেন, তখনই নীরবতা ভাঙল। তিনি বললেন, কখনো-কখনো কিভাবে তাঁর উপর শক্তি ভর করে, তখন তিনি একেবারে বদলে যান, সেই সময়ে যারা তাঁর সংস্পর্শে আসে তাদের জীবন কিভাবে বদলে দেন। তিনি বলে চললেন, ঐ সব সময়ে তাঁর মনে হয়, একটা বিরাট শক্তি তাঁর দেহের অণুপরমাণুর মধ্যে শিহরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে—প্রভাবিত করে সব কিছু; যদি তখন কেউ তাঁকে স্পর্শ করে, তার সমাধির অনুভূতি লাভ হয়, চির রহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যায়, পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়, সহস্র বর্ষের সাধনার ফল সে এক মুহূর্তে লাভ করে। স্বামীজী যেই কথা শেষ করেছেন, শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন সহসা উঠে পড়ে স্বামীজীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর দুই পা আঁকড়ে ধরলেন। ইনি পরলোকগত পি. সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার; তখন মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক; স্বামীজী এঁকে আদর করে 'কিডি' বলে ডাকতেন, সেই নামেই ইনি বেশী পরিচিত; মহাপ্রাণ মানুষ, ঐকান্তিকতার প্রতিমূর্তি, নিজ বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত করতেন নির্ভয় সাহসে। সিঙ্গারাভেলু স্বামীজীর পাদধারণ করলে স্বামীজী দুই হাতে তাঁকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু বললেন, 'এ তুমি কী করলে? এতখানি ঝুঁকি নিলে কেন? সে যাই হোক, এর পরিণাম থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।' ঠিক তখনি আমরা সকলে দেখলুম, সিঙ্গারাভেলুর মুখে চরম তৃপ্তির আলো। সেই মুহূর্তে তিনি কী অনুভব করেছিলেন কেউ জানে না, কারণ বহু অনুরোধেও এ বিষয়ে কিছু বলতেন না, কিন্তু অন্ততঃ এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সেদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তিনি সংসারত্যাগ করেছিলেন—স্ত্রীপুত্রাদি সব কিছু--অধ্যাপনা

ছেড়ে দিয়েছিলেন—অতঃপর শুধু স্বামীজীর কাজই করে গেছেন। তাঁকে যাঁরা জানতেন, তাঁদের সকলেরই মনে আছে, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে গিয়েছিলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধনায় ও ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতেন।"

স্বামীজীকে তাঁর দিব্য ভাবানুভূতির মুহূর্তে স্পর্শ করার 'ভয়ঙ্কর অর্থ' স্বামীজী জানতেন; তিনি সভয়ে ভেবেছিলেন—কোন্ প্রেরণার বিষদংশন সিঙ্গারাভেলু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন! স্বামীজীর সেই সানন্দ ভীতি ফুটে উঠেছে সিঙ্গারাভেলুকে লেখা একটি পত্রে—

"তোমার এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সঙ্কল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি ক'রো না। বিশেষতঃ, কোনো আহাম্মকির কাজ ক'রে অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার কারো নেই। সবুর করো, ধৈর্য ধরে থাকো, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।" (২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, আমেরিকা থেকে লেখা)

'কিডি' ছিলেন স্বামীজী-প্রবর্তিত দ্বিতীয় ইংরাজী পত্র 'Awakened India'-এর (Prabuddha Bharat) ম্যানেজার। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অকালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য তাঁর প্রয়াস, এবং তাঁর আধ্যাত্মিক চরিত্রের বিষয়ে ব্রহ্মবাদিনে লেখা হয়:

"... So simple and good at heart, so learned in the knowledge of the East and the West, and so self-sacrificing in the cause of Truth. Brilliant as his University career was, it never turned his head, and his thirst for knowledge went on increasing till it culminated in complete renunciation of all worldliness in 1894. This event is attributed by many to his having chanced to come in *contact* with Swami Vivekananda. Every one who had the pleasure of his frindship knew the earnestness and sincerity of purpose that sang through his system—the main cause of the success of the *Awakened India,* whose manager he was from the outset—and was sanguine of his perseverance and ultimate success in the matter of spiritual realization. No one can say exactly what progress he had made in that direction. But let us learn what that inward fulness noticeable about him in his later days really means. Let us try to follow in his footsteps and ascend to the Peak of Promise and like him." (*Brahmavadin* ; Nov. 1901)

প্রবুদ্ধ ভারতের পিছনে ছিলেন আর একজন ব্যক্তি—মাদ্রাজের একজন সেরা ডাক্তার—ননজুণ্ডা রাও। স্বামীজীর একান্ত ভক্ত এই ডাক্তারের বিবেকানন্দ-স্মৃতি কিয়দংশে অল্প পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, পরেও করব—এখানে অধিকন্তু স্মরণ করিয়ে দেব, ডাঃ ননজুণ্ডা রাও দার্শনিক চিন্তায় পারঙ্গম ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর '*Cosmic Consciousness of the Vedantic idea of Mukti*' গ্রন্থ ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়ে সারা দেশের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনানুভূতির আলোকে লিখিত হয়। এ

ছাড়া ডাক্তারের অন্য উল্লেখযোগ্য রচনাও আছে।

॥ ২ ॥

প্রবুদ্ধ ভারতের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধানের পূর্বে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয় দেওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এমন করেছি এই জন্য যে, এই জাতীয় পত্রিকাগুলি কখনই অর্থাকাঙ্ক্ষা বা যশাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়—এদের পিছনে থাকে সাধনার জীবন। প্রবুদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে আরও একজনের 'সাধনার' উল্লেখ করতে হবে—তিনি পত্রিকার প্রথম পর্যায়ের সম্পাদক রাজন আয়ার। তাঁর কথায় আসার আগে পত্রিকাটির সূচনা-কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করা যাক।

প্রবুদ্ধ ভারতের জীবনের দুটি ভাগ—প্রথম ভাগ অল্পস্থায়ী—প্রায় দুই বৎসরের। দ্বিতীয় পর্বের বয়স ইতিমধ্যেই ৭০ বৎসর পেরিয়ে গেছে, ভরসা করা যায় আরও বহু বৎসর সে পত্রিকা জীবিত থাকবে। প্রবুদ্ধ ভারত এখন ইংরাজীতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মাসিক এবং ভারতবর্ষের ধর্ম- ও দর্শন-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ।

প্রবুদ্ধ ভারতের পরবর্তী মর্যাদা তার সূচনাপর্বে আরোপ করার প্রয়োজন নেই—পত্রিকাটি প্রথমাবধি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নিজ সামর্থ্যে, এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই পত্রিকার তৎকালীন পরিচালকবর্গ যখন সম্পাদকের মৃত্যুর কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করেন, তখন সংযত গর্বের সঙ্গে তাঁরা পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য বিক্রয়সংখ্যা এবং আর্থিক সাফল্যের বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

প্রবুদ্ধ ভারত মাদ্রাজেই শুরু হয়, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, স্বামীজীর অনুমোদনে তাঁর মাদ্রাজী ভক্তদের দ্বারা। এর কয়েক মাস আগে মাদ্রাজ থেকে স্বামীজীর ভক্তরা 'ব্রহ্মবাদিন' প্রকাশ করেছেন, সে ক্ষেত্রে আবার নতুন একটি ইংরাজী পত্রিকা বার করার কারণ কি? সে কারণ কি আলাসিঙ্গার সঙ্গে বন্ধুদের মতভেদ? তা নয় বলেই বোধ হয়, কারণ আলাসিঙ্গার বিষয়ে যে সকল লেখা পাচ্ছি, সেগুলিতে আছে প্রবুদ্ধ ভারত আরম্ভের পিছনেও আলাসিঙ্গার ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। এ বিষয়ে এম. জি. শ্রীনিবাসন লিখেছেন।

"The Prabuddha Bharata also owes its origin to Alasinga. It was he who first proposed that as the *Brahmavadin* was of a more advanced standard, generally suitable to Vedantic scholars and elderly persons, another journal in English should be started for the benefit of youths and less educated persons containing simpler and less scholarly contributions. It was Alasinga who selected B. R. Rajan Iyer as the first Editor of the *Prabuddha Bharata*, which was started in the year 1896 through the joint efforts of Alasinga, Dr. Nanjunda Rao and G. G. Narasimhachar." (P. B. Aug 1947)

শ্রীনিবাসনের বক্তব্য সত্য বলেই মনে হয়. কারণ আমরা দেখেছি, স্বামীজী বারবার চিঠিতে ব্রহ্মবাদিনের দুরূহ প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। বেদান্তের সত্যকে সবমানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে

১ 'দিনমণি' পত্রিকার পূর্বকথিত প্রবন্ধেও একই তথ্য আছে। সম্ভবতঃ শ্রীনিবাসন 'দিনমণির' বিবরণের উপরই নির্ভর করেছেন এখানে।

নিশ্চয় ঐ কঠিন রীতিতে রচিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি উপযোগী ছিল না। অপরপক্ষে 'ব্রহ্ম-বাদিন' তার গুরুভার দার্শনিক আলোচনাদির জন্য ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে যে সমাদর পেয়েছে, তাও সরলীকরণের ফলে নষ্ট হবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পত্রিকার কথা ওঠে, এবং আলাসিঙ্গার মাথাতেও উঠতে পারে।

কিন্তু ব্যাপারটি আলাসিঙ্গার মাথাতেই উঠেছিল, ঠিক এমন কোনো সমসাময়িক প্রমাণ আমরা পাইনি। স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের প্রারম্ভিক পরিকল্পনার কথাই পেয়েছি। অবশ্য ডাঃ রাওয়ের পিছনে আলাসিঙ্গা থাকতে পারেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিলের স্বামীজীর চিঠিতে প্রথম এই কাগজটির পরিকল্পনার উল্লেখ দেখি। স্বামীজী ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে নিউইয়র্ক থেকে লিখলেন :

"ছেলেদের প্রস্তাবিত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং তা চালিয়ে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও ক'রব। আপনার উচিত 'ব্রহ্মাবাদিন'-এর ধারা অবলম্বন ক'রে কাগজটাকে স্বাধীনমতাবলম্বী করা; কেবল ভাষা ও লেখাগুলো যাতে আরও সহজ-বোধ্য হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব অপূর্ব গল্প ছড়ানো আছে, তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় করা দরকার; এই একটা মস্ত সুযোগ রয়েছে, যা হয়তো আপনারা স্বপ্নেও ভাবেননি। এই জিনিসটাই আপনাদের কাগজের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন সময় পাবো, তেমন আপনাদের জন্য আমি যত বেশী পারি গল্প লিখব। কাগজটাকে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তার জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' রয়েছে। এভাবে চললে কাগজটা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। ভাষাটা যতদূর সম্ভব সহজ করবেন, তা হলেই আপনারা সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্ববহুল মোটেই করবেন না। লেনদেনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাখবেন—'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।

এই চিঠি থেকে দেখা যায়, আলোচ্য পত্রিকার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ননজুণ্ডা রাওয়ের, এবং স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের ক্ষেত্রে যেমন আলাসিঙ্গাকে ভারার্পণ করেছিলেন, এক্ষেত্রে ননজুণ্ডার উপর তেমনি ভার দিলেন। আমাদের অনুমান, ননজুণ্ডাই এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।[২]

স্বামীজীর চিঠির উদ্ধৃত অংশ থেকে দেখা যায়, তিনি পরিষ্কারভাবে ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে আলোচ্য পত্রিকার চরিত্রগত পার্থক্য দেখিয়েছিলেন, এবং সংস্কৃতসাহিত্যে ছড়ানো 'অপূর্ব গল্পরাজি'কে জনপ্রিয় করে তোলা যে পত্রিকাটির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত—তাও জানালেন।

আরও একটি জিনিস পেলাম—স্বামীজী পত্রিকাটিকে 'সাহায্য' করার প্রতিশ্রুতি দিলেও

---

২ টাকাকড়ির ব্যাপারে এঁকে পুনশ্চ স্বামীজীর দৃঢ় নির্দেশ—"ভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব একটা দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। কাজকে ঠিক ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতর বন্ধুত্বের অথবা চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। যার ওপর ভার থাকবে, সে সব টাকাকড়ির অতি পরিষ্কার হিসেব রাখবে; এমন কি যদি কাউকে পরমুহূর্তে না খেয়ে মরতে হয়, তবুও 'শাকের কড়ি মাছে' দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা।"

পত্রের শেষাংশে জানালেন, সে-সাহায্য আর্থিক নয়, অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো আর্থিক সাহায্য করতে পারবেন না, আর্থিক সাহায্য করতে সমর্থ এমন লোক জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। এই পত্রিকাটিকে স্বামীজী প্রথম পর্যায়ে আর্থিক সাহায্য করেছেন, এমন উল্লেখ পরবর্তী কোনো চিঠিতেও পাই না।

স্বামীজী যদি পত্রিকাটিকে আর্থিক সাহায্য না করে থাকেন, তার একমাত্র কারণ, দেবার মত টাকা তাঁর হাতে ছিল না। শেষের দিকে আমেরিকায় তিনি বিনা অর্থে শিক্ষা দিয়েছেন। কিভাবে দিয়েছেন তা তাঁর জীবনী-গ্রন্থগুলিতে বিশেষভাবে আলোচিত। কিন্তু স্বামীজীর যথেষ্ট আগ্রহ ও সমর্থন ছিল পত্রিকাটি সম্বন্ধে। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা, ব্রহ্মবাদিনের মতই এই পত্রিকাতে বেরিয়েছে, এবং তিনি তাঁর একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষা—সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের গল্পরচনা—এই পত্রিকা মারফত পূরণ করবেন, একথা অনেকবার বলেছেন।*

সবচেয়ে বড় কথা, স্বামীজী তাঁর শ্রেষ্ঠ দান দিলেন পত্রিকাটির জন্য—তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে বাঙ্ময় করে পাঠালেন ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের আত্মাকে জাগাতে—

"বীরের মত এগিয়ে চলুন। এক দিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হউন; ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চিরবিশ্বস্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। মনে রাখবেন ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নহে। **এই চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই উদ্বেগ ও ঈর্ষার ভাব মনে উঠবে, তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন।** ঈর্ষাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের কারণ। এ থেকেই আমাদের জাতির সর্বনাশ। এটি সর্বদা পরিত্যাজ্য। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক; আপনার সাফল্য কামনা করি।"

[স্থূলাক্ষর লেখকের নির্দেশে] (১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬—৭-২৩৬)

আরও একবার স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ব্রহ্মবাদিনের জন্য যে 'মন্ত্র' দিয়েছিলেন, ননজুণ্ডাকেও সেই মন্ত্র লিখে পাঠালেন—

"চাই অদম্য উৎসাহ। যখন যা কর, তখনকার মতো তাই হবে ভগবৎসেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মতো আপনার আরাধ্য-দেবতা হোক, তাহলেই সফল হবেন।"

প্রবুদ্ধ ভারতের আলোচনা স্বামীজী যে কটি চিঠিতে করেছেন, তার বেশ কয়েকটিতে একটি বিশেষ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল—

---

* স্বামীজীর এই ইচ্ছাকে, তাঁর আরো অনেক ইচ্ছার মত ফলবতী করে তোলেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর **Cradle Tales of Hinduism** প্রভৃতি গ্রন্থে। স্বামীজীর কাছে শোনা বহু গল্প এই গ্রন্থে দিয়েছেন, একথা ভগিনী তাঁর নানা পত্রে জানিয়েছেন। স্বামীজী ১৮৯৬ সালে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠিতে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গল্প লেখার ইচ্ছার কথা বলেছেন—('আমি একটু সময় পেলেই প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য কয়েকটি গল্প লিখব'); পুনশ্চ ২৮ অক্টোবর লিখেছেন—'প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি গল্প আরম্ভ করেছি, শেষ হলেই পাঠিয়ে দেব'; প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি সহজ প্রবন্ধ বা বক্তৃতা প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপতে নির্দেশ দিতেন, যেমন—আলাসিঙ্গাকে ২২ সেপ্টেম্বর '৯৬ তারিখে লিখেছেন, 'জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পারো আর ননজুণ্ডা রাও প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপাতে পারেন।' প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত স্বামীজীর রচনার চরিত্র পাঠক মূল গ্রন্থ (Vivekananda in Indian Newspapers) থেকে দেখে নেবেন।

বিস্ময়ের এবং কৌতুকের কথা তা হল—'মলাট সমালোচনা।' এখানে পুনশ্চ আরও একটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাচ্ছি—কলাশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ। পরে তার বিস্তারিত আলোচনা করব—এখানে তাঁর এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যমাত্র উদ্ধৃত করছি। এই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেব—কিছু পূর্বে ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-সব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি—সেখানেও প্রচ্ছদের ব্যাপারে স্বামীজীর মনোযোগের কথা আছে।[৪] স্বামীজী ১৪ জুলাই ১৮৯৬, প্রবুদ্ধ ভারতের[৫] প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যা পেয়ে যে পত্র লেখেন, তার সবটাই পত্রিকার বিষয়ে আলোচনা। তিনি আমাদের উল্লিখিত প্রচ্ছদ-পত্রের বিষয়ে বলেন—

"একটি বিষয়ে কিন্তু আমায় একটু মন্তব্য করতে হ'ল—মলাটটা একেবারে রুচিহীন—অতি বিশ্রী ও কদর্য। সম্ভব হ'লে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন—আর এতে মানুষের মূর্তি মোটেই রাখবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই প্রবুদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিরাও নন, ইওরোপীয় দম্পতিও নন। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি বনের ছবি আঁকুন দেখি। কত ভাবই তো রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। লণ্ডনের গ্রীনম্যান কোম্পানি যে 'রাজযোগ' ছেপেছে, তাতে আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন—আপনি বম্বেতে তা পাবেন। আমি নিউইয়র্কে রাজযোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সেগুলি এই পুস্তকে আছে।"

যে উচ্চ শিল্পবোধ থেকে স্বামীজী প্রবুদ্ধ ভারতের প্রবন্ধ সমালোচনা করেছিলেন—সে রসদৃষ্টি তখন ভারতবর্ষে ছিল না। স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্তেরা এই মলাটটির শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। চিত্রটির মধ্য দিয়ে তাঁরা একটা বিরাট বক্তব্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তা তাঁরা প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যার সূচনাপত্রেই লিখে জানিয়েছিলেন।

"Here is the wonder of Providential disposition, that the eyes of the western world were themselves turned towards India, turned, not as of old for the gold and silver she could give, but for the more lasting treasures contained in her ancient sacred literature. Christian Missionaries in their eagerness to vilify the Hindu, had opened an ancient magic chest, the very smell of whose contents caused them to faint. Oriental scholars, the Livingstones of Eastern literature, had unwittingly invoked a deity which it was not in their power to appease. As philologists are succeeded by philosophers, Colebrookes and Caldwells give birth to Schopenhaurs and Deussens. *The white man and fair*

---

৪ ২৪ অক্টোবর ১৮৯৫, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৯৫-এর চিঠি দ্রষ্টব্য।

৫ ডাঃ ননজুণ্ডা রাও নূতন পত্রিকার নামের ব্যাপারে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটিকে গ্রহণ করেছিলেন। পাঠকদের জানা আছে, এই নামটি স্বামীজী মাদ্রাজের প্রস্তাবিত সংঘের জন্য দিয়েছিলেন। পত্রিকার জন্য এই নামটি স্বয়ং স্বামীজী দিতে বলেন, অথবা স্বামীজী-রচিত সংঘের নামটি ননজুণ্ডা গ্রহণ করেন, জানা যায়নি।

lady stray into the Indian woods and there come across the Hindu sage under the banyan tree. The hoary tree, the cool shade, the refreshing stream, and above all the hoarier, cooler and more refreshing philosophy that falls from his lips. enchant them. The discovery is published; pilgrims multiply. A Sanyasin from our midst carries the altar-fire across the seas. The spirit of the Upanishads makes a progress in distant lands. The procession develops into a festival. Its noise reaches Indian shores and behold, our Motherland is awakening." (Italics are mine)

(*Ourselves* : P. B. July, 1896)

উপরের বক্তব্য কিভাবে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছিল, তা গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত প্রতিলিপি থেকে পাঠকগণ দেখে নেবেন। সম্ভবতঃ ছবিটিতে সে যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের মান অনুযায়ী দর্শনীয় কিছু ছিল, নচেৎ পুণার বিশিষ্ট পত্রিকা 'মারহাট্টা' অবিলম্বে প্রবন্ধের প্রশংসা করে লিখত না—'The front page is almost picturesque'—, এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে এই ধরনের প্রশংসা মুখে বা লেখায় পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট পেয়েছিলেন;—এক্ষেত্রে তাই পত্রিকার 'প্রাণপুরুষে'র নিন্দাটা বড় বেজেছিল সংগঠকদের কাছে। নিশ্চয় তাঁরা স্বামীজীকে ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজী ২৬শে আগষ্ট উত্তরে জানালেন—

"মলাটের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, ওটি বড্ড রঙচঙে, চটকদার (tawdry); আর তাতে অনাবশ্যক একগাদা মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। নকসা হওয়া চাই সাদাসিধে, ভাবদ্যোতক অথচ সংক্ষিপ্ত (condensed)।"

এই মলাট সমালোচনা করে স্বামীজীর বোধ হয় আশঙ্কা হল—এর দ্বারা উল্টো উৎপত্তি না হয়! গৌণ বস্তুর বিরুদ্ধে আপত্তি যেন মুখ্যের ব্যাপারে সংগঠকদের নিরুৎসাহ করে না তোলে। সুতরাং ঐ পত্রেই তিনি লিখলেন—

"বীরের মত কাজ ক'রে চলুন; (মলাটের) নক্সা-টক্সার চিন্তা এখন থাক, ঘোড়া হ'লে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে যান—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের সঙ্গে কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সত্য প্রচার করে মরা ভাল—ঢের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন।"

তাহলেও শিল্পবোধ এমন একটা জিনিস, যার বিষয়ে আপস চলে না। প্রচ্ছদ-ব্যাপারটা স্বামীজীকে কাঁটার মত বিঁধছিল। তিনি ননজুণ্ডাদের উপর এ বিষয়ে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কিছুদিন পরে একটি চিঠিতে (চিঠিটি লণ্ডন থেকে লেখা; তারিখে ১৮৯৬ আছে, দিন বা মাস দেওয়া নেই) আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—"তোমার (অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিনের) ও প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য লোহার ব্লক সমেত নক্সা পাঠাব।"

এই ব্লক ও নক্সা স্বামীজী সত্যই পাঠিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি।

॥ ৩ ॥

পত্রিকা আরম্ভের পূর্বে ব্রহ্মবাদিনের মতই এই পত্রিকার প্রসপেকটাস বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। বিস্ময়ের কথা, পত্রিকার মুখ্য

সংগঠক ডাঃ ননজুণ্ডার নাম স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নেই। অপরপক্ষে ডাঃ ননজুণ্ডার স্বাক্ষর কিন্তু ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটাসে ছিল। প্রবুদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারীদের নাম—"P. Aiyasani, M.A., B.L., B. R. Rajan Ayer, B.A, G. G. Narasima Charya, B.A., B. V. Kamesvara Iyer, B.A.।" এঁরা কেউই ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটাসে স্বাক্ষরকারী ছিলেন না। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় এই দুটি কাগজ সমবেত সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল।

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস *Indian Mirror*-এ প্রকাশিত হয় ১৪ জুন, ১৮৯৬। অন্যান্য পত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। মিরারে ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্কের বিষয়ে লেখা হয়—"It will be a sort of supplement to the *Brahmavadin* and seek to do for students, youngmen and others, what that is already doing so successfully for the more advanced classes." এই উদ্দেশ্যের জন্য পত্রিকাটির রচনাগুলি হবে—"Simple, homely and interesting" —এর মধ্যে "Pouranic and classical episodes illustrative of those great truths and those high ideals" থাকবে। প্রসপেকটাসে পত্রিকার ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থনের কথা জানানো হয়, এবং যেহেতু এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনো 'personal gain' করবার ইচ্ছা নেই, তাই এই মাসিক পত্রিকার চাঁদা নির্ধারিত হয় 'at the very low figure of Re 1/8 per annum, including postage.'

প্রসপেকটাসে যে-সব কথা বলা হল, তা যে স্বামীজীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে লিখিত তা সহজেই বোঝা গেছে পূর্বোদ্ধৃত স্বামীজীর পত্রাংশের সাহায্যে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার একেবারে গোড়ায় '*ourselves*' নামে যে সম্পাদকীয় বিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে আরও বিস্তারিতভাবে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও ভাবী কার্যক্রমের আলোচনা করা হয়েছিল এবং ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে স্বামীজী এ ব্যাপারে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তার থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃত করে স্বামীজীর নির্দেশগুলি তুলে ধরা হয়েছিল বিস্তারিতভাবে। সেই দীর্ঘ সম্পাদকীয়—যাতে বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্ত আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করার চেষ্টা ছিল—আমরা উদ্ধৃত করছি না, তবে ভারতবর্ষে কোন্ সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় পত্রিকাটির উদ্ভব হল, তা দেখাতে উক্ত রচনার প্রথম অনুচ্ছেদটি উপস্থিত করা প্রয়োজন :

"The ready response with which our prospectus has been favoured on all sides, the eagerness with which our movement has been welcomed, and the support that has been generously promised to us in several quarters, all show that the time is ripe for similar undertakings, that there is a real demand in the country for spiritual nourishment—for the refreshment of the soul. But a few years ago, *Prabuddha Bharata* or the *Brahmavadin* would have been utterly impossible. The promise of many a western 'ism' had to be tried, and the problem of life had itself been forgotten for a while in the noise and novelty of the steam-engine and the electric tram; but unfortunately steam-engines and electric trams do not clear up the mystery; they only thicken it. This was found out, and a cry, like that of the hungry lion, arose for religion and

things of the soil. Science eagerly offered its latest discoveries, but all its evolution theories and heredity doctrines did not go deep enough. Agnosticism offered its philosophy of indifference, but no amount of that kind of opium-eating could cure the fever of the heart. The Christian Missionary offered his creed, but as a creed it would not suit; India had grown too big for that coat." (*Ourselves :* P. B. July, 1896)

ব্রহ্মবাদিনের মতই প্রবুদ্ধ ভারতও তার আবির্ভাবে সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিল নানা পত্রিকায়। নিছক সাংবাদিক ভদ্রতা থেকে ঐ অভ্যর্থনা জানানো হয়নি, আসলে অভ্যর্থিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলন, যা অনেকের কাছে ভারতের নবজাগরণের আন্দোলন। নচেৎ প্রবুদ্ধ ভারতের আবির্ভাবে পত্রে পত্রে দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচিত হত না নিশ্চয়।[৬]

প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রবুদ্ধ ভারত যে সাফল্য অর্জন করেছিল, তা সত্যই 'অভাবিত', কারণ দেখা যাবে এক বৎসরের মধ্যে এই পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে 'সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা'! বর্ষপূর্তিতে এই পত্রিকায় যে 'Retrospect' লেখা হয়, তার থেকে ঐ সংবাদ পাই। পঁচিশ বছর বয়সের সম্পাদক ঐ সংবাদ জানাতে গিয়ে খুবই ভাবাবেগ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, ২৫ বছরের পক্ষে যা স্বাভাবিক; তিনি সহকর্মীদের 'sincerity of purpose and purity of heart'-এর প্রশস্তি না করে পারেননি। স্বামীজীর আশীর্বাদই যে পত্রিকার সাফল্যের মূলে, তাও জানানো হয়েছিল। রচনাটি অবশ্যই আবেগে অসংযত, নিজেদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসের ঘোষণায় কিছু উচ্চভাষিত—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, এই ধরনের উচ্চভাষণের মূলে যে আদর্শ ও আত্ম-বিশ্বাস থাকে তাই জগৎকে নাড়া দেয় চিরদিন। রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম বর্ষপূর্তি ঘটল। এবার নিশ্চয় প্রশ্ন করার সময় এসেছে—এইকালে আমরা কী শিখেছি? আমরা নিজেদের এই প্রশ্ন করেছি। উত্তরে বলতে পারি, শিখেছি অনেক কিছুই। বাস্তবিক পক্ষে, এই পত্রিকার ক্ষুদ্র ইতিহাস প্রচুর শিক্ষাপ্রদ; তার মধ্যে সর্বপ্রধান একটি শিক্ষা, যা আমরা অর্থাৎ পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট সকলে পেয়েছি এবং যে-শিক্ষাকে আমরা যদি জীবনের শেষ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারি আমাদেরই মঙ্গল হবে, সে শিক্ষা হল—উদ্দেশ্য-নিষ্ঠা ও হৃদয়ের পবিত্রতা এই 'লৌহ যুগে' পর্যন্ত অলৌকিক কাণ্ড ঘটায়। যখন আমরা পত্রিকাটি আরম্ভ করেছিলাম তখন পৃথিবী উদ্ধার করব—এ জাতীয় বিরাট কোনো ভাববিলাস আমাদের ছিল না। আমরা শুধু চেয়েছিলাম নিজেদের উন্নতি করতে—আমাদের কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, যা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর তা হয়ত অন্য কারো কারো পক্ষেও মঙ্গলকর হতে পারে। নামযশ, প্রতিপত্তি, টাকাকড়ি প্রভৃতি কিছু লাভ করার উদ্দেশ্যও আমাদের ছিল না। পত্রিকাটি আরম্ভ করার বাসনা যেন আমরা দৈববশে পেয়ে গিয়েছিলাম, এবং ভবিষ্যতে এর ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন,

---

[৬] মারহাট্টা, ১৮৯৬, ১২ জুলাই, ইণ্ডিয়ান মিরার, ১৪ জুন, মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল, অক্টোবর, ১৮৯৬ সংখ্যায় এই পত্রিকাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ব্রহ্মবাদিন, ৪ জুলাই সংখ্যায় স্বভাবতই এই পত্রিকার পরিচয় দিয়েছিল।

এই কাজে যে সম্পূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে আমাদের প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। পত্রিকা আরম্ভ করার সময়ে আমরা রাজসিক আত্মবিশ্বাস বা তামসিক উচ্চাশা—উভয় বন্ধ থেকেই সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম। আমাদের মানসিক অবস্থা যখন এমন শান্ত ও পরিতৃপ্ত, যার স্মৃতি আমরা চিরদিন আনন্দে রক্ষা করব, আমরা 'যথাস্থান' থেকে অনুমতি চেয়েছিলাম, তা পেয়েছিলাম, এবং 'সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল।'" (অনূদিত)

যেখানে এহেন 'উদ্দেশ্য-নিষ্ঠা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা', সেখানে বহুজন অবিলম্বে আকৃষ্ট হবেনই, তাঁরা সহানুভূতি ঢেলে দেবেনই, যার ফলে পত্রিকার অচিরে 'অভাবনীয় সাফল্য' ঘটে যাবে।—

"একেবারে শুরুতেই আমাদের গ্রাহক-সংখ্যা ১৫০০, প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে তা বেড়ে এখন ৪,৫০০। এর দ্বারা আমাদের পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা।" (অনূদিত)

সম্পাদক অতঃপর বিখ্যাত ব্যক্তিদের বা পত্রিকার কিছু কিছু প্রশংসাবাণী সংকলন করে দিয়েছিলেন। সেগুলি মূলেই উপস্থিত করছি :—

"Mr. H. Dharmapala, General Secretary, Mahabodhi Society, wrote, for instance—"All hail to the *Prabuddha Bharata.*···May its mellifluous fragrance purify the materialistic atmosphere of fallen India. Your efforts will be crowned with success and *Prabuddha Bharata* will surely awaken the lethargic sons of *Bharatvarsha.*"

"The following were some of the opinions with which we were favoured—

"Mrs. Besant—"I think it is admirably written and edited and should be most useful to our beloved India."

"The Harbinger of Light—"The ideal is beautifully expressed in the leading article as 'one, where religious toleration, neighbourly charity, and kindness even to animals form the leading features, where the fleeting concerns of life are subordinated to the eternal, where man strives not to externalize but to internalize himself more and more, and the whole social organism moves, as it were, with a sure instinct towards God.' The method of introducing this ideal adopted by the paper is a novel one, it is principally in the form of parables, or short stories embodying some principles or philosophical ideas.···It is a pleasant attractive form of presenting truth, and in these novel-reading days will command more attention than the gist of it if presented unclothed."

"Benry B. Small, late Secretary, Agricultural Department, Canada—"I think that *Awakened India* is a wonderful issue and full of materials that should be valued alike by Christians and all others."

"Coulson Turnbull, Ph. D.—"I am very much pleased with the *little gem* and when I return home (Chicago) shall try to assist its sale." "

সবশেষে, এই বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সম্পাদকীয়তে নিজেদের নিষ্কাম কর্মসাধনার

কথা জানিয়ে পত্রিকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সানন্দে জানানো হয়েছিল—

"বর্তমানে পত্রিকাটির যে রূপ, একে তার চেয়ে আকর্ষণীয়, শিক্ষাপ্রদ এবং পাঠযোগ্য করে তুলতে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না, একথা জানাতে পারি। বেদান্ত বিষয়ে সুপরিচিত লেখকদের সহযোগিতালাভের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, এবং যদি ঈশ্বরেচ্ছা থাকে, পত্রিকাটি সর্বদিকে উন্নত হয়ে উঠবে। আমাদের পক্ষে এইটুকু বলতে পারি, প্রচণ্ড উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা নিয়ে আমরা কাজ করে যাব, ফল যাই হোক না কেন।" (ক্রমশঃ)

প্রজ্ঞা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

মন্ত্রে সে তো উচ্চারিত করেছে সত্যকে
সনাতন আঙিনায়, স্থির শান্ত চোখের দৃষ্টিকে
মেলে দিয়ে সুদূরের দিগন্তের পানে।
সে দৃষ্টিতে অন্ধকার হ'লো পুণ্য শ্লোক :
ভীতি নেই, নেই কোনো শোক।

চেতনার ভোর থেকে অনেক মৃত্যুর ফেনা
তমসার কৃষ্ণ পক্ষ দিয়ে
করেছে ভ্রূভঙ্গী তাকে, তবু তার প্রশান্তির নীড়
যায় নিকো ভেঙে, শুধু তার গূঢ় অনুভব নিয়ে
কালের কুয়াশা ছিন্ন ক'রে,—
আশ্চর্য শিল্পীর মতো সত্যকে তুলেছে শুধু ধ'রে
আমাদের চোখের সম্মুখে ;
পাই নিত্য স্পর্শ তার ধ্রুবজ্যোতি নক্ষত্রের অম্লান আলোকে।

সমালোচনা

Swami Vivekananda in East and West : প্রকাশক—রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার, ৬৮ ডিউকস এভেন্যু, লণ্ডন এন্‌ ১০ ও ৫৪ হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লয়ু ১১; মূল্য কাপড়-বাঁধাই ও কাগজ-বাঁধাই যথাক্রমে ১৮৲ ও ১২·৫০। পুস্তকটি উদ্বোধন কার্যালয়েও পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা পরিশিষ্টসহ ২২৩।

এক অনাস্বাদিত বিস্ময় নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল বিশ্বে। বিবেকানন্দ-মানস এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দুরবগাহী যে, উহার বিশ্লেষণ এক কঠিন দুঃসাধ্য প্রয়াস। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিবেকানন্দের ভাব, চিন্তা, আদর্শ ও অবদান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে ১১টি প্রবন্ধে। লেখকদের মধ্যে আছেন উদ্বোধনের প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সহ ৪ জন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী, প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ এ. এল্‌. ব্যশাম সহ ৫ জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এবং বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের সক্রিয় রূপকার শ্রী টি. এস্‌. অবিনাশিলিঙ্গম্‌।

সকল লেখকই স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনার উপর আধারিত প্রত্যেক প্রবন্ধই সুলিখিত। ভাষা প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যের জটিলতা থেকে মুক্ত। লেখকগণ স্বকীয় প্রত্যয়-প্রকাশে কুণ্ঠাহীন। ১১টি প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হচ্ছে : (১) Vivekananda and the Unity of Churches and Religions (Rev. Sidney Spencer), (২) Swami Vivekananda's Universality (Swami Satprakashananda), (৩) Swami Vivekananda : A Moulder of the Modern World (A. L. Basham).

গ্রন্থটির পরিশিষ্টে আছে লণ্ডনস্থিত ভূতপূর্ব ভারতীয় হাইকমিশনরদ্বয় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও এম্‌. সি. চাগলা, বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা ৺সি. পি. রামস্বামী আয়ার এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ইংরেজ শল্যচিকিৎসক ৺কেনেথ ওয়াকারের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বামীজীর বহুমুখী মনীষার পরিচয়ে ইচ্ছুক যাঁরা তাঁদের নিকট এই স্বল্প পরিসরের পুস্তকটি অবশ্য পঠিতব্য। বইটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ১৯৬৮র শেষভাগে প্রকাশিত হলেও বইটি স্বামীজীর জন্মশতবর্ষস্মরণেই রচিত হয়েছে। —স্বামী বীতশোকানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য : প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক —লেখাপড়া : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ৮·০০।

তরঙ্গের উত্থান-পতন আছে। ইতিহাসের কাল-তরঙ্গও উত্থান-পতনশীল। একটি দেশ বা জাতি এই তরঙ্গের তালে ওঠে বা নামে। সেই সূত্রেই নির্মিত হয় দেশ বা জাতির ইতিহাস। বাংলাদেশের প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষের ইতিবৃত্তে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দ এইরূপ একটি উন্নমনের কাল। প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে এই শতকে বাঙালীর যে 'মানস জাগরণ' ঘটে, তার ইতিহাস বিস্ময়কর ও অপূর্ব। ইউরোপীয় স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ, মানবকেন্দ্রিক ধর্ম ও সমাজভাবনা এদেশের চিরপ্রচলিত সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বুদ্ধি এবং ভাবপ্রবণ অন্তরে যে প্রোজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তারই উদ্ভাস এ যুগের সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য-চিন্তা। বহুবিচিত্র মানব-মনীষার আবির্ভাবও

এই তুঙ্গশীর্ষ তরঙ্গান্দোলনের ফলশ্রুতি।

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উনিশ শতকে বাঙালীর সেই নবজাগরণোৎসবের কয়েকটি দিকের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। এই চিত্রাঙ্কণে বিশেষ করে প্রাধান্য লাভ করেছে বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য। তিনি দেখিয়েছেন, উনিশ শতকে বাঙালীর চিন্তাধারাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে অধ্যাত্ম-ভাবনা। নব্য বঙ্গে প্রগতির মূল প্রেরণা শুধু বিজ্ঞান বা মানবিকতা নয়, মৌল প্রেরণা নিহিত রয়েছে অধ্যাত্ম-অনুসন্ধিৎসায়। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, সাহিত্য-চিন্তা সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে ভারতীয় জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা—ধর্ম-জিজ্ঞাসা। এই মর্মগত মৌল সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক উনিশ শতকের নয়জন বিশিষ্ট চিন্তানায়কের কর্ম-সাধনাকে অবলম্বন করেছেন: তাঁরা হলেন—রামমোহন, ডিরোজিও, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সাধনা বিভিন্নমুখী, প্রচেষ্টা পৃথক; সংহারে, সংস্কারে ও সংগঠনে তাঁদের প্রয়াস বহুবিচিত্র। কিন্তু সুরের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তায় সৃষ্ট হয়েছে একটি ঐকতান, যা সমস্ত চিন্তাধারাকে মিলিত করে এক অধ্যাত্ম-সাগর-সঙ্গমতীর্থের দিকে চালিত করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর 'মনন ও সাহিত্য'—এই দুটি বিষয়ই অধ্যাপক শ্রীঘোষের আলোচ্য। এই আলোচনায় তিনি মূলতঃ কবি-ব্যক্তিত্বের গভীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য খণ্ডে তিনি প্রধানতঃ বাংলা গদ্যে যে মননের প্রকাশ ঘটেছে, তারই দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও ভূদেব বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে যে মুদ্রাচিহ্ন রেখে গিয়েছেন লেখক তার দিঙ্‌নির্দেশ করেছেন। কিন্তু লেখকের এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মনীষীর মনন-ব্যক্তি যেরূপ প্রাধান্য পেয়েছে, সাহিত্য-ব্যক্তি তার তুলনায় অতি গৌণ স্থান লাভ করেছে। এতে হয়তো সাহিত্য-রসপিপাসু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শ্রীঘোষের এই আলোচনা তাঁর বিরাট পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র এবং সাহিত্য-কৃতির পরিচয় নয়, তার উৎস ও স্বরূপ নির্দেশ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি অনায়াস সঞ্চরণে সার্থকভাবেই সেই লক্ষ্য ভেদ করেছেন।

পরিশেষে, এই গ্রন্থরচনায় গ্রন্থকর্তার মানস-প্রবণতাও উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে সেই প্রত্যয়ের চিহ্ন গভীরভাবে মুদ্রিত। এই প্রত্যয় দীপ্ত কবিত্বময় ভাষায় সুপ্রকট হয়েছে 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা: শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক শেষ নিবন্ধটিতে। 'আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন' থেকে শুরু করে রাজনারায়ণ-ভূদেব পর্যন্ত অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানের যাবতীয় ধারাপ্রবাহ যেন সার্থক ভাবে মিলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অদ্বৈতানুভবমিশ্র জীবসেবার মুক্ত-বেণীতে। নব্যবঙ্গের সাধন-মননের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাও এইখানে। লেখক দ্বিধাহীন ভাষায় তাঁর এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। লেখকের প্রতিটি যুক্তি ও বিশ্লেষণ এই প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বিষয়-পরিবেশন যেমন মনোজ্ঞ হয়েছে, প্রকাশের ভাষাতেও এসেছে প্রশান্ত প্রসন্নতা। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-পরিচয়—শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীক্ষিতীশ গুপ্ত। প্রকাশক: জাহ্নবী সাহিত্য মন্দির, ৫ শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা ৩০। পৃষ্ঠা—১৩৮; মূল্য চার টাকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থ-সমূহে 'রবীন্দ্র-পরিচয়' একটি নূতন সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ কিরূপ পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়া আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, গ্রন্থখানিতে সেই কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। 'রবীন্দ্রজীবনের ঘটনা ও রচনাপঞ্জী'-শীর্ষক তথ্যপূর্ণ পরিচ্ছেদটি হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হইবে। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে কবির সাহিত্যকর্মের পরিচয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। রূপদান্ন রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। সর্বতোমুখী প্রতিভাধর ও বিরাটব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠক-সাধারণের যে অনুসন্ধিৎসা তাহা এই পুস্তকখানির মাধ্যমে অনেকাংশে তৃপ্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

নিত্যানন্দ-বিদ্যায়তন পত্রিকাঃ (১৯৬১-১৯৬৬) এড়গোদা নিত্যানন্দ বিদ্যায়তন, ডাকঘর—পরীহাটা, জেলা—মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত।

নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত চারিখানি পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের সাহিত্য-চর্চার পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শিক্ষকগণের লেখাগুলি সুচিন্তিত। 'ইচ্ছা করলে আমরাও বড় হতে পারি'—প্রবন্ধটি ছাত্র-গণের আত্মবিশ্বাস জাগাইতে সাহায্য করিবে।

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা: (১৯৬৮) তমলুক, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা—৩২

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, কবিতা, গান ও প্রবন্ধের সমাবেশে প্রকাশিত স্মারক-সংখ্যাটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও আকর্ষণীয় হইয়াছে।

গোবরডাঙা-খাঁটুরা উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা: (১৯৬৭), খাঁটুরা (গোবরডাঙা), ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা—১২৫।

ছাত্র শিক্ষক ও সুধীবৃন্দের লেখায় সমলঙ্কৃত হইয়া পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছাত্রদের রচিত অনেকগুলি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে মৌলিকতা আছে। শিক্ষক ও সুধীজনের লেখাগুলিতে চিন্তাশীলতা বিদ্যমান। ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ পত্রিকাটির আকর্ষণের বস্তু।

সারদা: (নববর্ষ সংখ্যা), ১৩৭৫—শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাচক্র, ২নং নবীনকৃষ্ণ বাবু লেন, ভদ্রকালী, হুগলী। পৃষ্ঠা—৪৪।

'সারদা' ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রের শুভ নববর্ষ সংখ্যাটি গুণিজনের রচনাসমৃদ্ধ। পরিচালকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

স্মরণিকা: (১৯৬৮)—বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র স্মরণিকাটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিপথ,' 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন, 'অনিবার্য পথনির্দেশ'—এই তিনটি প্রবন্ধ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(১) **শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন**: (বঙ্গভাষায় সূত্রাকারে রচিত) স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্কলক ও প্রকাশক: ব্রহ্মচারী অমূল্যকুমার, ডি, ৩২/১০৪, পাতালেশ্বর, বারাণসী। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা—৩২; মূল্য ৩০ পয়সা।

(২) **স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বিবেকানন্দ সোসাইটি**: শ্রীপরেশনাথ সেনগুপ্ত। বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৩৮; মূল্য ৭৫ পয়সা।

(৩) **কথামৃতকুসুমাঞ্জলি**: (পদ্যে রূপান্তরিত কথামৃতের উপদেশাবলী) সঙ্কলয়িতা: শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। পরিবেশক: টিচার্স কনসার্ন, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪০; মূল্য ১.২৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহর ও মঙ্গলঘাট অঞ্চলের বন্যার্তগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শিশুখাদ্য ৩০ টিন, সূতি কম্বল ৮০ খানি, চাষের সরঞ্জাম ৯৮৪টি এবং ছাত্রদের জন্য একসার-সাইজ বুক ১৪,৫৩৩ খানি বিতরিত হইয়াছে।

পাহাড়পুরের 'রাজবাড়ীতে' নূতন সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

গুজরাট বন্যার্তসেবা : সুরাট জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন ৩০০টি 'প্রি-ফেব্রিকেটেড সিমেন্ট কংক্রিটে'র গৃহ-নির্মাণ করিয়াছে; এগুলির মধ্যে ইতোমধ্যেই ১৮০টি গৃহ গৃহহারাদের দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আরো গৃহনির্মাণের কাজ সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

কার্যবিবরণী

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, একটি নার্সারি স্কুল এবং একটি মাতৃমন্দির (Maternity Home) পরিচালিত হইতেছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৫৭০। পাঠাগারে ৫টি দৈনিক, ২৯টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

৩ হইতে ৭ বৎসরের শিশুদিগকে নার্সারি স্কুলে ভর্তি করা হয়। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০২; তন্মধ্যে ৭৬ জন বালক এবং ২৬ জন বালিকা। ২৩ জন হরিজন বালকবালিকা এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। নার্সারি স্কুলটির নাম 'সারদা শিশুবিহার'। 'বাল-উদ্যান' নামে শিশুদের খেলাধুলার জন্য একটি পার্ক করা হইয়াছে, এখানে খেলার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। শিশুদিগকে গ্রীষ্ম- ও শীত-বস্ত্র দেওয়া হয়। তাহাদের পুষ্টির জন্য প্রতিদিন দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মাতৃমন্দিরে অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৩২ ও ২১৬।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্টজন্মদিন প্রভৃতিও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শাস্ত্র-ক্লাস, আলোচনা ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করা হইয়া থাকে।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৭ মার্চ, ১৯৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা ছিল মাত্র ৩২। বর্তমানে স্যানাটোরিয়ামে ২৫০টি শয্যা আছে; তন্মধ্যে ২৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডে, ১৩টি কেবিনে ও ৭টি কুটিরে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা আছে।

আরোগ্যলাভের পর রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। রোগমুক্ত রোগী-দিগকে ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, নার্সিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ার-হাউস, ওয়াটার-ওয়ার্কস, পোলট্রি-ফার্ম, টেলারিং প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৭৮, তন্মধ্যে ৩৯০ জন রোগীকে ভরতি করা হয় এবং ১৮৮ জন রোগী পূর্ববৎসরে ভরতি হইয়াছিল। ৩৩৩ জন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায় এবং বর্ষশেষে ২৪৫ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। ৭৬ জন রোগীর অস্ত্রোপচার, এক্স-রে বিভাগে ৪,৩২৬টি এক্স-রে এবং ল্যাবরেটরিতে ১৬,২৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ৮৬ জন রোগী সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং ১৪ জন রোগী কম-খরচে চিকিৎসিত হয়; কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে বিনা-ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে এতগুলি রোগীকে অন্তর্বিভাগে চিকিৎসালাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বদান্যতায় ১৪৫টি ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা-খরচে চিকিৎসার অগ্রাধিকারলাভের সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামের বহির্বিভাগস্থ চিকিৎসালয়ে ৫০৫ জন যক্ষ্মারোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত ৯১৭ ব্যক্তি বিনা-খরচে চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৩৫ জন রোগী আরোগ্য-লাভের পর স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে; স্যানাটোরিয়ামে ইহাদিগকে নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা-হাসপাতালের বার্ষিক ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না, আয় অপেক্ষা প্রতিবর্ষেই অধিক ব্যয় হইতেছে। আমরা সহৃদয় বদান্য জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে এই স্যানাটোরিয়ামটি সুপরিচালিত হইয়া জনসাধারণের সেবারত থাকিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে দান করেন।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ মিশনের প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তন। প্রাচীন গুরুকুল-আদর্শে পরিচালিত এই আবাসিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্রগঠন এবং শরীর-মনের সুষম বিকাশ-সাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সেণ্ট্রাল বোর্ড (নিউ দিল্লী)-এর স্বীকৃতিলাভের পর বিদ্যাপীঠে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী করা হইয়াছে। বর্তমানে এখানে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ধারা—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করে। চতুর্থ হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যাপীঠের মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৫০। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের সর্ব-ভারতীয় উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছিল বিদ্যাপীঠের ১২ জন ছাত্র, সকলেই উত্তীর্ণ হয়,

তন্মধ্যে ৪জন প্রথম এবং ৭জন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে একজন ছাত্র বিজ্ঞানে জাতীয় বৃত্তি লাভ করে।

বিদ্যাপীঠে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম বাগান করা প্রভৃতি শিখাইবার সুব্যবস্থা আছে। ব্যায়ামচর্চা. নানা প্রকার খেলা, ড্রিল, ভ্রমণ, ক্যাম্পিং প্রভৃতি সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ৭,০৮০ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ১২০ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ১২টি দৈনিক ও ৩৫টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক মতে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে মোট ৯,১৫৬জন স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে ৩,৮৪৭জন নূতন রোগী।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে স্থানীয় অনুন্নত জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পাইতেছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হইয়াছে। ১৬০ জন বালকবালিকা এখানে পড়াশুনা করে, দুপুরে তাহাদিগকে বিনামূল্যে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে বিহারে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে বিদ্যাপীঠ কর্তৃক ১০ মাস যাবৎ ব্যাপকভাবে খরাত্রাণকার্য করা হয়। এই সেবাকার্য চকাই, ঝাঝা, জামুই ও রিখিয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতিবৎসর বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উৎসব-সংবাদ

তমলুক : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৮শে মার্চ শুক্রবার হইতে ৩০ শে মার্চ রবিবার পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দের সভাপতিত্বে তিনদিন ধর্মসভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা ও স্বামী উমানন্দ যথাক্রমে 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ,' 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' ও 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দিনে কলিকাতার ''রসরঙ্গ'' সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা ব্যাখ্যা, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং 'রানী রাসমণি' ও 'সাবিত্রী সত্যবান' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

আসানসোল : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩রা হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বার্ষিক জন্মোৎসব ও বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বীতশোকানন্দ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ; ইঁহারা এবং স্বামী ঈশানানন্দ, অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। আসানসোলের শিল্পাঞ্চল, দুর্গাপুর, ধানবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও আসিয়া প্রত্যহ বহু ভক্ত সভায় যোগদান করিয়াছেন। উৎসবের শেষ দিন (পুরস্কার-বিতরণের দিন) বিদ্যালয়ের

ছাত্রগণ কর্তৃক 'কুশধ্বজ' নাটকাভিনয় দুর্যোগের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ছাত্রগণ একটি বিজ্ঞানপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বহরমপুর : (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল তিনদিন পূজাদি ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনদিন সভায় আলোচনার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'যুগস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ', জগন্মাতা সারদাদেবী' ও 'পথের দিশারী বিবেকানন্দ'। প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরশিবানন্দ, দ্বিতীয় দিন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও তৃতীয় দিন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ইঁহারা এবং মৌলভী রেজাউল করীম, অধ্যক্ষ অমূল্যচরণ গুহ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভান্তে শ্রী বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণগান করেন। শেষদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি, রামনামসংকীর্তন হয়; প্রায় আটশত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রত্যহ পাঁচ-ছয় শত শ্রোতা সভায় যোগদান করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত পূজাপাঠাদি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৪ঠা এপ্রিল শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, (সভাপতি), স্বামী অজজানন্দ ও শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫ই এপ্রিল 'যুগপ্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬ই এপ্রিল স্বামী অজজানন্দ (সভাপতি), শ্রীসুধাংশুশেখর মৈত্র ও শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আশ্রম-সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশনের উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। প্রথম দিন সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালেখ্য ও দ্বিতীয় দিন কীর্তন পরিবেশিত হয়। ৬ই এপ্রিল দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরলোকে স্বামী বীরেশানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে এপ্রিল স্বামী বীরেশানন্দ (নকুল মহারাজ) ৭৩ বৎসর বয়সে আলমোড়া আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্বামী বীরেশানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী সারদানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসী সেবাশ্রমে। এখানে তিনি সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিয়াছিলেন, ইহা ছাড়া কনখল, কিষেণপুর, আলমোড়া প্রভৃতি কেন্দ্রেও সেবাকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

অক্লান্তকর্মা, তপস্বিস্বভাব এই সন্ন্যাসী সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নড়াইল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ২৮শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে। আশ্রমপ্রাঙ্গণে উৎসবে প্রায় ২৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়িপ্রসাদধারণে পরিতৃপ্ত হন। সন্ধ্যায় ভজনের ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীসারদা সংঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব গত ১২ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত গোলপার্কস্থিত মহিলা-নিবাসে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ১০১ ঘণ্টা অখণ্ড 'কথামৃত'পাঠ ও পূজা-ভজনাদি করা হয়। শেষ দিন প্রায় পাঁচশত মহিলা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবের কয়দিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর, শ্রীমতী যূথিকা দত্ত, শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্তা প্রভৃতি।

যশোহর : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৮শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতির পর পাঁচসহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা করেন।

বাগবাজার : শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউসনে স্বামী বিবেকানন্দের ১০১তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৯শে মার্চ পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে সভায় স্বামী সদাত্মানন্দ (সভাপতি), স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ (প্রধান অতিথি) ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সমিতির বিবৃতি দেন এবং শ্রীবিমলকুমার রায় সঙ্ঘের সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন।

সভান্তে 'নিবেদন' শিল্পিগোষ্ঠী কর্তৃক স্বামীজীর ভারতপ্রবন্ধ গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

৩০শে মার্চ সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত (প্রধান অতিথি), অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ ও শ্রীপ্রমথ-নাথ দে স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী কর্তৃক সঙ্গীত, ভারতের বিশিষ্ট ব্যায়ামবীরগণ কর্তৃক ব্যায়ামপ্রদর্শনী, ও পরে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র উপভোগ্য হইয়াছিল।

নূতনপুকুর : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব সকালে পল্লীপরিক্রমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাপাঠাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। দুপুরে প্রায় আটশত ভক্ত নরনারী বসিয়া তৃপ্তিসহকারে খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সুরে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমের কর্মিগণ। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী নিবৃত্তানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল (প্রধান অতিথি)

শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সভায় তাঁহার লেখা পাঠ করা হয়। সভান্তে আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ একটি নাটক অভিনয় করেন।

আলিপুরদুয়ার জং: প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব গত ১২ই হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিন উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এই তিন দিন ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করেন। সভান্তে বেতারশিল্পী শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী রামায়ণগান পরিবেশন করেন। সভায় প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

নববারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল পরিষদ-প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করেন। ১৩ই এপ্রিল স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, পূজাপাঠাদি হয়। অপরাহ্নে এক ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দ। সন্ধ্যায় জনসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী (প্রধান অতিথি) ও স্বামী জয়ানন্দ স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

১৪ই এপ্রিল জনসভায় ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার (সভাপতি) ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দান করেন।

সতীশচন্দ্র ঘোষের পরলোকগমন

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্মী ও কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র ঘোষ গত ১লা এপ্রিল রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় ৭৬ বৎসর বয়সে করে জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া-ছিলেন। বাংলা ১৩০০ সালে বৈশাখ মাসে তিনি অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার বাকাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীতে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি বরাবর স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই সংস্থাকে গড়িয়া তুলিতে নানারূপে সহায়তা করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত বৈশাখ সংখ্যায় ১৭৭ পৃষ্ঠা ২য় কলমে ১০, ১১, ১৪ ও ১৬ লাইনে 'হলধারী' স্থলে 'হৃদয়' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ১৩।২৯

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(জীব-চেতনার দর্পণ)—মন, বুদ্ধি, অহংকার,
(জগতের মূল উপাদান)—জল, ক্ষিতি ও অনিল, আকাশ, অনল—
এসব প্রকৃতি—আমার অষ্ট প্রকৃতি বিবিধাকার॥

জীবনে সাধিত সব কর্মই প্রকৃতির গুণে হয়,
(দেহ-মন-আদি) প্রকৃতিকে মোরা মোহের বশেতে হয়ে জ্ঞানহারা
'আমি' ব'লে ভাবি, 'আমিই কর্তা' এই বোধ জাগে তাই॥

(দৈহিক কাজ, চিন্তা, বিচার প্রভৃতি) কর্ম যত
প্রকৃতিরই দ্বারা সে-সব সাধিত ইহা যেই জন দেখে স্পষ্টতঃ,
নিজেরেও সেথা দেখে অ-কর্তা,—সেই দেখে যথাযথ॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৬।৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ঈশ্বর-তিনি বিরাজিত সদা সবার হৃদয়মাঝে ;
সেথা হতে তিনি (মন-বুদ্ধ্যাদি) যন্ত্রে আরূঢ় জীবেরে অনাদি-
মায়াবলে পরিচালিত করেন জীবনের সব কাজে
(যন্ত্রী যেমন কলের পুতুলে চালায় পুতুল-নাচে)।

সবার হৃদয়ে আসীন আমারে পূজা করে যেই জনে
অভেদ দেখিয়া আপনারও সাথে, সে-জন যেভাবে থাকুক যে-পথে,
সে রহে সদাই আমারি মধ্যে—যুক্ত আমারি সনে॥

অপরের সুখ-দুঃখের বেদন যার হৃদিপারাবারে
তোলে তরঙ্গ সম বেদনের, সমত্ববোধ সর্বজনের
সঙ্গেই যার, পরম যোগী তো আমি বলি শুধু তারে॥

কথাপ্রসঙ্গে

কর্মযোগ

কর্ম না করিলে আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না; দেহের ভিতর সারাক্ষণ কর্ম না চলিলে দেহ রক্ষা পায় না; আবার জগতের প্রত্যেকটি অচেতন পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে উহার ভিতরকার অবিশ্রাম কর্মের উপর। সমগ্র জীব-জগৎই দাঁড়াইয়া আছে কর্মের উপর—স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ দৃষ্টিতেই ইহা সত্য। কাজেই এই জগতের মধ্যে থাকিয়া, সব ছাড়িয়া নির্জন গিরিকন্দর বা অরণ্যে চলিয়া গেলেও কর্মের সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। কিন্তু কর্মের ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ দেহমন-সায়রের গভীরতম প্রদেশে এমন একটি স্থান আছে যেখানে পৌছিতে পারিলে কর্মের তরঙ্গ আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে পৌছিবার নানা পথ আছে। কর্মযোগ সেগুলির অন্যতম। ভক্তিভাব অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে মানবসেবার মাধ্যমে কর্ম-যোগের সাধনা আমাদের প্রায় সকলেরই পক্ষে সহজসাধ্য, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত পূর্ণতা-লাভে ও বর্তমান যুগের কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধানে সর্বাধিক প্রশস্ত পথও।

জীব-জগৎ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত

কর্ম বলিতে অতি সাধারণভাবে বলা যায় কোন কিছুর একটি অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্তন; জড় পদার্থেও, মনবুদ্ধিতেও। সেজন্য জীবিকার্জনের জন্য যখন আমরা ক্ষেতে বা কারখানায় উৎপাদন করি, আফিস শিক্ষায়তন প্রভৃতি স্থানে লেখাপড়া-আলোচনাদি করি, তখন যেমন কাজ করি, তেমনি কাজ করি যখন নিশ্বাস লই বা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করি তখনও। এমন কি যখন বসিয়া বসিয়া ভাবি আমি কিছু করিতেছি না, তখনও কাজ করি, কারণ দেহে বা বাহিরের কোন বস্তুতে পরিবর্তন না ঘটাইলেও তখন আমরা মনে পরিবর্তন ঘটাই; চিন্তা করা মানেই মনে পরিবর্তন আনা যেন কোন সরোবরের স্থির বক্ষকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা। যখন আমরা *গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি, কোন স্বপ্নও* দেখি না—মন নিস্তরঙ্গ থাকে, তখনো যে-শক্তি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা করে সেই প্রাণ-শক্তি কাজ করিয়া চলে; তখনো আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, দেহে রক্তচলাচল খাদ্যপরিপাক প্রভৃতি কর্ম তখনো চলে।

স্থূল এবং সূক্ষ্ম সমগ্র জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে ভগবান তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত নিয়ম-গুলিকে সক্রিয় রাখিয়া নিরন্তর কাজ করিতেছেন বলিয়া, বা অন্য ভাষায় প্রকৃতি নিরন্তর কাজ করিতেছে বলিয়া। সূক্ষ্ম জগতের কথা সূক্ষ্মদর্শী সত্যদ্রষ্টাগণ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন (উহা প্রত্যক্ষ করিবার পথেরও সন্ধান সকলকেই দিয়া গিয়াছেন); সাধারণ অবস্থায় আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, কিন্তু যেটুকু আমাদের জ্ঞানগম্য সেই স্থূল জগতের অস্তিত্বই জড়বিজ্ঞানীদের মতেই নির্ভর করিতেছে এনারজির অবিশ্রাম কাজ করিবার উপর। এনারজি অবিশ্রাম বিভিন্ন এনারজিধর্মিরূপে এবং ইলেকট্রনাদি কণাধর্মিরূপে নিজেকে পরিবর্তিত করিতেছে, কণাগুলির কয়েকটিকে সবলে কেন্দ্রে বাঁধিয়া রাখিয়া ইলেকট্রনগুলিকে

তাহার চারিদিকে নিরন্তর ঘুরাইতেছে বলিয়াই বিভিন্ন পরমাণুর অস্তিত্ব; আর এই পরমাণু-গুলিকে নানা সংখ্যায় নানা ভাবে দানা পাকাইয়া রাখিতেছে বলিয়াই বিভিন্ন অণুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে। এই অণু-পরমাণুগুলিকে লইয়া এনারজি এই জড়জগৎ ফুটাইয়া তুলিতেছে। যে ইটের টুকরাটিকে আপাতদৃষ্টিতে স্থির, নিষ্কর্মা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার ভিতর সারাক্ষণ এনারজির এই সব কাজ চলিতেছে বলিয়াই সেটির অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। এনারজি যদি এসব কাজ করা বন্ধ করে, তাহা হইলে যে জগৎ আমরা দেখিতেছি তাহা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

শক্তিই পরিবর্তনসাধন বা কর্ম করে

স্থূল সূক্ষ্ম সর্বক্ষেত্রেই অবস্থার এই পরিবর্তন ঘটায় শক্তি—স্থূল বা সূক্ষ্ম শক্তি। স্থূল জগতে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তাহা সবই তো এনারজি ঘটায়। সেখানে যে-সব পরিবর্তন চেতন প্রাণীরা ঘটায়—যেমন পাখিরা যে বাসা তৈয়ারী করে, মানুষ ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে, রান্না করে ইত্যাদি, সেগুলির পিছনে আর একটি শক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তাশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে; এই সূক্ষ্মতর ইচ্ছাশক্তিই স্থূলতর এনারজিকে দিয়া কাজ করাইয়া লয়। আমাদের দেহের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন বা কাজ চলে, যেমন রক্তচলাচল, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্যদ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহা দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশের উপযোগী জীবকোষ গঠন, পুষ্টি, রক্ষণ ইত্যাদি, চিন্তা করা ইচ্ছা করা প্রভৃতি, সেগুলির পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে ইচ্ছাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তিচালিত প্রাণশক্তি এবং এনারজি। আলো, তাপ প্রভৃতি যেমন একই এনারজির বিভিন্ন রূপ মাত্র, সূক্ষ্মদর্শী সত্যদ্রষ্টাগণের মতে তেমনি এনারজি, প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি সবই একই শক্তির বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ মাত্র। তাঁহারা বলেন, শক্তিরূপে শক্তির সূক্ষ্মতম অবস্থা হইল চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই তাঁহারা বলেন, মূল উপাদান হইতে জীবজগতের সৃষ্টি, অবস্থান ও ঐ মূল উপাদানে লয়রূপ পরিবর্তন বা কর্মগুলি সাধিত হয় সর্ববিধ শক্তির মূল উৎস বা চরম রূপ এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই।

কর্মযোগের মূল কথা

অবিরাম কাজ তো চলিতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই, আমাদের সমগ্র জীবন জুড়িয়া, কিন্তু 'কাজ করিতেছি' এ বোধ জাগা সম্ভব কেবলমাত্র কোন জীবের মধ্যে, যেখানে চেতনার বিকাশ রহিয়াছে। এই চেতনার সংস্পর্শে আসিয়াই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি—প্রাণীর স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মদেহ—চেতন বলিয়া প্রতিভাত হয়; সেখানেই 'আমি ইচ্ছা করিতেছি' 'আমি কাজ করিতেছি' বা 'আমি কিছুই করিতেছি না', এই সব বোধ জাগে। চেতনাকে প্রকাশ করিবার উপযোগী সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত মন বুদ্ধি প্রভৃতি এবং তাহাতে চেতনার সংস্পর্শ ছাড়া এ বোধ জাগা বা ইচ্ছার বিকাশ সম্ভব হয় না। এনারজি ভাবে না যে সে কাজ করিতেছে, নিজে ইচ্ছা করিয়া সে কিছু করিতেও পারে না। একখণ্ড কাঠ বা একটি মৃতদেহ আমরা আগুনে ফেলিয়া পোড়াইতে পারি—এই দাহ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার ইচ্ছা বা 'আমি দগ্ধ হইতেছি' এ বোধ উহাদের মধ্যে জাগে না। কিন্তু একটি পিপীলিকা যদি ঐ কাঠ বা মৃতদেহের উপর বসিয়া থাকে, আগুন জ্বলিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে বাঁচাইবার ইচ্ছায় সেখান হইতে সরিয়া যাইবে।

সত্যদ্রষ্টাগণ কর্মযোগ-প্রসঙ্গে এই সূক্ষ্ম স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'আমি করিতেছি' এই বোধটুকুকে দেহ-মন-প্রাণাদির কর্মের আবর্ত হইতে সরাইয়া লও, তাহা হইলেই তুমি সত্যলাভ, ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভ করিবে—মৃত্যুভয়, দুঃখ প্রভৃতির হাত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের, অমৃতের অধিকারী হইবে।

যোগ শব্দের অর্থ সংযোগ; কর্মযোগ বলিতে বুঝায় কর্মের মাধ্যমে যে-পথে আমরা ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে পারি তাহাই। ভগবানলাভের জন্য ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি আরো বহু পথ আছে। সব পথেই কিন্তু ভগবান এবং সাধক উভয়কেই চেতন সত্তা বলা হয়—কোন পথে বলা হয় এ দুটি সত্তা পৃথক, কোন পথে বলা হয় এক, এই মাত্র প্রভেদ। সাধারণ অবস্থায় আমরা দেহ প্রাণ প্রভৃতি অচেতন, কর্মের আবর্তে সদা-পরিবর্তিত পদার্থগুলির সঙ্গে আমাদের চেতন সত্তাকে জড়াইয়া ফেলিয়া সেগুলির সমষ্টিকেই 'আমি' বলিয়া ভাবি, সেগুলির পরিবর্তনে নিজেকে পরিবর্তিত বলিয়া মনে করি। যে কোন পথ অবলম্বনেই আমরা ভগবানলাভ করিতে চাই না কেন, সব পথেই সাধনার মূল লক্ষ্য হইল এই চেতন ও অচেতনের সমষ্টি হইতে চেতন অংশকে, আমরা আসলে যাহা তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া, পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করা। সাধনা ছাড়া ইহা হয় না, স্থূল-দেহের নাশ বা মৃত্যুতেও না; তখন আমরা স্থূলদেহ হইতে পৃথক হই ঠিকই, কিন্তু প্রাণ-মন প্রভৃতি হইতে নিজেকে পৃথক ভাবিতে পারি না। যে-কোন সাধনপথ ধরিয়া নিজেকে দেহমনাদি হইতে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই উপলব্ধ হইবে যে, আমাদের স্বরূপ আসলে ভগবানই—আনন্দময় নিত্য চেতন সত্তা। হয় প্রত্যক্ষ হইবে তিনিই আমার অন্তরে, সকলেরই অন্তরে থাকিয়া আমাদের মন প্রাণ প্রভৃতিকে, এমন কি সেগুলির চালক আমাদের অহঙ্কারকেও পরিচালিত করিতেছেন—তিনি যেন যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র; অথবা তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ আমিবোধও থাকিবে না, প্রত্যক্ষ হইবে তিনি ও আমি এক—কর্মের কর্তা নয়, উহার সাক্ষিস্বরূপ। উভয় অবস্থায় এই সামান্য পার্থক্যটুকু থাকিলেও কোন ক্ষেত্রেই তখন আর 'আমি করিতেছি' এ বোধ জাগে না।

কর্মযোগের সাধন

কর্মযোগের সাধনায় এই উভয়বিধ ভাবে সিদ্ধ ব্যক্তিগণের উপলব্ধিকে সর্বদা ধারণায় রাখিয়া প্রত্যেকটি কর্ম করিতে হয়—একটি ভক্তির ভাব অবলম্বনে, অপরটি জ্ঞানের ভাব অবলম্বনে; জ্ঞান বা ভক্তির সংস্পর্শরহিত বিশুদ্ধ কর্মযোগের সাধনা খুবই কঠিন। সিদ্ধ ব্যক্তি-গণের আচরণ অনুকরণের প্রচেষ্টাই সাধনা। যেমন তবলা বাজানো শিখিতে হইলে যিনি ঐ বাজনায় সিদ্ধ এমন একজনের, ওস্তাদের কাছ হইতে প্রথমে দেখিয়া লইতে হয় তিনি কেমন বাজান। ওস্তাদ যেভাবে বাজাইয়া দেখাইলেন, ঠিক সেরূপ বাজনা হাতে তুলিতে শিক্ষার্থী প্রথম প্রচেষ্টায় কখনই পারিবে না, হয়তো কয়েক মাস বা কয়েক বছরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে। তবু তবলা বাজানো শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীকে অপটু অশিক্ষিত হাতের প্রথম চেষ্টা হইতে শুরু করিয়া শিক্ষার শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই চেষ্টা করিতে হইবে ওস্তাদ যেমন বাজাইয়াছেন ঠিক তেমনি ভাবে বাজাইবার।

তাই ভক্তিভাব অবলম্বনে যাঁহারা কর্মের মাধ্যমে ভগবানলাভ করিতে চান, তাঁহাদের

প্রত্যেকটি কর্ম করিবার সময় স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়, 'ভগবান আমার মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যেই থাকিয়া আমাদের চালাইতেছেন,' 'তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র'; অথবা 'তাঁহারই তৃপ্তির জন্ম কর্ম করিতেছি,' 'কর্মের মাধ্যমে তাঁহারই পূজা করিতেছি,' 'মানুষের ভিতর তিনিই আছেন, মানুষের সেবা তাঁহারই পূজা', ইত্যাদি। এই ভাব লইয়া কর্ম করিতে করিতে সে-ভাব ক্রমশঃ হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত এবং কর্ম ক্রমশঃ সে-ভাবানুরূপ হইতে থাকে, ক্রমশঃ হৃদয়ে ভগবানের অস্তিত্ব উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের দেহমন-প্রাণাদিতে আমিত্বের বাঁধনও সেই সঙ্গে শিথিল হইতে থাকে।

জ্ঞানের ভাব অবলম্বনে যাঁহারা কর্মের পথে চলিতে চান, তাঁহাদের প্রত্যেকটি কর্মসম্পাদনের সময় ইহাই ভাবিতে চেষ্টা করিতে হয়, "স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যে মূল উপাদানে গঠিত সেগুলি. এবং মন, বুদ্ধি ও তাহাদের মূল উপাদান—এ-সবই হইল প্রকৃতি; এই প্রকৃতির গুণেই সব কিছু ঘটিতেছে, আমি কিছুই করিতেছি না, আমি পরিবর্তনহীন চৈতন্যস্বরূপ; শুধু আমি নই সকলেই তাই। 'আমি করিতেছি' এ বোধ জাগিতেছে শুধু এই প্রকৃতির সহিত—দেহ-প্রাণ-মন প্রভৃতির সহিত—নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়াছি বলিয়া, এইগুলিকে 'আমি' বলিয়া, এগুলির পরিবর্তনকে আমার পরিবর্তন বলিয়া ভাবিতেছি বলিয়া।" এভাবে চলিতে চলিতে তাঁহারা শেষে এই প্রকৃতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁহাদের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রচণ্ড-কর্মতৎপর থাকিলেও এ বোধে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকেন—'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি'—আমি কিছুই করিতেছি না। অপর কোন মানুষ কাজ করিলে বা চিন্তা করিলে, সুখদুঃখাদিতে চঞ্চল হইলে বা বিচার করিলে আমরা যতখানি স্পষ্টভাবে অনুভব করি আমি এসব করিতেছি না, নিজের সক্রিয় দেহমনাদির বেলাও তাঁহারা ততখানি স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে তিনি এসব কিছুই করিতেছেন না।

নিরন্তর পরিবর্তন বা কর্ম ছাড়া স্থূল-সূক্ষ্ম কোন জগতের অস্তিত্বই থাকে না; কিন্তু সে-জগতের মধ্যে থাকিলেও কর্মের পথে ভক্তি বা জ্ঞান যে-কোন ভাব লইয়াই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন উভয় ভাবের অন্তেই সাধক দেখেন যে, সেসব কাজের—স্থূলবস্তুর পরিবর্তনেরই হউক অথবা চিন্তা বা সুখদুঃখাদির অনুভতিরূপ চিত্তের পরিবর্তনেরই হউক—কর্তা তিনি নহেন। একজন দেখেন, 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ', 'প্রকৃতির গুণেই সব কাজ হইতেছে', আর অপরজন দেখেন, ঈশ্বরেচ্ছায় সব হইতেছে, 'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না', ঈশ্বরই কর্তা।

ভক্তি-ভাবাশ্রিত কর্মযোগই যুগসমস্যা-সমাধানের প্রশস্ত পথ

জ্ঞান বা ভক্তি কোন অবলম্বন না রাখিয়াও কর্মযোগের সাধনা করা যায়; নিজের জন্ম কোন কিছু না চাহিয়া, কর্মের সফলতায় বা বিফলতায় সমভাবে নির্বিকার থাকিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম করিতে পারিলে কর্মযোগসাধনের ফল লাভ করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন অবলম্বন ছাড়া তাহা করা প্রায় সকলের পক্ষেই অসম্ভব। জ্ঞানের ভাব অবলম্বন করিয়া কর্মের পথে চলিবার লোকও বিরল। ভক্তিভাবাশ্রয়ে কর্মের পথে আমরা সকলেই চলিতে পারি।

কর্মযোগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল—ইহার জন্ম আমাদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই হয় না, ক্ষেত-খামারে, কারখানায়, আফিসে, বিদ্যায়তনে, গৃহস্থালীতে, সমাজসেবার ক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা যে যেখানে যাহা করিতেছি সেই কর্মকেই ইহার সাধনরূপে গ্রহণ করিতে পারি। প্রয়োজন শুধু ভাবের পরিবর্তন। কর্মযোগ-সাধনার সব কিছু নির্ভর করে কি ভাব লইয়া আমরা কাজ করিতেছি তাহার উপর, কি কর্ম করিতেছি তাহার উপর নয়।

কর্ম তো আমাদের করিতেই হয়; কর্মীর মনোভাবের উপর, কর্মের প্রতি তাহার আগ্রহ ও উদাসীনতা বা বিরক্তি, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রভৃতির উপর কর্মের মানও যে নির্ভরশীল, ইহাও আমাদের অবিদিত নয়। সর্বাধিক শ্রদ্ধার, পূজার ভাব লইয়া প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা যদি আমরা সকলেই করি তাহা হইলে কর্মের দিক দিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের লাভ বই লোকসান হইবে না। সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে কর্মীও লাভবান হইবেন প্রচুর পরিমাণে। এভাবে প্রত্যেক কর্মকে কর্মযোগে, ভগবানলাভের বা সত্যলাভের পথে পরিণত করার প্রচেষ্টায় সামান্য সফলতাও যদি আসে, তাহারই ফল হইবে প্রচেষ্টার তুলনায় বহুগুণ অধিক। এই কর্মযোগ-প্রসঙ্গেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, কর্মযোগের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও মানুষকে মহাভয়ের হাত হইতে রক্ষা করে—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগের সাধনা কেবল যে ব্যক্তি ও জাতিকেই লাভবান করিবে তাহা নহে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার অবদান হইবে অপরিমেয়। মানুষের সেবায় ভগবানেরই পূজা হইতেছে—এই ভাব লইয়া কর্ম করিতে করিতে এ বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে থাকে যে, যে-ভগবান আমার ভিতর রহিয়াছেন, তিনিই রহিয়াছেন সকলের ভিতর, 'তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র'—একথা শুধু আমার বেলাই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের বেলাই সত্য। ফলে, যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও কাহারো প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষের ভাব হৃদয়ে আর স্থান পায় না, সব দেশের সব ধর্মের সব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ক্রমশই হৃদয়ে গভীর হইতে থাকে; সব মানুষই যে মূলতঃ এক, আসলে সকলেই ঈশ্বর-স্বরূপ—এ ধারণার আলোক সর্ববিধ ভেদজ্ঞানের অন্ধকার সরাইয়া হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিতে থাকে। সব মানুষের সমভাবে কল্যাণ-কামনা, সব মানুষকেই মূলতঃ এক বলিয়া ভাবা—সাম্য ও একত্বাভিমুখতা—ইহাই তো এ যুগের মানবচিত্তসায়রে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক ব্যাপক চিন্তা-তরঙ্গ। কিন্তু এ চিন্তাকে সর্বমঙ্গল-সমন্বিত করিয়া এখনো আমরা মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছি না; বাস্তবক্ষেত্রে বাধা অনেক, আমরা এখনো তাহা সরাইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যতদিন পর্যন্ত যে-কোন আকারেই হউক প্রতিদানে নিজের জন্য কিছু চাহিয়া বা উপকারকের আসনে বসিয়া আমরা মানুষের কল্যাণ করিতে চাহিব, ততদিন ইহাকে সর্বাঙ্গীণ করিয়া, সর্ববাধামুক্ত করিয়া কিছুতেই মূর্ত করিতে পারিব না। সব মানুষ যেখানে যথার্থই এক, জাতি ও সম্প্রদায়, দৈহিক ও মানসিক আকৃতি, সম্পদ ও দারিদ্র্য, বিদ্যা ও মূর্খতা প্রভৃতি ভিত্তিক কোন ভেদই যেখানে পৌছিতে পারে না, সেখানকার সন্ধান যতদিন না আমরা পাইব ততদিন যথার্থ সাম্যের ভাব, সব দেশের সব ধর্মের

সব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা কখনও আসিবে না, এখন যেমন রহিয়াছে, তেমনি কৃত্রিমরূপে এবং আলোচনায় ও আকাঙ্ক্ষাতেই তাহা থাকিয়া যাইবে।

ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগের সাধনা এই উভয় লক্ষ্যেই আমাদের পৌছাইয়া দিতে পারে। মানুষের কল্যাণসাধনকালে এই সাধনা সাধককে উপকারকের উচ্চাসনে বসায় না, মানুষকে সর্বোচ্চ আসনে বসাইয়া সে সাধককে বসায় তাহার পাদমূলে, পূজকের আসনে। আর মানুষকে দেখিবার সময় মানুষে-মানুষে পার্থক্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, চিরদিনই থাকিবে, সেই দেহমনবুদ্ধি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে নিবদ্ধদৃষ্টি হয় আরো গভীর প্রদেশে—যেখানে সব মানুষই এক।

সব দেশের সব মানুষকে সমভাবে ভালবাসিবার অতিপ্রয়োজনীয়তার কথা আজ আমরা আলোচনা করিতেছি যুগধর্মে, যুগপ্রয়োজনে, বিশেষ করিয়া মানবজাতির বাঁচিয়া থাকিবারই প্রয়োজনে। কিন্তু ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ঠিক পথ এখনো খুঁজিয়া পাইতেছি না। এবিষয়ে আমাদের আলোচনা ও প্রচেষ্টা শুরু হইবার বহু পূর্বে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন—জনকল্যাণসাধনের এ প্রচেষ্টা ভগবদ্ভক্তিকে ভিত্তি করিয়া করিতে হইবে, নিজের কোন জাগতিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তো নয়ই, করুণা করিয়াও নহে, ভগবানের পূজাজ্ঞানে উহা করিতে হইবে—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করিতে হইবে। ভক্তি ছাড়া মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করা সম্ভব নয়, ভক্তি ছাড়া স্বার্থসম্ভূত ভালবাসার সঙ্কীর্ণ বিবর হইতে বাহির হইয়া বিশ্বপ্রেমের উন্মুক্ত প্রান্তরে আসাও অসম্ভব। একদিন কর্মযোগ-প্রসঙ্গে, স্কুলহাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কর্মানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে কর্মের সহিত ভগবানে ভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, বিশ্বজনীন ভালবাসা ভগবদ্ভক্তিসহায়েই সম্ভব—"সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।" দয়া মানে এখানে করুণা নয়, মায়ার বিপরীতার্থক, বিশ্বপ্রেম: "মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্বভূতে ভালবাসা।" "আমার জিনিস আমার জিনিস বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া।" "শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া।" "সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া।"

প্রাচীন ভারতে সমাজবিপ্লব

ডক্টর ভকতপ্রসাদ মজুমদার

প্রত্যেক সভ্যতার মূলেই সমাজ। সমাজ আছে বলেই রাজ্য, রাষ্ট্র, রাজা, প্রজা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজকে কেন্দ্র করে মানবসভ্যতার ইতিহাস রচিত হ'তে থাকে। অথচ নারাশংসীর কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেকের ধারণা যে, রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের ইতিহাসই হ'ল ভারতের প্রকৃত ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের ইতিহাসকে দুঃস্বপ্নকাহিনী বলেছেন। তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ঐ রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তন-স্বপ্নদৃশ্যগুলির বর্ণনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের যে-ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপ-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে"। (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪.৩৭৭-৩৭৮)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সি. এইচ. ফিলিপস্ মহাশয়ের সম্পাদনায় 'Historians of India, Pakistan and Ceylon' প্রকাশিত হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে একটি পঙ্‌ক্তিও লেখা হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে কেবলমাত্র ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিবৃতিতে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃ: ৪২৭)।

ইতিহাসের যুক্তি ঠিকমতন দিতে পারা এবং ইতিহাসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করতে পারাই চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের কর্তব্য। যে কয়জন ভারতবর্ষের সমাজের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অবদান অতি মূল্যবান। এঁরা পেশাদার ঐতিহাসিক নন। কিন্তু এঁদের ইতিহাসবোধ অত্যন্ত প্রখর। এঁরা কেবল সমাজের অতীত ইতিহাসের গতিই লক্ষ্য করেননি, তৎসঙ্গে ভাবীকালের সমাজকেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, প্রাচীনকাল হ'তে ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তি কোন্ কোন্ শ্রেণীর হাতে পরপর এসেছে। শুধু ভারতের নয়, সারা জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেই ভারতের তথা সারা জগতেরই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজবিকাশের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন যে, যুগে যুগে এক একটি বর্ণ বা শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা দেয়। অন্যান্য দেশের মত ভারতের আদিকালে পুরোহিতশ্রেণী সমাজের নেতৃত্ব করেছিল। যদিও তারা যুদ্ধ ও কূটনীতির পরামর্শ দিত, তথাপি তাদের জন্যই জড়ের উপর চেতনের অধিকার বিস্তৃত হ'ল। পুরোহিতদের প্রাধান্যের ফলেই মানুষ নিজের মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিল (বর্তমান

ভারত, ৭ম সং ; পৃঃ ১৫)। কিন্তু যে শ্রেণীর আধিপত্য যতই ব্যাপক হোক না কেন তা চিরস্থায়ী হয় না। সমাজ-সমুদ্রে কোন তরঙ্গ চিরকালের জন্য মাথা উন্নত রাখতে পারে না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুসারে বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করল। চারুকলা ও সামাজিক সংস্কৃতির উন্নতি হ'ল। তারপর বর্তমান যুগ বৈশ্যযুগ। আগামীকালে আসবে শূদ্রের যুগ, শূদ্রের প্রাধান্য: "এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে,...শূদ্র-ধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা"—('বাণী ও রচনা'—৬ষ্ঠ, ২৪১ পৃঃ)। সহস্র বৎসরের অত্যাচারে জর্জরিত শূদ্রদের আহ্বান করে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে" ('পরিব্রাজক', পৃঃ ৪২-৪৩)। ভারতবর্ষের সমাজে শূদ্র অথবা বৈশ্যের প্রধানতা হবে বা হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হননি। তিনি লিখেছিলেন, "স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী" (কালান্তর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ২৪.৩.৬৫)। আধুনিক ভারতে শূদ্রের সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সমাজসংস্কারের নেতৃত্ব করবার ভার ব্রাহ্মণদের দিয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বর্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ" ('রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৪,৩৯৫)। স্মরণ রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শব্দদ্বয় বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব ও যথার্থ স্বাধীনতা সমার্থক। ব্রাহ্মণ স্বার্থসংগ্রামের ঊর্ধ্বে। শূদ্রত্ব হ'ল ক্ষুদ্রত্ব। সেই ব্যক্তিই শূদ্র যে আত্মবিস্মৃত, যে চিত্তবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে জাতিগত ধর্ম পালন করছে। সুতরাং ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও যে ব্রাহ্মণ জড়, সে শূদ্র বলেই পরিগণিত হবে।

ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা। আর্যীকরণের প্রথম স্তরেই দেখতে পাওয়া যায় এই প্রথা। এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে অতুলনীয় এবং একদিক থেকে সর্বগ্রাসী। অন্যদিকে এ ব্যবস্থার ফলে ধর্মসূত্র ও মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের কাল থেকে রঘুনন্দন-কমলাকরের সময় পর্যন্ত আর্যবহির্ভূত জন ও কোমের স্তর-উপস্তরকে চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে। চার বর্ণের ইতিহাসই ভারতের সমাজ-চিন্তার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতের আদিকালে আর্যদের মধ্যে তিনটি বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। যাকে আমরা চতুর্থ বর্ণ বলি অর্থাৎ শূদ্র আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাঁর মতে অনার্য কোমগুলি যেমন, সাঁওতাল, কোল ও ধাঙড়েরা ছিল শূদ্র। আদি কোমগুলি যে আর্য ছিল না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোমগুলিকে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে

দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ, চের ও পাণ্ড্য কোমগুলিকে বয়াংসি বা পক্ষীবিশেষ বলা হয়েছে। বোধায়নের ধর্মসূত্রের কালে আরট্ট (পাঞ্জাব), পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), কলিঙ্গ প্রভৃতি কোমের লোকেরা আর্য-অধ্যুষিত দেশে বাস করত না। এদের নিবাসস্থানকে বলা হয়েছে "সংকীর্ণযোনয়ঃ"। মনুস্মৃতিতে এবং ভাগবতে কোমবাসীদের ব্রাত্য বা পতিত এবং 'পাপ' বলা হয়েছে। সুতরাং কোমের লোকগুলি এবং শূদ্রদের বাদ দিয়ে তিনটি উচ্চ বর্ণের সবাই ছিল দ্বিজ। তিন বর্ণেরই শিক্ষা-লাভের সমান অধিকার ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, বর্ণগুলির মধ্যে কর্মের প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এরা পরস্পর পরস্পরকে আদর্শের বিশুদ্ধি-রক্ষায় সাহায্য করত। যতদিন পর্যন্ত এক বর্ণের লোকেরা অন্য বর্ণের লোকেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিল, যতদিন ক্ষত্রিয় রাজ্যরক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেছিল এবং বৈশ্যেরা আর্যসমাজ ও রাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করেছিল, ততদিন প্রত্যেক আর্যই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল।

হিন্দুসমাজ জীবন্ত। তাই সমাজে বিভিন্ন বর্ণের ও শ্রেণীর লোকদের উন্নতি-অবনতি ঘটতে থাকে। বৈদিক কালের শেষের দিকে দেখা গেল ত্যাগের আদর্শ থেকে আর্যেরা বিচ্যুত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতারা বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের নরনারীর যৌনমিলনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য জন ও কোমবাসীদের বর্ণব্যবস্থা আ'না হ'ল। ঐ ব্যবস্থার পিছনে কোন একটি বিশেষ নিয়ম ছিল না। বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যে জাতি-নির্ণয় হয়েছিল, তাও বলা চলে না। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত নিম্নজাতির পিতামাতা বা বৃত্তির মধ্যে মিল দেখা যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সূতের উল্লেখ অথর্ববেদে (৩. ৫. ৬. ৭) আছে। বোধায়ন-ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, বৈশ্য পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভের সন্তান সূত। কিন্তু বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে সূতের পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা ব্রাহ্মণী। সূতের বৃত্তি সম্বন্ধেও নানা মত। মনু (১০. ৪৭) বলেন যে, সূতের বৃত্তি রথচালনা। বৈখানস স্মার্ত-সূত্র (১০. ১৩) অনুসারে সূতের কার্য ছিল রাজাকে কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করানো এবং তাঁর জন্য রন্ধন করা। যাই হোক, বৃত্তিভেদ যেদিন ধর্মশাসনের অন্তর্গত হ'ল সেদিন থেকে ভারতের দুর্দিন উপস্থিত হ'ল। বংশানুক্রমে বৃত্তি-নির্দেশের কি বিষম পরিণাম তা স্বল্প কথায় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: ঐ ব্যবস্থার ফলে উচ্চতর বর্ণের চিত্তের বিকাশ অবরুদ্ধ হ'ল। নিম্নতর জাতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক আচার ও বৃত্তি বংশানুক্রমে চলতে থাকায় মানুষ যন্ত্রে পরিণত হ'ল। কুম্ভকার, তৈলিক প্রভৃতি জাতির উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন: "এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে" ('রবীন্দ্র-রচনাবলী', ২৪.৩৬৫)। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে শূদ্র ও নিম্নজাতিরা কেন বর্ণব্যবস্থার কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসেনি? গুপ্তযুগের পূর্বেই যে শূদ্রেরা বৈশ্যদের কিছু অধিকার পেয়েছিল তা কি ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের দান? কৌটিল্যের সময় যে ক্ষেত্রকরেরা ফসলের অর্ধভাগ পাবার অধিকারী হয়েছিল তা কি

সমাজ-ব্যবস্থাপকদের উদারতার ফলে? মনুর ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে সূত্রকার, চিকিৎসক, কর্মকার, স্বর্ণকার ইত্যাদির কাছ থেকে অন্নগ্রহণ করা দূষণীয় ছিল। অথচ পাল আমলের সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের দরবারগুলিতে চিকিৎসকদের অবাধ গতি দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের শেষ পর্যায়ে সমাজে চিকিৎসকদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছিল। তবে কি সমাজ-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটেছিল?

সমাজবিপ্লব শব্দটি রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। সমাজে যখন নবীন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন সমাজ-বিপ্লব ঘটে। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আদর্শের সংঘাতের ফলেই সমাজবিপ্লব ঘটেছিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যেই সমাজবিপ্লবের ইতিহাস। বশিষ্ঠ ছিলেন সনাতন ব্রাহ্মণধর্মের পরিপোষক; বিশ্বামিত্র ক্ষত্রঋষি। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে এ বিরোধ ভাবগত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একই সৃজনশক্তি। তিনি ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘকালীন সংঘর্ষ দেখেননি, কেননা তাঁর ব্রাহ্মণ পূর্বধারা ও নবীন ধারার মধ্যে প্রতিবারই সমন্বয় রক্ষা করে এসেছে। আমরা যে সমাজবিপ্লবের কথা আলোচনা করছি, সেটি হ'ল শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষ, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের বিরোধ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে কেন আসেনি? প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্য-শূদ্রের অথবা বণ্টকদের সঙ্গে বহু উৎপাদনকারীর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা ছিল। দানস্তুতিগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ক্ষত্রিয়ের হাতেই ধনবণ্টনের ক্ষমতা ছিল। রাজার অভিষেক-উৎসবের বিবরণগুলি পড়লে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ-সংহিতার যুগে ধন উৎপাদন করত বৈশ্য ও শূদ্রেরা, ধনবণ্টন করত ক্ষত্রিয়েরা, আর ব্রাহ্মণেরা না ছিলেন উৎপাদক, না বণ্টক। সুতরাং বৈদিক যুগেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হ'তে পারত। বৌদ্ধযুগে বৈশ্যদের প্রাধান্য ছিল। শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ ছিলেন শ্রেষ্ঠী। গৌতম বুদ্ধকে জেতবন দান করবার অনেক আগে থেকেই তাঁর দানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যে শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, সেই শ্রেণীর অনেকেই বৌদ্ধসংঘের জন্য দান দিয়েছিলেন। মহাপরিনির্বাণসূত্রের কর্মকার চুন্দ একদিকে শিল্পী, অন্যদিকে ধনশালী। সুতরাং বৌদ্ধযুগে শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে ধন ছিল। অন্যদিকে আবার ঐ যুগেই দেখতে পাই হীন শিল্পীদের মর্মন্তুদ অবস্থা। সুত্তবিভঙ্গে কুম্ভকার, চর্মকার, তন্তুবায়, নাপিত সবাই হীন শিল্পীর দলে। এদেরও আবার নীচে হীনজাতি, যেমন রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ, বেণুকার। গুপ্তযুগে আবার দেখতে পাই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ামক ও শ্রেষ্ঠী শ্রেণীর মধ্যে আপসব্যবস্থা। শ্রেষ্ঠীরা রাষ্ট্রকে সাহায্য করত। মুদ্রারাক্ষসের চন্দনদাস রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠীর সম্মান পেয়েছিলেন। বাঙ্গলাদেশে ও বৈশালীতে সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠীরা অধিকরণের সদস্য হত। গুপ্তযুগে অতুল ধন যে ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে এসেছিল, তার বিরুদ্ধেও তো কোন শ্রেণী-আন্দোলন দেখা দেয়নি। এরই সঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত সমাজসেবক শ্রেণীর কথা। চণ্ডালের মতন জাতি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বরাবরই অস্পৃশ্য থেকে গেল। বৌদ্ধযুগেও এরা স্পৃশ্য হয়নি। বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীকন্যা চণ্ডালকে দেখে চোখ ধুতে গিয়েছিল। অনুরূপ ঘটনা একবার নয়, বৌদ্ধযুগে অনেক

বারই হয়েছিল। তবু চণ্ডাল, নিষাদ, পুক্কসেরা কেন এ অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছিল?

নিম্নবর্ণের ও অসংখ্য উৎপাদকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত সমাজবিপ্লব প্রাচীন কালে না দেখা দেবার অনেকগুলি কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে বংশানুক্রমে বৃত্তি-পালনের জন্যই তা সম্ভবপর হয়নি। মানুষ যখন একই কর্ম বংশানুক্রমে করতে থাকে তখন সে যন্ত্রে পরিণত হয়। যন্ত্রের চিত্ত থাকে না। তাই শিল্পী ও নিম্নশ্রেণীর সমাজ-সেবকরা নিজেদের অবস্থা উন্নত করবার চেষ্টা করেনি। এ ধরনের ভাবগত ব্যাখ্যা ছাড়াও সম্ভবতঃ বর্ণব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্যেই বিপ্লব দেখা দেয়নি। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র সমাজসেবক। সুতরাং তাঁরা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পেলেও সাধারণতঃ তাদের পুঁজির বাহুল্য ছিল না। ক্ষত্রিয় কোনদিনই উৎপাদকের কাজ করেনি। বৈশ্য যদিও ধনের উৎপাদনকারী ও বণ্টনকারী, তথাপি এদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নিম্নশ্রেণীর। তা ছাড়া বৈদিক যুগ থেকেই বৈশ্য ব্যবসায়ী ও ক্ষেত্রকর শ্রেণী করদাতা। মৌর্যযুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক শ্রেণীর উপর করভার বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীর ধনের প্রতিও রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি সর্বদাই থাকত। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রের গুপ্তচর ছলে ব্যবসায়ীর অর্থ হরণ করত। কুষাণ ও গুপ্তযুগে ব্যবসার বৃদ্ধি হলেও ব্যবসায়ী শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পায়নি। শ্রেণী ও নিগমের প্রতি ছিল রাজার সজাগ দৃষ্টি। নারদের নিয়ম থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী একত্র হতে পারত না। সুতরাং পুঁজি মুষ্টিমেয় বণিকের হাতে জমা হবার সম্ভাবনা কমই ছিল। তদুপরি প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র উৎপাদনকারীরাই সহযোগিতা করে ব্যবসা করতে পারত। পুঁজি যাদের হাতে থাকত, তারা উৎপাদকের ব্যবসা-প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারত না। এ ধরনের নিয়ম থাকায় প্রাচীন ভারতবর্ষে কোন যুগেই শিল্পিশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য পায়নি। বৃহদাকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভারতে এই জন্যই সম্ভবপর হয়নি, হয়তো এই কারণেই ভারতে ইংলণ্ডের মতন শিল্পবিপ্লব দেখা দেয়নি। তাই একদিকে শিল্পীরা পুঁজিপতির বিরুদ্ধে একত্র হ'তে পারেনি, আর অন্যদিকে শ্রেষ্ঠীরা পুঁজিপতিরা বিলাসময় জীবন যাপন করে বা ধর্মকার্যে অর্থব্যয় করে পুঁজি খরচ করত। শ্রেণী-বিভাজন ও বর্ণের যুগপৎ অস্তিত্বের জন্যই প্রাচীন ভারতে সমাজবিপ্লব ঘটেনি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সাময়িক দ্বন্দ্ব হলেও, এই দুই উচ্চ বর্ণের সঙ্গে বৈশ্য, শূদ্র বা নিম্ন জাতির লোকেদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়নি। শেষোক্ত বর্ণ বা নিম্নজাতির লোকেরা নিজেদের শক্তি অথবা সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।" তাঁর সময়ে এই সচেতনতার ঈষৎ উন্মেষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু একতাবন্ধন তখনো আসেনি: "ভারতেতর দেশে শূদ্রেরা যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে।" কিন্তু, "যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর!" ('বর্তমান ভারত', পৃ ২৯, সপ্তম সংস্করণ)।

স্বামীজীর স্বরূপ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

(৩) **'নর'-ঋষি :**

সঙ্গীতকে উপলক্ষ্য ক'রে ১৮৮১ সালের সম্ভবত: নভেম্বর মাসে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভবনে আনন্দোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম মিলন সংঘটিত হয়েছিল। এটি অবশ্য স্থূল কথা। স্বামীজীর ভাষায়— 'তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা'। কারণ, প্রথম পর্বে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে অতীন্দ্রিয় দিব্য-দর্শনের কথার উল্লেখ করেছি তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁদের এই মিলন প্রথম মিলন নয়। সে যাই হোক, ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে আমন্ত্রণ জানান এবং তদনুযায়ী তিনি কয়েক সপ্তাহ পরে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। নরেন্দ্রনাথ 'মন চল নিজ নিকেতনে'—এই গানটি গাইলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে নিজ কক্ষসংলগ্ন উত্তরের নির্জন বারাণ্ডায় নিয়ে গিয়ে করযোড়ে, দেবতার মত সম্মান প্রদর্শন করে বলেন—'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নর-রূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃ: ৬৯)। এই উদ্ধৃত বাক্যটির গঠন এমন যে, সহজেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ সেই প্রসিদ্ধ পুরাতন ঋষি 'নারায়ণ', বর্তমানে পুনরায় মনুষ্যরূপী হয়ে এসেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা গৃহীত হতে পারে না এই কারণে যে, এর বিপরীত আপ্তবাক্য রয়েছে। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-গ্রন্থে পাওয়া যায়, স্বামী যোগানন্দজী গ্রন্থকার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথনও বলতেন, 'জগৎ-পালক নারায়ণ, নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার।' (বাণী ও রচনা ২য় সং ৯. ৫৯)।

এই প্রকরণে স্বামী সারদানন্দ-রচিত একটি সঙ্গীতের অর্থ-বিচার করা যাক—যতটুকু এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। গানটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজন, কারণ তা না হ'লে সমাসবদ্ধ অন্তিম পদ 'নর-নারায়ণ'—শব্দটির অর্থ পরিষ্কার হবে না। গানটি এই :

স্তিমিত-চিৎ-সিন্ধু ভেদি, উঠিল কি জ্যোতি-ঘন,
কোটি সূর্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন,
মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন।
উজল বালক-বেশে, অখণ্ড-ঘর-প্রবেশে,
প্রেমঘন-বাহু-পাশে, কাহারে করে ধারণ।
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান, চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি, অবিদ্যা-কাম-কাঞ্চন।
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে বয়ান ;
তারা জলি ছায়াপথে, স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ।

(সাধনসঙ্গীত, ২য় সং, পৃ: ১৬০)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যখন গীতোক্ত এই দিব্য দর্শনটি হয়েছিল, তখন নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিম্নলিখিত কথাই প্রমাণ :

"আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দদর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। এক ধারে কেদার চুনী আর আর অনেক সাকারবাদী

ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ।"

"ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম, 'ও নরেন্দ্র'। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম, ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।"

(কথামৃত ৪. ২৪. ৩)

'কথামৃতে' উক্ত, এই দর্শন এবং 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লিখিত পূর্বোক্ত দর্শন, যা গানটির বিষয়-বস্তু—এই দু'টি দর্শনই এক মনে হয়। স্বামীজীর জন্ম ১৮৬৩ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮৩৬-এ। সুতরাং এই দর্শনের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়স ২৭ বছরের কম নয়। অর্থাৎ দর্শনটি ধৃতবিগ্রহ তাঁদের দু'জনেরই প্রাগ্-আবির্ভাব বিষয়ক। এইজন্য 'পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ'—এই অন্তিম বাক্যটি 'তারা জলি ছায়াপথে, স্পর্শে ধরা আচম্বিতে' পঙ্‌ক্তিটির অব্যবহিত পরেই স্থান পেলেও বিষয়-বস্তুর দিক থেকে কেবলমাত্র ঐ পঙ্‌ক্তির সঙ্গেই সম্বন্ধ নয়। ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'চল চলি'—শব্দ দু'টিকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সুতরাং স্বভাবতই 'নর-নারায়ণ' এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য হবে গানটির সামগ্রিক রূপ থেকে—অর্থাৎ হবে 'নর ও নারায়ণ' (দ্বন্দ্বসমাস)। তা' হলে স্বামী সারদানন্দজীর মত এই দাঁড়ায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন 'নারায়ণ'-ঋষি এবং স্বামীজী 'নর'-ঋষি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দর্শনটি যদি নরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে হ'ত, তাহলে এ রকম অর্থ করা স্বাভাবিক হ'ত যে, বালক-বেশী শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সমাধিস্থ যোগীকে জন্ম পরিগ্রহ করতে আহ্বান করছেন এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হচ্ছে বা অচিরেই হবে। সেক্ষেত্রে 'নর-নারায়ণ' পদটি শুধু নরেন্দ্রনাথেরই উদ্দেশে প্রযুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হ'ত। কিন্তু দর্শনটি স্বামীজীর জন্মের পূর্বে ঘটেনি বলেই ঐ ধরনের অর্থ করা সমীচীন নয়। তা সত্ত্বেও যদি পূর্বোক্ত অন্তিম পঙ্‌ক্তিটি, কেবলমাত্র অব্যবহিত পূর্ব পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অন্বিত করা হয়, তা'হলে 'নর-নারায়ণ' শব্দটির ব্যাসবাক্য করতে হয়—'নররূপী নারায়ণ' (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), আর এই ব্যাসবাক্যই যদি সঙ্গীত-রচয়িতার অভিপ্রেত বলে মনে হয়—কারণ এতে লীলাপ্রসঙ্গেরই ভাষা এসে যাচ্ছে, তা'হলেও 'নররূপী নারায়ণ'-এর কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্গীতোক্ত 'বালক' ও 'যোগী' এবং লীলাপ্রসঙ্গোক্ত 'দেবশিশু' ও 'ঋষি' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'ভক্তমালিকা'য় লিখেছেন : 'এই যুগ্ম আত্মাই যুগে যুগে নারায়ণ ও নর-ঋষির অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মসংস্থাপন করেন।' (১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১)। ঐ গ্রন্থেরই ৩২ পৃষ্ঠায় আছে : '(শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলিতেন, ও অখণ্ডের ঘর—সপ্তর্ষির এক ঋষি—নরনারায়ণ ঋষির নর।' গ্রন্থকারের আধুনিকতম রচনা 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'—গ্রন্থেও পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন্দ্রনাথ—'নরনারায়ণের নরঋষি' (১. ১৩২)।

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'নারায়ণসকাশে নরঋষি' এই শীর্ষকটিও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। এখানে যে শব্দশ্লেষ অলংকার রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় 'নর' ও 'নারায়ণ' এই দুটি শব্দের প্রত্যেকটিই একটি সামান্য ও

একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বিশেষ অর্থটি নিলে আমরা পাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন 'নারায়ণ'-ঋষি এবং স্বামীজী হচ্ছেন 'নর'-ঋষি।

স্বামীজীর স্বরূপ আলোচনার এই তৃতীয় পর্বটি এখানেই সমাপ্ত হল।

(৪) **শিবাবতার :**

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়।' (কথামৃত', ১. ১৩. ৬)।

'যাদের শিবের অংশ তাদের জ্ঞানীর স্বভাব।' (ঐ ২. ২২. ৩)।

'সোঽহং সোঽহং কল্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ স্বমুখঠেলা।' (ঐ ২. ৮. ২)।

'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর।' (ঐ ৪.২৩.৭)।

'ওর (নরেন্দ্রের) মধ্যে শিবের শক্তি আছে।' ('যুগনায়ক বিবেকানন্দ' ১. ১৩৩)।

শেষোক্ত গ্রন্থে আরও পাওয়া যায় :

'একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি আলোর রেখা যেন বারাণসীর দিক হইতে কলিকাতাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে, এবং তিনি সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার প্রাথনা পূর্ণ হয়েছে; এখানকার লোক যে, তাকে একদিন না একদিন এখানে আসতেই হবে।' (১. ১০৬)।

স্বামীজীর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তাঁর মা পুত্রকামনায় এক বৎসর শিবের ব্রত পালন করে স্বামীজীকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। কাশীবাসিনী কোন এক আত্মীয়ার সাহায্যে ভুবনেশ্বরীদেবী কাশীক্ষেত্রে ৺বীরেশ্বর শিবের পূজাদির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং স্বয়ং কলকাতায় থেকে ধ্যান-জপ, ব্রত-পূজাদিতে নিমগ্না ছিলেন। স্বামীজীর জন্মের কয়েক মাস আগে, একদিন পূজা-প্রার্থনাদির পরে স্বপ্নে তাঁর একটি দিব্য দর্শন হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, জটাজূটমণ্ডিত, জ্যোতির্ময়, তুষার-ধবল মহাদেবের ধ্যানমূর্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। দেবাদিদেব সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে এক পুরুষ-শিশুর আকার ধারণ করলেন—যেন তাঁর নিজেরই সন্তান। এই দেবস্বপ্নটি যে মিথ্যা হবার নয়, ভুবনেশ্বরীদেবী তা অন্তরের অন্তস্তলে বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ ঐ দর্শনের ফলে তাঁর মনপ্রাণ এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। পুত্রসন্তান লাভ করে জননী তার নাম রেখেছিলেন—'বীরেশ্বর'।

৺বীরেশ্বর শিবের অংশে যে স্বামীজীর জন্ম তা স্বামী শিবানন্দজী একদিন বেলুড় মঠে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কাশীপুরের বাগানে থাকার সময়ে স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি একটি অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলেন যার অন্তর্নিহিত অর্থ পরবর্তীকালে ৺বীরেশ্বর শিবের স্তোত্রপাঠে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল। (শিবানন্দবাণী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৯৮-১৯৯ দ্রষ্টব্য)।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলতেন—'স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে পূজা করবি। স্বামীজীর মা শিবব্রত করে স্বামীজীকে পেয়েছিলেন।' (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১০৫)।

পূজ্যপাদ নাগ মহাশয় বলেছিলেন—'অদৃষ্টে ছিল, ঠাকুরের শ্রীচরণদর্শন করেছিলুম, তাই ধন্য হয়ে গেছি। শিবাবতার স্বামীজীকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছি, সাক্ষাৎ মা ভগবতীকে দর্শন করেছি ও মায়ের কৃপা পেয়েছি' ইত্যাদি। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৮৭)।

বাস্তবিক, স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীতে এবং তাঁর বাণী ও রচনাতেও শিবের প্রভাব বহুল পরিদৃষ্ট হয়।

শিশু বীরেশ্বর রামায়ণের কাহিনী শুনে বাজার থেকে রাম ও সীতার যুগলমূর্তি কিনে এনে বাড়ীর চিলেঘরে স্থাপন করে ধ্যান ও পূজাদি করতেন। একদিন পূজাতে তাঁর অতি প্রিয় নিত্যসঙ্গী সহিসের কাছে শুনলেন—'বিয়ে করা বড় খারাপ।' শ্রোতার তখন বয়স বা বুদ্ধি হয়নি সহিসের উক্তির উৎস কোথায় তা বুঝতে। শিশুমনে সীতারামের মিলন পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে মনের দুঃখ জানালেন। বুদ্ধিমতী জননী হেসে বললেন—'বিলে, ওতে আর হয়েছে কি? তুই শিবপূজো কর।' সন্ধ্যার অন্ধকারে দুঃখোদ্বেল অন্তরে বিলে সীতারামের যুগলমূর্তি ছাদ থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পরদিন বাজার থেকে একটি শিবমূর্তি এনে সীতারামের আসনে বসিয়ে ধ্যান শুরু করলেন।

ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক, সন্দেহ নেই। তবে এটিকে স্বামীজীর পরবর্তী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তাঁর রামচেতনার প্রতি অবিচার করা হবে। মাটির সীতারামমূর্তি চূরমার হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু নিভৃত হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত ছিল নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' আছে, "নরেন্দ্রনাথের মাতা বলিলেন—পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন!' বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔষধও বাহির করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তখন ৺বীরেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল দুই-এক ঘড়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত।" (৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ৮৬-৮৭)।

প্রভাতের এই সোনালী আলো থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে অস্তাচলগামী আয়ুসূর্যের দিকে নিবদ্ধ করলে সেখানেও আমরা দেখি শিবেরই মহিমা! স্বামীজী বলতেন, অমরনাথ শিব তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুবর দিয়েছিলেন। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' আছে, 'শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলেছিলেন—অমরনাথ-দর্শনের পর হতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।' (বাণী ও রচনা, ২য় সং, ৯. ৯০)। এই প্রসঙ্গে, ঐ গ্রন্থেই বর্ণিত, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্বামীজীকে কুণ্ডল, ত্রিশূল, বিভূতি রুদ্রাক্ষ, জটাজূট দিয়ে শিবের বেশে সাজানো এবং দেবস্বপ্ন-প্রণোদিত শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক স্বামীজীর শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার বাসন দিয়ে তাঁর বিধিমত পূজা—এই দুটি ঘটনাও স্মরণীয়। (ঐ, পৃঃ ৭৮ ও ১০২)।

ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি' গ্রন্থেও স্বামীজীর শিবচেতনার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামীজীর শিবস্তোত্র, শিবের গান, 'বর্তমান ভারত'এ তাঁর স্বদেশমন্ত্র—হে ভারত ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর...... হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও' (বাণী ও রচনা ৬ ২৭৯) ইত্যাদি বহু রচনা তাঁর শিবস্বরূপের ইঙ্গিত দেয়।

শিবরূপী শ্রীগুরুর উদ্দেশে সুরভারতীতে রচিত, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধ 'মূর্তমহেশ্বর' সঙ্গীতটি স্বামীজীর শিবপরিচয় সুরের মাধ্যমে জগতে চিরকাল ছড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই।

স্বামীজীর স্বরূপ-কথায় চতুর্থ পর্বটির আর একটি দিক রয়েছে। তাঁর সহোদর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য মহেন্দ্রনাথ দত্তের একটি উক্তিতে সেই দিকটি উল্লিখিত হয়েছে। উক্তিটি এই : 'আমাদের তিন ভাইয়ের রুদ্রাংশে জন্ম। রুদ্রাংশে না জন্মালে, কেউ-ই রুদ্রতেজ দেখাতে পারে না।' (শতবার্ষিকী 'লেখমালা', পৃ: ১২-১৩)।

রুদ্র হচ্ছেন শিবের সংহারমূর্তি। শিব যখন বাম হন, তখন হন রুদ্র; রুদ্র যখন 'দক্ষিণ' হন, তখন হন শিব—'রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, যে শিবরূপ, তাই দিয়ে আমাকে সর্বদা রক্ষা কর—এই হল বৈদিক প্রার্থনা। একই পুরুষের দুটি রূপ। বাস্তবিক স্বামীজীর ভেতর এই দুটি রূপেরই সম্যক্ অভিব্যক্তি দেখা যায়। তাই, শুধু শিবরূপেরই আলোচনা করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রুদ্ররূপেরও আলোচনা প্রয়োজন।

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'তে রুদ্রতেজের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। বলছেন স্বামীজী :

> "ঢাকঢোল দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরু-গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে।...বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।" (বাণী ও রচনা, ২য় সং, ৯.২১৯-২৩)

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-কবিতায় রুদ্রভাবের জয় জয়কার :

'মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ,
ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার
শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায়
করাল বিজলীজ্বালা।

* *

'ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্ ঝর্‌র্ দামামা নকাড়,
বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্, বব-বব-বম্
বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল
বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়
আসোয়ার ঘোড়া হাতী॥

* *

'রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়
মৃত্যুরূপা এলোকেশী।

* *

'আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান,
প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥'

শ্রীমা সারদাদেবীকে এক ব্যক্তি বলেছিলেন—স্বামীজী আজ বেঁচে থাকলে, কত কাজই না দেশের হ'ত! কথাটি শোনামাত্রই শ্রীশ্রীমা বলেছেন—'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে, কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃ: ২০৩-২০৪)।

মায়ের এই সহজ সরল উক্তিতে স্বামীজীর রুদ্রস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালে লণ্ডন শহরে বসেই স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গে বলছেন :

'বেপরোয়া হ'য়ে কাজ করতে হবে। বিধি-মতে কাজ করে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।

'পড়ুক গুলি আমার বুকে ; আমেরিকা, ইউরোপ একবার কিরকম কেঁপে উঠবে! তখন বুঝবে বিবেকানন্দ কি জিনিস! আমেরিকায় এমন স্থান নেই যেখানে বিশ-ত্রিশ হাজার লোক নিতান্তই আমার অনুগত নয়। আমার রক্ত পড়লে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে যাবে।' (লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১৯১)।

এই উদ্ধৃতিটি একটি উপলক্ষণ মাত্র। এই ধরনের উদ্দীপনাপূর্ণ, রুদ্রতেজোদীপ্ত, অগ্নিগর্ভ বহু শব্দ-ঝংকার একদিন বাংলার তরুণদের প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল এবং দেশমাতৃকার বেদীমূলে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে তাদের প্রোৎসাহিত করেছিল, সন্দেহ নেই।

মনে পড়ে, মারাঠী জননায়ক, বিচারপতি রানাডের সন্ন্যাসবিরোধী অভিভাষণের তীব্র প্রতিবাদে স্বামীজীর অগ্নিময়ী ভাষায় প্রবন্ধ-রচনা—ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীকেও গৌরব দেওয়া, কারণ, সে তো জীবনে একবারও চেষ্টা করেছে শৃঙ্খল ভাঙ্গতে, কাপুরুষের মত চিরনিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি!

এ গৌরবদান, ভারতের অতীত যুগের সাহিত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিক্রমা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এ গৌরব দিয়েছিলেন কয়েক হাজার বছর আগে একদিন গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের বিধানে ভ্রষ্ট পায় ঊর্ধ্বলোকে পুণ্যকৃৎদের দীর্ঘকালীন সঙ্গ ও অন্তে নরলোকে পবিত্র বংশে দুর্লভ জন্ম—বলেছিলেন পার্থসারথি পার্থের সংশয় নিরসন করে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের এই শাশ্বত বাণীরূপকে বিশ্বাসের আলোকেই দেখতে হয় সর্ব-সাধারণকে। কিন্তু এ যুগে স্বামীজী ভ্রষ্টকে গৌরব দিয়েছেন, যুক্তির দিক থেকে। অবশ্য এ যুক্তিও তাঁদেরই গ্রাহ্য, যাঁরা চতুর্বর্গের তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই স্বামীজী লিখেছিলেন :

> "আদর্শটি যদি খাঁটি ও সরল হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে-কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ চলতি কথাতেই আছে—'ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল'।
>
> "যে কখন উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি, সেই কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী তো বীর।"

(বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ৪০০-৪০১)।

মনে পড়ে, বালী স্টেশনে স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কর্মচারীর থানা হয়ে বরাহনগর মঠে গিয়ে স্বামীজীকে লিখে দিতে বলা যে, অখণ্ডানন্দজী তাঁর গুরুভাই এবং তদুত্তরে স্বামীজীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠের—'লিখে আবার দোব কি।' শুনে ও তাঁর করাল ভ্রূকুটি দেখে বেগতিক বুঝে পুলিশ-পুঙ্গবের দ্রুত পলায়ন!

মনে পড়ে, আবু রোড স্টেশনের সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা। শ্বেতাঙ্গ রেলকর্মচারীর অভদ্র ব্যবহারে স্বামীজীর তীব্র তিরস্কার—'এই শেষ বলছি, হয় তোমার নাম ও নম্বর দাও, নতুবা লোকে দেখুক, তোমার মত কাপুরুষ দুনিয়ায় নেই।'

আর মনে পড়ে, জাহাজের সহযাত্রী খৃষ্টান মিশনারীর জামার কলার বজ্রমুষ্টিতে ধরে রুদ্রমূর্তি স্বামীজীর সেই ভয়প্রদর্শন—'আবার আমার ধর্মের নিন্দা করলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দোব।'

স্বামীজীর প্রাক-সন্ন্যাস জীবনের রুদ্রভাবের ঘটনাগুলি এখানে বাদই দেওয়া গেল।

বার শো বছর ধরে যে রচনাবলী ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রধান উপজীব্য হয়ে রয়েছে, যা থেকে তাঁরা জেনেছেন, সন্ন্যাস কি, সন্ন্যাসীর কৃত্য কি, সন্ন্যাসের মহিমা কি, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সন্ন্যাসী হবেন 'শান্তদর্প'। সুতরাং জামার কলার চেপে ধরা—এ আবার কোন্ দেশী সন্ন্যাসীর কৃত্য? এই প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। এর উত্তর এই যে, আসলে দর্প হচ্ছে 'অহং'। সেই 'অহং' চিরদিনের মত স্বামীজীর মুছে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে জগদ্গুরুর শ্রীকরস্পর্শে। শিবরূপের আর রুদ্ররূপের সমন্বয় ঘটেছিল এক অখণ্ড নীরূপে। যে 'অহং' দেখা দিত, তা ছিল 'সোনার তলোয়ার', 'পোড়াদাড়' বাধিতের পুনরাবৃত্তি, লোককল্যাণে।

বাইরের আচরণে আমরা অনেকেই অতি বিনীত হতে পারি, কণ্ঠে আমাদের 'দাসানুদাস'-সুর অনুরণিত হতে পারে অনুক্ষণ, কিন্তু তাতে 'দর্প' যায় না। অহংকার প্রচ্ছন্নই থেকে যায়, বিনষ্ট হয় না। কিন্তু রুদ্রমূর্তি, দৃপ্তকণ্ঠ স্বামীজী চিরকালই ছিলেন শান্তদর্প। যিনি শিব তাঁরই রুদ্র হওয়া সাজে। কুসুমকোমলতা ও কুলিশ কঠোরতার মিলনভূমি ছিল তাঁর অন্তর। একাধারে 'শান্তম্ শিবম্' ও 'রুদ্রসুন্দরম্' রূপ ছিল তাঁর।

অযোগ্য অনুচর অক্ষম লেখনী নিয়ে আরাধ্যদেবতা স্বামীজীর দুরবগাহ, অতি-লৌকিক স্বরূপের বিচার-বিমর্শ করতে প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি উক্তির অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। শ্রীমা সারদাদেবীর ও আপ্তপুরুষগণেরই উক্তিনিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্থ সমীচীন প্রতিভাত হয়েছে, তাই ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। তবু একথা বলব না যে, এখানে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বিষয়ে তাই চরম সত্য বা শেষ কথা। বিষয়টি লৌকিক নয়, সুতরাং বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলি:

'আচার্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥'

"অনন্ত শক্তিই ধর্ম বা ঈশ্বর।"

"বীর্যলাভের প্রধান উপায় উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে আমি আত্মা······আমি সর্বশক্তিমান্।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

'উত্তররামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে' অর্থাৎ উত্তররামচরিতে ভবভূতির বহু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তর কাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটক 'উত্তর-রামচরিত' রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মহাবীরচরিত নাটকের উত্তরাংশ বলিয়া উহার এইরূপ নাম। কোন কোন পণ্ডিত উত্তর অর্থে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। কারণ যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্রের মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, স্ত্রী ভাই প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনুরক্তি ও কর্তব্য লক্ষিত হয়। কিন্তু উত্তররামচরিতে প্রজানুরঞ্জনের জন্য, আদর্শস্থাপনের জন্য, পূর্ণ যৌবনে আপন মনকে বশীকৃত করিয়া স্ত্রীনির্বাসন, বর্ণাশ্রমধর্ম সংরক্ষণ, স্বর্ণসীতা গড়িয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন ইত্যাদি গুণাবলী রামচন্দ্রকে মর্যাদাবান পুরুষে পরিণত করিয়াছে। এই নাটকখানি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকেও সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং ভবভূতির কবিকল্পনার উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। ভবভূতির এই নাটকে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে—আমরা অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে উহা দেখাইব।

উত্তররামচরিতের আরম্ভটা সুন্দর; বহু দুঃখের পর রাম-সীতার মিলন আনন্দের। রাজলক্ষ্মী সন্তান-সম্ভবা। বিধি সীতাকে পুনর্বার নির্বাসনে পাঠাইবার ভূমিকাস্বরূপ রামচন্দ্রকে লোকপ্রসিদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: 'গর্ভবতীর যে-কোন ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ করিবে।' রামচন্দ্র সীতার সামনে প্রজাপালনের প্রতিজ্ঞাস্বরূপ বলিয়াছেন, "লোকের সন্তোষের নিমিত্ত স্নেহ, দয়া, সুখ এমন কি সীতাকে পরিত্যাগ করিতেও আমার দুঃখ নাই।" সীতা এই কথা সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন; কারণ তিনি তখন ঐ কথার তাৎপর্য চিন্তা করেন নাই। কালিদাস লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে বিভিন্ন স্মৃতিকথা টানিয়াছেন, ভবভূতি সেখানে সংক্ষেপে সারিয়া বর্তমান নাটকে চিত্রদর্শন নামে প্রথম অঙ্ক সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত পূর্ব বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এইরূপ আলেখ্যদর্শন ভবভূতির একান্ত নিজস্ব নহে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলায়' (ষষ্ঠ অঙ্কে, কালিদাস বিরহকাতর রাজা দুষ্মন্তকে শকুন্তলার চিত্র দর্শন এবং ঐ চিত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে জীবিতের ন্যায় সম্ভাষণাদি করাইয়াছেন। পরে বয়স্য চিত্র বলিয়া স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বলিলেন, "দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন। স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥" অর্থাৎ আমি তন্ময় হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়াকে দর্শন করিতেছিলাম, তুমি স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরায় কান্তাকে চিত্রীভূতা করিয়া তুলিলে। এইভাবে দেখা যায় কালিদাসের ছায়া ভবভূতির উপর পড়িয়াছে।

ঐ সব চিত্রদর্শনকালে সীতা আবেগভরে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "স্নিগ্ধ ও নিস্তব্ধ বনশ্রেণীর মধ্যে আবার বিচরণ করিব, আর পবিত্রতা-জনক, পাপনাশক ও শীতল ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিব।" রাম সীতার ঐ মনোবাসনা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে সীতার অভিলাষ পূর্ণ

করিতে বলিলেন। এদিকে দুর্মুখ আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রজাদের অসন্তোষের কথা বলিলেন। রামচন্দ্র স্থির করিলেন: যে-কোন কার্যের দ্বারা লোকের সন্তোষ করা সজ্জনের ব্রত। তথাপি তাঁহার খেদোক্তি সত্যই হৃদয়বিদারী: "হায়, বিধাতা দুঃখ-ভোগের জন্য রামের দেহে চৈতন্য দিয়াছিলেন।" নিদ্রিতা সীতার চরণযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া (সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) রামচন্দ্র বলিলেন, "দেবি, রামের মস্তকে তোমার চরণ-কমলস্পর্শ এই শেষ।" স্ত্রীর পা স্বামী মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন-ইহাতে ভবভূতির কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্য অনুমিত হয়। ভবভূতি ভাবিয়াছেন, এইরূপ আচরণের দ্বারা রামচন্দ্রের এই অক্ষয় অকীর্তির কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। তারপর লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণ করিয়া প্রকারান্তরে নির্বাসন দিয়া আসিলেন।

ভবভূতির পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক দ্বিতীয় অঙ্কটিও স্বকপোলকল্পিত। বাল্মীকির আশ্রম হইতে আগতা আত্রেয়ীর সঙ্গে বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথন খুবই চমৎকার। আত্রেয়ী সীতাসখী বাসন্তীর কাছে বলিয়া চলিলেন সীতার দুর্দশার কথা, অপবাদের কথা, কুশ ও লবের জন্মকথা। আত্রেয়ী আরও বলিলেন যে, রাজার দোষ ভিন্ন প্রজাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু হয় না; সেই হেতু রাম-রাজ্যে এক ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হওয়ায় রামচন্দ্র নিজে ঐ মৃত্যুর হেতু শম্বুক নামক এক শূদ্র-তপস্বীর অন্বেষণ করিতেছেন। বাসন্তী জানিতেন যে, যজ্ঞের ধূমমাত্রপানকারী শম্বুক নামক শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে। তিনি রামচন্দ্রের দর্শনে আশান্বিত হইলেন। আত্রেয়ী বাসন্তীকে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলিলেন। যজ্ঞ করিতে হইলে যজমানের সহধর্মিণীর প্রয়োজন হয়। বাসন্তী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে আত্রেয়ী বলিলেন যে, রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণময়ী মূর্তি গড়িয়া যজ্ঞ করিতেছেন। বাসন্তী রামচন্দ্রের ঐরূপ কড়ি-কোমল আচরণে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন: "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥" অর্থাৎ লোকোত্তর পুরুষদের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠিন আবার কুসুম হইতেও কোমল; সুতরাং সেই চিত্ত কে বুঝিতে পারে?

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের' চতুর্থ খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষভাব বুঝাইতে গিয়া স্বামী সারদানন্দজী ভবভূতির উপরোক্ত বিখ্যাত শ্লোক অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন: "অবতারশরীরে দেব এবং মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্বে কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, একথা ভাবি নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সকলের আকর্ষণের কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "কুসুমকোমল বালক-পরিচ্ছেদে আবৃত ভিতরের বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ।"

ভবভূতির ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্কটিও কাল্পনিক। পূর্ব অঙ্কে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকুমারকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং শূদ্র তপস্বী শম্বুককে তাহার ঈপ্সিত লোকে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটী ও জনস্থানের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বনবাসের সেই সুখ-দুঃখে ভরা দিনগুলির স্মৃতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ভবভূতি তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে তমসা ও মুরলা নামক নদীদ্বয়কে মানবীরূপে সৃষ্টি করিয়া রাম-সীতার মিলনের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তমসা

সীতার কাহিনী বলিয়া চলিয়াছেন: "লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বাল্মীকির তপোবনে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তারপর সীতার প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখাবিষ্ট হইয়া নিজেকে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই দুইটি বালক প্রসব করেন। সেই সময় ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গা (বালক দুইটির সহিত) সীতাকে ধরিয়া পাতালে লইয়া যান। স্তন্য-দুগ্ধ-পরিত্যাগের পর তাঁহার সেই বালক দুইটিকে স্বয়ং গঙ্গাদেবী বাল্মীকির নিকট সমর্পণ করিয়া আসেন। কিন্তু বর্তমানে শম্বুকের ঘটনায় রামচন্দ্র জনস্থানে আসিয়াছেন —সরযূ নদীর মুখে গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া সীতার সহিত গৃহাচারচ্ছলে গোদাবরীনদীকে দেখিতে আসিয়াছেন। কুশ ও লবের জন্ম হইতে আজ দ্বাদশ বৎসর শেষ হইয়াছে। ভগবতী গঙ্গা সীতাকে অদৃশ্য হইবার বর দিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন, 'তমসে, তুমি সীতার সহচারিণী হও।'"

ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে রামচন্দ্রের সহিত বাসন্তীর সাক্ষাৎ হয় এবং ছায়া সীতা ও সহচরী তমসা রামচন্দ্রকে দর্শন করেন। ভবভূতি এখানে অলৌকিক উপায়ে রাম-সীতার মিলন ঘটাইয়াছেন। ভবভূতি রামচন্দ্রকে সীতার জন্য হাহুতাশ এমন কি মূর্ছা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। মহাবীরচরিতের রামচন্দ্র কঠোর, দৃঢ়, বীর; কিন্তু উত্তররামচরিতের রামচন্দ্র কোমল, দুর্বল, এমন কি নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ভবভূতি হইতেছেন নাটক-নির্মাতা; সুতরাং তাঁহাকে অপরের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নাটকের শ্রোতৃবর্গ স্ত্রীপুত্র-পালনকারী সাধারণ মানুষ; সেই হেতু তাহাদের মনের ভাব ভবভূতি নাটকে দেখাইয়াছেন। ইতিহাসকর্তা বাল্মীকির মত বস্তুপ্রকাশ করিয়াই তিনি মুক্ত থাকিতে পারেন না। তাহা ছাড়া বীরপুরুষের হৃদয় সদা সর্বদা যে কেবলমাত্র বীররসে ভরপুর থাকিবে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। মনুষ্যহৃদয় কোন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে না, সেখানে নানা ভাবের আলোড়ন উঠিতে পারে। দর্শনশাস্ত্র বলেন যে, হৃদয়ের নিজেরই একটা যুক্তি আছে, যুক্তি যে বিষয়ে নিজে অজ্ঞ। এই ব্যাপারে ভবভূতি লৌকিক উদাহরণ দিয়াছেন: জলরাশি বৃদ্ধি পাইয়া জলাশয়ের অনিষ্ট আরম্ভ করিলে তাহার জল-নিঃসারণই প্রতীকার; সেইরূপ শোকের উদ্বেলন আরম্ভ হইলে বিলাপ দ্বারাই হৃদয়কে ধারণ করা যায়।

ভবভূতি তাঁহার অমর লেখনীতে রামচন্দ্রের বিরহাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন: "কষ্টং ভোঃ! কষ্টম্। দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে, বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্। জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ, প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥" অর্থাৎ দারুণ কষ্ট! দারুণ কষ্ট! গাঢ় শোকাবেগ হৃদয়কে দলিত করিতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে না; বিকল দেহ মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না; অন্তরের দাহ দেহকে জ্বালাইতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে না; মর্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন না।

আমরা আবার রঘুবংশে ফিরিয়া যাই। কালিদাস পঞ্চদশ সর্গে ১০৩টি শ্লোকে রামের অন্ত্যলীলা শেষ করিয়াছেন। তিনি নূতন কিছু বলেন নাই; আপনভাবে বাল্মীকিকে

পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। সীতাকে বিদায় দিয়া আসিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন : "কালের গতিই এই প্রকার। সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। আপনি যদি মৈথিলীর জন্য শোকবিহ্বল হন তবে যে অপবাদের ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অপবাদই (রাম কলঙ্কিনী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত) আবার পুরমধ্যে প্রচারিত হইবে।" বাল্মীকি এইখানে বেশ যুক্তিসম্পন্ন ব্যবহার দেখাইয়াছেন। ভবভূতি কিন্তু নিজের হৃদয়াবেগকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। যজ্ঞের বিঘ্নকারী লবণ রাক্ষসের বধের জন্য রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্ন যাত্রাকালে বাল্মীকির তপোবনে একরাত্রি কাটান। বাল্মীকি রামায়ণমতে সেই রাত্রেই কুশ ও লবের জন্ম হয়। নামকরণের হেতু দেখাইতে গিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন যে, একটির কুশদ্বারা ও অপরটির লব বা গোপুচ্ছ-লোম দ্বারা গর্ভক্লেদ মার্জিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত আদিকবি তাহাদের নাম কুশ ও লব রাখেন। ইহার পর রামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্রকে বধ করিয়া মৃত ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ভবভূতি বধ দেখান নাই।

ভবভূতির কথা আমরা বেশী করিয়া বলিতেছি, কারণ তিনি রামের অন্ত্যলীলায় অনেক মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ববর্তী অঙ্কগুলির ন্যায় বর্তমান অঙ্কটি (কৌশল্যা ও জনক-সম্মেলন) নূতন ধরনের। সীতার শোকে পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল অগ্নিব্যাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় সন্তপ্ত। জনক, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী কৌশল্যা প্রভৃতি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম হইতে বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত। মহামান্য অতিথিদের জন্য মধুপর্ক সহযোগে অর্ঘ্য দিবার রীতি আছে। পশুমাংস দিয়া মধুপর্ক প্রস্তুত করিতে হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুহিংসার বিধি আছে। (সমাংসো মধুপর্কঃ ইতি শ্রুতেঃ)। মনু-স্মৃতিতেও মধুপর্কে পশুহিংসার কথা আছে। যাহা হউক, অঙ্কের প্রারম্ভে পূর্বকথিত অতিথিদের জন্য মধুপর্ক-পরিবেশন লইয়া ভবভূতি তপস্বী ভাণ্ডায়ন ও সৌধাতকির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সৃষ্টি করিয়াছেন তারপর পশুহিংসার যৌক্তিকতা দেখানো হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ভবভূতি মীমাংসক মত পোষণ করিতেন।

কৌশল্যা আশ্রম-বালকদের মধ্যে লবকে দেখিয়া "ও মা, ইহাদের মধ্যে এইটি কে? ঠিক রামভদ্রের শোভায় পরিশোভিত, সুলক্ষণ, সুন্দর এবং সুন্দরভঙ্গিসমন্বিত অঙ্গদ্বারা আমাদের নয়ন শীতল করিতেছে।" জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি অভ্যাগতেরা যখন লবকে স্নেহ, আদর করিতে ব্যস্ত এবং তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তৎপর, তখন নেপথ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর আদেশ শ্রুতিগোচর হইল। অভ্যাগতদের কাছে চন্দ্রকেতুর পরিচয় পাইয়া লবের রামায়ণের উপাখ্যান মনে পড়িল। অভ্যাগতদের অগ্রহাতিশয়ে লব তাঁহাদের সীতানির্বাসন পর্যন্ত 'রামায়ণ' শোনাইলেন। পরবর্তী অংশ সম্বন্ধে বলিলেন : আমি জানি না; তবে ভগবান বাল্মীকি উহার কোন এক অংশকে নিজ হস্তে লিখিয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সূত্রকার ভরতমুনির কাছে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ ধনুর্বাণহস্তে সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন।

'রাজা সার্বভৌমোঽশ্বমেধেন যজেত নাপ্যসার্বভৌমঃ' (আপস্তম্বঃ)। ক্ষত্রিয় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সার্বভৌম রাজা হইতেন। বাল্মীকি-শিষ্য লব রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব আটক করিলেন। শুরু হইল তুমুল যুদ্ধ। বীর বালক একাকী অযোধ্যার চতুরঙ্গ সেনা বিধ্বস্ত করিলেন। রথচারী চন্দ্রকেতু পাদচারী লবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে মহাবাহু লব, এই সকল সৈন্য দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? এই আমি রহিয়াছি, আমার নিকটে আইস; তেজে তেজ লীন হউক। তুমি আশ্চর্য গুণাধিক্যবশতঃ আমার প্রীতিকর হইয়াছ। অতএব তুমি আমার সখা হইলে।" সারথি সুমন্ত্র বালক লবের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কারণ লব জৃম্ভকাস্ত্র দ্বারা সমস্ত সৈন্যকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কুমারদ্বয় পরস্পরকে স্নেহ ও অনুরাগের সঙ্গে দর্শন করিলে কি অবস্থার উদ্ভব হইল, ভবভূতি তাহার একটি মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়াছেন: ইহা কি ঈশ্বরেচ্ছাকৃত সম্মেলন, না গুণের আধিক্য? কিংবা জন্মান্তরীণ গাঢ় সম্বন্ধ নিবন্ধন কোন চিরপরিচয় অথবা দৈববশতঃ অজ্ঞাত কোন আত্মীয়-সম্বন্ধ? বিনা কারণে যে প্রণয় জন্মে, তাহার নাশ হয় না, কারণ স্নেহস্বরূপ সেই সূত্র অন্তরের মর্মস্থানগুলিকে সেলাই করিয়া দেয়।

তারপর রামচন্দ্রের কথা উঠিল। রামায়ণজ্ঞ বাল্মীকি শিষ্য লব বলিয়া চলিলেন রামের অকীর্তির কথা—তাড়কাবধ (নারীবধ), খরের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিন পা পিছাইয়া যাওয়া, গোপনে বালীবধ ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দায় চন্দ্রকেতুও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বাধিল তুমুল সংগ্রাম। চন্দ্রকেতু আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলে লব বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা থামাইয়া দেন। রাবণের যুদ্ধ-বর্ণনায় ভবভূতি দেবরাজ ইন্দ্র ও গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখানেও তেমনি বিদ্যাধর দম্পতিকে উজ্জ্বল বিমানে উঠাইয়া যুদ্ধবর্ণনা দেওয়াইয়াছেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। এমন সময় শম্বুকবধ করিয়া রঘুনাথ রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রের আদেশে যুদ্ধ থামিল চন্দ্রকেতু রামপদে প্রণত হইলেন। চন্দ্রকেতু পরিচয় করাইয়া দিলে লব নিবেদন করিলেন, "পিতঃ, বাল্মীকির ছাত্র লব অভিবাদন করিতেছে।" লবকে দেখিয়া রামের মনের অবস্থা ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন: এই বালকটি সহসাই আমার দুঃখের অবসান করিতেছে কেন? কেনই বা অন্তরাত্মাকে স্নেহার্দ্র করিতেছে? অথবা স্নেহ কোন কারণ অপেক্ষা করিয়া হইবে—ইহা তো অপ্রামাণিক! আভ্যন্তর কোন গূঢ় কারণে দুইটি হৃদয় স্নেহসূত্রে বাঁধা পড়ে, ভালবাসা তো কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। তারপর লবের জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া রামচন্দ্রের মনে সেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। কারণ উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতাকে আলেখ্য দর্শন করাইবার সময় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীন দিব্যাস্ত্রগুলি কালে সীতার সন্তানদের হস্তগত হইবে। ঐসব অস্ত্র একমাত্র গুরুপরম্পরা আসিয়া থাকে।

আপন সন্তানের প্রতি বাৎসল্যভাব কালিদাস 'শকুন্তলা'তে দেখাইয়াছেন। হেমকূট পর্বতে ভগবান মরীচির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত ভরতকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "আমার হৃদয়ে এই বালকের প্রতি ঔরস-পুত্রের ন্যায় স্নেহ জন্মিতেছে।" ভবভূতি যেমন জৃম্ভকাস্ত্রের দ্বারা সম্বন্ধ টানিয়াছেন, কালিদাসও তেমনি ভরতের মণিবন্ধে রক্ষাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।

এইসব দৃষ্টে মনে হয় পূর্ববর্তী কবি কালিদাসের ছাপ পরবর্তী কবি ভবভূতির উপর কতভাবেই না পড়িয়াছে!

সীতা-নির্বাসন-প্রসঙ্গে কলিদাস 'রঘুবংশে' রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের উপর লিখিয়াছেন: "শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্‌বংশ-বাসিনঃ। অনন্যজানেঃ সৈবাসীৎ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী॥" অর্থাৎ মৈথিলীর পরিত্যাগও শ্লাঘনীয়, কারণ রামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্বীয় ভার্যা পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি সীতারই স্বর্ণ-মূর্তি দ্বারা সহধর্মিণীর কার্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরাই ঐ যজ্ঞের রক্ষক ছিলেন। তদনন্তর মৈথিলীতনয় কুশ ও লব বাল্মীকির আদেশে তৎপরিজ্ঞাত রামায়ণ ইতস্ততঃ গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একে রামের চরিত্র, বিশেষতঃ আদি কবি বাল্মীকির রচনা, উপরন্তু কুশ ও লব কিন্নর-সদৃশ কণ্ঠস্বরশালী। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সহ সানন্দচিত্তে উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তারপর বাল্মীকি সীতাকে পুনর্গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "মৈথিলী যদি স্বীয় চরিত্র-বিষয়ে প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, তবেই তাহা সম্ভব।" বাল্মীকি সীতাকে তপোবন হইতে আনাইলেন। কালিদাস সীতাকে যে তপস্বিনীর বেশ পরাইয়াছেন, তাহা সত্যই সুন্দর: "কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিত চক্ষুষা। অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা।" অর্থাৎ সীতার প্রশান্ত মূর্তি কাষায়বসনে আবৃত এবং তাঁহার নয়নদ্বয় নিজ চরণে সমর্পিত—ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পবিত্রা বলিয়া অনুমান করিল।

পবিত্রতাস্বরূপিণী নারীজাতির আদর্শ সতী সীতার উদ্দেশে 'রামায়ণী কথা'য় বলা হইয়াছে: "নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাসকলাময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই। এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ, তাহার পুনরুদ্দীপন কর। তোমার সুকোমল অলক্তরাগরঞ্জিত পাদযুগের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত; তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান।"

যাহা হউক, প্রজাদের সামনে সেই জনাকীর্ণ অযোধ্যার রাজসভায় রাজমহিষী সীতা নিজ সতীত্বের চরম পরীক্ষা দিতে ঢুকিলেন। সারা জীবনই তিনি দুঃখের উপর পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, এবং প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কালিদাস লিখিয়াছেন: "বাঙ্‌মনঃকর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে। তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি॥" অর্থাৎ ভগবতী বসুন্ধরে, যদি আমি বাক্য মন ও কর্ম দ্বারা পতির প্রতি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তবে আমাকে আত্মগর্ভে স্থান দান করুন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল। বসুধাদেবী নাগেন্দ্রফণোদ্ধৃত সিংহাসনে আপন কন্যা সীতাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া রামচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও অন্তর্হিত হইলেন। গুরুজনেরা ধরণীর প্রতি রামচন্দ্রের ক্রোধ শান্ত করিলেন। সীতার অন্তর্ধানে রামচন্দ্র মণিহারা ফণী হইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি সেই মিথিলেন্দ্রনন্দিনী পৃথিবীতে একান্তই না থাকেন, আমার জীবন কি করিয়া থাকিবে? আলম্বন বিনা আশ্রয়ের স্থিতি হয় না।" কালিদাসের রামচরিতে যবনিকা পড়িল। রামচন্দ্রকে ছদ্মবেশী যম আসিয়া নিবেদন করিলেন: "ব্রহ্মার অনুরোধে

আপনি এইবার স্বর্গারোহণ করুন।" কুশ ও লবের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামচন্দ্র পবিত্র সরযূ নদীকে স্বর্গারোহণের সোপান করিলেন।

রামচরিতে কালিদাস বিয়োগান্ত, ভবভূতি মিলনান্ত। কালিদাস লব কুশকে দিয়া অযোধ্যার রাজসভায় রামায়ণগান করাইয়াছেন; ভবভূতি বাল্মীকির তপোবনেই উহার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। উত্তররামচরিতের সম্মেলন নামক শেষ অঙ্কে তপোবনের গঙ্গাতীরে রামলক্ষ্মণ ও প্রজাবর্গের সম্মুখে বাল্মীকি-বিরচিত ও অপ্সরাগণ কর্তৃক অভিনীত রামায়ণের শেষ অধ্যায় সীতা-নির্বাসন পালা শুরু হইল। রামচন্দ্র ভ্রমবশতঃ অভিনয়কে সত্য বলিয়া ক্রমাগত হাহুতাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রতিবারেই নাটক বলিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। নাটকের মধ্যে নাটক প্রবেশ—ইহা সংস্কৃত নাটকের একটি টেকনিক। যাঁহারা কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' বা শ্রীহর্ষদেব-বিরচিত 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন সেখানেও নাটকের মধ্যে নাটক সৃষ্টি করিয়া এক অপূর্ব কলার উদ্ভব হইয়াছে।

কালিদাস সীতাকে পাতাল প্রবেশ করাইয়াছেন বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী অনুসারে। এই দৃশ্য সত্যই করুণ। সেইহেতু ভবভূতি ওদিক দিয়া গেলেন না। তিনি গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিলেন। তিনি সীতাকে পাতাল প্রবেশ করাইলেন আবার অলৌকিক উপায়ে তুলিলেন। ইহা আমরা ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্কে তমসার মুখে শুনিয়াছি। তারপর ভবভূতি রামচন্দ্রকে নাটক দেখাইতে দেখাইতে নাটকীয় ভাবে সীতাকে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করাইলেন। বাস্তব সীতাকে সঙ্গে লইয়া অরুন্ধতী প্রবেশ করিলেন এবং পুরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনপদবাসিগণ, আমি অরুন্ধতী। ভগবতী গঙ্গা ও পৃথিবী প্রশংসা করিয়া সীতাকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছেন। পূর্বে ভগবান অগ্নি ইহার পবিত্র চরিত্র নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্যবংশের বধূ এবং যজ্ঞভূমি হইতে সমুৎপন্ন সীতাকে রামচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করুন—এ বিষয়ে আপনাদের মত কি?" তিরস্কৃত প্রজাগণ লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া বাল্মীকি মিলনের সমাপ্তি ঘটাইলেন। নাটকের যবনিকা পড়িবার পূর্বে ভবভূতি সুন্দর বলিয়াছেন: "সানুষঙ্গানি কল্যাণানি" অর্থাৎ মঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গেই উপস্থিত হয়।"

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই কাব্যসমুদ্র মন্থন করিলেন। তাহা হইতে উঠিল 'রামসুধা', যে সুধা পান করিলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে। কালিদাস শোনাইলেন (রঘুবংশ: শ্রব্যকাব্য) আর ভবভূতি দেখাইলেন (রামচরিতদ্বয়: দৃশ্যকাব্য)। কর্ণেন্দ্রিয় কালিদাসের রামগাথা শুনিয়া সব কিছু মনের নিকট পৌঁছাইয়া দিল এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় ভবভূতির রামচরিতনাটকদ্বয় দেখিয়া সব কিছু মনের কাছে পৌঁছাইয়া দিল। ফলে মনোজগতে একটি মধুর হিন্দোল দোল দিতে লাগিল। ঐ হিন্দোলের নাম 'রামলীলা'। ঐ রামলীলা শুনিবার ও দেখিবার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া তাহার গেহকে ভুলিয়া, দেহকে কষ্ট দিয়া, দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, সংসারের মায়ামোহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাত্রা করিয়াছে। ঐ যাত্রা অমর তীর্থযাত্রা। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম' গাহিতে গাহিতে মানুষ চলিয়াছে অযোধ্যানগরীতে, গোদাবরী-

নদীতীরে, পঞ্চবটীবনে, রামেশ্বর সেতুবন্ধে। ভক্ত আপনভাবে ভগবানের সঙ্গে নিজ মানস সেতু বাঁধিয়াছে ঐ দীর্ঘ তীর্থযাত্রার মাধ্যমে। সে মানস চক্ষে ত্রেতাযুগের সব ঘটনা দেখিয়াছে; আপনভাবে বুঝিয়াছে সত্যস্বরূপ ভগবান রামচন্দ্র রজ ও তমের প্রতিমূর্তি রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রামনামের রূপ ও মহিমা বুঝাইতে গিয়া ভবভূতি মন্দোদরীকে দিয়া বলাইয়াছেন, "রামনামে শিলা জলে ভাসে।" নিতান্ত নির্বোধ স্ত্রীলোকের উক্তি বলিয়া রাবণ উহা উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরাও মূঢ়তাবশতঃ ঐরূপ করি। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা জানে রামনামে অসাধ্য সাধন হয়। সেতুবন্ধে দাঁড়াইয়া তাহারা রাম-চরিতের সঙ্গে নিজেদের সেতু বাঁধে। নিজেদের মধ্যে যে তমোগুণী কুম্ভকর্ণ ও রজোগুণী রাবণ আছে, তাহাদের দমন করিবার জন্য 'শরণং তব চরণং ভবতরণং মম রাম' ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করিতে থাকে। কালিদাস ও ভবভূতি সেই রামনামের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন: 'শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রাম'কে সাধারণ মানুষের অনায়াসলভ্য করিয়া দিবার জন্যই মহাকবিদের প্রয়াস। রামনামের মহিমা কীর্তন করিয়া বাল্মীকির ন্যায় কালিদাস ও ভবভূতি অমর হইয়া রহিয়াছেন।

নববর্ষে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অন্তরমন্দির উজ্জ্বলি' মাগো,
অভয় শঙ্খ স্বনি' প্রেমে জাগো।
করুণাময়ি, তব আশিস প্রার্থি
জিনিতে পুঞ্জিত তমসা-আর্তি।
জ্যোতির্ময়ি মা, পরম শরণ্য—
যার ধ্যান ধরি' জীবন ধন্য!
হৃদয়-গ্রন্থি যত খণ্ডি' কৃপাণে
জ্বালো আলো মুক্তি বিষাণে।
কণ্টক কুসুমে মঞ্জরি মাগো,
অভয় শঙ্খ স্বনি' প্রেমে জাগো।

গর্ব-দুরভিমানে নিতি হয় মা,
অরুণাভা তব পলকে লয় মা!
অমনি নিশাচর প্রাণতুফানে
ভ্রান্তিবিলাসী মায়া আনে।

তুমি কত দূরে! তবু পথহারা
পান্থ জপে তব মন্ত্র-ইসারা।
যাচি দেবি, তব চরণে হরষে
সুন্দর শরণাগতি নব বরষে।

তব ধ্রুবতারাদীপে মাগো,
অভয় শঙ্খ স্বনি' প্রেমে জাগো।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

দর্শন ও উপদেশ

"স্বামীজীকে আপনি এখনো (তাঁর দেহত্যাগের পরও) দেখতে পান?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন, "তিনি রয়েছেন আর দেখতে পাবো না?"

নিজ দর্শনাদি সম্বন্ধে সত্যদ্রষ্টাগণের উক্তির মূল্য আমাদের কাছে এইখানেই সর্বাধিক। অবতারগণ, মহাপুরুষগণ দেহত্যাগের পরও সূক্ষ্ম শরীরে থাকেন—'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'—এ বিবৃতি শুনিয়া মনে যে বিশ্বাস আসে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক বিশ্বাস আসে যখন কোন 'ভাগ্যবান' বলেন, 'আমি দেখিয়াছি, আমি দেখিতে পাই।'

তাঁহাদের উপদেশ সম্বন্ধেও একই কথা। এরূপ বিশুদ্ধ-দর্শন ব্যক্তিগণ যখন নিজের ভাষায় তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের বিবৃতি দেন, তাহা শুনিয়া মনে যে বিশ্বাস আসে, শুধু যুক্তি-বিচারসহায়ে সে বিশ্বাস কখনো আসে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথার মধ্যেই এমন শক্তি নিহিত থাকে যাহা সোজাসুজি মনের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া এই বিশ্বাস আনিয়া দেয়। সে-কথা মনের উপর হইতে একটি আবরণ যেন সরাইয়া দিয়া বিশ্বাসের স্নিগ্ধ আলোকের পথ অবারিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন পণ্ডিতের সঙ্গে আর আপনাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তফাত আছে নিশ্চয়ই?" স্বামী তুরীয়ানন্দজী উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই! আমাদের মুখ থেকে শুনলেই মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়।" এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর (তখন ব্রহ্মচারী) নিজের ভাষাতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি: "বেলুড় মঠে বাসন্তীপূজা। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ মঠে আছেন; পূজক রোজ তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে পূজোয় বসে। তিনি রোজই জিজ্ঞাসা করেন, 'এর পরে কি?' পূজক বিবরণ দেয়। নবমীর দিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কালকে কি হবে?' পূজক বলল, 'সকালে সামান্য দশোপচারে পূজা হ'য়ে দর্পণ-বিসর্জন হবে। আর সন্ধ্যাবেলা প্রতিমা-বিসর্জন।' মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে কোথায় বিসর্জন দেবে?' পূজক উত্তর দিল, 'কেন মহারাজ, এই গঙ্গায়।' মহারাজ আবার বললেন, 'গঙ্গায় বিসর্জন দেবে!' পূজকের উত্তর, 'হাঁ মহারাজ, প্রত্যেকবার আমাদের গঙ্গায় বিসর্জন হয়।' তিনি স্থিরভাবে বললেন, 'মাকে বিসর্জন দেবে হৃদয়ে।' শাস্ত্রের কথা 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি! যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি' গুরুবাক্যে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। বিজয়ার দিন সকালে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মাকে কোথায় বিসর্জন দেবে?' পূজক বলল, 'হৃদয়ে। হৃদয়ের বস্তু বাইরে এসেছিলেন, পূজা গ্রহণ করে আবার ভেতরে চলে যাবেন।' মহারাজ বললেন আপনি তো দেখছি পণ্ডিত লোক!…" সন্ন্যাসীটি বলেন, "'তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে' ইত্যাদি মন্ত্রটি তো এর আগে কতবার পড়েছিলাম, কিন্তু তাতে যা হয়নি এঁর মুখ থেকে একটা কথা শুনেই তা হয়ে গেল।"

দর্শন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার দর্শনাদির কিছু কিছু বলিয়াছেন। তবে অনেক সময় শ্রোতাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া বিষয়টিকে একটু হাল্কা করিয়াও দিতেন। যেমন একদিন অনেক সব দর্শনের কথা বলিয়া শেষে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তবে কি জান? রাখাল মহারাজের আর আমার ঐ রকম দর্শনাদি খুব হত। দুজনেরই রাত্রে ঘুম কম হত কি না, তাই ঐ রকম দেখতাম। তোমরা 'ইয়ং বেঙ্গল' ওসবে বিশ্বাস করো না।"

কাশীতে সেবাশ্রমের বাড়ী নির্মাণ করাইতে যাইয়া তিনি শিবঠাকুরকে দেখার কথা বহুবার বলিয়াছেন। স্টেশন হইতে সেবাশ্রমে যাইবার পথে একা উল্টাইয়া পায়ে খুব চোট লাগে, খুব যন্ত্রণা ও জ্বর হয়। রাত্রে "দেখি কি, শিবঠাকুর মৃদুমধুর হাস্যে আমার দিকে আসছেন। তখন তাঁকে বললুম, 'কি শিবঠাকুর, আমাকে এখন কি নিতে এসেছেন? আমি এখন যাব না, ঠাকুরের কাজ রয়েছে; তাই আগে করতে হবে।' ওকথা কে শোনে? তিনি স্মিত হাস্যে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তাঁর শরীরটি বরফের মতো ঠাণ্ডা আর কোমল। আমার শরীরও তখন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল; সকল যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। তখন তাঁকে বললাম, 'ঠাকুর, এখন তবে আসুন! ঠাকুরের কাজ করতে হবে।' শিবঠাকুর হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আশ্চর্য এই যে, সকালে উঠে দেখি জ্বর নেই, পায়ের ব্যথাও নেই—সব সেরে গেছে। এখনও যেন সেই প্রশান্তমূর্তি জটাজুটধারী হাসিমুখে দাঁড়ানো শিবঠাকুরকে দেখতে পাই, তাঁর সঙ্গে কথা কই, আর কত আনন্দ হয়!"

কালীঘাটে তিনি মা-কালীর দর্শনলাভ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করছি, মা কৃপা করে দর্শন দিলেন।" মা-কালীর দর্শনলাভের সময়, এবং সারনাথে ও পাঁড়েলা শিবদর্শন করিতে যাইবার পূর্বে তিনি কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ প্রত্যক্ষ করেন। কালীঘাটে "কুণ্ডলিনী সড়সড় করে উঠে একেবারে সহস্রার আলো করে দিলে।" "কাল ভোরবেলা একটা বেশ ভাব হয়েছিল—ঐ রকম অনুভব করেছিলাম সারনাথে যাবার পূর্বেও। কালো সাপের মতো কি যেন একটা নীচ থেকে ওপরের দিকে খুব বেগে উঠছিল। এটা আর কিছু নয়, কুণ্ডলিনীর খেলা।" "কাল যদিও কথায় কথায় বলেছিলাম যে পাঁড়েলা মহাদেব দর্শন করতে যাব, কিন্তু ভিতরে যে খুব একটা আগ্রহ ছিল তা নয়। হয়তো যেতাম না। কিন্তু রাত্রিতে এক আশ্চর্য দর্শন হল। নীচ থেকে উপর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্যোতিতে ভরে গেল। সে যে কি, তা মুখে বলা যায় না! ভারি আনন্দ হয়েছিল। বুঝতে পারলাম, শিবঠাকুর কৃপা করেছেন।"

এলাহাবাদে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানান্তে তিনি ত্রিবেণী মাতার দর্শন পান। অতি কমনীয় কুমারী-মূর্তি জল হইতে মাথা তুলিয়া হাত দিয়া তিনটি বেণী ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেখাইয়া আবার জলমধ্যে অদৃশ্য হন। স্নানান্তে আশ্রমে ফিরিবার পথেও একদিন সেই ত্রিবেণী দেবীকে দেখিয়াছিলেন: "তিনটি বেণী তুলিয়ে আমার সামনে সামনে চলেছেন।"

জগন্নাথ-দর্শন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করেছিলাম। আলিঙ্গন করার সময় জগন্নাথ-

দেবকে ঠিক ননীর পুতুলের মতো নরম বোধ হয়েছিল।”

রামায়ণের অনুবাদ করিতে বসিলেই তিনি শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিকে দেখিতে পাইতেন: “আমি যখন রামায়ণ লিখতে বসি, তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করি।”

সারনাথে ও ব্রহ্মদেশের পেগুতে তিনি বুদ্ধদেবের দর্শনলাভের কথা বলিয়াছেন। সারনাথে তিনি শ্রীভগবানের নিরাকার সত্তার সহিত নিজের সত্তার একীভূত হইয়া যাইবার ও সেই নিরাকার সত্তা হইতেই তাঁহার সাকার রূপের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার কথা বহুবার বলিয়াছেন। এই দর্শনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এর আগে তীর্থস্থানে বা মন্দিরাদিতে কিছু কিছু দর্শন হয়ে থাকলেও এমনটি কখনো দেখিনি। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার—একেবারে নিরাকার জ্যোতিঃসমুদ্র! ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল। আমি যেন একটি বিন্দুর মতো ঐ জ্যোতিঃসমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই আনন্দজ্যোতিঃ দর্শন করছি। তখন আমাতে আর আমি নেই। নিমেষে নিখিল বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে এক শুদ্ধ চেতন সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। এবং তন্মধ্য হতে ভেসে উঠল—বুদ্ধদেবের একটি অতি কমনীয় ও প্রেমময় রূপ! সে যে কি আনন্দ! ..... ঐ ভাবের নেশা তিনদিন পর্যন্ত ছিল।”

এই প্রসঙ্গে সময়ান্তরে বলিয়াছেন, “শুকদেব যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন সকল দিক থেকে ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’ শব্দ শুনতেন। ‘জ্যোতিঃ ব্রহ্ম’ ‘জ্যোতিঃ ব্রহ্ম’ এই শব্দ পর্বতময় সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে শুনতেন। সেই জ্যোতিঃ কি জান? বড় স্নিগ্ধ ও মধুর। আনন্দ, শান্তি ও জ্ঞান-স্বরূপ; সেই জ্যোতিঃ চিদ্ঘন। ......এই জ্যোতিঃ আমি সারনাথে মিউজিয়ামে বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে দেখি। এক অনন্ত অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্র। আমি যেন তাতে একটি বিন্দুর মতন। . সমগ্র জগৎ ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছিল—আমিও নেই।”

“এই থেকেই বোঝ, মহাপুরুষরা শরীর ছাড়লেও তাঁদের প্রতিমূর্তি বা ছবি জীবন্ত।... মহাপুরুষদের কৃপাতেই আমরা ঐ দিব্য জ্যোতির সন্ধান পাই।”

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে পেগুতে বুদ্ধের শায়িত মূর্তি দেখিতে গিয়া সেখানেও তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন পান—“বুদ্ধদেব কৃপা করে আমায় দর্শন দিয়েছেন। দেখলাম শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি একেবারে জীবন্ত। তাঁর সৌন্দর্যের কি অপূর্ব বিভা!”

অদ্বয় অরূপ সচ্চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ, আমাদেরও স্বরূপ, এবং এই অরূপ সত্তা হইতেই যে বিভিন্ন ঈশ্বরীয় রূপের এবং অবতারগণের উদ্ভব—এই সত্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সহায়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই ‘দাক্ষিণাত্যে তীর্থসমূহ কেমন দেখিলেন?’—এই প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিয়াছিলেন, “কেমন আর দেখলুম! একই ব্যাপার। তিনিই সর্বত্র আছেন”; বলিয়াছিলেন, “সচ্চিদানন্দই ভগবান”; বলিয়াছিলেন এবং শ্রোতার হৃদয়ে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন যে, নিজেরই স্বরূপকে প্রতিমায় আনিয়া সাকার ঈশ্বররূপে পূজা করা হয়, এবং পূজান্তে আবার নিজেরই স্বরূপে সেই সাকার রূপের বিসর্জন দিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার দেহত্যাগের পরও পূর্বের ন্যায় দেখিতে পান কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন, “তা দরকার হলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় বইকি।” শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের সময় বিজ্ঞানানন্দ

পাটনায় ছিলেন। সেই রাত্রেই তিনি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন—"দেখি যে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলাম তাই তো, ঠাকুর এখানে কেন? কেনই বা তাঁকে এভাবে দেখলাম। তার পর-দিনই কাগজে তাঁর দেহত্যাগের খবর পাওয়া গেল।"

স্বামীজীর দেহত্যাগের সময়ও তিনি নিকটে ছিলেন না, এলাহাবাদে ছিলেন: সেখানেই তাঁহার দর্শন পান—"স্বামীজী মহারাজের দেহ-ত্যাগের সময়ও আমার এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে ঠাকুরঘরে ধ্যান করছি—দেখলাম যে ঠাকুরের কোলে স্বামীজী বসে আছেন। দেখে ভাবলাম—এ আবার কি! তারপর বেলুড় মঠ থেকে তার পাই যে, স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন।"

বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরে যে স্বামীজী এখনো রহিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন—"স্বামীজী এখনো এখানে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পা টিপে টিপে যাই, যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাইনে, পাছে চোখোচোখি হয়ে যায়।" "তিনি এই সামনের বারান্দায় বেড়ান, ছাদে পায়চারি করেন, ঘরে গান করেন, আরও কত কি।"

দাক্ষিণাত্যে কন্যাকুমারী ও বিবেকানন্দ-শিলাদর্শনের অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি এক-দিন ভোরে বলেন, "দেখ, এইমাত্র স্বামীজীকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।" সেদিন জহরলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারে সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল ছিল।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন তিনি তাঁহার সব গুরুভ্রাতাদেরই সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পঁচিশে বৈশাখ এল, হে রবীন্দ্র, তব বঙ্গদেশে,
উৎসবের নব নব বেশে।
তব জন্মদিন এল, শতাধিক বৎসরের পরে,
সম্বর্ধনা মঞ্চে মঞ্চে করিয়াছি পত্রপুষ্প করে।

তুমি বাজায়েছ বাঁশি;
মনুষ্যহৃদয় চিরসৌন্দর্য-পিয়াসী,
ছুটিয়াছে সে-বাঁশির মধুবর্ষী স্বরে,
বাস্তবের আবিলতা অবহেলি', ঊর্ধ্বে বহু দূরে।
সুবিমল পবিত্রতা, জোছনার মাধুর্যের মতো
নারীর হৃদয়ে সেথা শোভে যেন পুষ্প শত শত:
পুরুষ চরিত্র নিয়ে জাগিছে সেথায় মহিমায়,

দীনের আশ্রয়, আর খড়্গসম যেথায় অন্যায় ;
সুখের, শান্তির সেই 'মানুষের' লোকে,
দেখায়েছ তুমি পথ, কাব্য-কথা-সঙ্গীত-আলোকে।
অকৃতজ্ঞ নহি মোরা, ভিত-শীর্ষে রাখি তব পট,
আলোকিত অনুষ্ঠানে তব নামে রাখি পুণ্য ঘট।
ব্যবহার ? রুচি-বোধ ? শালীনতা ? অমৃতে বিশ্বাস ?
শ্রদ্ধা ? শ্রম ? সংযত বিলাস ?
ও সব তো সে-যুগের, ও সব তো পচা ও প্রাচীন !
ও সব মানি না মোরা, গুরুদেব ! আমরা স্বাধীন !

প্রতিভার বীণাখানি বাজাইলে অখণ্ড-পূজায় ;
সেই দেশ বিখণ্ডিত, আজি আরো খণ্ড হতে চায়।
রাজনীতি অন্য নীতি করি' অস্বীকার
দিকে দিকে বিস্তারিছে নিজ অধিকার।
অন্নবস্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, হৃদয়ের রস
ছাঁচে ঢেলে দিতে চায় ! যান্ত্রিক হরষ !

কবিগুরু ! বিশ্বকবি ! তব নামে করি তবু জাঁক,
দিকে দিকে ডাকে যবে পচিশে বৈশাখ।
কিন্তু হায় ! বক্ষে কই অমলিন প্রীতির বিশ্বাস ?
অসীমের রূপে ভরা কোথা সে আকাশ ?
কাল-বোশেখীর রথে আসিয়াছে দুর্যোগের রাত,
দিকে দিকে ঘন ঘন ঘটে বজ্রপাত ;
কাঁপিছে চাঁপার কলি, মাধবীর কাঁদিছে সুবাস।
এসো কবি, রোখো সর্বনাশ।
তোমার পৌরুষ-দীপ্তি সর্বচিত্তে উদ্ভাসিত হোক,
আসুক পবিত্র তেজ, শুভ বুদ্ধি, প্রেমের আলোক।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ৪ ॥

এমন একটি পত্রিকা—মধ্যাহ্নদীপ্ত—আরম্ভের ঠিক দু'বছর পরে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, এই পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় বেরুল—*Farewell*—'বিদায়'—তার মানে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল!! এরই নাম 'মধ্যাহ্নে অন্ধকার'।

অন্ধকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনন্ত রাত্রির না হয়ে সূর্যগ্রহণের অন্ধকারতুল্য হয়েছিল, কারণ পত্রিকাটির পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল মাত্র দু'মাসের মধ্যেই। কিন্তু ঐ বিস্ময়কর সমাপ্তির কারণ কি? আর্থিক অসুবিধা? না। *Farewell* রচনার মধ্যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জানান—"The journal was a thorough success as a business concern."[১] পত্রিকাটির মৃত্যুর কারণ ভিন্নতর—তা হল, পত্রিকা-সম্পাদকের মৃত্যু, যিনি এর 'life and soul' ছিলেন। আর্থিক ব্যাপারটি বাদ দিলে কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। *Farewell*-এর সূচনাতেই তা দেখেছি—

"We regret very much to intimate to our subscribers that we are forced to stop the journal with this issue, as we find the loss sustained in the premature death of our Editor, Mr. B. R. Rajam Iyer, irreparable. Except the few 'Contributions' and the 'Extracts,' all the articles were written by him, some under the following pseudonyms:—T.C. Natarajan, M. Ranganatha Sastri, A recluse, and, Nobody-knows—who." (P. B., June, 1898)

রাজম আয়ার মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল নয়। তাঁর দেহত্যাগের পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে লেখা দু'একটি স্মৃতিকথায় রাজম আয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে রাজম আয়ারের পরিচয় প্রায় নেই।

রাজম আয়ার স্বামীজীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন মনে হয়। অন্ততঃ 'বেদান্তকেশরী'র ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সংখ্যায় পি এন শ্রীনিবাসাচারীর স্মৃতিকথায় তা পাই। অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

"এই মাদ্রাজে আমরা কয়েকজন স্বামীজীর সেই বিরাট সত্তা-জাগরণী, জীবনসৃষ্টিকারী শক্তির প্রত্যক্ষদর্শী। আমি নিজে তার বিষয়ে জানি। ৬০ বছর আগেকার ঘটনার কথা বলছি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যাবার আগে, স্বামীজী মায়লাপুরে দুটি সত্তাকে জাগিয়েছিলেন। একজন হলেন—বি আর রাজম আয়ার, *Rambles in Vedanta* গ্রন্থের তিনি অমর লেখক। স্বামীজী রাজমকে দেখেন, তাঁকে দিব্য আবেশ দান করেন, তার ফলে অধ্যাত্মরসে

---

[১] কিন্তু তা হলেও, পরিচালনার ব্যাপারে কিছু অব্যবস্থা ঘটেছিলই। স্বামীজী ১৮৯৮, মার্চ মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন—"প্রবুদ্ধ ভারত অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; উহার সুশৃঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো।"

রাজম নিমজ্জিত হয়ে যান। অপরজন সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র। স্বামীজী তাঁকে খুবই ভালবাসতেন, 'কিডি' বলে ডাকতেন। সিঙ্গারাভেলু প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন, সংসার ত্যাগ করেন এবং স্বামীজীর পদে আত্মসমর্পণ করেন। স্বামীজীর এমনই ছিল চৌম্বক শক্তি, এমনই প্রাণ-সৃষ্টিকারী, সত্তা-সৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তি। আমি নিজে সে জিনিস দেখেছি। আমার মধ্যে যদি কিছু আধ্যাত্মিক ভাব থাকে, তা ঐসব মানুষের জন্যই যাঁদের স্বামীজী নির্মাণ করেছিলেন; স্বামীজী করেছিলেন বলার চেয়ে বলা উচিত তা করেছিল তাঁর সেই দারুণ অগ্নিময় দৃষ্টি —ব্রহ্মণ্যশক্তিতে জলন্ত দৃষ্টি।"

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মূল্য সর্বাধিক। সুতরাং শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসাচারী-প্রদত্ত তথ্যকে আমরা গ্রহণ করছি। স্বামীজী-প্রবর্তিত বেদান্তের প্রভাবও রাজম আয়ারের উপরে ছিল মেনে নিতে বাধা নেই। তাঁর *Rambles in Vedanta* গ্রন্থে (যে গ্রন্থটি প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত রাজমের রচনা-সংকলন) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচিত্র দেওয়া হয়েছে বেদান্ত-বিগ্রহরূপে। এবং তাঁর উপরে স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা জানা ছিল বলেই স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে 'মালাবার মেল' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল।—

"And that famous periodical, edited also at his (Swamiji's) instance by the late Mr. B. R. Rajam Ayer, who too like his master (i e. Sw. Vivekananda) died, alas! too early."

এইসকল তথ্য থেকে মনে হতে পারে স্বামীজী রাজম আয়ারের গুরু ছিলেন,[৮] কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। ভিন্ন এক ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত গুরু।

সে প্রসঙ্গে আসার আগে রাজমের ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ ভারতের জুন ১৮৯৮ সংখ্যায় G. S. K.-লিখিত *Our Late Editor* রচনা থেকে তথ্য সংকলন করে দিচ্ছি।

মাদুরা জেলার বাটলাগুণ্ডু গ্রামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজম আয়ারের জন্ম। পিতামাতার তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাল্যে খুবই লাজুক ছিলেন, খেলাধুলা বা বয়সোচিত মজার ব্যাপারে যোগদান করতেন না। মাদুরা থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করে মাদ্রাজে আসেন ১৮৮৭ সালে, সেখানে 'ক্রিশ্চান কলেজে' ভর্তি হন, এবং বি. এ. পাশ করেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। "পরবর্তী তিন বৎসরে, যখন তিনি মাদ্রাজে ল কলেজের ছাত্র, তখন ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনাপাঠে যথেষ্ট মনোযোগ দেন এবং ইংরেজী কাব্যের অন্তর্নিহিত শিল্প ও ভাবপ্রতিভার ভিতরে প্রবেশ করবার মতো অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন।" রাজমের কল্পনাশক্তিতে প্রবলতা এবং গভীরতা যথেষ্ট ছিল, অনুভূতিশক্তিও সবিশেষ, শেক্সপীয়ার, বায়রন, কীটস, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও জর্জ এলিয়টের জগতে ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতেন, বিশেষতঃ শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব

---

[৮] সাংবাদিক-লেখক সেন্ট নিহাল সিং ১৯৫৫ সালের অগষ্ট মাসে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় *A Backward Glance at Prabuddha Bharata* নামক প্রবন্ধে কার্যতঃ এই ভুলই করেছিলেন:

"There (in Madras) in 1895, he chanced upon the man who was to touch his soul with a flame that was to consume such dross as had not already been burnt away—that was at the same time, to illumine his mind. This was as mentioned before, the Swami Vivekananda".

এখানে জানানো উচিত, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেই ছিলেন না।

ছিল সর্বাধিক। 'সত্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের জন্য যে গভীর ব্যাকুলতা' এঁদের কাব্যের মধ্যে রাজম দেখেছিলেন, তা রাজমের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সত্য ও আত্মাকে জানবার জন্য দার্শনিক উৎকণ্ঠায় তাঁকে অধীর করে তুলল। মাত্র ইংরেজ কবিদের কাব্যানুশীলনেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। বিখ্যাত তামিল ঋষি-কবি থায়ুমনবরের (Thaumanavar) কাব্যের অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যে অবগাহন করেছিলেন এবং তাঁর কাছে সুবিখ্যাত তামিল কবি কম্বনই (Kamban) ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ কবি-প্রতিভা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্রিশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে' একটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে রাজম প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় থেকে 'বিবেকচিন্তামণি'তে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস কমলাম্বল (Kamalambal) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মহান তামিল কবি কম্বনকে (Kamban) জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসে রাজম ঐ কবির ঐশ্বর্যময় বাগ্-ধারাগুলিকে পুনঃপ্রয়োগ করেন। শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কল্পনার সূক্ষ্ম রসসঞ্চারের চেষ্টাও এর মধ্যে করেছিলেন এবং হিন্দু গৃহ-জীবনের সুন্দর ছবিও ছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিকের আসল উদ্দেশ্য ছিল 'অশান্ত আত্মার অন্তর্গহনের তীব্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা', যে-আত্মা 'বহু যন্ত্রণার অন্তে অবশেষে পেয়েছিল অকলুষিত বিশুদ্ধ সায়রের সন্ধান, যেখানে তার যুগযুগের জলন্ত তৃষ্ণা প্রশমিত হবে।' ইতোমধ্যেই রাজম আয়ার স্পষ্টতই বেদান্তদর্শনের প্রভাবে পড়েছিলেন, তাঁর উপন্যাসের পরিণতিতে দার্শনিক সিদ্ধান্তই উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার সৌন্দর্যের অতি বড় ভক্ত হয়েও ঐশ্বরিক চেতনার বিরাট তত্ত্বের কাছে কাব্যানু-ভূতিকে তাঁর খুবই সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, বড়জোর তা যেন মন্দিরের প্রবেশ-পথে একটি বিশ্রামাগার।[১]

---

১ রাজম কাব্যানুভূতির সীমাবদ্ধতা ও ঐশ্বরিক চেতনার অসীমত্বের কথা এইভাবে ফুটিয়েছেন—

"Poetry gives both pleasure and pain: it has to record both the greatness of the universe and the littleness of man. Then again it cannot fall in love with the sultry day, the filhy tank, the barren desert and things of that kind of which there is no lack on earth. At the best therefore poetry is but a resting place on the wayside, a *mantapa* on the road to the temple. A higher happiness than what poetry can give is the birthright of man. It is his prerogative to be eternally and changelessly happy, to rejoice as much at sultry weather as at a moonlit night, to regard with equal composure to wanton wickedness of men and their benevolent self-sacrifice, not merely to weep with joy at a Cumbrian sunset and fly into space with a singing sky-lark's flight but to 'mingle in the universe and feeling what he can never express, but cannot all conceal' become himself the sun, the setting, the splendour, the sky-lark, the singing and the sky and all the rest in the glorious universe. Man is destined to conquer the heavens, the stars, the mountains, and the rivers, along with his body, his mind, and his senses, and even in this life, to dissolve himself into boundless space, and feel all within himself the roaring sea, the high mountain, the shining stars, and the noisy cataract. In this sense, he is the Lord of the creation—its exultant and all-pervading Lord, the Para-brahman of the Vedas, and at this stage he is above all anger, all meanness and all wickedness. The rage of intellect and the storm of the senses are all over, and in the mind of the highest emancipated man, there is an eternal moony splendour, boundless beatitude that is above all expression."

(*Our late Editor* রচনায় উদ্ধৃত)

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঐ বৈদান্তিক ঐক্য-বোধকে ব্যক্তিজীবনে উপলব্ধির স্তরে লাভ করবার জন্য রাজম ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—তাঁর অন্তর্জ্বালা নিবারণ করতে পারবেন এমন মানুষের সন্ধানে দু' বৎসর নানা স্থানে সন্ধান করে ফেরেন, অবশেষে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মাদ্রাজ শহরে সেই বাঞ্ছিত জনের সন্ধান পেলেন যিনি তাঁকে শান্তি দিতে সমর্থ। তিনি সত্যই শান্তি পেয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিন অবধি একাগ্র নিষ্ঠায় ধ্যানধারণা করে গিয়েছেন, ১৮৯৬-এর অক্টোবরে অন্ত্রের ব্যাধিতে যখন গুরুতর পীড়িত তখনো মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি। এর পরে তিনি সাধনায় এমনই মগ্ন হয়ে পড়তে থাকেন যে, প্রবুদ্ধ ভারতের কাজ পর্যন্ত তাঁর কাছে ভারস্বরূপ বোধ হয়।

১৮৯৬-এর অসুখ সারবার পরে রাজমের স্বাস্থ্য ভালই ছিল। মৃত্যুর মাস দুয়েক আগে মূত্রাশয়ের ব্যাধির সূত্রপাত হয়। গোড়ায় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি। ক্রমে তা কঠিন আকার ধারণ করে ১৩ মে, ১৮৯৮ তারিখে তাঁর জীবনান্ত ঘটায়। রাজম বিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ধর্মপত্নী এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে রেখে গিয়েছিলেন।

G. S. K.-লিখিত উপরের বিবরণে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। তবে গুরু-লাভের পূর্বে রাজমের উপর বেদান্ত-প্রভাবের উল্লেখ আছে।[১০] শ্রীনিবাসাচারীর স্মৃতিকথার সূত্রে বলতে পারি, এই বেদান্ত-প্রভাব স্বামীজীর কাছ থেকেই রাজম পেয়েছিলেন। স্বামীজীর প্রভাব রাজমের সুপ্ত সংস্কারকে জাগিয়েছিল, তাঁকে সেই যন্ত্রণা দিয়েছিল যা অশান্ত সন্ধানে তাড়িত করে আত্মাকে—কিন্তু সম্ভবতঃ রাজমের ব্যক্তিস্বভাব বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে বরণ করবার উপযোগী ছিল না। উদ্রিক্ত-তৃষ্ণ রাজমের অধ্যাত্ম-সন্ধান এবং তার পরিণতির বিষয়ে জি. এস. কে-র রচনা থেকে কিছু উল্লেখ আগে করেছি, এখন তাঁর মূল রচনার অংশ উদ্ধৃত করছি:

"In 1894, he (Rajam Iyer) seriously set his heart upon realizing this infinite happiness to which the whole creation is moving consciously or unconsciously. For two years he went about from place to place in the hope of finding someone who could cure the fever of his heart, otherwise preferring to remain alone and obscure and seeking the privacy of his own glorious light. About the close of 1895 in Madras, where he always preferred to live because, as he said, he could lose himself in that wilderness of houses to be obscure, and in this busiest part of the town, he found someone who could put him in the way of acquirnig that peace and happiness for which his soul was panting for sometime past. From this time upto his death, he addressed himself to his supreme duty with a single mindedness, devotion and self-sacrifice which may be called truly heroic. Nothing could ruffle the sweet serenity and the even temper of his mind, and the moment of the greatest physical agony, which he experienced during the attack of intestinal obstruction in 1896, and when face to face with death now, he never fretted, faltered or feared. He sought the company of no one except that of

---

১০ ঠিক পূর্ববর্তী পাদটীকায় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

his Guru, and preferred to hide himself in the light of his own thought or rather *Existence*, for even thought and speech he felt as a burden. He was either meditating, reading devotional or philosophical works, or writing for the *Prabuddha Bharata* ; and towards the close of his short life he devoted nearly the whole of his time to meditation, so much so that he found the editing of the journal a burden."

এই রচনার লেখক 'জি এস কে' রাজমের গুরুর অন্যতম ভক্ত ছিলেন স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রবুদ্ধ ভারতের পরিচালক-গোষ্ঠীর অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন ধরে নিতে পারি। *Farewell* রচনাটি থেকে দেখতে পাই, এই গোষ্ঠীরই কোনো একজন (বা একাধিক জন) রাজমকে প্রথম উক্ত গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিম্নে উদ্ধৃত অংশে পাঠক দেখবেন, রাজম যে স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে প্রথম ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, তা এই রচনার লেখকের জানা ছিল না বা জানা থাকলেও তাকে বিশেষ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না:—

"If the articles were pleasing and edifying in a high degree, it was because the writer had himself some realization of the Truth, and his views were developed under the teaching of a great sage, the 'Muni' whose 'Maditations' appeared in the journal.

Even before he came in contact with the sage, the writer had a most marked religious bent, as shown by the leader of this issue, which was the article which first attracted our attention to him. On reading the article in the *Brahmavadin* in 1895 we felt the hand of a great man and longed to find him. And when we sought him out, we found him an unpolished diamond.[11] He had himself been in search of a master for over two years, and we most opportunely fell in with him and took him to the sage, whom he accepted as his Guru after some preliminary discussion. He soon received the necessary polish and his thoughts found vent in the *Prabuddha Bharata*. To praise his articles would look like self praise, but those who have enjoyed and profitted by them need no such words from us. Suffice it to say that the sage above referred to, remarked of the articles that they were inspired words."

নূতন গুরুর নির্দেশে ও আশীর্বাদে এবং নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ব্যাকুলতায় রাজম আয়ার জীবনের একেবারে শেষের দিকে সাধনায় এমনভাবে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন যে, এই অতি-আগ্রহ তাঁর মৃত্যুর কারণরূপে কোনো কোনো মহলে আলোচিত হয়েছিল, যার ফলে প্রবুদ্ধ ভারতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করতে হয়।[12] রাজম আয়ার যে সত্যই

---

১১ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যদি রাজম আয়ারের সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারত-পরিচালকগোষ্ঠীর প্রথম পরিচয় হয়, তাহলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কি স্বামীজীর সঙ্গে সত্যই রাজমের সাক্ষাৎ হয়েছিল? সাক্ষাৎ হয়েছিল—এর পক্ষে বর্তমানে আমাদের হাতে প্রত্যক্ষদর্শী পি. এস. শ্রীনিবাসাচারীর স্মৃতিকথা ভিন্ন আর কিছু নেই এবং আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারি না।

১২ "Before closing we may remove a misapprehension which seems to have crept into some quarters. It was remarked that Mr. Rajam Iyer died a martyr to his philosophy. If this means an insinuation that any yoga practice followed by him, led to his ill-health and untimely death, we hasten to assure Mr. Rajam Iyer's friends and admirers that the *Nishta* or contemplation by which he realized the Atman was none of the common breath-stopping or tip-of-the-nose-watching kind. He lived a glorious and happy life and died a natural and peaceful death."

(*Our late Editor*)

সাধনায় শান্তিলাভ করেছিলেন তা ব্রহ্মবাদিনেও লিখিত হয়েছিল।[১৩] গুরুর প্রভাবে রাজমের রচনায় নূতন বৈশিষ্ট্যও দেখা গিয়েছিল। এ বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

"To those who could read between the lines, it must have been evident that the *Prabuddha Bharata* presented a peculiar interpretation of the Vedanta, and in this sense the journal had a marked individuality or personality, that of its editor, or of the sage, his Guru. It is our belief that the extraordinary popularity of the journal all over the length and breadth of India and even abroad was due not so much to the Vedanta merely as such promulgated by the journal as to the peculiarly beautiful and non-mystical interpretation which the journal presented. And as there is none to our knowledge who can rightly fill the place of the saint-editor whom we have lost, we are unable to continue the journal as other journals or magazines might under similar circumstances have been continued."

(*Our Late Editor.*)

এই উদ্ধৃতিটি কয়েকটি প্রশ্ন অনিবার্য করে তোলে: যেখানে পত্রিকাটি ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা এবং আর্থিকভাবে সফল, সেখানে সম্পাদকের মৃত্যুতে, তিনি পত্রিকার যতকিছুই হোন না কেন, তৎক্ষণাৎ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া কিছু অস্বাভাবিক। পত্রিকার রচনা বা নীতির ব্যাপারে কি কিছু মতভেদ হয়েছিল পরিচালকদের মধ্যে? এবং রাজমের এই 'Peculiar interpretation of Vedanta' স্বামীজী কি রকম পছন্দ করেছিলেন?[১৪]

॥ ৫ ॥

রাজম আয়ারের বেদান্ত এবং তাঁর সম্পাদিত প্রবুদ্ধ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যে স্বামীজীর সম্পূর্ণ অনুমোদন পায়নি তার প্রমাণ, নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সম্পাদকীয়। ১৮৯৮-র জুন মাসের পরে প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়েছিল, তা আবার শুরু হয় মাত্র দু'মাস পরে অগস্ট মাস থেকে। অগস্ট সংখ্যায় সম্পাদকীয় রচনার গোড়ায় প্রবুদ্ধ ভারতের নবপর্যায়ের নীতি ও পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

"Prabuddha Bharata comes to its readers this month in a new garb. On the demise of its gifted editor, it died a natural death. But now, like a new Phœnix, emerging from its own ashes, it returns to the world after but a brief suspension of activity. Its past karma, gathered in the diffusion of the highest Vedantic thought, demanded its re-incarnation.

---

১৩ "From what we have known of him we can unhesitatingly say that if the goal of all philosophy is to secure a happy Euthanasia, then Rajam Aiyer was a real *Vedantin.* He bore suffering with heroic fortitude and met his death in a spirit of complete resignation."

(*Brahmavadin*, May 16, 1898)

১৪ লক্ষণীয় বিষয় স্বামীজীর পত্রাবলীতে রাজম আয়ারের উল্লেখ নেই (!) রাজম সম্ভবতঃ স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেননি। কিংবা স্বামীজী রাজমকে তাঁর বেদান্তের উপযুক্ত প্রচারক মনে করেননি। হতে পারে, স্বামীজী রাজমের উল্লেখ যে-সব চিঠিতে করেছেন, সেগুলি বিলুপ্ত। যেকোনো ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য, পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হবার ব্যক্তি রাজম ছিলেন না স্বামীজীর কাছে।

The management under Prabuddha Bharata will henceforth appear with pretence to no higher ideal than was set up for its conduct in the first issue of the journal (July, 1896). It will strive to maintain the paper on the same lines as have been so admirably followed for the last two years, with only such additions and alterations as growing needs require.

While writing on this subject, it may not be out of place to mention that the present conductors have at their head the Swami Vivekananda, and that the pages of the magazine will be enriched by regular contributions from his pen."

(*Editorial Section*, P. B. Aug. 1898)

এর পরেই প্রবুদ্ধ ভারতের পুরাতন নীতির ও বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান নীতি ও বক্তব্যের পার্থক্যের কথা মার্জিত অথচ দৃঢ় ভাষায় জানানো হল। এর মধ্যে পাঠকগণ প্রবুদ্ধ ভারতের পূর্বতন প্রচ্ছদ চিত্রের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি লক্ষ্য করবেন :

"A word of explanation is necessary, with regard to the alteration of the title page.

Ages ago, Indian thought, travelling by many ways, reached the West, but it is only about two generations since the foremost thinker of the Occidental world, at that time, declared that the one advantage which his age possessed over all others, was in gaining access to the ideals of Ancient India. Indeed, before the time of Schopenhauer, Indian thought lay shrouded in the darkness of Western ignorance, or at best was regarded with stolid indifference as mere heathen fetishism. But ever since the rays of the mighty German genius first fell upon the Upanishads, that attitude has been slowly undergoing a change, until, as he prophesied, 'the white man and his fair lady stray into Indian woods, and there come across the Hindu sage under the banyan tree. The hoary tree, the cool shade, the refreshing stream, and above all, the hoarier, cooler and the more refreshing philosophy that falls from his lips enchant them. The discovery is published, pilgrims multiply. A sanyasin from our midst carries the altar fire across the seas. The spirit of the Upanishads makes a progress in distant lands. The procession develops into a festival. Its noise reaches Indian shores, and behold, our Motherland is awakening."

(*Editorial Section*, P. B., Aug. 1898)

দেখা গেল, প্রবুদ্ধ ভারত যে নীতিতে এই দুই বৎসর পরিচালিত হচ্ছিল, তাকে বর্তমান পরিচালকগণ, (আসলে স্বামী বিবেকানন্দ) 'anachronism'-এর চিহ্ন বলে মনে করেছেন। পরিবর্তিত কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে প্রবুদ্ধ ভারত চলছিল না বলে স্বামীজীর ধারণা হয়েছিল।[১৫] প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা নয়, (প্রবুদ্ধ ভারত যা থাকতে চাইছিল রাজম আয়ারের নেতৃত্বে),—প্রাচীনের ভিতর থেকে নূতনের অভ্যুত্থানই স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল। তদনুযায়ী প্রবুদ্ধ ভারতের পূর্বতন মটো—'He who knows the Supreme attains the highest.' (Tait. Upa.)-এর স্থানে এল উপনিষদের আর এক বাণী ও তার বিবেকানন্দ-কৃত অনুবাদ : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' ; Arise, awake and stop not till the goal is reached.' (Katha. Upa.).

এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে—

"We have also deemed it necessary to replace the old motto by another, which appeared to us more fitting to the aim and nature of the work, Prabuddha Bharata has before it. The English rendering which we publish of it, as the reader will observe, is not literal. It is a free running translation of the sense, couched in the vigorous words of the Swami Vivekananda—for as many readers will probably recollect, it is taken from one of his lectures."

(*Editorial Section*, P. B., Aug. 1898).

অসাধারণ জনপ্রিয়, চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিশ্চয় ভারতপ্রেমিক ও বেদান্তপ্রেমিকেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সুতরাং অচিরকালে যখন প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ ঘোষণা করা হল, তখন অনেক পত্রিকাতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বামীজীর কাছে নিশ্চয় বেদনাদায়ক ঠেকেছিল। নিশ্চয় শত্রু মিত্র সকলের কাছেই এটা বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্ত-আন্দোলনের সংগঠনের পক্ষে অন্যতম পরাজয়ের স্মারক! আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এই জাতীয় পরাজয়-স্বীকৃতি মারাত্মক। সুতরাং পত্রিকার পুনঃ-প্রকাশ নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল— আন্দোলনের মর্যাদা ও শক্তি প্রমাণের জন্যও অন্ততঃ।

তাছাড়া আরও একটি প্রয়োজন : ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে—তার মুখপত্র অবশ্যই চাই। ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত বিবেকানন্দের সমর্থক, কিন্তু বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা নয়, তার মালিকানা অন্যের হাতে (স্বামীজী মালিকানা ব্যক্তিগত ভাবে নিতে রাজী হননি)। পত্রিকা দুটি নীতির ব্যাপারে বিবেকানন্দ-মতাবলম্বী থাকতে পারে, ছিলও, কিন্তু তাকে যে তা থাকতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। স্বামীজী যে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করেননি সে-অবধি ভক্ত সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা দিয়ে কাজ চলে যেত, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-গঠনের পরে প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বক্তব্য-প্রকাশক পত্রিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' বন্ধ হয়ে যেতে এই সুপরিচিত পত্রিকাটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের বাহন করে তোলার সুবিধা এল। আমার আরো বিশ্বাস, যদি প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ নাও হত, তাহলেও হয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে নিজস্ব পত্রিকা বের করা হত। (ক্রমশঃ)

---

১৫ প্রবুদ্ধ ভারতের নীতি সম্বন্ধে স্বামীজীর অনমু-মোদনের ইঙ্গিত কয়েকটি পত্র থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা যায়। তবে এই ইঙ্গিত-আবিষ্কার সম্পূর্ণ অনুমানমূলক। স্বামীজী ১৮৯৭-র ৯ জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন— "মেটিরিয়েল জোগাড় করছ না কেন, আমি নিজেই এসে কাগজ স্টার্ট করব।" এই কাগজ কি উদ্বোধন? মনে হয় না। পরের দিন মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মাদ্রাজে শীঘ্রই একখানি পত্রিকা আরম্ভ করা হবে, গুডউইন তারই কাজে সেখানে গেছে।" এই পরিকল্পিত পত্রিকাই বা কোন্ পত্রিকা? নিশ্চয়ই দেশীয় কোনো পত্রিকা নয়—যেহেতু ইংরাজ গুডউইন গেছেন সেই কাজে! মাদ্রাজে তখন ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত চালু আছে, একথা স্মরণ রাখতে হবে। স্বামীজী কেন তৃতীয় পত্রিকার কথা ভাবলেন? আমরা মীমাংসা করতে অসমর্থ।

শিবাজী-গুরু রামদাস

শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি
কিছুই অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রভু ভিক্ষা মাগি ফির তবু
সবার সর্বস্বধন চাহি।"

সাতারা নগরীর মাঝে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে চলেছেন এক সন্ন্যাসী আর তাঁর পিছনে পিছনে চলেছেন আর একজন, ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী নন, তিনি মারাঠা রাষ্ট্রের কর্ণধার শিবাজী। কাঁধে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি। এ কি আশ্চর্য কাণ্ড! যাঁর কোন দুঃখ দৈন্য নেই, তাঁর এ সাধের ভিক্ষা-বৃত্তি কেন? সারা নগরীর গবাক্ষদুয়ার খোলা, তার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে পুরবাসীদের কৌতুহলী চোখ। মনে হয় সম্রাটের বিচিত্র খেয়াল!

শিবাজীর কথা তো আগেই বলা হয়েছে আর ঐ গেরুয়াবসন-পরা সন্ন্যাসী হলেন শিবাজীর গুরু বিখ্যাত রামাইৎ সাধু রামদাস স্বামী। শিবাজীর পথ রাজধর্মপালনের পথ, হিংসার পথ আর তাঁর গুরু রামদাসের পথ অধ্যাত্মধর্ম-পালনের পথ, অহিংসার পথ। তবু তাঁদের মিলনে ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, এক নব যুগের সূচনা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। রামদাসের সঙ্গে শিবাজীর যখন মিলন হয়েছে তখন উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। রামদাসকে তাঁর সাধক-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য করতে হয়েছে দুরূহ সাধনা। আর ঔরঙ্গজীবের 'পার্বত্য মূষিক' মারাঠী সর্দার শিবাজীকে বিরাট মুঘল শক্তির সঙ্গে প্রতিপদে লড়াই করতে হয়েছে, তবেই স্থাপিত হয়েছে তাঁর স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের ভিত্তি। শিবাজী যে আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন, তার সবখানির আদর্শ তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরু রামদাস স্বামীর কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর গুরু রামদাস এই আদর্শ পেলেন কোথা থেকে?

রাজা-রাজড়ার ঘরে জন্ম হয়নি রামদাসের। আজন্ম সাধক তিনি। মহারাষ্ট্রের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা সূর্যপন্তজী ও মা রানুবাঈ প্রভু রামচন্দ্রজীর উপাসক। রামচন্দ্রজীর কাছে প্রার্থনা করে তাঁরা লাভ করেছিলেন রামদাসকে। নারায়ণ তাঁর বাপ-মায়ের দেওয়া নাম। অল্প বয়সে নারায়ণের পিতৃবিয়োগ হয়। সচ্ছল সংসারে মায়ের অভিভাবকত্বে বড় হয়ে ওঠেন নারায়ণ। ছেলেটি শান্ত শিষ্ট, কিন্তু একটু বাউণ্ডুলে স্বভাবের, কখন কোথায় থাকে মা ঠিক হদিস করতে পারেন না। তাঁর স্বভাব-সংশোধনের জন্য তাঁকে পাঠশালে ভরতি করে দেওয়া হল। কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার্জনের প্রতি কোন আসক্তি প্রকাশ পেল না নারায়ণের, অতএব অতি দ্রুত বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হল। এর পর নারায়ণের কাজ হল মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো বিশেষ করে রামচন্দ্রজীর মন্দিরে, মহাবীর বা হনুমানজীর মূর্তির সামনে গেলে তিনি বিহ্বল হয়ে যান। আর কষ্ট হয় মহারাষ্ট্রের গ্রামজীবনে সাধারণ মানুষের কাহিনী শুনে। একে তো তাদের জীবনে রয়েছে বিধাতা-নির্দিষ্ট দুঃখ কষ্ট রোগ শোক ইত্যাদি, তার উপর দিল্লীর মুঘল শাসকের অত্যাচারে তাদের জীবন বিষময়, না আছে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, না আছে

উৎপন্ন শস্যসম্পদ-ভোগের অধিকার। কি করে এদের জীবন থেকে এই অত্যাচার দূর করা যায় সেটাও নারায়ণ স্বামী ভাবতে থাকেন।

একদিন তিনি মায়ের কাছে প্রস্তাব করে বললেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হবেন। কারণ সংসার-জীবনের সুখও নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর মা রাণুবাঈ কিন্তু তাঁর সন্ন্যাস নেবার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, ভয়ঙ্কর রকমের কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। মায়ের চোখে জল দেখে নারায়ণেরও মহা অস্বস্তি। মা কেঁদে বললেন, 'আমি ভাবলাম কোথায় তুই বিয়ে করে সংসারী হবি, আমার সেবা যত্ন করবি, তা নয় তুই সন্ন্যাসী হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবি।' মাকে শান্ত করার জন্য নারায়ণ হঠাৎ বলে বসল, 'আচ্ছা মা, তুমি মেয়ের খোঁজ করো, আমি সংসারী হব।'

কিন্তু বিয়ে করা নারায়ণের হয়ে ওঠেনি; মায়ের চোখে জল দেখে বিয়েতে তো তিনি মত দিলেন, কিন্তু ভিতরে তাঁর মহা অশান্তি, তাঁর কর্তব্য কর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন—দেশে দারুণ ম্লেচ্ছাচারের বন্যা, মুঘল অত্যাচার হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে: কে এর প্রতিকার করবে? কেন, তিনি তো রয়েছেন! হনুমানজী রামচন্দ্রের জন্য সমুদ্র পার হয়েছিলেন আর তিনি কি পারেন না মুঘল শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করে ধর্মকে সজীব রাখতে? কিন্তু মায়ের চোখের জল? অবশেষে তিনি সংসার-ত্যাগের সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন; এখন সুযোগের অপেক্ষা, কারণ মায়ের অনুমতি নিয়ে যে যাওয়া যাবে না একথা নারায়ণ ভাল করেই বুঝেছিলেন।

সুযোগ যারা চায়, বিধাতা তাদের সুযোগ মিলিয়ে দেন। নারায়ণের বিবাহবাসর, বর এসেছে শোভাযাত্রা করে, বরকে বরাসনে বসিয়ে কন্যাকর্তা বরযাত্রীর আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত। নারায়ণ দেখলেন, এই মহা সুযোগ; অতএব তিনিও 'জয় রঘুবীর' বলে অন্তর্ধান করলেন। রাত্রের অন্ধকারে কাঁটাবন ঝোপ বনবাদাড় ভেঙ্গে চললেন সোজা গোদাবরী নদীর তীরে; সেখানকার মাটিতে রয়েছে প্রভু রামচন্দ্রজীর পায়ের স্পর্শ। সেখানকার মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে অনেকক্ষণ কাঁদলেন, তারপর ভোরবেলা স্নান করে উঠে জপধ্যানে মগ্ন হলেন। কিন্তু তিনি তো মন্ত্রতন্ত্র বিশেষ কিছু জানেন না, কিভাবে তিনি রামচন্দ্রজীর দেখা পাবেন এই হল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। যাই হোক ব্যাকুলতা আর চোখের জল সম্বল করে তিনি রামচন্দ্রজীর নামজপে আত্মনিয়োগ করেন। এত তন্ময় হয়ে তিনি জপ করেন যে, তাঁর দেহবোধ ভুল হয়ে যায়। সেই সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর গুরু। গুরু তাঁকে বিধিমত মন্ত্র দান করে সেই সঙ্গে সাধন-পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর নতুন নামকরণ হল রামদাস। যাবার আগে গুরুজী বললেন, 'রামদাস, তোমার ব্যাকুলতা রয়েছে আর রয়েছে ঈশ্বরে নিষ্ঠা। প্রভুজী তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্মরাজ্য-স্থাপনে সাহায্য করতে, কিন্তু সব আগে তোমাকে অধিকার অর্জন করতে হবে, বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রচার করতে হবে, তার জন্য চাই তোমায় সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা। আর কালে তোমার ইষ্টদর্শন হবে।' রামদাস আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁর মনের কোণে যা রয়েছে সংকল্পের আকারে, গুরুজীর আশ্বাসে তার ঘোষণা দেখে। সংশয়াকুল

রামদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, সামান্য শক্তির অধিকারী। কেমন করে সম্ভব হবে ম্লেচ্ছাচারের বন্যা নিবারণ করা?' গুরুজী বললেন, 'বৎস, তাঁর কৃপাতে সবই সম্ভব, আগে তুমি শক্তি অর্জন করো, তারপর দেখবে দেশের রাজা পর্যন্ত তোমার পথ ও মত মেনে নেবে।'

এরপর আরম্ভ হল রামদাস স্বামীর নিরলস শাস্ত্রসাধনা। তারপর পর্যটন শুরু করলেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এই দীর্ঘ তপস্যার সময়ে গুরুকৃপায় তাঁর ইষ্টদর্শন হয়। এরপর শুরু হল রামদাস স্বামীর আচার্য-জীবন। রামদাস স্বামী ফিরে এলেন নিজের দেশ মহারাষ্ট্রে। তখন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনে মহাশক্তিধর শিবাজীর অভ্যুদয় ঘটেছে। 'পার্বত্য মূষিকের' জ্বালায় পরাক্রান্ত মুঘল শক্তি দাক্ষিণাত্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ঔরঙ্গজীব বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি বুঝতে পারছেন শিবাজীকে রুখবার সামর্থ্য তাঁর নেই, শিবাজীর মনে তখন রঙীন স্বপ্ন—স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সেখানে ন্যায় ও সত্যের শাসন থাকবে নিরঙ্কুশ। অথচ এই আদর্শের পথে পরিচালনার জন্য চাই যোগ্য ব্যক্তির মন্ত্রণা, নির্দেশ। কে দেবে তাঁকে এবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ। তিনি শুনলেন পন্ধারপুরের সাধু তুকারামের কথা। ছুটলেন তাঁর কাছে, সাধু তুকারাম বিঠ্ঠলজীর (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত, পরম বৈষ্ণব, তিনি শিবাজীর অধ্যাত্মপিপাসা চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু ক্ষাত্রধর্মের উৎসাহ তাঁর কাছ থেকে শিবাজী পেলেন না।

এমন সময় শিবাজীর কানে গেল রামদাস স্বামীর নাম। সাতারার কয়েক মাইল দূরে ছাফলে রামদাস তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর ইষ্টবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। তাঁর আশপাশে এসে জড়ো হয়েছেন ধর্মকামী সাধারণ মানুষের দল তাঁদের নিয়ে রামদাস তৈরি করেছেন রামাইৎ সাধু। এই সম্প্রদায় একদিকে যেমন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে, সেই সঙ্গে প্রচার করে ক্ষাত্রধর্ম ম্লেচ্ছাচার ও যবনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবার মহতী বাণী প্রচার করেন এই সব রামাইৎ সাধু। শিবাজী দেখলেন এই তাঁর সেই গুরু যাঁর জন্যে তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তিনি গিয়ে হাজির হলেন ছাফলের আশ্রমে। রামদাস স্বামী গভীর জঙ্গলে অধ্যাত্ম-সাধনায় মগ্ন, আসলে গুরুও চাইছেন শিবাজীকে পরীক্ষা করতে। শিবাজী বার বার আশ্রমে আসেন আর বার বার ফিরে যান। শিবাজীর রাজকোষের অর্থে ছাফলের মঠ সুন্দরভাবে তৈরী হল। রামদাস স্বামী সেদিন মঠে আছেন। শিবাজী তাঁর অভ্যাসবশতঃ মঠে বেড়াতে এসেছেন, গুরু-শিষ্যের হঠাৎ মিলন হয়ে গেল। রামদাসের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন শিবাজী, রামদাস স্বামীও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর রামদাস আর শিবাজী এক হয়ে গেলেন, নতুন রাজধর্মের পাঠ নিলেন শিবাজী রামদাসের কাছ থেকে। সারা মারাঠা রাজ্যের উন্নতিতে রামদাস স্বামীর দান অসামান্য, কারণ শিবাজীর শক্তি আর রামদাসের পরিচালনার গুণে মারাঠা রাজ্যে হিন্দুধর্ম ও নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি হতমান, শিবাজীর রাজ্য দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করছে। রামদাস স্বামী দেখলেন তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, এবার ফেরার সময় হয়েছে প্রভু রামচন্দ্রজীর কাছে। শিষ্য-সেবক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, রামদাস ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হয়ে যাচ্ছেন, একদিন তিনি তাঁদের

কাছে বললেন তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদের কথা। তাঁদের বিষণ্ণ দেখে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে রামদাস বললেন, 'তোমরা অকারণে শোক করছ কেন? আমি তোমাদের গুরু হলেও অমর নই, ঈশ্বরের বিধান মেনে চলতে আমি বাধ্য। আমি আশা করব তোমরাও সহজভাবে তাঁর বিধান মেনে নেবে।' এরপর রামদাস অধিকাংশ সময় সমাধিতে ডুবে থাকতেন। শিষ্য-সেবকরা বুঝতে পারছিলেন, তাঁর শেষ সময় এগিয়ে আসছে। এর মধ্যেই একদিন প্রকাশ পায় এই মহাপুরুষের করুণাঘন রূপ। রামদাস সকালে তাঁর আশ্রমে বসে আছেন শান্ত সমাহিত, হঠাৎ বাইরে শুনতে পাওয়া গেল করুণ ক্রন্দনের স্বর—একমাত্র পুত্রের শোকে পাগলিনী জননী তাঁর মৃত সন্তান কোলে করে আশ্রমে এসে হাজির। পাগলিনীর কান্নায় রামদাস স্থির থাকতে পারেননি; তিনি বললেন, 'দেখ মায়ী, রামচন্দ্রের কৃপায় তোমার ছেলে চোখ মেলে চাইছে।' মহাপুরুষের বাক্য সফল করে শিশু জেগে উঠল ঘুম থেকে।

গুরু রামদাস দেহ রাখবেন—শীঘ্রই কানে কানে এ খবর শিবাজীর কাছে পৌঁছে গেল। শিবাজী এলেন গুরুসন্নিধানে, জিজ্ঞেস করলেন গুরুর অবর্তমানে তিনি কোথায় পাবেন শক্তির উৎস। গুরুর উত্তর—'তোমার আত্মায়, তোমার অস্তিত্বের অনুভবে আমি প্রকাশ থাকব। সেই তো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তারপর শেষ দিনে গিয়ে মিলবে তুমি আমার সঙ্গে রামচন্দ্রজীর পদতলে।'

ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন শিবাজী—মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের নায়ক, আর অমর হয়ে আছেন শিবাজী-গুরু রামদাস।

"মানুষ হও…সদুদ্দেশ্য, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"

"জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।"

"মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে।"

"একটা মানুষ যদি তৈরী হয় তো লাখ বক্তৃতার কাজ হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

ভারততীর্থে নিবেদিতা: (ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলীর সংকলন ; ভগিনী নিবেদিতা শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন): সিষ্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৮৬ ; মূল্য ৬৲ টাকা।

আমাদের জীবনভূমিতে যখন খরার প্রকোপ দেখা দেয়, তখন ঈশ্বর তাকে তাঁর করুণাধারায় সিক্তিত করে দেন। সেখানে আমাদের কোনও কৃতিত্ব অনুমান করতে যাওয়া নিরর্থক। নিবেদিতাকে, ঠিক এমনই, ঈশ্বরের দান হিসাবেই আমার মনে হয়। তাঁকে আমরা অর্জন করিনি, সে-যোগ্যতাও আমাদের ছিল না।

তবু তিনি একদিন সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এই দেশে এসেছেন, এই প্রাচ্য ভূমিকে স্বদেশ-রূপে বরণ করে নিয়েছেন, তারপর গুরু বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে জাগিয়ে তুলেছেন সুপ্তিমগ্ন ভারতবর্ষকে। এই দেশকে যিনি তাঁর সব দিয়েছিলেন, সার্থকনামা সেই নিবেদিতাকেও আমরা স্বচ্ছন্দে ভুলতে বসেছিলাম—জাতি-হিসাবে আমরা এমনই আত্মতুষ্ট অথবা অকৃতজ্ঞ! স্বস্তির কথা, তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ-দশক পরে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-কথিত "লোকমাতা" নিবেদিতকে জানবার আগ্রহ পাঠক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে দেখা দেয়। সেই জিজ্ঞাসা মেটানোর আয়োজনও চলে তারই সঙ্গে সমতা রেখে। নিবেদিতা সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের হাতে এখন বেশ কিছু বই। তাঁর তপশ্চর্যা-স্বরূপ কর্মকাণ্ডের কাহিনী নিবেদিতার বিভিন্ন জীবন-চরিতমূলক রচনায় বিধৃত। কয়েকটি গ্রন্থে (যেমন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার "ভগিনী নিবেদিতা," শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "নিবেদিতা লোকমাতা") ওই মহাজীবনের ভাষ্যও পাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় নিবেদিতারই রচনা পাঠ। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে (কম্‌প্লিট ওয়ারকস অব নিবেদিতা: চার খণ্ড ইংরেজীতে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত ; পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশের অপেক্ষায়) ইংরেজী ভাষা যাঁদের অনায়ত্ত, বাঙালী পাঠক-সমাজের সেই বৃহৎ অংশের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ বহুদিন প্রায় ছিল না বললেই চলে। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই অভাব কিছুটা দূর করল। প্রকাশিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার এই প্রয়াস তাই বিশেষ-ভাবে অভিনন্দনের যোগ্য। "দি মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম্"-সহ তাঁর এগারখানি বইয়ের নির্বাচিত পরিচ্ছেদ ছাড়া নিবেদিতার কয়েকটি প্রবন্ধ ও চিঠির অনুবাদ এতে সঙ্কলিত।

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে কতখানি ভালবেসে-ছিলেন, এই দেশের মানুষকে কতখানি আপনার করে নিয়েছিলেন, তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে প্রায় ৪০০পৃষ্ঠার সংকলন-গ্রন্থটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, ছত্রে ছত্রে। ভারতীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা—সব কিছুর বর্ণনাতেই পাই একটি আন্তরিক আবেগের স্পর্শ। সেই আবেগ-উচ্ছ্বাস অবশ্যই যুক্তি আর বুদ্ধির হাত ধরে চলেছে। কিন্তু এখানে বড় কথা তাঁর প্রতীতি। মনে রাখা

দরকার, এদেশের সবটুকুই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই আন্তরিক ইচ্ছাই হয়তো তাঁর প্রতীতির উৎস। যুক্তি এসেছে তার পরে—যার সহযোগে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, বিশ্বাসের বস্তুকে বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরে করেছেন প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় জীবনধারার মধ্যে তিনি পেয়েছেন শুচিতা, নিষ্ঠা আর লালিত্যের পরিচয়। এমন কি বিবিধ সংস্কার আর প্রচলিত আচারও তাঁর চোখে সুন্দররূপে প্রতিভাত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি আর নির্বিচার আনুগত্যের ঐতিহ্যে তিনি মুগ্ধ।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে কোনও দিক দিয়েই ছোট নয়, বরং প্রতীচ্য প্রাচ্য দেশের কাছ থেকে নানা বিষয়ে পাঠ নিতে পারে—এই কথাটাই তাঁর বিভিন্ন রচনার অন্যতম উপজীব্য। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতা কলকাতার সাধারণ বাড়িতেও স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। বাড়ির ছাদের একটি বর্ণনা এখানে অংশতঃ তুলে দিচ্ছি: "আমার বাড়ির স্থাপত্যকলার অপর সৌন্দর্য হল বাড়ির ছাদটি।···চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত একই ধরনের ছাদের পর ছাদ ছড়িয়ে আছে; মধ্যে মধ্যে গাছপালা ও বাগানের সবুজ শোভা···। এখানে প্রভাতে সূর্যাস্তকালে কিংবা নিশীথে চাঁদের আলোয় সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেকে একা বলে অনুভব করা যায়।···অন্দরমহলে অধিকাংশ সময়ে আবদ্ধ থাকে যেসব হিন্দু ললনা, তাদের কাছে এ-রকম একটি ছাদ থাকা যে কতখানি! এখানেই তাদের জীবনদর্শন, বিমূর্ত জীবনের সঙ্গে পরিচয়—নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তার সাক্ষাৎ-লাভ।" এই বর্ণনায় একই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং কবিসুলভ মানসিকতা পরিস্ফুট। সাধারণ ভিক্ষুকের উল্লেখেও তিনি সশ্রদ্ধ: "অধিকাংশের পরনে শুভ্র বস্ত্র, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ভিক্ষাপাত্র···। ···আমার আকর্ষণের পাত্র হল নিঃসঙ্গ এক ভিক্ষুক।···সে নগ্নপদ, বুদ্ধের ন্যায় পীতবসন-পরিহিত, ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে।" (হায়, নিবেদিতার চোখ যদি আমাদের থাকত!)

এদেশে শিক্ষার প্রসার, সামাজিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার কথা অবশ্যই তিনি বলেছেন, কিন্তু প্রাচীন ভাবধারার উপরই নূতনের বিকাশ তাঁর কাম্য। তিনি ভারতের পরাধীনতার বন্ধন-মোচনের স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নকে সত্য করতে হলে স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েদেরও যে সক্রিয় ভূমিকা আবশ্যক তা তিনি বিশ্বাস করতেন। দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান জানাতেও তাই তিনি দ্বিধা করেননি: "আজ তাঁর (ভারত-জননীর) মন্দির তমসাচ্ছন্ন। যেদিন ভারত-রমণীগণ জাতীয়তার মহারতি করতে সক্ষম হবেন, সেদিন আবার এই দেবালয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।"

এই সকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ "দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম্" গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি পরিচ্ছেদ। "গোপালের মা," "মা-কালীর কাহিনী," "বুদ্ধ-যশোধরা" প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং "পত্রাবলী"ও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা এবং গোপালের মা প্রসঙ্গে তাঁর লেখায় পরম শ্রদ্ধা আর ভক্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি ভোলবার নয়। সেটি হল: "আমার বরাবর মনে হইয়াছে যে, ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ

সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা তিনিই (শ্রীশ্রীমা)। কিন্তু তিনি কি এক প্রাচীন আদর্শের শেষ উদাহরণস্থল অথবা এক নূতন আদর্শের প্রথম উদাহরণস্থল?" গোপালের মা-কে তিনি বলেছেন "শ্রেষ্ঠ সাধিকা"; তাঁর সঙ্গে শিশুখৃষ্ট-জননীর তুলনা করেছেন।

বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের মূল আদর্শ কী? —তাঁরই বাণী: "যাহা কিছু কর, মানুষের জন্য কর। মুক্তি নহে, ত্যাগ: আত্মানুভূতি নহে, আত্মত্যাগ।" গুরুর এই মন্ত্র সম্পূর্ণত: নিবেদিতারও। নিবেদিতা এক জায়গায় বলছেন: "(বিবেকানন্দের) একজন শিষ্যা যেন কদাপি মঠে একদিনের পুণ্য অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত না হন—যেদিন তাঁহার জীবনের প্রথম উন্মেষ-স্বরূপেই স্বামীজী তাঁহাকে শিবপূজা করিতে শিখান, তারপর ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া শুভকর্ম সমাধা করেন। …একজনকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে উপদেশ দেন, 'যাও যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।'" সেই একজন শিষ্যা অবশ্যই নিবেদিতা। এবং তিনি ওই উপদেশ শেষাদন পর্যন্তই মনে রেখেছেন, পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে—জীবন দিয়ে।

আজও এই কথা যখন ভাবি, আমাদের চোখ কি তখন জলে ভরে আসে না?

—জ্যোতির্ময় বসু রায়

Souvenir, 1968—Ramakrishna Misson Seva Pratisthan (A General Hospital), 99 Sarat Bose Road, Calcutta 26. P. 44. Price: One Rupee only.

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের এবারকার স্মরণিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ: Swami Vivekananda: A Great Synthesizer, Surgical instruments as described in the Sushruta-samhita, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে ত্যাগ ও সেবা, রোগপরিচর্যায় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী।

এতদ্ব্যতীত 'Thritysix years of the Seva Pratisthan' প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক অবস্থা হইতে প্রতিষ্ঠানের পরিবিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত। 'Our School of Nursing: Co-curricular activities'—সচিত্র এই লেখাটিতে এবং 'ওঁরা সেবার শপথ নিলেন' এই সুখপাঠ্য রচনাটিতে পরিষেবিকাগণের শিক্ষাধারা ও তাহার ভিত্তিমূলে ত্যাগের উচ্চাদর্শের কথা বর্ণিত। অন্যান্য লেখাগুলিও উচ্চকোটির।

যুগশঙ্খ (১৯৬৮)—বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ। পৃষ্ঠা ৭৫।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মালদহ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা 'যুগশঙ্খ' সুমুদ্রিত রচনাসম্ভারে অলঙ্কৃত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছাত্রদের কয়েকটি কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পে মৌলিকতা আছে; লেখাগুলি পাঠ করিলে 'শিশু-সাহিত্যিক'দের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও মনে হইবে। 'বিদ্যামন্দির-সংবাদ-পরিক্রমা'য় বহুমুখী বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(১) **পথের দিশারী**: শ্রীঅমিয়া দেবী। প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির, সি ২৭, বাঘা যতীন পল্লী, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা ১৩৬, মূল্য দুই টাকা।

(২) **অঠরাশ্লোকী গীতা (মরাঠী)**—পুরুষোত্তম পাণ্ডুরঙ্গ গোখলে, কন্হাড় (সাতারা)। প্রকাশক: সৌ সুলোচনা গোখলে, ৪৩৬ সোমবার পেঠ, কন্হাড়। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা ৩৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত এপ্রিল, ১৯৬৯, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যসমূহ :

স্কুল টেক্সট বুক ১৩০টি, ছাত্রদের নোটবুক ১,৩৫৬ থানি এবং বিস্কুট ৪৮ টিন।

বরনেশ বাজারে সেবাকার্যের জন্য নূতন ক্যাম্প খোলা হইয়াছে; একটি 'স্কুল-কাম-কম্যুনিটি হল' এবং ২০টি কুটির নির্মাণের কাজ শুরু করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চলে কয়েকটি কূপ-খননের কার্য ইতঃপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে।

মণ্ডলঘাট অঞ্চলে যে ২০টি কূপ খননের কার্য চলিতেছিল, তাহা প্রায় সমাপ্তির পথে। পাহাড়পুর ক্যাম্প সেবাকেন্দ্রে কুটির নির্মাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

গুজরাট বন্যার্তসেবা: রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য গত মে মাসে ৩০০টি চার কুঠুরির 'প্রি-ফেব্রিকেটেড সিমেণ্ট কংক্রিটে'র গৃহ নির্মিত হইয়াছে। অনুরূপ ১,০০০টি গৃহের নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে, এই গৃহগুলিতে সুরাট জেলায় ৪,০০০ দুঃস্থ পরিবারের স্থান-সঙ্কুলান হইবে।

কার্যবিবরণী

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের বিংশতিতম বর্ষের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ৫৪নং হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লিউ ১১-তে অবস্থিত শাখাকেন্দ্রে এবং ৬৮নং ডিউকস অ্যাভেনিউ, মাসওয়েল হিল, লণ্ডন এন. ১০-এ অবস্থিত আশ্রমে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় কার্যধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে।

হল্যাণ্ড পার্ক আশ্রম এবং মাসওয়েল হিল আশ্রমের পরিদর্শক-সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৩০২ ও ৪,১১৫। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের মোট শ্রোতৃসংখ্যা ৫,০৫৪।

'*Vedanta for East & West*' পত্রিকাখানি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাসমৃদ্ধ '*Swami Vivekananda in East & West*' গ্রন্থখানি স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ অগস্ট মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পুস্তকাবলী ও ফটোগ্রাফ কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতাদিগের মধ্যে অনেকে ইওরোপ, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

স্বামী ঘনানন্দ হল্যাণ্ড পার্ক কেন্দ্রে ৩৫টি রবিবাসরীয় সভার পরিচালনা করেন। তিনি সেভেন ওকস্ স্কুলে বক্তৃতা দেন, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন এবং ব্লুমসবারি সেণ্ট্রাল ব্যাপ্টিস্ট চার্চে ভাষণ দেন। গিল্ড হলে তিনি ইংলণ্ডের মাননীয়া রানীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। লর্ড চেম্বারলেন কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী ঘনানন্দ বাকিংহাম গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করেন এবং ওয়েস্ট-মিনিস্টার অ্যাবেতে মরিশাস স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেন।

স্বামী পরহিতানন্দ লীডস্, শেফিল্ড, ব্রম্‌লে,

আইলওয়ার্থ এবং ইস্টকোট ও চেশম কন্‌গ্রিগেশন্যাল চার্চে প্রচারকার্যের প্রসার করিয়াছেন। 'তাহারা (ধর্মগুলি) কি স্বতন্ত্র ?' —এই বিষয়ে টেলিভিশন বক্তৃতায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারী বুদ্ধচৈতন্য যে মাসে ভারত হইতে ইংলণ্ডে আসেন এবং সিটিংবোর্ন কলেজে দর্শনের ক্লাসে বক্তৃতা করেন; তিনি মাসওয়েল হিল আশ্রমে দুইটি ভাষণ দেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী আদীশ্বরানন্দ কয়েকদিন হল্যাণ্ড পার্ক কেন্দ্রে অবস্থান করেন। ফেব্রুআরি মাসে স্বামী ঘনানন্দ একজন শিক্ষানবিসকে সঙ্গে লইয়া ভারত ভ্রমণ করেন এই এক মাসে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বোম্বাই, নিউ দিল্লী, বারাণসী, বেলুড়, মাদ্রাজ প্রভৃতি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। জুলাই মাসে তিনি জুরিখ পরিদর্শন করেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, বুদ্ধপূর্ণিমা, দুর্গাষ্টমী, খৃস্ট্‌মাস ইভ যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে।

ভারত সরকার এই বেদান্ত কেন্দ্রকে বার্ষিক অর্থসাহায্য করেন।

কলম্বো ঃ সমুদ্রতটের নিকটবর্তী রামকৃষ্ণ রোডে অবস্থিত সিংহল শাখার প্রধান কর্মকেন্দ্র কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী (১৯৬৬, এপ্রিল—১৯৬৮ মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে।

এই আশ্রমে দৈনিক পূজাপাঠ, সাময়িক উৎসব, তামিল ও ইংরেজীতে ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা ধর্ম- ও সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতাপ্রদানের ব্যবস্থাও সময় সময় করা হইয়া থাকে। 'পোয়া-'দিবসে (Poya-day) শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবেকচূড়ামণি অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা হইয়াছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে শিশুদের জন্য 'পোয়া'-দিবস ধর্ম-ক্লাসের আয়োজন করা হইতেছে, ১৫টি শিশু লইয়া ক্লাস আরম্ভ করা হইয়াছিল বর্তমানে শিশুসংখ্যা—৫৭৫। ২২ জন অবৈতনিক শিক্ষক শিক্ষাদানকার্য পরিচালনা করেন। ধর্মালোচনার ব্যবস্থায় শিশুদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্টি-ভবন, ছাত্রাবাস প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গ্রন্থাগারে ২,৪৫০ খানি পুস্তক আছে। অবৈতনিক পাঠাগারে ২৭ খানি সাময়িক এবং ১০ খানি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কলম্বো হইতে ১৮০ মাইল দূরে কাতারাগামায় 'রামকৃষ্ণ মিশন মদম' ধর্মশালায় দৈনিক গড়ে ৩০০ জনেরও অধিক এবং শনি-রবিবারে গড়ে ৭০০ জন আশ্রয়প্রার্থী তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বার্ষিক উৎসবে ১৭ দিন ধরিয়া প্রতিদিন প্রায় ১২,০০০ তীর্থযাত্রীকে বিনামূল্যে আহার্য এবং ২০,০০০ ব্যক্তিকে সরবৎ দেওয়া হইয়াছিল।

বাটিকালোয়া আশ্রমের উদ্যোগে জেলখানায় কয়েদীদিগকে ও কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিশুদের একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, ছাত্রসংখ্যা ৪২৫। কালাডি-উপ্পোদাই-এ বালকদের জন্য একটি এবং আনাইপন্থী ও কারাতিভুতে বালিকাদের জন্য দুইটি অনাথাশ্রম পরিচালিত হইতেছে। এই অনাথাশ্রমগুলিতে মোট ১১৫ জন শিক্ষালাভের

সুযোগ পাইয়াছে, তন্মধ্যে ৪৫টি বালিকা।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবনের তিন-চতুর্থাংশ নির্মিত হইয়াছে।

গত ৯ই মে, ১৯৬৮ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শুভাগমন করিয়া কয়েকদিন আশ্রমে অবস্থান করেন। কলম্বো কেন্দ্রে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষের আগমন এই প্রথম। তাঁহার আগমনে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের আমেরিকা সফর

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বা পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নে সাতহাজার শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারই ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই ঐতিহাসিক শহরে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ১৯৬৮ সনের ২৫শে জুলাই এক বছরের জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ত্রিনিদাদ, গায়না, কানাডা এবং আমেরিকার মধ্য পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ছাত্রছাত্রীদের সভায়, ধর্মসভায়, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে, সাধারণ জনসভায়, কলেজের ভজনালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ঘরোয়া বৈঠকী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সফরের প্রথমার্ধে তিনি ত্রিশটিরও বেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভাষণ দিয়াছিলেন। 'মার্কিন বার্তা' এ প্রসঙ্গে আরও বলিতেছে :

"...সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেছেন যে, ঐ সকল ছাত্রছাত্রীদের গভীর আগ্রহ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। 'বিশেষ করে যুবসমাজের আগ্রহে আমি আনন্দিত হয়েছি, তাদের এই আগ্রহ খুবই আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রায় সকল স্থানেই শ্রোতারা গভীর আগ্রহে বেদান্তের বাণী শুনেছে, তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এ সম্বন্ধে আরও শুনতে চায়।' কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বক্তাকে পুনরায় আমেরিকা আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা বহু ছাত্রছাত্রীর মনেই গভীর রেখাপাত করেছে। মিনেসোটার কার্লটন কলেজের ছাত্র অ্যান কার্টিস বলেছেন, 'একদিকে তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল জ্ঞান কেবলমাত্র আমাকে মুগ্ধই করেনি, আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে এবং বুদ্ধি ও মননশীলতার ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে বিপুল প্রেরণা। অন্যদিকে তাঁর কথাগুলি আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে।' ওয়েস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেদিন ভাষণ দেন সেদিন লেকচার হলে তিলধারণেরও জায়গা ছিল না।

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উইসকনসিন ইউনিয়ন লিটারেরী কমিটির চেয়ারম্যান ডেভিড মিলোফস্কী বলেছেন, 'আপনার আগমন আমাদের মনের দিগন্ত-প্রসারণে সাহায্য করেছে। আর আমরা উপলব্ধি করেছি যে, ভৌগোলিক দিক থেকে বিরাট ব্যবধান থাকলেও পৃথিবীর সকল মানুষই এক বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। শনিবার সন্ধ্যায় আপনার বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছিল...বেদান্ত ও পশ্চিমী চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য যেন অনেকখানি মিলিয়ে গিয়েছে।

ভার্জিনিয়ার মিলিটারী ইনষ্টিটিউটেও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বক্তৃতা দেন।...

আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে, নানা অনুষ্ঠানে তিনি একশরও বেশী বক্তৃতা দিয়েছেন। সর্বত্রই তিনি বিপুল সাড়া পেয়েছেন, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে। তাঁর মতে বিশ্বের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দানই হচ্ছে বেদান্তের বাণী।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এক বছরের জন্য আমেরিকায় গিয়েছেন: ইউটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়ার্ধের সফর শুরু হয়েছে।"

উৎসব-সংবাদ

চেরাপুঞ্জি: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় আসামের রাজ্যপাল শ্রীব্রজকিশোর নেহেরু পৌরোহিত্য করেন। স্বাগত অভিভাষণে স্থানীয় কেন্দ্রের সম্পাদক চেরাপুঞ্জি আশ্রমের প্রারম্ভ, বিস্তার ও বর্তমান কার্যধারা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণী পাঠ করেন।

তিনি বলেন, ১৯২৪ সালে স্বামী প্রভানন্দজী খাসিয়া পাহাড়ে মিশনের যে শিক্ষাপ্রচার-কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ এই অঞ্চলে একটি উচ্চবিদ্যালয়, ২টি জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়, ৯টি এম ই স্কুল, ২৮টি প্রাইমারী স্কুলের মাধ্যমে দক্ষিণ খাসিয়া পাহাড়ে এক হাজার বর্গমাইল জুড়িয়া প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিনা খরচে লেখাপড়া এবং কারিগরী বিদ্যা শিখিবার সুযোগ পাইতেছে।

সভাপতির অভিভাষণে রাজ্যপাল বলেন, 'আমি দেখিয়াছি পাশ্চাত্যদেশেও মিশনের সন্ন্যাসিগণ ভারতীয় কৃষ্টি ও বেদান্ত প্রচারের কার্যে কিরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের জীবন ও বাণীর দ্বারা ধর্মকে ব্যাবহারিক জীবনে কিরূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায় তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবাবলম্বনে ব্যক্তিগত গণ্ডী হইতে ধর্মকে সমাজসেবার ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরের পূজা-জ্ঞানে সেবাকার্য করিতে বলিয়াছেন। তাই বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বেদান্তের আদর্শই সমগ্র বিশ্বে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে নূতন সাড়া জাগাইয়াছে। স্বামীজীর সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মানবজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং সমাজের যথার্থ ভূষণস্বরূপ।'

আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-দিবসে বিশেষ পূজাদি, শোভাযাত্রা, প্রসাদবিতরণ ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁহাদের জীবনী ও বাণীর আলোচনা হইয়াছিল।

মনসাদ্বীপ: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৪ঠা হইতে ৮ই এপ্রিল ৫ দিন সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী নিষ্কলানন্দ ও স্বামী ভাস্করানন্দ। স্বামী অমলানন্দ প্রথম তিন দিন ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শেষ দুই দিন ভাষণ দেন।

৪ঠা এপ্রিল বিকালে আশ্রম-পরিচালিত ৩টি বিদ্যালয়ের (১টি বহুমুখী, ১টি বালকদের নিম্নবুনিয়াদি ও ১টি বালিকাদের প্রাথমিক) বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণী সভা আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিষ্কলানন্দ। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ

কর্তৃক বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শিত এবং সভান্তে 'বন্দীবীর' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

৫ই এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি ও হরিনামসংকীর্তন হয়। বিকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করিবার পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী অমলানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে আড়াই হাজারেরও অধিক ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘ কর্তৃক যাত্রানুষ্ঠান হয়।

৬ই এপ্রিল উত্তর সাগর অঞ্চলে মুড়িগঙ্গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী আপ্ত-কামানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা হয়। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, সঙ্গীত ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করিবার পর ঐসব বিষয়ে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তাহাদের পুরস্কৃত করা হয়। সভান্তে আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘের যাত্রাভিনয় পরিবেশিত হয়।

৭ই এপ্রিল দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভাস্করানন্দ। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক লিখিত ও প্রযোজিত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি 'দেবপ্রণাম' সভায় পরিবেশিত হয়। সভান্তে মনসাদ্বীপ আশ্রম-পরিচালিত ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

৮ই এপ্রিল দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে সুমতি-নগরে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এইস্থানে 'রামকৃষ্ণ প্রগতি সঙ্ঘ' নামক ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত যুবকদের একটি সঙ্ঘের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী আপ্তকামানন্দ। এই উপলক্ষে সকালে সঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহে ঠাকুরের পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে স্বামী নিষ্কলানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। সভায় আবৃত্তি প্রভৃতিতে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। 'দেবপ্রণাম' গীতি-আলেখ্য এবং ছায়াচিত্র এখানেও প্রদর্শিত হয়।

স্বামী যোগীশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২০শে মে, ১৯৬৯ বেলা সাড়ে এগারটার সময় স্বামী যোগীশ্বরানন্দ (উপুদা) মহারাজ ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা মঠে যোগদান করেন, সেখানে সেবাকার্যে (relief works) তিনি প্রায়শই অংশ গ্রহণ করিতেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবস্থান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশই বেলুড় মঠে অতিবাহিত হয়। স্বামী যোগীশ্বরানন্দ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্মের মধ্যে না থাকিলেও সর্বদা কঠোর সাধুজীবন যাপন করিতেন। অনাড়ম্বর সাধু-জীবন, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও সরলতার জন্য তিনি ছোট বড় সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বাগ্দা : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, প্রভাত-ফেরী, কীর্তন, উপনিষৎপাঠ প্রভৃতির পর প্রায় একহাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগরতলা : বিগত ১৯শে এপ্রিল হইতে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত ৮ দিন আখাউড়া রোডস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী মঠে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রভাতফেরী, ভাগবত পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিপালিত হইয়াছে। স্বামী প্রমথানন্দ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপিকা অমিতা ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ ডঃ হীরালাল চ্যাটার্জী, অধ্যাপক শ্রীবাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য, শ্রীরজতকান্তি গুপ্ত প্রভৃতি ২১, ২২, ২৩শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমতী ভানু নাগ ও শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য দুইদিন কীর্তন পরিবেশন করেন। ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হয় এবং প্রায় ৪ হাজার নরনারী খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৬শে এপ্রিল স্বামী প্রমথানন্দ ভাষণ দেন।

বারাসত : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২১শে এপ্রিল শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার অষ্টম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা-পাঠাদি ও গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে 'আচার্য শঙ্কর' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। উৎসবে অনেক সাধু ও ভক্ত নরনারী যোগদান করেন।

আরিট : (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৬শে এপ্রিল শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, পাঠ, কীর্তন ও রামায়ণগান হয়। ২৭শে এপ্রিল রবিবার সকালে শোভাযাত্রা, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, মধ্যাহ্নে দেড় হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণ ও অপরাহ্ণে আরিট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি-প্রতি-যোগিতা এবং পুরস্কারবিতরণ ও ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় স্বামী বিশোকাত্মা-নন্দ (সভাপতি), স্বামী অমলানন্দ, স্বামী সুশান্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে সহস্রাধিক নরনারীর সমক্ষে রামায়ণগান পরিবেশিত হয়।

হাওড়া : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম-ভবনে গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর ব্যাপক প্রভাবের বিষয়ে বলেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 'কবির্মনীষী রামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি স্বামী বুধানন্দ মহারাজ তাঁহার মনীষাপূর্ণ ভাষণে রামকৃষ্ণের জীবন কিভাবে মানুষের বন্ধন খণ্ডন করিয়া তাহাকে মুক্ত জীবনে উত্তীর্ণ করিতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় দিন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বমনীষার পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট

ভূমিকার বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী অভজানন্দ মহারাজ আধুনিক জীবনে স্বামীজীর বাণীর প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। সভাপতি স্বামী চিদাত্মানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে সকলের কাছের মানুষ তাহাই বিবৃত করেন। বিখ্যাত গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক উভয় দিনই সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পুরুষোত্তমপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সংঘের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ২রা মে হইতে ছয়দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত ও তাঁহাদের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচিত হয়। উক্ত তিন দিন স্বামী জীবানন্দজী, স্বামী তপনানন্দজী, স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী, স্বামী অন্নদানন্দজী ও স্বামী ভাবাতীতানন্দজী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান এবং প্রত্যহ সান্ধ্য আলোচনাসভায় অংশ গ্রহণ করিয়া উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য পূজা করিয়াছিলেন।

৪ঠা মে সকালে স্বামী অন্নদানন্দজী সেবা-সংঘ প্রাঙ্গণে, 'মোক্ষদা দাতব্য চিকিৎসালয়' ও 'ব্রজমোহন পাঠাগার' দ্বিতল ভবনের ভিত্তি-স্থাপন করেন।

প্রথম তিন দিন সন্ধ্যায় ভজন ও লীলা-সঙ্গীত পরিবেশন করেন তমলুকের সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীবিষ্ণুব্রত মাইতি ও শ্রীশচীকান্ত বেরা। শেষ তিন দিন বাঁকুড়ার রামগীতিসুধাকর শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন। তাছাড়া প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারী খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস-সমন্বিত একটি 'স্মরণী' উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে।

অ্যাপোলো ১০-এর চন্দ্র-প্রদক্ষিণ

গত ১৮ই মে রাত্রি ১০-১৯ মিঃ সময়ে আমেরিকার কেপ-কেনেডি হইতে কর্নেল টমাস পি. স্টাফোর্ড, জন ডবল্‌. ইয়ং এবং ইউজিন এ. সারনান অ্যাপোলো-১০ মহাকাশ-যানে চন্দ্র-প্রদক্ষিণের জন্য যাত্রা করিয়া সাফল্যের সহিত চন্দ্র-প্রদক্ষিণানন্তর গত ২৬শে মে রাত্রি ১০-২২ মিঃ সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নির্বিঘ্নে অবতরণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের যাত্রা-পথের বিবরণ সবই অ্যাপোলো-৮-এরই মতো; কেবল পার্থক্য এই যে এবার মহাকাশযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের যান 'লুনার মডিউল' মহাকাশযানের সহিত সংযুক্ত ছিল। চন্দ্রপ্রদক্ষিণকালে টমাস স্টাফোর্ড ও ইউজিন সারনান 'কম্যাণ্ড মডিউল' (যেখানে মহাকাশচারীরা থাকিয়া যান পরিচালন করেন) হইতে এই 'লুনার মডিউলে' প্রবেশ ও উহাকে 'কম্যাণ্ড মডিউল' হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক-ভাবে চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৭ মাইল নিকট পর্যন্ত যান এবং কয়েকবার এভাবে প্রদক্ষিণ ও এত নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের পর পুনরায় উপরে উঠিয়া 'কম্যাণ্ড মডিউলের' সহিত অবতরণযানটিকে পুনঃ সংযুক্ত করেন এবং উহা হইতে 'কম্যাণ্ড মডিউলে' ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার পর লুনার মডিউলকে মূল যান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া যাত্রিগণ আরো কয়েকবার চন্দ্রপ্রদক্ষিণানন্তর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিবার পূর্বের মহড়ারূপে এই অভিযানটি আয়োজিত হইয়াছিল। ইহার সাফল্য চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিয়া দিল।

ভারতের আদিমানবের শিলীভূত অস্থির সন্ধান

শিলীভূত অস্থির ভিত্তিতে মানুষের আদি-পুরুষের সন্ধান আজও চলিয়াছে। গত বছর (১৯৬৮) বসন্তকালে উত্তরভারতের শিবালিক পর্বতমালায় তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালানোর ফলে একটি বিরাটকায় শিলীভূত চোয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, এধরনের যেসকল উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির তুলনায় এটি পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি বছরেরও বেশী প্রাচীন। এই চোয়ালটি জারগ্যানটোপিথিকাস নামে প্রস্তর যুগের এক ধরনের বিরাটকায় বানরের বলিয়াই উঁহাদের ধারণা। ইহাদের পূর্বপুরুষ ছিল ডাইওপিথিকাস নামে একধরনের জীব। শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাংওটাং প্রভৃতির পূর্বপুরুষ এ সকল জীব দেড় কোটি থেকে দু কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিত।

শুক্রগ্রহে অভিযান

পৃথিবী হইতে যাত্রা করিবার পর পনেরো কোটি মাইল পথ চলিয়া রাশিয়া কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত মহাকাশ-যান 'ভেনাস-৫' ও 'ভেনাস ৬' গত ১৬ই ও ১৭ই মে শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া সেখানকার বহু তথ্য পাঠাইতেছে। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার এই সাফল্য বিস্ময়কর।

জানা গিয়াছে, শুক্রগ্রহের চারিদিকের বায়ুমণ্ডল অতি উত্তপ্ত, উহার চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ২০ গুণ অধিক।

পরলোকে গোকুলদাস দে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য গোকুলদাস দে ৭৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় নিজ ভবনে ইষ্টচিন্তা-নিরত অবস্থায় গত ২৬শে মে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গোকুলবাবু ছাত্রজীবন হইতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য দর্শন ও কৃপা লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের সঙ্গ ও স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ও ভগিনী নিবেদিতা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির স্মৃতিচারণ তিনি প্রায়ই করিতেন। তাঁহার এই সব স্মৃতিচারণের কিছু কিছু এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছে। পালি-ভাষার এই খ্যাতিমান অধ্যাপকের কয়েকটি গবেষণা-পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় লেখকগণ

১। ডক্টর ভক্তপ্রসাদ মজুমদার :
রীডার (ইতিহাস), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

২। স্বামী ধ্যানানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, কলিকাতা

৩। স্বামী চেতনানন্দ :
অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা

৪। শ্রীদিলীপকুমার রায় :
হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা

৫। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য :
কলিকাতা

৬। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
লেকচারার (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় :
বহরকুলি (বর্ধমান)

দিব্য বাণী

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ
শুচিঃ সম-গ্রীব-শিরঃ-শরীরঃ ॥ ৪
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্ ॥ ৫
(…… মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৭)

—কৈবল্যোপনিষদ্

হয়ে ত্যাগপথ-চারী, রুদ্ধ করি সর্ববিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বার—
বিষয় গ্রহণ হতে সকল ইন্দ্রিয়গণে করি প্রত্যাহার,
নির্জন প্রদেশে বসি শুচি শুদ্ধ হয়ে সুখাসনে
ঋজুভাবে—সমসূত্রে রাখি দেহ গ্রীবা ও আননে,
ভকতি-পূরিত চিত্তে নমি নিজ শ্রীগুরুদেবেরে,
বিরজ বিশোক শুদ্ধ নিরমল প্রশান্ত শিবেরে
ধ্যান করি হৃদিপদ্মে যতচিত্ত যোগিগণ করেন গমন
অজ্ঞানের পারে, যেথা সর্বসাক্ষী পরমাত্মা জগৎ-কারণ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ ৬
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥৭

অব্যক্ত অনন্ত যিনি, বেদরাশি সৃজন যাঁহার,
চিন্তার অতীত যিনি, চিদানন্দময় পারাবার,
আদি-অন্ত-মধ্য-হীন, অবিনাশী—চিরবিদ্যমান,
অদ্বয় অরূপ যিনি, অত্যদ্ভুত যে সত্তা মহান,
নিজ শক্তি উমা সনে যুক্ত সেই শান্ত মহেশ্বরে,
নীলকণ্ঠ ত্রিনয়ন বিশ্বধাতা পরম ঈশ্বরে
ধ্যান করি হৃদিপদ্মে যতচিত্ত মুনিগণ করেন গমন
অজ্ঞানের পারে, যেথা সর্বসাক্ষী পরমাত্মা জগৎ-কারণ॥

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥ ৮
স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ৯

—কৈবল্যোপনিষদ্

(বিশ্ব হতে বহু দূরে ধ্যানের গভীর দেশে করিয়া গমন
সর্বত্যাগী মুনিগণ যে সত্তারে করেন দর্শন
এ বিশ্ব রূপেও তিনি—সর্বসাক্ষী পরমাত্মা জগৎ-কারণ।)

এ বিশ্ব তাঁহারই রূপ—তিনিই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, হর,
স্বমহিমা-সমুজ্জ্বল সর্বোত্তম তিনিই অক্ষর,
তিনিই পালনকর্তা, প্রাণ, কাল, চন্দ্রমা, অনল,
যা-কিছু রয়েছে বিশ্বে, সম্ভাব্যও পরে যা-সকল
তিনিই সে-সব, নিত্য—সর্বকালে বিদ্যমান আপন বিভায়।
তাঁহারে জানিয়া শুধু মরণের পারে যাওয়া যায়
(জন্ম-মৃত্যু-পাশ হতে) মুক্তিলাভে নাহি আর দ্বিতীয় উপায়॥

কথাপ্রসঙ্গে

'সাকারও, নিরাকারও'

প্রত্যক্ষই জ্ঞান। বিশ্বাস আমাদের পথের অবলম্বন; বিশ্বাস ছাড়া আমরা জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসরই হইতে পারি না। যুক্তি-বিচার হইল মনের সংশয় কাটাইয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় সেই বিশ্বাস আনিবার সহায়ক মাত্র; প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া আবার কোনওরূপ যুক্তিবিচারের সৌধও গড়িয়া উঠিতে পারে না। যুক্তিবিচারের কাজ মনে বিশ্বাস জাগানোতেই শেষ। বিচার সত্যলাভের একটি পথও বটে; কিন্তু আমরা যেন না ভুলি, সে-বিচার হইল বিশ্বাস আসিবার পর তাহাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবারই চেষ্টা মাত্র, সত্যাসত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা নহে। সে-বিচারও যতক্ষণ আমরা করিতেছি, জ্ঞান হইতে আমরা বহুদূরে। প্রত্যক্ষই জ্ঞান, যাহা বিচারের সীমার অতীত।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় যাহাদের সহজাত বিশ্বাস আসিয়াছে, এবং ভগবানলাভের জন্য যাহারা বিচার-পথ ছাড়া অন্য পথে চলিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিচারের প্রয়োজন খুব বেশী নেই।

'বিচারের দৃষ্টিতে' ঈশ্বরের স্বরূপ নিরাকার, তাঁহার সাকারত্ব 'বিচারের দৃষ্টিতে' একটু নিম্ন-স্তরের কথা। কিন্তু বহু পথ ধরিয়া চলিয়া ভগবানকেবহু ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "তিনি সাকারও বটে, নিরা-কারও বটে, আবার তা ছাড়া কি তা কে জানে! তাঁর ইতি করা যায় না"; বিচার করিয়া, এমন কি কেবল তাঁহার নিরাকার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াও একথা কখনো বলা চলে না তিনি কেবল নিরাকারই, সাকার বা অন্য কিছু নহেন। আবার কেবল তাঁহার সাকার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াও বলা চলে না যে তিনি কেবল সাকারই, অন্য কিছু নহেন। "তোমায় বলছি, রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস ক'রো না। রূপ বিশ্বাস কর।" যে দর্শন করেছে সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।"

যুক্তি-বিচার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপকে নির্গুণ নিরাকার অদ্বৈত সত্তা ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যুক্তি-বিচার জ্ঞান নহে, জ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যাঁহার উপলব্ধি "বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে", সেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'তিনি সাকারও, নিরাকারও' এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিবৃতিতে আক্ষরিক অর্থেই যাঁহারা দৃঢ়বিশ্বাসবান, কেবল তাঁহাদেরই জন্য শ্রীরাম-কৃষ্ণের অন্যান্য কথার পটভূমিতে এ প্রসঙ্গ, যুক্তি-বিচারের সাহায্যে ইহার বিশ্লেষণ করিবার জন্য নহে।

জ্ঞান মনবুদ্ধির সীমার অতীত

যাহাকে ভগবান বলি, ব্রহ্ম বলি, বা আত্মা বলি তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে মনবুদ্ধির সীমানায় কোন ধারণাই হয় না। তাহা বাক্যমনের অতীত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য বলিয়াছেন তিনি শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, "শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা।" আমাদের জানা, দেখা, শোনা বা কল্পনা করা, কোন কিছুর সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব। কারণ এ সবই

হইল মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া তাঁহার যে প্রকাশ তাহাই, যে 'আমি' এসব দেখে শোনে সে-ও তাহাই। যেমন, একটি রঙীন কাঁচের চিমনির ভিতর একটি বর্ণহীন আলো জ্বলিতেছে। যতক্ষণ ঐ রঙীন কাঁচটির ভিতর দিয়া আলোক প্রকাশিত হইবে, ততক্ষণ ঐ আলোয় উদ্ভাসিত বস্তুসমূহকে এবং ঐ আলোর উৎসটিকেও আমাদের রঙীন বলিয়াই বোধ হইবে। রঙীন কাঁচের ওপারে না যাইতে পারিলে আলোটির বর্ণহীন স্বরূপ জানিবার উপায় আমাদের নাই। আমাদের স্বরূপ যেন ঐ বর্ণহীন আলোক, শুদ্ধ-চেতনা, আর মনবুদ্ধি যেন রঙীন কাঁচ। আমরা সাধারণ অবস্থায় যাহাকে 'আমি' বলি তাহা মনবুদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশিত চেতনা, রঙীন আলোক। ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইয়া তাঁহাকেও ইহারই অনুরূপ কিছু বলিয়া ধারণা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। অবশ্য ভগবানের বা আমাদের স্বরূপের প্রকাশকত্ব ও অস্তিত্ববোধ মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া আসিলেও বিলুপ্ত হয় না, বর্ণহীন আলো রঙীন হইলেও উহার প্রকাশশীলতা নষ্ট হয় না। যেমন আমরা যে চেতন সত্তা, ইহাতে আমরা সকলেই নিঃসংশয়, 'আমি আছি' এ বোধ আমাদের স্বতঃসিদ্ধ, ইহার প্রমাণের জন্য আমাদের কোন যুক্তিবিচারের আশ্রয় লইতে হয় না। মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলেও আমাদের চেতনার এই প্রকাশশীলতা ও অস্তিত্ববোধ থাকিয়াই যায়। তবু, আমরা চেতন সত্তা ইহা জানা সত্ত্বেও, আমাদের এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। কারণ মনবুদ্ধিহীন চেতনা কেমন, আমরা আসলে কিরূপ, সে সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের নাই। 'আমি' বা কোন চেতন সত্তা সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে কোন দেহমনবুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাণীর কথাই ধারণায় আসে আমাদের। চেতন সত্তা বলিতে আমরা বুঝি উহা এমন একটি সত্তা যাহা কোন দেহের আশ্রয়ে প্রকাশিত, যাহা নিজের ও জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ, যাহা চিন্তাদি করিতে পারে। ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইয়াও এ অবস্থায় আমরা ইহার বেশী কিছু ধারণা করিতে পারি না, কোনও-না-কোনরূপ দেহ-মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সত্তার কথাই মনে জাগে। সাধারণতঃ আমাদেরই মত একজনের কথাই মনে জাগে, যাঁহার আকার আছে, যিনি আমাদেরই মত অনুভব করেন, যিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন, উহা পূরণ করেন ইত্যাদি (সাকার ঈশ্বর)। বড়জোর ধারণা করিতে চেষ্টা করি, তাঁহার দেহ নাই কিন্তু তিনি মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট—আমাদের প্রার্থনা শুনেন (নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম)। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন অশরীরী চেতন সত্তার কথা ধারণা করিতে যাইলেও কোন-না-কোন একটি আকার অবলম্বন না থাকিলে চলে কি? মন-বুদ্ধির সীমার ভিতর যতক্ষণ আছি, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বা ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার দৌড় এই পর্যন্তই। 'আমি আছি' এ জ্ঞান আমাদের থাকিলেও উহা মনবুদ্ধির রঙ-এ রাঙানো জ্ঞান, আমরা আসলে যাহা তাহার জ্ঞান নহে। স্বামীজী তাই বলিয়াছেন, "এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে; কারণ সে জানে 'আমি আছি'; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। আমরা সকলেই জানি যে 'আমি আছি,' কিন্তু কি করে আছি তা জানি না।" আমরা জানি না যে আমাদের অস্তিত্ব রঙীন কাঁচকে, মনবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া নাই, আছে উহার ভিতরকার বর্ণহীন আলোকে, শুদ্ধ চেতনায়। দেহ তো বটেই, মনবুদ্ধিও না থাকিলে এ অস্তিত্ববোধের,

আমরা আসলে যাহা তাহার কিছুই হইবে না, তাহার বিনাশ নাই কোনকালে।

আমি 'কি করে আছি' তাহা প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। মনবুদ্ধির সীমার ভিতর থাকিয়া কি যুক্তিবিচার, কি কোন প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

শাস্ত্রবাক্যও জ্ঞান নহে

তাই জ্ঞান বলিতে শব্দসমষ্টির বা শাস্ত্রার্থের, সত্যদ্রষ্টাদের বাণীর বৌদ্ধিক ধারণা বোঝায় না, জ্ঞান হইল মনবুদ্ধির অতীত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমারের নিকটে যাইয়া বলিতেছেন, "আমি বহু শাস্ত্র পড়িয়াছি কিন্তু তথাপি আমি শোকগ্রস্ত। জ্ঞানীরা বলেন, আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকাতীত হন। এত পড়িয়াও আমার শোক যায় নাই।" তিনি পড়িয়াছেন, বৌদ্ধিক ধারণায় আনিয়াছেন যে তিনি শোকাতীত সত্তা, কিন্তু তথাপি তিনি শোকগ্রস্ত। কারণ জ্ঞান, শাস্ত্রবাক্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁহার হয় নাই—"আমি 'আত্মবিৎ' নহি, আমি শাস্ত্র মুখস্থ করিয়াছি, যুক্তিবিচার সহ বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই; আমার জ্ঞান এখনো কতকগুলি শব্দমাত্র—আমি 'মন্ত্রবিৎ', সত্যদ্রষ্টা নহি—'আত্মবিৎ' নহি।" আচার্য শঙ্কর তাই বেদান্তাদি শাস্ত্রকেও অবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'অপরোক্ষ অনুভূতি বেদেরও অতীত, কারণ বেদেরও প্রমাণ ঐ অপরোক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথাটি আরো সহজ করিয়া, সরস করিয়া বলিয়াছেন, 'পাঁজিতে লেখা আছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়, তাও না।' গিরিশবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথাটি তাঁহার খুবই মনে ধরিয়াছিল, হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'মশায়, এক ফোঁটাও পড়ে না, না?'

মনবুদ্ধির এই সীমার ভিতরকার জিনিস হইল আমাদের যুক্তিবিচার এবং প্রত্যক্ষদর্শিগণের বাণী বা শাস্ত্রও। প্রত্যক্ষদর্শিগণ যখন মনবুদ্ধির অতীতে যাইয়া সত্যকে উপলব্ধি করিবার পর নিজ উপলব্ধির কথা আমাদের বলেন, তখন মন-বুদ্ধির সীমার মধ্যেই যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই বলিতে পারেন। আর যতটাও বা পারেন, তাহাও বলেন না, কারণ বলিয়া লাভ নাই —"বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বলতেন, তাহলে আমরা বুঝতেই পারতাম না।" তাঁহাদের সেই কথাই শাস্ত্র, সত্য সম্বন্ধে তাহাই প্রমাণ, তথাপি তাহা সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান নহে, সত্যের আভাস মাত্র। 'তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ', 'তিনি মনবুদ্ধির অতীত'—এ সব কথাই তাই। সত্য সম্বন্ধে বলার, চিন্তা করার জন্য এ সবই সর্বোচ্চ কথা, একমাত্র কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু যতক্ষণ মনবুদ্ধির ভিতর আমাদের থাকিতে হইতেছে ততক্ষণ এগুলি আমাদের কাছে শব্দমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহে। বর্ণহীন আলো কোন কালেই যে দেখে নাই, রঙীন আলোকে উদ্ভাসিত বস্তুজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই যাহার জ্ঞানের সর্বস্ব, বর্ণহীন আলোক সম্বন্ধে তাহার ধারণা করাইতে হইলে রঙীন আলোকে আলোকিত জ্ঞানের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে। তাহা আমরা বুঝিব। বর্ণহীন আলো কি? যেসব রঙীন আলোর সহিত আমরা পরিচিত, উহা তাহা নহে— উহা লাল নহে, নীল নহে, হলুদ নহে; মানুষের আসল স্বরূপ বা ভগবান আমাদের

জ্ঞান যাহা কিছুর সহিত পরিচিত তাহা নহেন —জগৎ নহেন, দেহ নহেন, মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, মনবুদ্ধির গুণমণ্ডিত আমাদের সাধারণ অহংবোধও নহেন। কি তবে? কি তাহা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। যে বেলফুলের গন্ধ কখনো শুঁকে নাই, কোন বর্ণনা তাহাকে সে গন্ধ কিরূপ তাহা বুঝাইতে পারে না। যে ঘি কখনো খায় নাই, ঘি-এর আস্বাদের কোন বর্ণনাই তাহাকে সে-আস্বাদ কিরূপ তাহা ধারণা করাইতে পারে না। অজানা কোন কিছু সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে আমাদের মন তাহার পরিচিত জিনিসগুলির সহিত তুলনা করিয়া তাহা বুঝিতে চায় বা পারে। আমরা বিদ্যুতের স্পর্শে শক খাই, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতে বা পাখা ঘুরিতে দেখি, বিদ্যুৎবাহী তার দেখি, মেঘে বিদ্যুৎ-চমক দেখি। এগুলি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ভিতরের জিনিস, বিদ্যুতের স্বরূপ তাহা নহে—বিদ্যুৎ আসলে কিরূপ তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। সে-সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে আমাদের বিদ্যুচ্চমক, আলো, বা পাখা, বা তার, বা এই জাতীয় কোন পরিচিত রূপ মনে ভাসিয়া উঠিবেই।

চলার পথের উপলব্ধি

বিচারের দৃষ্টিতে তাই অদ্বৈত তত্ত্ব ছাড়া আর কোন কিছুই সত্য নহে; এই অদ্বয়তত্ত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান—ভগবানের সাকারত্বও অজ্ঞানের কথা। তিনি 'সাকারও, নিরাকারও' একথা আক্ষরিক অর্থে বিচারের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায় না। বলিতে হয়, তাঁহার রূপ নাই, তাঁহাকে সাকাররূপে যখন দেখিতেছি, তখন সত্য হইতে, জ্ঞান হইতে একধাপ নীচে রহিয়াছি।

বিচারে অদ্বয়তত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াইতে পারে না ইহা ঠিকই, কিন্তু বিচার তো আর জ্ঞান নহে। জ্ঞান হইল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় কেবল একটি উপলব্ধিই, তাহা যত উচ্চই হউক, তাঁহার স্বরূপের 'ইতি' নহে। তাছাড়া, বিচার করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার সময় দেহ-মন বুদ্ধি সত্য নহে, জগৎ সত্য নহে, নামরূপবিশিষ্ট কিছুই, ঈশ্বরের সাকার রূপও সত্য নহে ইত্যাদি ভাবিয়া চলিতে হয়, উপলব্ধির একের পর একটি ধাপ ছাড়িয়া ছাড়িয়াও হয়তো উঠিতে হয়। সত্য প্রত্যক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত, মনবুদ্ধির সীমা—বিচারের সীমা, ভাবের সীমা, ধ্যানের সীমা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত এসবের কোন কিছুই ভগবান নহে, ইহাই উপলব্ধি হয় ঠিকই।

ফেরার পথে

কিন্তু ইহা চলার পথের কথা। সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ফেরার পথে এই দেহমনবুদ্ধি-অহংকে এবং জগৎকে অন্যরূপ দেখা যায়। দেখা যায়, এগুলি আছে বটে তবে পূর্বে যেভাবে আছে বলিয়া মনে হইত, সেভাবে নাই। দেহ, মন, বুদ্ধি, জগৎ—এসব নাম রূপ আছে বটে, তবে উহার ভিতর সত্তা হিসাবে সেই অদ্বয় সত্তাই, ভগবানই রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, ছাদে উঠিবার সময় 'এটা ছাদ নয়' বলিয়া একটির পর একটি সিঁড়ি ছাড়িয়া ছাড়িয়া উঠিতে হয়; ছাদে উঠিলে দেখা যায়, ছাদ যাহা দিয়া তৈরী, সিঁড়িও সেই একটি বস্তু দিয়া, চুণ সুরকি দিয়া তৈরী। কিন্তু নামরূপ? উহা সত্য নয় বলিয়া বোধ হইলেও উহা তো রহিয়াছে। মরীচিকাকে সত্য বলিয়া বোধ হইবার সময় উহাকে সত্য জল বলিয়া বোধ হয়; উহা মরীচিকা ইহা

বুঝিবার পর উহাকে আর সত্য জল বলিয়া বোধ হয় না ঠিকই. কিন্তু জলের রূপ একটি দেখা যায় তখনো। তিনিই জীব-জগৎ হইয়া রহিয়াছেন দেখা যায়, সত্তা হিসাবে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই দেখা যায়, কিন্তু জীব-জগতের রূপ, অসত্য বলিয়া বোধ হইলেও, থাকিয়া যায়।

ফেরার পথে ইহা একটি উপলব্ধি—তাঁহাকে কেবল নিরাকার রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিবার পরের উপলব্ধি, বহু সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ করা উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু একভাবে নয়, সাকার নিরাকার সর্ববিধ ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—চিনির পাহাড়ের কেবল একটি দানা নয়, অনেকগুলি দানার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারই অন্যতম উপলব্ধি—"তিনি সাকারও, নিরাকারও" ইহা যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতে চাই আমরা, তাহা হইলে বোধ হয় ইহাই ধরিয়া লইতে পারি যে, তিনি শুধু জীব-জগতের বা সাকার ঈশ্বরের সত্তাকেই ভগবান রূপে নয়, সেগুলির রূপকেও ভগবান বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। "কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন, এ সন্দেহ মনে উঠে।" "যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ।"

এরূপ ধরিয়া লইলে বলিতে হয় জগৎ বা আমাদের দেহমনাদি তাঁহার প্রতিমা বা মন্দির নয়, তিনিই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, স্বামী বিবেকানন্দেরও এরূপ একটি অনুভূতির বিবৃতি দিয়াছেন ভগিনী নিবেদিতা: "এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ, তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু তিনিই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।"

মোটের উপর কথা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই কথা ও উপলব্ধি অনুযায়ী "তাঁর ইতি করা" যায় না। বিচার করিয়া বলা চলে না তিনি নিরাকারই, সাকার হইতে পারেন না। "দেখেছি বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়, আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক।" "সাকার রূপও দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়, তা তোমায় বোঝাব কেমন ক'রে?" তাছাড়া বিচার জ্ঞান হইতে বহু দূরে, প্রত্যক্ষই জ্ঞান।

মনবুদ্ধির অতীত সত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথাই প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যাঁহার উপলব্ধি তাঁহার নিজের কথা অনুসারেই "বেদবেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে", স্পষ্টাক্ষরে নিজ উপলব্ধির কথা বলিতেছেন, "যে দেখেছে, সে ঠিকই জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায় না।" "বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে,...চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনো নিত্য হতে লীলাতে থাকে, কখনো লীলা হতে নিত্যে।" "নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।" "যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।" "আমি তাই সাক্ষাৎ দেখেছি, বিচার আর কি করবো? আমি দেখেছি তিনিই এই সব হয়ে রয়েছেন, জীব জগৎ সবই।"

মিস্ ম্যাকলাউডের অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী সারদানন্দকে লিখিত)

[ইংরেজী হইতে অনূদিত]

১৫ই আগষ্ট, '২০

হল্‌স ক্রফ্‌ট্‌

ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন

Dearest II,

শ্রীশ্রীমায়ের ২১শে জুলাই* তারিখে দেহত্যাগের সংবাদ প্রথমে মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে পাই, পরে বশীও জানিয়েছে—মঠে শেষকৃত্য সমাধা হবার পর ফিরে গিয়ে। সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল,—আধুনিক হিন্দু নারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ! আমার কাছে তাঁর জীবন হল অসীম উৎসাহের জীবন—যা আমাদের সবাইকে সেই শরণদায়ী সহানুভূতিভরা জীবনতলে একত্র করেছে, যা নতুন প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ ঋজু প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন আদর্শের নজির সৃষ্টি করেছে! ওঃ, তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে গেছেন—আমাদেরও অবশ্য তাই-ই করতে হবে—তাঁর নয়, আমাদের স্বকীয় (জীবনের নজির সৃষ্টি)! আর অন্য কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না।

আপনার বিশ্বস্ত ও প্রীতিভাজন

জে. ম্যাকলাউড

---

* ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭ রাত্রি দেড়টা

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রে

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামী বিবেকানন্দের হিমালয় আশ্রমের স্বপ্ন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চাঙ্গের মুখপত্রের কল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে প্রথম-দিকে তিনজন উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনোৎসর্গের কথা স্মরণ করতে হয়; এঁদের দুইজন ইংরাজ—ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, তৃতীয় জন ভারতীয়—স্বামী স্বরূপানন্দ। স্বামীজীর জীবনীতে এঁদের জীবন ও সাধনার বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ আছে। সেই সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জানুআরি, ১৯৫০ সংখ্যার '*Fifty years of Advaita Ashrama*' এবং *Advaita Ashrama ; Mayavati : Early years*' (*A pilgrim*'- লিখিত) প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য। স্বামী অভজ্ঞানন্দ-প্রণীত 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থেও স্বামী স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কিছু সংবাদ আছে। এইসব রচনা থেকে, অন্য সূত্র থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে সংক্ষেপে উপস্থিত করব।

'প্রবুদ্ধ ভারত' দ্বিতীয় পর্যায়ে অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যাবে বলে স্বামীজীর মনে অদ্বৈত আশ্রম-সম্বন্ধীয় চিন্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে অবশ্যই আমরা স্বামীজীর হিমালয়প্রীতির বিষয়ে বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করছি না। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অধ্যাত্মস্বভাবে সমতলের নন, হিমালয়েরই সন্তান; হিমালয়ের অদ্বৈতকে সমতলের দ্বৈতের মধ্যে স্থাপন করাই তাঁর জীবনব্রত।

হিমালয়ে একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রথমাবধি জাগরূক ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসার পরে যখন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘটল, তখন থেকে এই আশ্রম স্থাপনের অভিপ্রায় ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্যাপ্টেন জে এইচ সেভিয়ার এবং মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার দীর্ঘদিন ধরে সত্যসন্ধানী, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বাঞ্ছিত সত্যকে খুঁজে পাননি, একদিন জনৈক বন্ধুর কাছে এক হিন্দু যোগীর কথা শুনেছিলেন, যিনি তখন লণ্ডনের এক বক্তৃতাকক্ষে জ্ঞানযোগের উপর ভাষণ দিচ্ছেন,—সেভিয়ার দম্পতি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তেত্রিশ বছরের প্রদীপ্ত তারুণ্যের কণ্ঠে ধ্বনিত অনন্ত জীবনের ও সত্যের বাণী—অদ্বৈত দর্শন। "অল্পভাষী, মধ্যবয়সী ভিক্টোরীয় ইংরাজ ক্যাপ্টেন ভাবলেন, এই তরুণবয়স্ক মানুষটি যা বলছেন, তা কি ইনি বুঝেছেন?" বক্তৃতাশেষে মিস ম্যাকলাউডকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই তরুণটিকে আপনি জানেন? এঁকে দেখে যা মনে হচ্ছে, ইনি কি তাই?" "নিশ্চয়ই"—দ্বিধাহীন কণ্ঠে মিস ম্যাকলাউড বললেন। "তাহলে এঁকে আমরা অনুসরণ করব—

ঈশ্বরের পথে"—তাঁদের আরও দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত। এই প্রৌঢ় দম্পতির পক্ষে ঐ সিদ্ধান্ত আপাততঃ বিস্ময়কর মনে হলেও তা অনিবার্য ছিল, কারণ "সারা জীবন এই মানুষটিকে এবং এঁর দর্শনকে আমরা খুঁজে এসেছি।" স্বামীজীও প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মিসেস সেভিয়ারকে মাতৃসম্বোধন করে সরাসরি বললেন, "আপনারা ভারতবর্ষে চলুন না কেন? আমার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি আপনাদের আমি দেব।" অতঃপর গুরু বিবেকানন্দ সেভিয়ার দম্পতিকে অদ্বৈত সত্য দান করবেন, এবং উক্ত দম্পতি তাঁদের তরুণ গুরুকে দেবেন পিতা ও মাতার স্নেহ এবং শিষ্য-শিষ্যার অখণ্ড আনুগত্য ও সেবা।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণকালে স্বামীজী যখন আলপস্‌ পর্বতের তুষারভূমিতে বিচরণ করছিলেন, তখন স্বতঃই হিমালয়স্মৃতি তাঁর মনে ফিরে এসেছিল। হিমালয়ে মঠ স্থাপনের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। জীবনের কর্ম যখন সাঙ্গ হবে, হিমালয়-আবাসে তিনি চলে যাবেন, শান্তির মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যেরা একসঙ্গে থাকবে, তাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন; তারপর ভারতীয়রা যাবে পাশ্চাত্যে বেদান্ত শিক্ষা দিতে, পাশ্চাত্য শিষ্যরা ভারতে থেকে যাবে এখানকার মানুষের কল্যাণকার্যে। সেভিয়াররা স্বামীজীর কথা অবশ্যই শুনেছিলেন। "এ যদি করা যায় কী অপূর্ব হবে স্বামীজী! এমন একটি মঠ করতেই হবে।"[১]

সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন, এবং ১৮৯৭ সালের মে মাসে আলমোড়ায় গিয়ে স্বামীজী জনসভায় হিমালয়-কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলেছিলেন।[২]

---

১ এই সময়কার নানা পত্রে স্বামীজীর হিমালয় আশ্রমের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে। ৫ অগস্ট, ১৮৯৬, সুইজারল্যাণ্ড থেকে লালা বদ্রী শা'কে লেখেন, "আলমোড়ায়, কিংবা আরও ভাল হয় কাছাকাছি অন্য জায়গায় একটি মঠ করতে চাই। ...আলমোড়ার কাছে মঠস্থাপনের উপযোগী বাগান-সুদ্ধ এ রকম জায়গা আপনার সন্ধানে আছে? একটা গোটা পাহাড় পেলে ভাল হয়।"

ঐ বছরে ২১ নভেম্বরে লণ্ডন থেকে এঁকেই আবার লিখলেন, "মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আলমোড়ায় বসবাস করতে যাচ্ছেন। এঁরা আমার শিষ্য-শিষ্যা আপনি জানেন, হিমালয়ে আমাদের জন্য এঁরা মঠ স্থাপন করে দেবেন। এইজন্যই আপনাকে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে বলেছিলাম। একটা গোটা পাহাড় চাই, তার সামনে তুষার-শৃঙ্গমালা খোলা থাকবে।"

২০ নভেম্বর আলাসিঙ্গা পেরুমলকে—"মিঃ সেভিয়ার এবং তাঁর পত্নী আলমোড়ার কাছে একটি স্থান সংগ্রহ করছেন সেখানে আমাদের হিমালয়-কেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা। এখানে পাশ্চাত্য-শিষ্যরা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হিসাবে বাস করবে।"

২৮ নভেম্বর হেল-ভগিনীদের—"সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি ও হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতার একটা গোটা পাহাড়ের উপর এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল থাকবে, আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডা হবে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ঐখানে থাকবেন এবং ঐটি ইউরোপীয় কর্মিগণের কেন্দ্র হবে।"

২ আলমোড়ায় প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রে স্বামীজীকে কলিযুগে 'আর্যবংশীয়গণের নেতা' বলে সম্বোধন করা হয়—"শ্রীশঙ্করাচার্যের পরে এদেশে আর কেহ কখনো যে-চেষ্টা করেন নাই, আপনি সেই গুরুতর কার্য-সমাধা করিয়াছেন।" স্বামীজী হিমালয়ে মঠস্থাপনে অভিলাষী, এই সংবাদে প্রভূত আনন্দ প্রকাশ করে বলা হয়—"আচার্যপ্রবর শঙ্করও তাঁহার আধ্যাত্মিক বিজয়ের পর সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।" অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী হৃদয় উজাড় করে হিমালয়বন্দনা করেন।—"আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে-ভূমির বিষয়ে ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি।

কিন্তু অবিলম্বে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি,[৩] তখন সাময়িকভাবে আলমোড়া শহরেই একটি আশ্রয় সংগ্রহ করে নিতে হয়েছিল, কারণ আশু গুরুতর প্রয়োজন। প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশই সেই 'প্রয়োজন'। হিমালয় কেন্দ্র এবং সংঘের মুখপত্র প্রকাশের কেন্দ্র ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়ে গেল। স্বামীজী দেখলেন, হিমালয় আশ্রমের সঙ্গে বহিরঙ্গ কর্মরূপে পত্রিকার কাজটি জুড়ে দিলে জ্ঞান ও কর্মের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটবে। ১৮৯৮, ১৭ জুলাই শ্রীনগর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—"আলমোড়ায় কাগজটা বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়, কারণ সেভিয়ার বেচারা একটা কাজ পায় এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়।"

স্বামীজী ক্যাপ্টেন সেভিয়ার প্রভৃতির সঙ্গে আলমোড়া শহরে 'টমসন হাউস' নামক একটি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করছিলেন ১৮৯৮ সালের মে-জুন মাসে। এখানে হ্যাণ্ড প্রেসের ব্যবস্থা করে ফেললেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার. এবং ১৮৯৮ সালের অগস্ট মাসে প্রবুদ্ধ ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা বেরুল টমসন হাউস থেকেই, সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ, ম্যানেজার ক্যাপ্টেন সেভিয়ার। স্বামীজীর দুটি কবিতা এই সংখ্যাতে বেরিয়েছিল—প্রথমটি *To the Awakened India*, অর্থাৎ 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি', দ্বিতীয় কবিতা '*Requiescat in Pace*' বা 'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম।' একটি কবিতায় তিনি নূতন ভারতের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, অন্য কবিতায় এই নূতন ভারতের জন্য যে মহাপ্রাণ বিদেশী প্রাণোৎসর্গ করে গেলেন, সেই গুডউইনের জন্য পরম শান্তি প্রার্থনা করেছিলেন। নূতন ভারত বলি চায়,

---

এই সেই পবিত্র ভূমি, যথায় ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু আত্মা শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, ইহার গভীর গহ্বরে, ইহার দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে ... অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল। ... ইহাই সেই ভূমি, অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি। .. আমার প্রাণের বাসনা, এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইব।" হিমালয় বৈরাগ্য দান করে, জীবনের সকল ভয় হরণ করে, হিমালয়ের কোলে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যবোধ লুপ্ত হয়, সুতরাং সার্বভৌমিক ধর্মশিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান এইখানেই হওয়া সম্ভব। হিমালয়ে মঠস্থাপন-প্রসঙ্গে স্বামীজী এইসব কথা বলেছিলেন—"আমার মাথায় এখনো হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সংকল্প আছে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটিই কেন সার্বভৌমিক ধর্মশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করিয়াছি, তাহা সম্ভবতঃ তোমাদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া অবশ্যই চাই—*এ কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না*—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে।" ('আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর')

৩ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী ১০ অক্টোবর, ১৮৯৭, তারিখে মরী থেকে লেখেন—"ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসূরীর নিকট বা অন্য কোনো central জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হতে দু'তিন জন এসে জায়গা select করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাবেন। .. ভাব এই যে, খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। ডেরাডুন গরমী কালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসূরী itself শীতকালে বোধহয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ বৃটিশ বা গাড়োয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারোমাস জল চাই নাইবার-খাবার জন্য। এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়ার তোমায় খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছে।"

প্রাণবলি, যে দেবে সেই ধন্য—বিবেকানন্দের কবিতা দুইটির মধ্যে ছিল তারই ইঙ্গিত।

আলমোড়ায় থাকাকালে প্রবুদ্ধ ভারতের চিন্তা স্বামীজীর মনকে কতখানি অধিকার করেছিল, তার কিছু বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা 'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' গ্রন্থে।—

"এই সময়ে (জুন জুলাই, ১৮৯৮) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে মাদ্রাজ থেকে প্রবুদ্ধ ভারতের স্থানান্তর ব্যাপারটি আমাদের সকলের মন অধিকার করেছিল।[৪] এই কাগজটির প্রতি স্বামীজীর সব সময়েই বিশেষ ভালবাসা ছিল—যে চমৎকার নাম তিনি এই পত্রিকাটিকে দিয়েছেন, তার থেকেই তা বোঝা যায়। তাছাড়া নিজস্ব মুখপত্র-প্রবর্তনেও তিনি সর্বদা উৎসুক ছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষায় এই পত্রিকার মূল্য তাঁর কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পত্রিকার মারফত তাঁর আচার্যের ভাবনা ও বাণী ছড়িয়ে পড়বে, যেমন তা ছড়াবে প্রচার ও কর্মের দ্বারা। সুতরাং নিজস্ব পত্রিকাদির বিষয়ে তাঁর দিনের পর দিন চিন্তা, যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজের বিষয়ে। দিনের পর দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির বিষয়ে কথা বলেছেন। এক অপরাহ্নে যখন আমরা একত্র বসে আছি, তিনি একটি কাগজ এনে হাজির করলেন, যাতে 'তিনি একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রূপ দাঁড়িয়েছে'—(*To the Awakened India* কবিতায়)।"

প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে নিবেদিতার যোগদানের কথাও উঠেছিল। নিবেদিতা-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে *Wanderings* গ্রন্থের পরিশেষে সংযোজিত অংশ থেকে পাই—

"The *Prabuddha Bharata*'s first number had just arrived, and there was so thought of despatching Nivedita to Almora to help the Editor."

আলমোড়ার ক্যানটনমেণ্ট শহর ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে খুশী করতে পারছিল না। স্বামীজীর স্বপ্নের হিমালয় আশ্রম নিশ্চয় আলমোড়া শহরে স্থাপিত হতে পারে না। উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের চেষ্টা চলছিলই। অবশেষে তা মিলল, 'লাজুক ক্যাপ্টেন এবং তাঁর কল্পনা-প্রবণ পত্নী' জায়গাটি দেখে খুশী হলেন। আলমোড়া শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, একেবারে নির্জনে, সত্যই একটি গোটা পাহাড়ের উপরে সেই স্থানটি। আগে ছিল চা-বাগানের সম্পত্তি, মালিক ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

সাত হাজার ফুট উঁচু স্থানটি, কয়েক শো ফুট উঁচুতে একটি সুন্দর অগভীর হ্রদ, সামনে খোলা হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গমালা, অসীম নির্জনতা, যা দীর্ঘ উন্নত দেওদারের গভীর নিঃশ্বাসে মথিত হয় দিনে-রাতে—এমনই স্থানে, শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মদিনে, ১৮৯৯ সালের ২১ মার্চ অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হল। জায়গাটির নাম ছিল মায়াপট, বদলে করা হল মায়াবতী। সবচেয়ে নিকটের রেল স্টেশন সেখান থেকে ৬০ মাইল দূরে।

অদ্বৈত আশ্রম এবং প্রবুদ্ধ ভারত কার্যালয় একই সঙ্গে। প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি ছোট প্রেস কিনে হাজির করা হল, কয়েক জন কর্মী রইলেন, প্রধান হয়ে রইলেন অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দ এবং অবশ্যই

---

৪ নিবেদিতা এখানে তথ্যগত ভুল করেছেন। মায়াবতী আশ্রম ঐকালে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মায়াবতী নয়, আলমোড়াতে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র স্থানান্তর বিষয়ে তাঁরা সকলে চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের মুখ্য স্থপতি ক্যাপ্টেন সেভিয়ার (যিনি নামে ম্যানেজার) এবং তাঁর পত্নী মিসেস সেভিয়ার।

লোকালয় থেকে বহু দূরে সেই নির্জন পর্বতে বসে পত্রিকা চালানো যতখানি কর্ম তার থেকে বেশী সাধনা একথা না বললেও চলে, সবটাই ছিল একটি অখণ্ড আত্মানুসন্ধানের এবং লব্ধ অধ্যাত্ম-সম্পদের বিকিরণ-প্রয়াস, কিন্তু তাই বলে পত্রিকার মান নেমে ছিল না, স্বরূপানন্দ তা হতে দেননি আপ্রাণ চেষ্টায়। স্বামীজী ভারী খুশী হয়েছিলেন, নিউইয়র্ক থেকে অগস্ট, ১৯০০ তারিখে এক শিষ্যকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "স্বরূপকে বলবি, আমি তার কাগজ চালানতে বিশেষ খুশী। He is doing splendid work।"

প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটছে, কিন্তু অদ্বৈত আশ্রমকে যিনি বাস্তবে সম্ভবপর করেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের চরম বলিদানের কথা এখানে না বলে পারছি না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁর এই স্বপ্নের আশ্রমেই দেহত্যাগ করেন। প্রায় কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁর জন্য করা যায়নি, নিরুপায় পত্নীর চোখের সামনে স্বামীর জীবনদীপ নিভে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেনের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হিন্দুমতে তাঁর সংকার করা হয়, মায়াবতী আশ্রমেরই নিম্নপ্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর পারে—যেখানে গাছে-লতায়-পাতায় জড়ানো আচ্ছন্ন শান্তি এবং অশ্রান্ত জলকলতান—কোনো স্মারক চিহ্ন নেই, কারণ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার সত্যই অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

ক্যাপ্টেনের দেহত্যাগের সময়ে স্বামীজী বিদেশে ছিলেন, কিভাবে যেন তাঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, অজানা আকর্ষণে দ্রুত ভারতে ফিরে এসেছিলেন, জানুয়ারী মাসের বরফ-পড়া দিনে ছুটে গিয়েছিলেন মায়াবতীতে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, স্বামীজীর সেই বেপরোয়া ভালবাসা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের পরমতম স্মৃতিসম্পদ—সে কাহিনী এখানে বলার প্রয়োজন নেই, বিবেকানন্দ-জীবনীর একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় তা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার চলে গিয়েছিলেন; থেকে গিয়েছিলেন মিসেস সেভিয়ার, বৈধব্যের শুভ্রবাসে, চিরশুভ্র তুষার রাজ্যের দিকে দৃষ্টি মেলে, আশ্রম-মাতা তিনি, শুধু আশ্রমের নন, আশপাশের সমস্ত গ্রামবাসীদেরও তারা তাঁকে 'দেবী' বলত আরও ১৭ বছর আশ্রমে কাটিয়েছিলেন, সেই নির্জনে কী করে কাটাতেন, এক বাক্যে তার উত্তর দিয়েছিলেন একবার,—"যখন মনে ভার নামে, আমি স্বামীজীর কথা ভাবি।"

এই বিবেকানন্দ শুধুই ব্যক্তিমানুষ নন, তিনি একটি সত্যের প্রতিনিধি। "স্বামীজী একটি জানালার মত যার মধ্য দিয়ে অনন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়"—নিবেদিতা একবার লিখেছিলেন। সেই অনন্তকেই 'মাতাজী' লাভ করতেন অদ্বৈত আশ্রমে প্রতি মুহূর্তে।

ইতোমধ্যে আমরা স্বামী স্বরূপানন্দের বিষয়ে কিছু কিছু কথা পেয়ে গিয়েছি। দেখেছি যে, স্বরূপানন্দের সংঘে যোগদানকে স্বামীজী 'অ্যাকুইজিশন' বা রত্নলাভ বলেছেন, নিশ্চয় স্বরূপানন্দের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চরিত্রের মহিমা অনুভব করেই ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু কথা ছিল। স্বরূপানন্দের সন্ন্যাস হয় ২৯ মার্চ, ১৮৯৮ তারিখে। স্বামীজী তখনই মিশনের নিজস্ব পত্রিকার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। স্বরূপানন্দের মধ্যে তিনি নিশ্চয় সেই কল্পনার ভবিষ্যৎ সার্থকতাকে দর্শন করেছিলেন। স্বরূপানন্দের পূর্বনাম

অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐকালে তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ডন' নামক ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদক। অজয়হরি অধিকন্তু কট্টর অদ্বৈতবাদী। স্বামীজী সত্যই একজন খাঁটি অদ্বৈতবাদী চাইছিলেন, যিনি ভক্তিস্রোতে গা ভাসান দেবেন না, রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত এবং রামকৃষ্ণ-ভক্ত হয়েও রামকৃষ্ণ-মূর্তির পূজক হবেন না, যিনি অদ্বৈতবাদী অভারতীয়দের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন, এবং সেই অদ্বৈত ভাবনার দিক দিয়েই রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরাজি পত্রিকাটি চালাবেন। স্বরূপানন্দ স্বামীজীর সেই অকাঙ্ক্ষিত শিষ্য।

স্বরূপানন্দ দীর্ঘজীবী হননি। গুরুর দেহত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর দেহান্ত হয়। *The Mysore Herald* পত্রিকায় (Aug. 28, 1906) তাঁর দেহত্যাগের পরে তাঁর বিষয়ে যা লেখা হয়েছিল তার কিছু অংশ —"The Swami was 38 years of age when he died. He took sannyasam 8 years ago and immediately became the editor of Prabuddha Bharata. He had also been the editor of 'Dawn'. He was a devoted student of Sankaracharya and was very well-known for his Sanskrit and English scholarship."

প্রবুদ্ধ ভারতে স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে যে মূল শোকবার্তা প্রকাশিত হয়, তা হয়তো মাদার সেভিয়ারের রচনা, কিংবা তাঁরই নির্দেশে রচিত। সেই রচনাটিতে অল্পের মধ্যে স্বরূপানন্দের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উচ্চরূপের কথা বলা হয়েছিল—

"...Swami Swarupananda had for some years been President of the Advaita Ashrama, Mayavati, and it was mainly owing to his exertions and zealous help that the monastery was started in March of 1899.

He brought to the Ashrama an earnestness, which compelled attention, and all who came under his influence will be most ready to admit the value of his services, who realise how much high principle and constant effort are involved in fashioning the life of, and in maintaining such an institution.

The inmates were encouraged to meditate and study and also to use their energies in various ways for the good of the community. It was under his able editorship that the Prabuddha Bharat attained to its present wide circulation. What he sought were the attainments of high ideals, which could have emanated from nothing but the greatest and purest aspirations and an inextinguishable belief in the truth of Advaita. He cherished meditation as a clue to which the soul must cling in the labyrinth of this mutable and fleeting world, as the means to inward illumination, to all that is true and eternal. Retirement from active business in the world did not hinder the multiplicity of his interest in any work directed to the spiritual and social advancement of mankind.

The Swami will be remembered by all for his gentleness, forbearance, and strength of character. Never was the voice of personal anger heard from his lips.

These few remarks give but an imperfect hint of the real man as he was to those who knew and loved him, and it was impossible to have any

association with him without respecting and loving him."

আর নিবেদিতা, যিনি একদা স্বরূপানন্দের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন স্বামীজীর নির্দেশে, ধ্যানশিক্ষাও করেছিলেন, স্বরূপানন্দের প্রতি যাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, তিনি স্বরূপানন্দের পরিচয় দিতে প্রবুদ্ধ ভারতে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে ব্যক্তিগত বহু অনুভূতিকে নিবেদন করেছিলেন পূজার আকারে—

"গভীর বেদনার সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। তাঁকে হারিয়ে আমরা কতখানি হারালাম—সদ্য বিয়োগের এই পটভূমিকায় তা এখনই লিখে জানানো সম্ভব নয়, যদিচ এইটুকু জানি যে, ক্ষতি অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস পান। সন্ন্যাসপ্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপর হিমালয় কেন্দ্রের ভার অর্পণ করা হয়। সেইসঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকও হন। সেই অবধি দুই গুরুদায়িত্বের কার্যাবলী তিনি পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে এসেছেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বজাত নানা সম্পর্কের প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতেরা তাঁর পূর্ণ-পরিণত শক্তির কথা জানতেন,—যে মহান জীবনদর্শনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন, তারই প্রচারে ঐ শক্তি সদা-প্রস্তুত ছিল। সংস্কৃতে তাঁর সমূহ পাণ্ডিত্য, এবং তিনি একনিষ্ঠ শঙ্করপন্থী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। এঁর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি যে, বেলুড় মঠে যোগদান করার অব্যবহিত পরেই তিনি এঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন - অন্যান্যের মতো প্রারম্ভিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়নি। স্বামীজীর এই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পরিপূর্ণ-ভাবে রক্ষা করেছিলেন পরবর্তী বৎসরগুলিতে, তাঁর উন্নত অবিচলিত নিষ্ঠাভক্তির অনুসরণে। যারা তাঁর কাছে 'ধ্যান' ও 'যোগ' শিক্ষা করতে আসত, তাদের কাছে তিনি সহৃদয়, ধৈর্যশীল শিক্ষকরূপে দেখা দিতেন—সাহায্য করার, উন্নীত করার অপূর্ব সামর্থ্য যাঁর ছিল। জীবনের সংকটক্ষণে যারা তাঁর উপর নির্ভর করত, তাদের দিতেন নিরন্তর স্নেহপূর্ণ আশ্রয়। আর যে ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মার ব্যাকুল অভিসার—তাঁর জীবন সে সকলেরই মূর্ত বিকাশরূপে প্রতীয়মান হত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে। তথাকথিত ত্যাগ-বৈরাগ্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিকতার আবরণে কাপুরুষতার প্রশ্রয়,—তাঁর ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশীল বুদ্ধি বাস্তব সমস্যার সম্পূর্ণ অনুধাবনে সমর্থ ছিল, তার সমাধানে অকুতোভয় ছিল তাঁর মন।

"আমরা যারা স্বামী স্বরূপানন্দকে জানতাম, বিরাট সম্ভাবনার শীর্ষে উন্নীত তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যান করবার সময়ে একথা ভাবতেই পারি না—সে জীবনের সমাধান হয়েছে মৃত্যুতে। খুলে গেছে দ্বার, গভীর নীরবের, পূর্ণ নৈঃসঙ্গ্যের। আত্মলয়ে চির-আকাঙ্ক্ষী সাহসী আত্মা সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বরিত বেগে। এ-জীবনের চরম ত্যাগে অর্জিত সেই মৃত্যুর মহাসন্ন্যাস নিশ্চয়ই আবার নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নূতন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে তাঁর আবির্ভাবের।"

('নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

প্রবুদ্ধ ভারতের পরবর্তী ইতিহাস অনু-সন্ধানের প্রয়োজন নেই। এখনো জীবিত ও প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি রামকৃষ্ণ সংঘ ও তার বাইরের বহু শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির সাহায্যে ও রচনায় পুষ্ট হয়েছে। স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে স্বয়ং নিবেদিতা কিছুদিন এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনা লিখেছেন। নিবেদিতার অন্যান্য বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিবেদিতার রচনা সম-কালীন ভারতীয় শিক্ষিত মহলে অতি উচ্চ সমাদরের সঙ্গে পঠিত হত। স্বামী বিরজানন্দ বা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের মত শক্তিশালী সন্ন্যাসী প্রবুদ্ধ ভারত ও মায়াবতীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নানা সঙ্কটের সময়ে এবং অনেক পরে স্বামী অশোকানন্দের নির্ভয় মনীষাপূর্ণ রচনাদি এই পত্রিকার পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করেছে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' আজও তার উচ্চ মান বজায় রেখে চলেছে।

আরও কয়েকটি পত্রিকা-সংবাদ

স্বামীজীর চিঠিপত্রের মধ্য থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্তাবিত আরও দু'একটি পত্রিকার সংবাদ এখানে দেওয়া যায়। ইংলণ্ডে ই. টি. স্টার্ডি গোড়া থেকেই পত্রিকাপ্রকাশে উৎসাহী। স্বামীজীর সঙ্গে স্টার্ডির যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি, পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ, তখনই তিনি বেদান্ত বিষয়ক পত্রিকার কথা স্বামীজীর কাছে উত্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৫, ২৪ এপ্রিল তারিখে স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে তাঁকে লেখেন—"পত্রিকা বাহির করা বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু এসব করিবার মতো ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নাই; আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করিতে পারি, মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে পারি। সত্যের উপর আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করিবেন। এবং তিনিই প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাইবেন, আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট হইতে পারি।"

এর পরে আলাসিঙ্গাপ্রমুখ ভক্তগণ যখন মাদ্রাজ থেকে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশ করে উঠতে পারছিলেন না, সে অসামর্থ্যে বিরক্ত স্বামীজী ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন—"আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার ক'রব, মনে করছি।" ধরে নেওয়া যায়, পত্রিকার ব্যাপারে স্টার্ডি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর আরও কথাবার্তা হয়েছে। এর পরে ১৮৯৬ মার্চে স্বামীজী আমেরিকা থেকে আমেরিকায় পরিকল্পিত পত্রিকার বিষয়ে আলাসিঙ্গাকে লেখেন—"এখানে একখানি পত্রিকা চালাব; লণ্ডনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে ওখানেও তাই ক'রব।" একই বিষয়ে স্বামীজী লণ্ডন থেকে ৫ জুন ১৮৯৬ ওলি বুলকে লেখেন-"গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র বার করা সম্বন্ধে তোমাকে এই ডাকে একখানা চিঠি লিখছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখতে হ'লে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর সে যেভাবে কাজ করবার প্রস্তাব করছে, তাকে সেইভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব।" এইখানে উল্লেখযোগ্য, গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ডে ছিলেন; স্টার্ডির সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় স্বামীজী দুঃখের সঙ্গে তাঁকে আমেরিকা যেতে বলেন; এবং স্বামীজী ভাবেন, গুডউইন যদি আমেরিকা যান, তিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমেরিকায় প্রস্তাবিত কাগজটির পরিচালক হতে পারবেন।

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁর পার্শ্বস্থ সকলকে সর্বসময় উদ্দীপ্ত রাখত। ফলে তিনি কাছে থাকলে তাঁর ভক্ত বা সঙ্গীদের কর্মোৎসাহের সীমা থাকত না। স্বামীজী ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে ১৪ জুলাই ১৮৯৬ লিখলেন—"এখানে মুশকিল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত; কারণ সত্যি বলতে গেলে কোন বিদেশীই খাঁটি ইংরেজের মতো তেমন ভাল ইংরাজি লিখতে পারে না এবং খাঁটি ইংরাজিতে লিখলে ভাবের যা বিস্তার হবে, হিন্দু-ইংরাজিতে তা হ'তে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত।"

এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইউরোপ বা আমেরিকায় ভারতবর্ষ থেকে পরিচালিত ইংরাজি ভাষায় পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ইংলণ্ড বা আমেরিকায় সেই দেশীয়দের পত্রিকার উপরই নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিমধ্যে স্টার্ডির পত্রিকার আয়োজন আরও এগিয়েছিল। এবং এ-ব্যাপারে ম্যাক্সমূলার সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন। স্টার্ডিকে লেখা ৫ অগস্ট, ১৮৯৬ চিঠিতে সেই সংবাদ পাই—"ম্যাক্সমূলার আমাদের কার্যধারা জানতে চান, এবং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও খবর চান।··· আশা করি, বড় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ভাল ক'রে ভেবে দেখবে। আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পারা যাবে এবং কাগজখানি নিজেদের হাতেই রাখা যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলার কিপ্রকার কার্যধারা ঠিক কর, তা জেনে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি।" 'Big Magazine' বলতে স্বামীজী এখানে ব্রহ্মবাদিনের কথা বলেননি বলেই মনে হয়।

তাহলেও ইংলণ্ডের পত্রিকার বিষয়ে স্বামীজীর মনে একটা দ্বিধা ছিল। স্টার্ডি-প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা বোধ হয় সব সময়েই বোধ করেছেন। তাছাড়া বাইরে পত্রিকা বের হলে ব্রহ্মবাদিনের সম্ভাব্য ক্ষতি-বিষয়েও তিনি চিন্তা করতে পারেন। এ-বিষয়ে তাই অল্প কয়েকদিন পরেই, ১২ অগস্ট, স্টার্ডিকে লিখলেন, "আজ আমেরিকা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এককেন্দ্রীকরণ—বর্তমান কার্যারম্ভে তো বটেই। আমি তাদের এ পরামর্শও দিয়েছি যে, অনেক-গুলি কাগজ ছাপাবার বদলে তারা ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে আমেরিকায় লেখা কয়েক পাতা জুড়ে শুরু করুক এবং কিছু চাঁদা তুলে আমেরিকার খরচাটা পুষিয়ে নিক। জানি না, তারা কি করবে।"

স্টার্ডি স্বামীজীর কথায় রাজী হননি বলেই মনে হয়। তিনি পত্রিকা বের করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বামীজী তখন ১০ সেপ্টেম্বর তাঁকে লিখলেন—"তোমার মাসিক পত্রিকার পরি-কল্পনায় তিনি (ডয়সন) খুব আনন্দিত এবং এসব বিষয়ে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান; শীঘ্রই তিনি সেখানে যাচ্ছেন।···"

স্টার্ডি কিন্তু যত তাড়াতাড়ি কাগজ বার করবেন ভেবেছিলেন, তা পারেননি। আলাসিঙ্গাকে লেখা এক চিঠিতে (তারিখ শুধু আছে ১৮৯৬) স্বামীজী লেখেন—"স্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনো কাজে পরিণত হয়নি।"

স্টার্ডির কাগজ বেরিয়েছিল, যদিও তার আয়ু স্থায়ী হয়নি। স্বামীজী ২০ নভেম্বর লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গাকে যে পত্র লেখেন, তার মধ্যে সেই সংবাদ আছে। এই পত্রে আন্তর্জাতিক পত্রিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু বক্তব্য পাই—